হুমায়ূন আহমেদ

মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস সমগ্র

মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস সমগ্র

হুমায়ূন আহমেদ

মাওলা ব্রাদার্স ।। ঢাকা

উৎসর্গ

কাদের সিদ্দিকী

বীর উত্তম

প্রসঙ্গ কথা

তখন আমার বয়স মাত্র তেইশ।

আবেগ ও কল্পনায় হৃদয় টইটুম্বুর। বেঁচে থাকাটাই যেন পরম সুখের ব্যাপার। সব কিছুই ভাল লাগে। আকাশের দিকে তাকালে মনে হয় আজকের আকাশটা যেন অন্যদিনের চেয়ে বেশী নীল। গাছের দিকে তাকালে মনে হয় গাছের পাতা এত সবুজ হয় কেন? কারণ ছাড়াই আনন্দে চোখ ভিজে ওঠে। সারাক্ষণ মনে হয় পৃথিবীতে এত সুখ কেন?

ঠিক তখন শুরু হল উনসত্তরের গণ আন্দোলন। বাঁচা মরার যুদ্ধ। ভাবুক কল্পনাবিলাসী একটি যুবকের ধরাবাঁধা জীবন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। কি ভয়াবহ অভিজ্ঞতা! ভাই বোন এবং মা'কে নিয়ে পালিয়ে আছি বরিশালের এক গ্রামে। আশেপাশের গ্রামগুলি পাকিস্তানী সেনারা জ্বালিয়ে দিচ্ছে। যে কোন মুহূর্তে এই গ্রামেও আসতে পারে। কি নিদারুণ আতংক! জীবনানন্দের নদী দিয়ে ভেসে যেত মানুষের লাশ। সারাক্ষণ মনে হত আমি নিশ্চয়ই কোন একটা কুৎসিত স্বপ্ন দেখছি। এই দুঃস্বপ্ন কেটে যাবে। দেখব সব আগের মতই আছে। দুঃস্বপ্ন কিন্তু কাটে না। দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী জগদ্দল পাথর হয়ে বুকের উপর চেপে থাকে।

একদিন খবর এল আমার ভালমানুষ বাবাকে মিলিটারিরা মেরে ফেলেছে। এই খবর পাওয়ামাত্র গ্রামের লোকজন আমাদের বাড়ি থেকে বের করে দিল। আমাদের **কারণে** মিলিটারির কোপানলে তারা পড়তে রাজি নয়। রাতের অন্ধকারে সবাইকে নিয়ে নৌকায় উঠেছি। কোথায় যাব কিছুই জানি না। আহ্ কি কষ্ট, কি কষ্ট!

বরিশাল থেকে কি ভাবে আমার মাতামহের বাড়ি ময়মনসিংহের মোহনগঞ্জে পৌঁছলাম সেই গল্প যন্ত্রণার গল্প। পৌঁছে দেখি সেখানেও একই অবস্থা। মিলিটারিরা ঘাঁটি বসিয়েছে, ধরে নিয়ে যাচ্ছে যুবক ছেলেদের। বাঁচার এক মাত্র উপায় মুক্তি বাহিনীতে যোগ দেয়া। আমি ভীতু ধরনের মানুষ। পারিবারিক বিপর্যয় আমার মনোবলও টুকরো টুকরো করে দিয়েছে। কাজেই মুক্তি বাহিনীতে

যোগ না দিয়ে ছোট ভাইকে নিয়ে চলে এলাম ঢাকায়, কারণ তখন ঢাকা মোটামুটি নিরাপদ এরকম কথা শোনা যাচ্ছে। পাকিস্তান সরকার নাকি চেষ্টা করছে রাজধানীকে স্বাভাবিক দেখাতে।

চেনা ঢাকা নগরী তখন অচেনা। রাস্তায় হাঁটতেও ভয় ভয় লাগে। এই বুঝি ধরে নিয়ে গেল। উঠলাম মহসিন হলে। অল্পকিছু ছাত্র সেখানে আছে। বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়া হয়েছে। আমার কাছে জায়গাটা বেশ নিরাপদ মনে হল।

যখন ভয় একটু কমেছে রাতে ঘুমুতে পারি, বার বার ঘুম ভাঙে না ঠিক তখন মিলিটারিরা আমাকে এবং চার জন ছাত্রকে ধরে নিয়ে গেল। স্থান হল বন্দিশিবিরে।

মুক্তিযুদ্ধকে আমি দেখেছি যুবকের চোখে, এবং দেখেছি খুব কাছে থেকে। জীবন এবং মৃত্যুকে এত ঘনিষ্ঠভাবে কখনো দেখব ভাবি নি। কত বিচিত্র আবেগ, কত বিচিত্র অনুভূতি ! অথচ লেখালেখি শুরু করবার পর অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম এই সব আবেগ ও অনুভূতি আমার লেখায় আসছে না। যেন মুক্তিযুদ্ধ আমার আড়ালে ঘটে গেছে ! মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক আমার প্রথম লেখাটি লেখা হয় মুক্তিযুদ্ধের চার বছর পর। নাম শ্যামল ছায়া। একটি ছোট গল্প যা বাংলা একাডেমী-পত্রিকা উত্তরাধিকারে প্রকাশিত হয়। তার প্রায় এক বৎসর পরে শ্যামল ছায়া নামে একটি উপন্যাস লিখি। একদল মুক্তিযোদ্ধা একটা থানা আক্রমণ করবার জন্যে যাচ্ছে। এই হচ্ছে উপন্যাসের বিষয়। এক রাতের কাহিনী। উপন্যাস হিসেবে হয়তবা উৎরে যায় কিন্তু আমার মন ভরল না। মনে হল আমি পারছি না। স্বাধীনতা যুদ্ধের মত বিশাল ব্যাপার ধরবার মত ক্ষমতাই হয়তবা আমার নেই। মন খারাপ হয়ে গেল। অনেকবার চেষ্টা করলাম মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লিখতে — পারলাম না। কেন পারছি না সেও এক রহস্য। দশ বছর পর লিখলাম 'সৌরভ'— মুক্তিযুদ্ধের সময়কার ঢাকা নগরীর মানুষদের জীবনচর্যার গল্প। আমার কাছে মনে হল অবরুদ্ধ ঢাকা নগরীর কিছুটা সৌরভে ধরা পড়েছে। খানিকটা আত্মবিশ্বাস ফিরে এল। লেখা হল ১৯৭১, আগুনের পরশমণি, সূর্যের দিন। মুক্তিযুদ্ধের বিশালতা এই সব লেখায় ধরা পড়েছে এমন দাবী আমার নেই। দাবী এইটুকুই — আমি গভীর ভালবাসায় সেই সময়ের কিছু ছবি ধরতে চেষ্টা করেছি। কতটুকু পেরেছি তার বিচারের ভার আজকের এবং আগামীদিনের পাঠকদের উপর।

'মাওলা ব্রাদার্স' আমার মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসগুলি একত্র করেছেন, তাঁদের ধন্যবাদ।

২ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯

শহীদুল্লাহ হল
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা

হুমায়ূন আহমেদ

সূচীপত্র

- ☐ শ্যামল ছায়া ·····৯
- ☐ নির্বাসন ·····৫১
- ☐ ১৯৭১ ·····৯২
- ☐ সৌরভ ·····১৫৭
- ☐ আগুনের পরশমণি ····২৩৫
- ☐ সূর্যের দিন ·····৩৩১

শ্যামল ছায়া

আবু জাফর শামসুদ্দীন

নৌকা ছাড়তেই ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়তে লাগলো।

এ অঞ্চলে বৃষ্টি বাদলার কিছু ঠিক নেই। কখন যে হুড়মুড়িয়ে বৃষ্টি নামবে আবার কখন যে সব মেঘ কেটে গিয়ে আকাশ ঝক্‌ঝকে হয়ে উঠবে কেউ বলতে পারেনা।

আমি নৌকার ভেতরে কুণ্ডুলী পাকিয়ে শুয়ে পড়লাম। বেশ শীত করছে। ঠাণ্ডা বাতাসে গায়ে কাঁপন লাগে। নৌকা চলছে মন্থর গতিতে। হাসান আলী নির্বিকার ভঙ্গিতে দাঁড় টানছে। এত বড় নৌকা কি জন্যে নিয়েছে কে বলবে। পানশির মত আকৃতি। দাঁড় টেনে একে নিয়ে যাওয়া কি সোজা কথা?

এখন বাজছে নটা। রাত দুটোর আগে রামদিয়া পৌঁছানো এ নৌকার কর্ম নয়। গুণ টেনে নিয়ে গেলে হয়ত হবে। কিন্তু গুণটা টানবে কে? আমি নেই এর মধ্যে, বৃষ্টিতে ভিজে গুণের দড়ি নিয়ে দৌড়ানো আমাকে দিয়ে হবে না। সাফ কথা।

বৃষ্টি দেখছি ক্রমেই বাড়ছে। বিলের মধ্যিখানে বৃষ্টির শব্দটা এমন অদ্ভুত লাগে। কেমন যেন মন খারাপ হয়ে যায়। মাঝে মাঝে আবার বাতাসে 'হুঅ' 'হুঅ' আওয়াজ উঠছে। প্যাঁচা ডাকার মত। ভয় ধরে যায় শব্দ শুনে। ছেলেবেলায় একবার এ-রকম শব্দ শুনে এমন ভয় পেয়েছিলাম। মানসাপোতার বিলে মাঝি দিক ভুল করেছে। চারদিকে সীমাহীন জল। বড়রা সবাই ভয় পেয়ে চেঁচামেচি করছে। তাদের

হৈচৈএ ঘুম ভেঙ্গে শুনেছি সেই বিচিত্র 'হঅ' 'হঅ' আওয়াজ। আজও সেই শব্দে ভয় ধরলো। কে জানে কেন। আমি কি কোন অমঙ্গলের আশঙ্কা করছি?

কুট কুট করে মশার কামড় খাচ্ছি। এই বিলের মধ্যে আবার মশা কোত্থেকে আসে? হাত পা আর মুখে অল্প কিছু কেরোসিন তেল মেখে নিলে হত। সবাই দেখি তাই করে। হুমায়ূন ভাইও করেন। মশার উৎপাত থেকে বাঁচা যায় তাহলে। কেরোসিন মাখতে ইচ্ছে হয়না আমার। কি জানি বাবা চামড়ার কোন ক্ষতিই করে কিনা। হয়ত গাল টাল ঝলসে কয়লা হয়ে পড়বে। এর চেয়ে মশার কামড় অনেক ভাল। হানড্রেড টাইম্‌স বেটার।

হুমায়ূন ভাইও দেখি আমার পাশে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছেন। তাঁর ধারণা আমি ঘুমিয়ে রয়েছি। মাথায় নীচ থেকে নিঃশব্দে বালিশটা নিয়ে নিলেন। বেশ লোক যা হোক। মজিদ বা আনিস হলে আমি গদাম করে একটা ঘুঁষি মারতাম। পরিষ্কার একটা হাতের কাজ দেখতে পেত। চালাকি পেয়েছ না? বালিশ ছাড়া আমি শুয়ে থাকতে পারিনা। অনেকেই দেখি মাথার নীচে কিছু নেই কিন্তু কেমন ভোঁস ভোঁস করে নাক ডাকায়। আমি পারি না।

বৃষ্টিরতো বড় বাড়াবাড়ি দেখছি। ঝড়টর আসলে বিপদ। সাঁতার যা জানি তাতে তিন মিনিটের বেশী ভেসে থাকা যাবে না। নৌকা ডুবলে মার্বেলের গুলির মত তলিয়ে যাওয়া ছাড়া গতি নেই। অবশ্যি সেটাও খুব একটা মন্দ ব্যাপার হবে না। ওমা হাসি আসছে কি জন্যে বা। সবাইকে চমকে দিয়ে হেসে উঠব নাকি?

হুমায়ুন ভাই দেখি উঠে বসেছেন। মশা কামড়াচ্ছে বোধ হয়। কিংবা কোন কারণে ভয় লাগছে। ভয় পেলেই এ রকম অস্থিরতা আসে। মজিদ বললো—

ঃ কি হুমায়ুন ভাই ঘুম হল না?

ঃ এই ঝড় বৃষ্টিতে ঘুম আসে নাকি? তাছাড়া টেনসনের সময় আমার ঘুম হয় না।

ঃ এক দফা চা খেলে কেমন হয়? বানাবো নাকি?

ঃ বাতাসের মধ্যে চুলা ধরাবে কি করে?

ঃ হাসান মিয়া ধরাতে পারবে। ও হাসা, লগি মেরে নৌকা দাঁড় করাও গো। চা না খেলে জুত হচ্ছে না। এহে তুমিতো ভিজে একেবারে আলুর দম হয়ে গেছ হাসান আলী।

AMARBOI.COM

ভিজে আলুর দম হয়ে যাওয়াটা আবার কি রকম। এ-রকম উল্টা-পাল্টা কথা শুধু মজিদই বলতে পারে। একদিন আমাকে এসে বলছে "জাফর যা পরিশ্রম করেছি একেবারে টমেটো হয়ে গেছি।" পরিশ্রমের সঙ্গে টমেটোর কি সম্পর্ক কে জানে।

নৌকা খুঁটি গেড়ে বসে আছে। এতক্ষণে তাও নৌকার দুলুনিতে বেশ একটা ঝিমুনির মত এসেছিল, সেটুকুও গেছে। ঘন ঘন চা খেয়ে কি আরাম যে পায় লোকে কে জানে। আনিস দেখি আবার সিগারেটও ধরিয়েছে। নতুন খাওয়া শিখেছে তো তাই যখন তখন সিগারেট ধরানো চাই। আবার ধোঁয়া ছাড়ার কত রকম কায়দা। নাক মুখ দিয়ে। হাসি লাগে দেখে। মজিদ বললো—

ঃ আনিস, আমকে একটা ট্রাফিক পুলিশ দাও দেখি। আরে বাবা সিগারেটের কথা বলছি।

ঃ বুঝেছি বুঝেছি, তোমার এইসব ঢং ছাড় দেখি।

বৃষ্টির বেগ মনে হয় একটু কমেছে। হু হু করে বাতাস বইছে ঠিকই। মজিদ বললো—

ঃ জাফর মরার মত ঘুমুচ্ছে, দেখেছেন হুমায়ূন ভাই ?

ঃ হেঁটে অভ্যেস নেইতো, টায়ার্ড হয়ে পড়েছে।

ঃ টায়ার্ড না হাতী। জাফর হচ্ছে কুম্ভকর্ণের ভাতিজা। হেভী ফাইটিং-এর সময়ও দেখবেন মেশিনগানের উপর মাথা রেখে ঘুমুচ্ছে।

সবাই হেসে উঠল হো হো করে। আমার বেশ মজা লাগছে। আনিস বললো, "এক কাজ করি, জাফরের কানের কাছে মুখ নিয়ে মিলিটারী মিলিটারী বলে চিৎকার করে উঠি। দেখি জাফর কি করে।" মজিদ বললো—"দাঁড়া চায়ের পানি ফুটুক তারপর।"

ওদের কথাবার্তা এমন ছেলেমানুষী। হাসি লাগে আমার। কি মনে করেছে ওরা। 'মিলিটারী মিলিটারী' শুনে আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে আমি পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ব নাকি ? সরি, এতটা ভয় আমার নেই। আচমকা শুনলে একটু দিশাহারা হব হয়ত, এর বেশী না। সোনাতলায় একবার মিলিটারীর সামনে পড়ে গেলাম না ? আমি আর সতীশ ধানক্ষেতে রাইফেল লুকিয়ে একটু এগিয়েছি, ওম্নি মুখোমুখি। ভাগ্য ভাল দলের আর কেউ ছিলনা আমাদের সঙ্গে। আট দশটা জোয়ান ছেলে একসঙ্গে দেখলে কি আর রক্ষা ছিল ? দুজন ছিলাম বলেই বেঁচেছি। সতীশ অবশ্যি দারুণ ভয় পেয়েছিল, নারকেলের পাতার মত কাঁপতে শুরু করেছে। আমি নিজেও হকচকিয়ে গিয়েছি। ছজন মিলিটারী ছিল সব মিলিয়ে,

AMARBOI.COM

যেমন চেহারা তেমন স্বাস্থ্য। তারা জানতে চাইল, কোন্ বাড়ীতে কচি ডাব পাওয়া যাবে। আমরা ওদের খাতির করে আজীজ মল্লিকের বাড়ী নিয়ে গেলাম। সতীশ গাছে উঠে কাঁদি কাঁদি ডাব পেড়ে নামালো। তারা মহাখুশী। একটাকার একটা নোট দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে দিল সতীশের দিকে। সতীশ সেই নোট হাতে নিয়ে বত্রিশ দাঁতে হেসে ফেললো—যেন সাত রাজার ধন হাতে পেয়েছে।

প্ল্যান করেছিলাম রাতের অন্ধকারে এক হাত নেব। কিন্তু ওরা সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকলো না। দুপুরের রোদ একটু কমতেই রওনা হয়ে গেল।

বৃষ্টি বোধ করি একেবারেই থেমে গেল। চা বানানো হচ্ছে শুনছি। ওদের 'মিলিটারী মিলিটারী' বলে চেঁচিয়ে ওঠার আগেই উঠে পড়ব কিনা ভাবছি, তখনি অনেক দূরে কোথায় 'হই হই' শব্দ পাওয়া গেল। নিমিষের মধ্যে আমাদের নৌকার সাড়া-শব্দ বন্ধ। চায়ের পানি ফোটার বিজ বিজ আওয়াজ ছাড়া অন্য কোন আওয়াজ নেই। হাসান বললো— 'নৌকা আসতাছে!' একটা শীতল স্রোত বয়ে গেল শরীরে। ধ্বক করে উঠলো বুকে।

কিসের নৌকা কাদের নৌকা কে জানে? মিলিটারীরা অবশ্যি স্পীড বোট ছাড়া নড়াচড়া করে না। তা ছাড়া রাতের বেলা তারা ঘাঁটি ছেড়ে খুব প্রয়োজন ছাড়া নড়েনা। তবে 'রাজাকারের' উপদ্রব বেড়েছে। তাদের আসল উদ্দেশ্য লুটপাট করা। এই পথে শরণার্থীদের নৌকা মেঘালায়ের দিকে যায়। ঐ সব নৌকায় হামলা করলে টাকা-পয়সা গয়না-টয়না পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে অল্পবয়সী সুশ্রী মেয়েও পাওয়া যায়। দূরের নৌকা দেখলাম স্পষ্ট হয়েছে। সেখান থেকে ভয় পাওয়া গলায় কে যেন হাঁক দিল—

ঃ কার নৌকা গো?

আমাদের নৌকা থেকে মজিদ চেঁচিয়ে বললো—

ঃ তোমার কার নৌকা?

ঃ ব্যাপারীর নৌকা। মাছ যায়।

শুনে পেটের মধ্যে হাসির বুদবুদি ওঠে। ব্যাপারী মাছের চালান দেয়ার আর সময় পেল না। আর মাছ নিয়ে যাচ্ছে এমন জায়গায় যেখানে দেড় টাকায় একটা মাঝারি সাইজের 'রুই' পাওয়া যায়। হুমায়ূন ভাইয়ের গম্ভীর গলা শোনা গেল—

ঃ ঐ যে মাছের ব্যাপারী ঃ নৌকা আন এদিকে।

AMARBOI.COM

কি আশ্চর্য, এই কথাতেই নৌকার ভেতর থেকে বহুকন্ঠের কান্না শুরু হয়ে গেল। ছোট ছোট ছেলেমেয়ের গলার আওয়াজও আছে। এই বাচ্চাগুলি এতক্ষণ কি করে চুপ করে ছিল তাই ভাবি। নৌকার ভেতর থেকে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। মজিদ বললো—

ঃ ভয় নাই ব্যাপারী ; নৌকা কাছে আন।

ঃ আপনারা কি করেন ?

ঃ ভয় নাই, আমরা মুক্তি বাহিনীর লোক। আসো এদিকে, কিছু খবর নেই।

"মুক্তি বাহিনী, মুক্তি বাহিনী!" আনন্দের একটা হল্লা উঠলো নৌকা দুটিতে। অনেক কৌতূহলী মুখ উঁকি মারল। এরা হয়ত আগে কখনো মুক্তি বাহিনী দেখেনি, শুধু নাম শুনেছে। মেঘ কেটে গিয়ে আকাশে চাঁদ উঠেছে। চাঁদের আলোয় কৌতূহলী মুখগুলি দেখতে ভাল লাগে।

ঃ নমস্কার গো বাবা সকল। আমার নাম হরিপাল। কাসুন্দিয়ার জগৎপালের নাম তো জানেন। আমি জগৎপালের ছোট ভাই। আমার আর জ্যাঠার পরিবার আছে এই নৌকায়। মোট একুশ জন।

হরিপাল লোকটা বক্যবাগীশ। কথা বলেই যেতে লাগলো। দেখতে পাচ্ছি তার ঘন ঘন তৃপ্তির নিঃশ্বাস পড়ছে। নৌকার ভেতরের ছেলে-মেয়েগুলির কৌতূহলের সীমা নেই। ক্রমাগত উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে। এদের মধ্যে একটি মেয়ের চেহারা এমন মনকাড়া যে চোখ ফেরানো যায় না। আমি বললাম,

ঃ ও খুকী, কি নাম তোমার ?

খুকী জবাব দেবার আগেই হরিপাল বললো—"এর ডাক নাম মালতী। ভাল নাম সরোজিনী। আর এর বড় যে তার নাম লক্ষ্মী। ভাল নাম কমলা। ও মালতী বাবুরে নমস্কার দে।" মালতী ফিক করে হেসে ফেললো। হরি পালকে চা খেতে দেওয়া হল এক কাপ। এত তৃপ্তি করে সে বোধ হয় বহুদিন চা খায়নি। খাওয়া শেষে ভোঁস ভোঁস করে কেঁদে ফেললো। তাদের কাছে আমাদের একটি মাত্র জিজ্ঞাস্য ছিল—শিয়ালজানী খালে কোন নৌকা বাঁধা দেখেছে কিনা। আমাদের একটি দল সেখানে থাকার কথা। কিন্তু হরিপাল বা হরিপালের মাঝি কেউই সে কথা বলতে পারলনা।

হাসান আলী নৌকা ছেড়ে দিল। ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে দাঁড় পড়ছে। হরিপালদের নৌকাকে পেছনে ফেলে এগুচ্ছি, হঠাৎ শুনলাম ইনিয়ে বিনিয়ে সে নৌকা থেকে কে একটি মেয়ে কাঁদছে। হয়ত তার স্বামী নিখোঁজ হয়েছে, হয়ত তার ছেলেটিকে বেঁধে নিয়ে গেছে রাজাকাররা।

AMARBOI.COM

নিস্তব্ধ দিগন্ত বিস্তৃত জলরাশি, আকাশে পরিষ্কার চাঁদ, এ সবের সঙ্গে এই করুণ কান্না কিছুতেই মেলানো যায় না। শুধু শুধু মন খারাপ হয়ে যায়।

এগারোটা বেজে গেছে। দুটোর আগে রামদিয়া পৌঁছানো অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছে। অবশ্যি তা নিয়ে কাউকে খুব চিন্তিতও মনে হচ্ছে না। আনিস দেখি আরেকটা সিগারেট ধরিয়েছে। মজিদ লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছে। হাসান আলী নির্বিকার ভঙ্গিতে দাঁড় টানছে। আমি বললাম—

ঃ হাসান আলী দুটোর মধ্যে পৌঁছতে পারবেতো?

হাসান আলী জবাব দিল না। বিশ্রী স্বভাব তার। কিছু জিজ্ঞেস করলে ভান করবে যেন শুনতে পায়নি। যখন মনে করবে জবাব দেয়া প্রয়োজন তখনি জবাব দেবে, তার আগে নয়। আমি আবার বললাম—

ঃ কি মনে হয় হাসান আলী, দুটোর মধ্যে রামদিয়া পৌঁছব?

কোন সাড়াশব্দ নেই। এই জাতীয় লোক নিয়ে চলাফেরা করা মুশকিল। আমি তো সহ্যও করতে পারিনা। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় দিই রাইফেলের বাঁট দিয়ে মাথায় এক বাড়ি—হারামজাদা ছোটলোক। কিন্তু রাগ সামলাতে হয়। কারণ লোকটা দারুণ কাজের। এ অঞ্চলটা তার নখদর্পণে। নিকষ অন্ধকারে মাঝে মাঝে আমাদের এত সহজে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে গিয়েছে যে মনে হয়েছে ব্যাটা বেড়ালের মত অন্ধকারেও দেখতে পায়। খাটতে পারে যন্ত্রের মত। সারারাত নৌকা চালিয়ে কিছুমাত্র ক্লান্ত না হয়ে বিশ ত্রিশ মাইল হেঁটে মেরে দিতে পারে। আবু ভাই, হাসান আলীর কথা উঠলেই বলতেন 'দি জায়েন্ট।'

AMARBOI.COM

কিন্তু এই এক দোষ, মুখ খুলবে না। কিছু জিজ্ঞেস করলে শূন্য দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে আবার নিজের কাজ করে যাবে। প্রথম প্রথম মনে হত হয়ত কানে কম শোনে। ও আল্লা, শেষে দেখি এক মাইল দূরের ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাকটিও বুঝি তার কান এড়ায় না। কুড়ালখালির কাছে একবার আমাদের সমস্ত দলটি নৌকায় বসে। আবু ভাই সে সময় বেঁচে। তিনি এক নেংটো বাবার গল্প করছেন, আমরা সবাই হো হো করে হাসছি, এমন সময় হাসান আলী বললো—

ঃ লঞ্চ আসতাছে, উঠেন সবাই পাড়ে উঠেন।

আমরা কান পেতে আছি। কোথায় কি—বাতাসের হুস হুস শব্দ ছাড়া কোন শব্দ নেই। আনিস বললো—যত সব বোগাস, তারপর কি হল আবু ভাই? আবু ভাই বললেন,

ঃ গল্প পরে হবে, এখন উঠে পড় দেখি, হাসান আলী যখন শব্দ শুনেছে তখন আর ভুল নেই।

সেবার সত্যি সত্যি দুটি স্পীড বোট বাজারে এসে ভিড়েছিল। হাসান আলীর কথা না শুনলে গোটা দলটা মারা পড়তাম।

আমার অবশ্যি সে রকম মৃত্যুভয় নেই। তবু কে আর বেঘোরে মরতে চায়? আমাদের মধ্যে মজিদ-এর ভয়টাই বোধ হয় সবচে বেশী। কোন অপারেশনে যাওয়ার আগে কোরআন শরীফ চুমু খাওয়া, নফল নামাজ পড়া, ডান পা আগে ফেলা—একশো পদের ফ্যাকরা। গলায় ছোট খাট ঢোলের আকারের এক তাবিজ। কোন পীর সাহেবের দেয়া যা সঙ্গে থাকলে অপঘাতে মরবার বিন্দুমাত্র আশঙ্কাও নেই। ভাবলেই হাসি পায়।

এ রকম ছেলে দলে নেয়া ঠিক নয়। এতে অন্যদের মনের বল কমে যায়। তবে হ্যাঁ, আমি একশোবার স্বীকার করি অপারেশন যখন শুরু হয় তখন মজিদের মাথা থাকে সবচে ঠান্ডা। একতিল বেতাল নেই। আর 'এইম' পেয়েছে কি! তিনটি গুলির মধ্যে তার দুটি গুলি যে টার্গেটে লাগবে এ নিয়ে আমি হাজার টাকার বাজী রাখতে পারি। আমাদের ট্রেনিং দেওয়াতেন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সুবেদার সুরুজ মিয়া। আমরা ডাকতাম বুড্ডা ওস্তাদ। বুড্ডা ওস্তাদ প্রায়ই বলতেন—"মজিদ ভাইয়ের হাত সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেব, আল্লা কি হাত কি নিসানা, জিতা রহ"।

মজিদের মত ছেলের এতটা ভয় থাকা কি ঠিক? মজিদ যদি এ রকম ভয় পায় তো আমরা কি করি? এক রাত্রে ঘুম ভেঙে দেখি সে হাউ মাউ করে কাঁদছে। আমি হতভম্ব। জিজ্ঞেস করলাম—

ঃ কি হয়েছে মজিদ?

ঃ কিছু হয় নাই।

খুব করে চেপে ধরায় বললো—সে স্বপ্নে দেখেছে এক বুড়ো লোক এসে তাকে বলছে "আব্দুল মজিদ তোমার গলায় কি গুলি লেগেছে?" এতেই কান্না। শুনে এমন রাগ ধরলো আমার। ছিঃ ছিঃ একি ছেলেমানুষী ব্যাপার। আমি অবশ্যি কাউকে বলিনি।

পরবর্তী এক সপ্তাহ সে কোথাও বেরলো না। হেন তেন কত অজুহাত। আসল কারণ জানি শুধু আমি। কত বোঝালাম—স্বপ্নতো আর কিছুই নয়, অবচেতন মনের চিন্তাই স্বপ্ন হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু মজিদের এক কথা—তার সব স্বপ্ন নাকি ফলে যায়। একবার নাকি সে স্বপ্নে দেখেছিল তার ছোট বোন পানি পানি করে চিৎকার করছে

AMARBOI.COM

আর সেই বোনটি নাকি কদিন পরই এক্সিডেন্টে মারা গেছে। মরবার সময় 'পানি পানি' করে অবিকল যেমন স্বপ্নে দেখেছিল তেমনি ভঙ্গিতে চেঁচিয়েছে। কি অদ্ভুত যুক্তি।

মৃত্যুর জন্যে ভয় পাওয়াটা একটি ছেলেমানুষী ব্যাপার নয় কি? আমার তাই মনে হয়। যখন সত্যি সত্যি মৃত্যু তার শীতল হাত বাড়াবে তখন কি করব জানি না, তবে খুব যে একট বিচলিত হব তাও মনে হয় না।

তা ছাড়া আমার মৃত্যুতে কারো কিছু আসবে যাবে না। আমার জন্যে শোক করবার মত প্রিয়জন কেউ নেই। আত্মীয়স্বজনরা চোখের পানি ফেলবে, চেঁচিয়ে কাঁদবে, বন্ধু বান্ধবরা মুখ কালো করে ঘুরে বেড়াবে, তবেই না মরে সুখ।

শুনেছি বিলেতে নাকি অনেক ধনী বুড়োবুড়ি বিশেষ এক সংস্থার কাছে টাকা রেখে যায়। এইসব বুড়োবুড়ির কোন আত্মীয়স্বজন নেই। সেই বিশেষ সংস্থাটি বুড়োবুড়ির মৃত্যুর পর লোক ভাড়া করে আনে। ভাড়া করা সেই লোকগুলি গলা ফাটিয়ে বুড়োবুড়ির জন্যে কাঁদে। অদ্ভুত ব্যবস্থা। সত্যি এ রকম কিছু আছে, না শুধুই গালগল্প। আমাদের দেশে এ রকম থাকলে আমিও আগেভাগেই লোক ভাড়া করে আনতাম। তারা সুর করে কাঁদতে বসত—"ও জাফর জাফররে তুমি কোথায় গেলারে" এই কথা মনে উঠতেই দেখি হাসি পাচ্ছে। আমি সশব্দে হেসে উঠলাম। আনিস বললো।

ঃ কি হয়েছে এত হাসি—।

ঃ এম্নি হাসছি।

হঠাৎ হাসান আলী ভয় পাওয়া গলায় বললো—

ঃ লঞ্চের আওয়াজ আসে।

আমার বুক ধ্বক করে উঠলো। তার মানে হচ্ছে আমিও ভয় পাচ্ছি। সেই ভয় যা যুক্তি তর্ক মানে না, হঠাৎ করে এসে আমাদের অভিভূত করে ফেলে। হুমায়ুন ভাই বললেন—

ঃ নৌকা ভেড়াও হাসান আলী।

ছপ ছপ শব্দে দাঁড় পড়ছে। আনিস এবং মজিদ দুজনেই দুটি বৈঠা তুলে নিয়েছে। আমরা এখনো লঞ্চের শব্দ শুনিনি, তবে হাসান আলী যখন শুনেছে তখন আর ভুল নেই।

সাড়াশব্দ শুনে মজিদের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। সে হকচকিয়ে বললো—

AMARBOI.COM

: কি হয়েছে ?

আমি বললাম—

: মজিদ তোমার শ্বশুর সাহেব আসছেন, উঠে বস।

: কে শ্বশুর, কার কথা বলছ ?

হুমায়ুন ভাই বিরক্ত হয়ে বললেন—

: তামাশা রাখ জাফর। হাসান আলী এখনো শুনতে পাচ্ছ ?

হাসান আলী অনেকক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর হাসি মুখে বললো—

: না আর শব্দ পাই না।

খবর পাওয়া গেছে এই অঞ্চলে কিছুদিন ধরেই একটি স্পীড বোট ঘুরে বেড়াচ্ছে। বর্ষার পানিতে খালবিলগুলি যেই একটু ভরাট হয়েছে ওম্নি নামিয়েছে স্পীড বোট। নৌকা করে আমাদের আরো এগিয়ে যাওয়া ঠিক হবে কি না বুঝতে পারছিনা। অবশ্যি রামদিয়া পর্যন্ত কি ভাবে যাব তা ঠিক করবে হাসান আলী। আমাদের রাত দুটোর আগে রামদিয়া পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব হচ্ছে তার। হাসান আলী বললো—

: হাঁটা পথে যাওন লাগব। অল্প কিছু প্যাক কাদা আছে কিন্তু উপায় আর কি ?

মজিদ বললো—

: কয় মাইল পথ ?

: আট নয় মাইল।

: আমার শেয়ালের মত ক্ষিধে লেগেছে, হাঁটা মুশকিল।

আনিস বললো—

: শেয়ালের মত ক্ষিধেটা কি রকম জিনিস ?

: অর্থাৎ মুর্গী খেতে ইচ্ছে হচ্ছে।

মজিদ হো হো করে হেসে ফেললো।

নৌকা থেকে বেরিয়ে এসে দেখি চাঁদ ডুবে গেছে। কিন্তু খুব পরিষ্কার আকাশ। অসংখ্য তারা ঝিকমিক করছে। নক্ষত্রের আলোয় আবছা ভাবে সব নজরে আসে। আনিস বললো—

: দশ মাইল হাঁটা সহজ কর্ম না। হুমায়ুন ভাই অনুমতি দিলে আরেক দফা চা হোক। কি বলেন ?

: বেশতো চা চড়াও।

: হাসান আলী, আদা আছে তোমার কাছে ? একটু আদা চা হোক, গলাটা খুস খুস করছে। জাফর তুমিও খাবে নাকি হাফ কাপ ?

: না, চা খেলে ঘুম হয়না আমার।

AMARBOI.COM

ঃ ঘুমুবার অবসরটা পাচ্ছ কই ?

ঘুমুবার অবসর সত্যি নেই। তবু অভ্যেসটাতো আছে। হুমায়ূন ভাই দেখি নৌকার ছাদে উঠে বসেছে। গুন গুন করছে নিজ মনে। কোন্ গানটা টিউন করছেন কে জানে। ঠিক ধরতে পারছিনা। আহ্ চমৎকার লাগছে। আড়াল থেকে শুনতে বেশ লাগে। অনুরোধ করতে গেলেই সেরেছে। গাইবেন না কিছুতেই। তাঁর কাছ থেকে গান শোনবার সবচে ভাল উপায় হচ্ছে এমন একটা ভাব দেখানো যে তিনি কি করছেন তার দিকে তোমার একটুও নজর নেই। হ্যাঁ এইবার গান শোনা যাচ্ছে—

"শ্যামল ছায়ায় নাইবা গেলে
না না না নাইবা গেলে"

না না বলবার সময় বেশ কায়দা করে গলা ভাঙছেতো! শুনতে খুব ভালো লাগছে। শান্ত হয়ে আছে বিল। বিলের পানি দেখাচ্ছে কালো আয়নার মত। কালো আয়নাটা আবার কি? কি জানি কি। তবে কালো আয়নার কথা মনে হয়। আকাশে অসংখ্য তারা উঠেছে। তারাগুলির জলে ছায়া পড়া উচিত। কি আশ্চর্য, ছায়া পড়ছেনা তো। আকাশে যখন খুব তারা ওঠে তখন নাকি দেশে আকাল আসে। মজিদ বললো—

ঃ সাংঘাতিক ক্ষিধে লেগেছে। খালি পেটে চা খাওয়াটা কি ঠিক ?

হুমায়ূন ভাই গান থামিয়ে বললেন—

ঃ খালি পেটে চা না খেতে চাইলে গোটা দুই ডিগবাজী খেয়ে নাও মজিদ। এ ছাড়া আর কোন খাদ্যদ্রব্য নেই।

আনিস আবার এই শুনেই ফ্যা ফ্যা করে হাসতে শুরু করেছে। এর মধ্যে এত হাসির কি আছে! হুমায়ূন ভাই আবার গুন গুন শুরু করেছেন। তাঁর বোধ হয় মন টন বিশেষ ভাল নেই। কারো সঙ্গে কথা-বার্তা বলছেন না। এম্নিতে তিনি অবশ্যি খুব ফুর্তিবাজ ছেলে। আমার উপর রাগ করেছেন কি ?

আজ ভোরে তাঁর সঙ্গে আমার খানিকটা মন কষাকষি হয়েছে। কিন্তু আমি অন্যায় কিছু বলিনি। শুধু বলেছি মেথিকান্দার এই অপারেশনের দায়িত্ব হুমায়ূন ভাইয়ের নিয়ে কাজ নেই। এতে কি মনে করেছেন তিনি? তাঁর প্রতি আস্থা নেই আমার? তিনি ঠিকই মনে করেছেন। এমন দুর্বল লোকের এরকম এস্যাইনমেন্টের নেতৃত্ব পাওয়া ঠিক নয়। কিন্তু আমাদের সাব সেক্টারে সেকেণ্ড ইন কমাণ্ড কি মনে করে এটা করলেন কে জানে।

AMARBOI.COM

দালাল হাজী মারার ব্যাপারটাই দেখি না কেন। এই লোক কম করে হলেও গোটা ত্রিশেক মানুষ মেরেছে। হিন্দুদের ঘর বাড়ী জ্বালিয়ে একাকার করেছে। মিলিটারী ক্যাপ্টেনের পিছে পিছে কুকুরের মত ঘুরে বেড়িয়েছে। সে যখন হলদিয়ার বাজারে ধরা পড়ল আমাদের হাতে, আমি বললাম, 'গাছের সঙ্গে বেঁধে বেয়োনেট দিয়ে শেষ করে দি।' গ্রামের লোকদের একটা শিক্ষা হোক, ভবিষ্যতে আর কেউ দালালী করবার সাহস পাবে না। হুমায়ূন ভাই মাথা নাড়েন। ক্যাম্পে নিয়ে যেতে চান এ্যারেস্ট করে। পাগল নাকি? সেই শেষ পর্যন্ত গুলি করে মারতে হল। হুমায়ূন ভাই সেই দৃশ্যও দেখবেন না। তিনি নদীর পাড়ে চুপচাপ বসে রইলেন। আরে বাবা তুমিতো মেয়ে মানুষ নও। নাচতে নেমেছ এখন আবার ঘোমটা কিসের? 'You have to be cruel, only to be Kind' আবু ভাই বলতেন সব সময়। আহ্ মানুষের মত মানুষ ছিলেন আবু ভাই। আবু ভাইয়ের লাশ নিয়ে যখন আসলো তখন বড্ড ইচ্ছে হচ্ছিল তাঁর পায়ে চুমু খাই। আবু ভাইয়ের মত মানুষগুলি এত অল্প আয়ু নিয়ে আসে কেন? যুদ্ধ শেষ হলে আবু ভাইয়ের মেয়েটিকে দেখতে যাব। তাকে কোলে নিয়ে বলব—কি বলব তাকে?

হুমায়ূন ভাই দেখি উত্তেজিত হয়ে নেমে আসছেন ছাদ থেকে। কি ব্যাপার, মোটর লঞ্চের আলো দেখা যায় নাকি? আনিস চা ছাঁকতে ছাঁকতে বললো—

ঃ কি ব্যাপার হুমায়ূন ভাই?

ঃ কিছু না। অনেকগুলি উল্কাপাত হল। একটা তো প্রকাণ্ড।

উল্কাপাত শুনেছি খুব অশুভ ব্যাপার। আমার মা বলতেন অন্য কথা। তিনি নাকি কোথায় শুনেছেন উল্কাপাতের সময় কেউ যদি তার গোপন ইচ্ছাটি সশব্দে বলে ফেলে তাহলে সে ইচ্ছা পুর্ণ হয়। এক মজার কাণ্ড হল একদিন। জ্যামিতি বই হারিয়ে ফেলেছি। সন্ধ্যাবেলা বসে আছি বারান্দায়। আকাশের দিকে চোখ। উল্কাপাত হতে দেখলেই বলব "জ্যামিতি বইটা যেন পাই।"

কোথায় গেল সে সব দিন। মায়ের মুখ আর মনেই পড়ে না। একদিন কথায় কথায় অবনি স্যার আমাদের ক্লাসে বললেন—'যে সব ছেলের মনে মায়ের চেহারার কোন স্মৃতি নেই তারা হল সবচে অভাগা।" আমি চোখ বুঁজে ক্লাসের ভেতরই মায়ের চেহারা মনে আনতে চেষ্টা করলাম। একটুও মনে পড়ল না। সে যে পড়ল না পড়লই না। এখনো

AMARBOI.COM

পড়ে না। স্বপ্নেও যে এক আধ দিন দেখব সে উপায়ও নেই। আমার ঘুম এমন গাঢ়—স্বপ্ন টপ্নের বালাই নেই। দুর ছাই।

নেমে পড়েছে সবাই। ওরে বাবারে কি কাদা। কোমর পর্যন্ত কোপে যাবার দাখিল। হাসান আলী আরেকটু হলে গুলির বাক্স নিয়ে নদীতে পড়তো। লাইট মেশিনগানটা সবাই মিলে চাপিয়েছে আমার কাঁধে। নামেই লাইট, আসলে মেলা ওজন। আকাশে গুর গুর মেঘ ডাকছে আবার। বৃষ্টি নামলেই গেছি—মজিদের ভাষায় একেবারে "পটেটো চিপ্‌স" হয়ে যাব।

হুমায়ূন আহমেদ

আজ সারাটা দিন আমার মন খারাপ ছিল ; এখন মধ্যরাত্রি। ছপ ছপ শব্দে কাদা ভরা রাস্তায় হাঁটছি। মনের সঙ্গে সঙ্গে শরীরও বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। এত দিনেও হাঁটার অভ্যেস হল না। আনিস এবং মজিদ কত নির্বিকার ভঙ্গিতেই না পা ফেলছে। এতটুকু ক্লান্ত না হয়েও তারা দশ মাইল হেঁটে পার হবে ; বিপদ হবে আমাকে নিয়ে। জাফরও হাঁটতে পারে না। তবে আমার মত এত সহজে ক্লান্তও হয় না। সমস্ত দলটির মধ্যে আমি সবচে দুর্বল। শরীরের দিক দিয়ে তো বটেই, মনের দিক থেকেও। তবুও আজকের জন্যে আমিই 'কমাণ্ডার'। 'কমাণ্ডার' শব্দটা শুনতে বড় গেঁয়ো। অধিপতি বা দলপতি হলে মানাতো। না, আমি তেমন বাংলা প্রেমিক নই। একুশে ফেব্রুয়ারীতে ইংরেজী সাইন বোর্ড ভাঙার ব্যাপার আমার কাছে খুব হাস্যকর মনে হয়। যে কোন জিনিসের বাড়াবাড়ি আমাকে পীড়া দেয়। আর সে জন্যেই যুদ্ধে এসেছি।

AMARBOI.COM

এক মাইলও হাঁটিনি, এর মধ্যেই পা ভারী হয়ে এসেছে। কি মুশকিল! নিশ্বাস পড়ছে ঘন ঘন। সার্ট ভিজে গিয়েছে ঘামে।

ঢাকা থেকে ভাই, বোন, বাবা, মা সবাইকে নিয়ে একনাগাড়ে ত্রিশ মাইল হেঁটে পৌঁছলাম মির্জাপুর। কি কষ্ট কি কষ্ট! নিজের জন্যে কিছু নয়। জরী ও পরীর দিকে তাকানো যাচ্ছিল না। পরীর ফর্সা-মুখ নীল বর্ণ হয়ে গেল। আমাদের সঙ্গে অনেকেই হাঁটছিলেন। কাফেলার মত ব্যাপার। এক একবার হুস করে সুখী মানুষেরা গাড়ী নিয়ে উড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, আমরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি। এমন হৃদয়বান কাউকে কি পাওয়া যাবে যে আমাদের একটুখানি লিফট দেবে! দুঃসময়ে সবাই হৃদয়হীন হয়ে পড়ে। আমাদের সঙ্গে একজন গর্ভবতী মহিলা ক্লান্ত পায়ে হাঁটছিলেন। তিনি ক্রমাগতই পিছিয়ে পড়ছিলেন। ভদ্রমহিলার স্বামী তা দেখে রেগে আগুন। রাগী গলায় বললেন—"টুকুস টুকুস করে

হাঁটছ যে ? তোমার জন্যে আমিও মরব নাকি ?” এই দীর্ঘপথে কত কথাবার্তা হয়েছে কতজনের মধ্যে। কত অশ্রু বর্ষণ, কত তামাশা, কিছুই আজ আর মনে নেই, কিন্তু ঐ স্বামী বেচারার কথাগুলি এখনো কাঁটার মত বুকে বিঁধে আছে। গর্ভবতী মহিলার শোকাহত চোখ এখনো চোখে ভাসে।

রাস্তাতেই পরীর হু হু করে জ্বর উঠে গেল। আমি বললাম, 'কোলে উঠবি পরী ?' পরীর কি লজ্জা। ক্লাস টেনে পড়া মেয়ে দাদার কোলে উঠবে কি ? পরী অপ্রকৃতিস্থের মত পা ফেলে হাঁটতেই থাকলো। তার হাত ধরে ধরে চলছি আমি। ঘামে ভেজা গরম হাত আর কি তুলতুলে নরম ! পরীর হাতটা যে এত নরম তা আগে কখনো জানিনি। জরীর হাত ভীষণ খসখসে, অনেকটা পুরুষালী। কিন্তু পরীর হাত কি নরম কি নরম !

মীর্জাপুরের কাছাকাছি এসেই পরী নেতিয়ে পড়ল। জড়িয়ে জড়িয়ে বললো—“আমার ঘুম পাচ্ছে।” বমি করতে লাগলো ঘন ঘন। বাবা একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়লেন। কোথায় ডাক্তার কোথায় কি ? এর মধ্যে গুজব রটে গিয়েছে ঢাকা থেকে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একদল জোয়ানকে মিলিটারীরা এইদিকেই তাড়া করে আনছে। চারদিকে ছুটোছুটি, চিৎকার, আতঙ্ক। মা এবং জরী ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে। বাবা যাকেই পাচ্ছেন তাকেই জিজ্ঞেস করছেন—“কিছু মনে করবেন না। আপনি কি ডাক্তার ?”

ডাক্তার পাওয়া যায়নি। কিন্তু এক ভদ্রলোক দয়াপরবশ হয়ে তাঁর ট্রাকে আমাদের টাঙ্গাইলে পৌঁছে দিলেন। টাঙ্গাইল পৌঁছলাম শুক্রবার সন্ধ্যায়। পরী মারা গেল রোববার রাতে। সন্ধ্যাবেলাতে কথা বললো ভাল মানুষের মত। বারবার বললো—“কোন মতে দাদার বাড়ী পৌঁছতে পারলে আর ভয় নেই। তাই না বাবা ?”

পরীর মৃত্যু তো কিছুই নয়। কত কুৎসীত মৃত্যু হয়েছে চারপাশে। মৃত্যু এসেছে সীমাহীন বীভৎসতার মধ্যে। কত অসংখ্য অসহায় মানুষ প্রিয়জনের এক ফোঁটা চোখের জল দেখে মরতে পারেনি। মরবার আগে তাদের কপালে কোন স্নেহময় কোমল করস্পর্শ পড়েনি।

অনেক মধ্যরাত্রিতে যখন অতলস্পর্শী ক্লান্তি আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে তখন মনে হয় আমার হাত ধরে টুকটুক পা ফেলে পরী হাঁটছে।

যে জান্তব পশুশক্তির ভয়ে পরী ছোট ছোট পা ফেলে ত্রিশ মাইল হেঁটে গেছে, আমার সমস্ত ক্ষমতা ও শক্তি তার বিরুদ্ধে। আমি রাজনীতি বুঝি না। স্বাধীনতা টাধীনতা নিয়ে সে রকম মাথাও ঘামাইনা। শুধু

AMARBOI.COM

বুঝি ওদের শিক্ষা দিতে হবে। জাফর প্রায়ই বলে, "হুমায়ূন ভাই ইচ্ছে করে চোখ বুঁজে থাকেন।" হয়ত থাকি। তাতে ক্ষতি কিছু নেই। "আমি কি আমার দায়িত্ব পালন করিনি জাফর?"

মনে মনে এই কথা বলে আমি একটু হাসলাম। জাফরের সঙ্গে আজ ভোরে আমার খানিকটা মন কষাকষি হয়েছে। সে চাচ্ছিল আজকের এই এস্যাইনমেন্টের নেতৃত্ব যেন আসলাম পায়। জানিনা এর পেছনের সত্যিকার কারণটি কি? দলপতির প্রতি আস্থা না থাকা বড় বিপদ-জনক। মুশকিল হচ্ছে আমরা রেগুলার আর্মীর লোকজন নই। আনু-গত্য হল একটা অভ্যাস যা দীর্ঘদিনের ট্রেনিং-এর ফলে মজ্জাগত হয়। রেগুলার আর্মীর একজন অফিসারের অনুচিত হুকুমও সেপাইরা বিনা দ্বিধায় মেনে নেবে। কিন্তু আমার হুকুম নিয়ে তারা চিন্তা ভাবনা করবে। পছন্দ না হলে কৈফিয়ত পর্যন্ত তলব করে বসবে। কাজেই আমার প্রথম কাজ ছিল দলের লোকের আস্থা অর্জন করা। বুঝিয়ে দেয়া যে আমার উপর নির্ভর করা যেতে পারে। কিন্তু আমি তা পারিনি। কাপুরুষ হিসেবে মার্কামারা হয়ে গেছি।

যদিও তারা সব সময়ই 'হুমায়ূন ভাই হুমায়ূন ভাই' করে এবং সবাই হয়ত একটু শ্রদ্ধাও করে, কিন্তু সে শ্রদ্ধা একজন যোদ্ধা হিসেবে নয়।

আমার প্রথম ভুল হল যখন হাজী সাহেবের মৃত্যুতে সায় দিতে পারিনি। লোকটার নৃশংসতা সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ ছিল না। মৃত্যুদণ্ড যে তার প্রাপ্য শাস্তি এতেও ভুল নেই। তবু আমার মায়া লাগলো। ষাটের উপরে বয়স হয়েছে। মরবার সময়তো এমনিতেই হল। তবু বাঁচবার কি আগ্রহ। সে আমাদের বিশ হাজার টাকা দিতে চাইল। শুনে আমার ইচ্ছে হল একটা প্রচণ্ড চড় কষিয়ে দি। কিন্তু আমি শান্ত গলায় বললাম—'জাফর, হাজী সাহেবকে ক্যাম্পে নিয়ে চল'। জাফর চোখ লাল করে তাকালো আমার দিকে। থেমে থেমে বললো—'একে কুকুরের মত গুলি করে মারব।' হাজী সাহেব চিৎকার করে আল্লাহ্কে ডাকতে লাগলেন। এই তিনিই যখন মিলিটারী দিয়ে লোকজন মারিয়েছেন তখন সেই লোকগুলিও নিশ্চয়ই আল্লাহ্কে ডেকেছিল। আল্লাহ্ তাদের যেমন রক্ষা করেন নি—হাজী সাহেবের বেলায়ও তাই হল। হাজী সাহেব অপ্রকৃতিস্থ চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে মৃত্যুর প্রস্তুতি দেখতে লাগলেন। জাফর এক সময় বললো—'তওবা টওবা যা করবার করে নেন। দোওয়া কালাম পড়েন হাজী সাহেব।' আর তখনি হাজী সাহেব চিৎকার করে তাঁর মাকে ডাকতে লাগলেন—"ও মাইজি গো, ও

AMARBOI.COM

মাইজি গো"। কতকাল আগে হয়তো এই মহিলা মারা গেছেন। সেই মহিলাটিকে হাজী সাহেব হয়ত ভুলেই গিয়েছিলেন। আজ রাইফেলের কালো নলের সামনে দাঁড়িয়ে আবার তাঁর কথা মনে পড়ল। আল্লাহ্‌র নাম চাপা পড়ে গেল। এক অখ্যাত গ্রাম্য মহিলা এসে দাঁড়ালেন সেখানে।

আমি পিছিয়ে পড়েছিলাম। আনিস বললো—'রাইফেলটা আমার কাছে দিন হুমায়ুন ভাই'। আমি একটু লজ্জা পেয়ে গেলাম। জাফর এবং হাসান আলী ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের উঁচু সড়কে উঠে পড়েছে। বেশ কিছুদূর এগিয়ে রয়েছে তারা। দ্রুত পা চালাচ্ছি। উঁচু সড়কে উঠে পড়তে পারলে হাঁটা অনেক সহজ হবে। পরিষ্কার রাস্তা, জল কাদা নেই। এখান থেকেই আমরা সরাসরি গ্রামের ভেতর দিয়ে চলব। আমি উঠে আসতেই মজিদ বললো—"জোঁক ধরেছে নাকি দেখেন ভাল করে। আনিসের পা থেকে তিনটা জোঁক সরানো হয়েছে। একটা রক্ত খেয়ে একেবারে কোল বালিশ হয়ে গিয়েছিল। হাসান আলী টর্চ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পায়ের উপর ফেলতে লাগলো। না জোঁক টোক নেই। তবে শামুকে লেগে পা অল্প কেটেছে। জ্বালা করছে। মজিদ বললো— "একটু রেস্ট নেই, মালগাড়ীর মত টায়ার্ড হয়ে গেছি। দেখি আনিস একটা সিগারেট।" আনিস সিগারেটের প্যাকেট খুললো। হাসান আলীও হাত বাড়িয়ে সিগারেট নিল। সে আমাদের সামনে খাবে না তাই একটু সরে গেল। আনিস বললো—'আপনিও নিন একটা হুমায়ুন ভাই।' সিগারেট টানলে আমার জিভ জ্বালা করে। নিকোটিন জিভের উপর জমা হয় হয়তো। তবু নিলাম একটা। আমাদের এখন সাহস দরকার। আগুনের স্পর্শ সে সাহস দেবে হয়তো। দেয়াশলাই সবে জ্বালিয়েছি ওম্নি বাঁশ বনের অন্ধকার থেকে কুকুর ডাকতে লাগলো। তার পরপরই একটি ভয়ার্ত চিৎকার শোনা গেল—

ঃ কেডা ঐখানে কেডা? কথা কয়না লোকটা কেডাগো?

হারিকেন হাতে দু চারজন মানুষও বেরিয়ে এলো। "ও রমিজের বাপ ও রমিজের বাপ" বলে চিকন কণ্ঠে তুমুল চিৎকার শুরু করলো একটি মেয়ে। সবাই বড় ভয় পেয়েছে। এর মধ্যে অল্প বয়েসী একটি শিশু তারস্বরে কাঁদতে শুরু করল। মজিদের উচ্চ কণ্ঠ শোনা গেল—

ঃ ভয় নাই, আমরা।

ঃ তোমরা কেডা?

ঃ আমরা মুক্তি বাহিনীর লোক।

AMARBOI.COM

কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের চারপাশে ভীড় জমে উঠলো। হারিকেন হাতে ভয়কাতর লোকগুলি ঘিরে দাঁড়ালো আমাদের। অস্পষ্ট আলোয় রাইফেলের কালো নল চিক চিক করছে। আমরা তাদের সামনে অষ্টম আশ্চর্যের মত দাঁড়িয়ে আছি—

ঃ মিয়া সাবরা এট্টু পান তামুক খাইবেন?

ঃ না। আপনারা এত রাত্রেও জাগা, কারণ কি?

ঃ বড় ডাকাইতের উপদ্রব। ঘুমাইতাম পারি না। জাইগা বইয়া থাকি।

ঃ এই দিকে মিলিটারী আসছিল?

ঃ জ্বি না। তয় রাজাকার আইছিল দুইবার। রমেশ মালাকাররে বাইন্ধা লইয়া গেছে। গয়লা পাড়া পুড়াইয়া দিছে।

ঃ রাজাকারদের কেউ খাতির যত্ন করেছিল নাকি?

ঃ জ্বি না জ্বি না।

ঃ এই গ্রামের কেউ রাজাকারে নাম লেখাইছে?

লোকগুলি চুপ করে রইল। জাফর ধমকে উঠল—'বল ঠিক করে।'

ঃ একজন গেছে। কি করব মিয়া সাব, পেটে ভাত নাই। পুলাপানডি কান্দে।

আমি বললাম—

ঃ 'দেরী হয়ে যাচ্ছে চল হাঁটা দেই'।

আনিসের বোধ হয় কিছু কথা বলবার ইচ্ছে ছিল। সে অপ্রসন্ন ভঙ্গিতে হাঁটতে শুরু করল।

আনিসের এই স্বভাব আমি লক্ষ্য করেছি। মানুষের সপ্রশংস চোখ তার ভারী প্রিয়। যখনি আমাদের ঘিরে কিছু কৌতূহলী মানুষ জড় হয় তখনি সে খুব ব্যস্তসমস্ত হয়ে এল, এম, জি-র ব্যারেল নাড়তে থাকে বা খামাখাই গুলির কেসটা খুলে ফেলে। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে এমন একটা ভঙ্গি করে যেন ভারী বিরক্ত হয়েছে। বক্তৃতা দিতেও তার খুব উৎসাহ। দেশের এই দুর্দিনে আমাদের কি করা উচিত এ সম্বন্ধে তার সারগর্ভ ভাষণ তৈরী। টেপ রেকর্ডারের মত— চালু করে দিলেই হল। 'গ্রামে গ্রামে প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠন করতে হবে। চোর, ডাকাত, দালাল নির্মূল করতে হবে। দখলদার বাহিনীকে দাতভাঙা জবাব দিতে হবে।' ইত্যাদি ইত্যাদি। বক্তৃতা শেষে কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বিকট সুরে চেঁচিয়ে ওঠে—"জয় বাংলা! জয় বঙ্গবন্ধু!!"

AMARBOI.COM

আনিস ছেলেটিকে আমি খুব পছন্দ করি। চমৎকার ছেলে, একটু পাগলাটে। অপারেশনের সময় সব বিচার বুদ্ধি খুইয়ে বসে। গুলি ছোঁড়ে এলোপাথারি। পেছনে সরতে বললে ক্রল করে সামনে এগিয়ে যায়। সামনে এগুতে বললে আচমকা পেছন দিকে দৌড় মেরে ধরে।

মেথিকান্দায় প্রথম অপারেশনে গিয়েছি। আমাদের বলে দেয়া হয়েছে একেবারে ফাঁকা ক্যাম্প। চারজন পশ্চিম পাকিস্তানী রেঞ্জার আর গোটা পনেরো রাজাকার ছাড়া আর কেউ নেই। রাত দুটোয় অপারেশন শুরু হল। আমি আর সতীশ গর্তের মত একটা জায়গায় পজিসন নিয়েছি। বেশ বড় দল আমাদের। সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছি। দলের নেতা হচ্ছেন আবু ভাই। কথা আছে পশ্চিম দিক থেকে আবু ভাই প্রথম গুলি চালাতে শুরু করবেন, তার পরই মাথা নীচু করে খালের ভেতর দিয়ে চলে আসবেন আমাদের কাছে। আমরা সবাই পূর্ব দিকে বসে আছি। আনিস আর রমজান উত্তরে একটা মাটির ঢিবির আড়ালে চমৎকার পজিসন নিয়েছে। রমজান খুব ভাল মেশিনগানার। বসে আছিতো আছিই আবু ভাইয়ের গুলি করার কোন লক্ষণই দেখিনা। সবাই অধৈর্য হয়ে উঠেছি। আচমকা আমাদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে গুলিবর্ষণ হতে লাগলো। আমরা হতবুদ্ধি। অবশ্যি সবারই পজিসন ভালো। গায়ে গুলি লাগবার প্রশ্নই ওঠে না। তবু একদল ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল। আর তারপরই মর্টারে গোলা বর্ষণ হতে লাগলো। আমাদের দিকে সবাই চুপচাপ। হতভম্ভ হয়ে গিয়েছি। রমজান মিয়া এই সময় উঁচু গলায় চেঁচিয়ে উঠলো—

ঃ কেউ ভয় পাবেন না, কেউ ভয় পাবেন না।

তার পর পরই রমজান মিয়ার মেশিনগানের ক্যাট ক্যাট শব্দ শোনা যেতে লাগলো। সতীশকে বললাম—'শুরু কর দেখি, আল্লাহ্ ভরসা', আর তখনি মার্টারের গোলা এসে পড়লো। বারুদের গন্ধ ও ধোঁয়ায় চারিদিক আচ্ছন্ন হয়ে গেল। ধোঁয়া পরিষ্কার হতেই দেখি আমি আনিসের কাঁধে শুয়ে। আনিস প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে। সবাই যখন পালিয়েছে, সে তখন জীবন তুচ্ছ করে খোঁজ নিতে এসেছে আমার। মেথিকান্দার সেই যুদ্ধে আমাদের চারজন ছেলে মারা গেল। রমজান মিয়ার মত দুর্ধর্ষ যোদ্ধা হারালাম। গুলি লেগে আবু ভাইয়ের ডান হাতের দুটি আঙুল উড়ে গেল। আবু ভাই তারপর একেবারে ক্ষেপে গেলেন। পাঁচদিন পরই আবার দল নিয়ে আসলেন মেথিকান্দায়। সেবারও দুটি ছেলে মারা গেল। তৃতীয় দফায় আবার আসলেন। সেবারও

AMARBOI.COM

২—

তাই হল। মিলিটারীরা ততদিনে মেথিকান্দাকে দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করেছে। চারিদিকে বড় বড় বাঙ্কার। রাত দিন কড়া পাহারা। গুজব রটে গেল মেথিকান্দা মুক্তি বাহিনীর মৃত্যু কূপ। সতীশ বলতো "যদি বলেন তাহলে গভর্নর হাউসে বোমা মেরে আসব, কিন্তু মেথিকান্দায় যাব না, ওরে বাপরে!"

কিন্তু আবু ভাইয়ের মুখে অন্য কথা—"মেথিকান্দা আমিই কব্জা করব। যদি না পারি তাহলে 'গু' খাই।" চতুর্থ বারের মত তিনি বিরাট দল নিয়ে গেলেন সেখানে। সবাই ফিরল, আবু ভাই ফিরলেন না।

পঞ্চম বারের মত যাচ্ছি আমরা। আমার কি ভয় লাগছে না কি? "ছিঃ হুমায়ুন ছিঃ। একটির পর একটি জায়গা তোমাদের দখলে চলে আসছে, মেথিকান্দায় ঘাঁটি করে একবার যদি সোনারদির রেলওয়ে ব্রীজ উড়িয়ে দেয়া যায় তাহলে বিরাট একটা অংশ তোমাদের হয়ে যাবে। আর এত ভয় পাওয়ারই বা কি? মৃত্যুকে এত ভয় পেলে চলে?" একটা গল্প আছে না—এক নাবিককে একজন সংসারী লোক জিজ্ঞেস করলো—

ঃ আপনার বাবা কোথায় মারা গেছিলেন?

ঃ তিনি নাবিক ছিলেন। সমুদ্রে জাহাজডুবী হয়ে মরেছেন।

ঃ আর আপনার দাদা?

ঃ তিনিও ছিলেন নাবিক। মরেছেন জাহাজডুবীতে।

সংসারী লোকটি আঁৎকে উঠে বললো—

ঃ কি সর্বনাশ! আপনিও তো মশাই নাবিক। আপনিও তো জাহাজডুবী হয়ে মরবেন।

নাবিকটি বললো—

ঃ তা হয়ত মরব। কিন্তু নাবিক না হয়েও আপনার দাদা বিছানায় শুয়ে মরেছেন, ঠিক নয় কি?

ঃ আপনার বাবাও বিছানাতেই মরেছেন, নয় কি?

ঃ হ্যাঁ হাসপাতালে।

ঃ আপনিও সেই ভাবেই মরবেন। তাহলে বেশকমটা হল কোথায়?

আসল কথা আমার ভয় লাগছে। সাহস সঞ্চয়ের চেষ্টা করছি। ভয় পাওয়াতে লজ্জার কিছু আছে কি? আমার লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই এই মনে করে গুন গুন করে গান গাইতে চেষ্টা করলাম—'সেদিন দুজনে.....।' শীস দিয়ে আমি বেশ ভাল সুর তুলতে পারি। কিন্তু গান গাইতে গেলেই চিত্তির। জরী বলে—"তোমার মীড়গুলি খুব ভাল আসে,

AMARBOI.COM

আর কিছুই হয় না।" কি জানি বাবা মীড় কাকে বলে। আমি এত সব জানি না। আমি তো তোর মত বিখ্যাত শিল্পী নই। গান নিয়ে আমার কোন মাথা ব্যাথাও নেই। বাথরুমে গোসল করতে করতে একটু গুন গুন করতে পারলেই হল।

জাফরটা ভীষণ গান পাগলা। যেই গুন গুন করে একটু সুর ধরেছি ওমনি সে পিছিয়ে পড়েছে। এখন সে আমার সঙ্গে সঙ্গে হাটবে। জাফর যাতে ভালমত শুনতে পায় সেই জন্যে আরেকটু উঁচু গলায় গাইতে শুরু করলাম। আমার গুন গুন শুনেই এই? জরীর গান শুনলেতো আর হুঁস থাকবে না। জাফরকে একদিন কথায় কথায় জিজ্ঞেস করেছিলাম "গান গায় যে কানিজ আহমেদ তার নাম শুনেছ?" সে চমকে উঠে বললো—

ঃ নজরুল গীতি গান যিনি তাঁর কথা বলছেন?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ খুব শুনেছি। আপনি চেনেন নাকি?

আমি সে কথা এড়িয়ে গিয়েছি। যুদ্ধ টুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে জাফরকে একদিন বাসায় নিয়ে যাব। জরীকে ডেকে এনে পরিচয় করিয়ে দেব— "এর নাম আবু জাফর শামসুদ্দীন। আমরা এক সঙ্গে যুদ্ধ করেছি।" আর জাফরকে হেসে বলব—

ঃ জাফর এর নাম হল জরী। আমার ছোট বোন। তুমি চিনলে চিনতেও পার, গান টান গায়—কানিজ আহমেদ, শুনেছ হয়তো।

জাফর নিশ্চয়ই চোখ বড় বড় করে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকবে। সেই দৃশ্যটি আমার বড় দেখতে ইচ্ছে করছে। তাছাড়া আমার মনে একটি গোপন বাসনা আছে। জরীর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেব জাফরের। যুদ্ধের মধ্যে যে পরিচয় তার চেয়ে খাঁটি পরিচয় আর কি হতে পারে? জাফরকে আমি ভালভাবেই চিনেছি।

কিন্তু জরীর কি পছন্দ হবে? বড় খুঁতখুঁতে মেয়ে। সমালোচনা করা তার স্বভাব। কেউ হয়ত বাসায় গিয়েছে আমার খোঁজে। জরী আমাকে এসে বলবে—"দাদা, তোমার একজন চ্যাপ্টা মত বন্ধু এসেছে।" অরুনকে সে বলতো কাতলা মাছ। অরুণ রেগে গিয়ে বলেছিল—"কাতলা মাছের কি দেখলে আমার মধ্যে?" জরী সহজভাবে বলেছে—"তোমার মাথাটা শরীরের তুলনায় বড়তো, এই জন্যে। আচ্ছা রাগ করলে আর বলব না।" আদর দিয়ে দিয়ে মা জরীর মাথাটি খেয়ে বসে আছেন। অল্প বয়সেই অহংকারী আর আহলাদী হয়ে উঠেছে।

AMARBOI.COM

কে জানে এর মধ্যে বিয়েই হয়ে গেছে হয়ত! অনেকদিন তাদের কোন খবর পাই না। শুনেছি বাবা আবার ঢাকা ফিরে এসেছেন। ওকালতি শুরুর চেষ্টা করেছেন। দেশে এখন কি আর মামলা মোকদ্দমা আছে? টাকা পয়সা রোজগার করতে পারছেন কি না কে জানে।

ঢাকার অবস্থা নাকি সম্পূর্ণ অন্য রকম। কিছু চেনা যায় না। ইউনিভার্সিটি পাড়া খাঁ খাঁ করে। দুপুরের পর রাস্তা ঘাট নিঝঝুম হয়ে যায়। ঢাকায় বড় যেতে ইচ্ছে করে। কতদিন ঢাকায় যাওয়া হয় না। আবার কি কখনো এ রকম হবে যে নির্ভয়ে ঢাকার রাস্তায় হেঁটে বেড়াব। সেকেণ্ড শো সিনেমা দেখে কোন একটা রেস্টুরেন্টে বসে চা খেয়ে গভীর রাতে বাড়ী ফিরব।

সলিল কিছুদিন আগে গিয়েছিল ঢাকায়। অনেক গল্প শুনলাম তার কাছে। খুব নাকি বিয়ে হচ্ছে সেখানে। বয়স্কা মেয়েদের সবাই ঝটপট বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে। ঘরে রাখতে সাহস পাচ্ছে না। হয়তও পারে। সলিল অবশ্যি বেশী কথা বলে, তবুও বিয়ে কি আর হচ্ছে না? বিয়ে হচ্ছে। নতুন শিশুরা জন্মাচ্ছে। মানুষ জন হাট বাজার করছে। জীবন হচ্ছে বহতা নদী।

একি, আবু ভাইয়ের মত ফিলসফি শুরু করলাম দেখি। আবু ভাই কথায় কথায় হাসাতেন আবার তার ফাঁকে ফাঁকে এত সহজ ভাবে এমন সব সিরিয়াস কথা বলে যেতেন—আশ্চর্য! আবু ভাই তার অসংখ্য ভক্ত রেখে গেছেন। যারা তাঁকে দীর্ঘ দিন মনে রাখবে। এই বা কম কি?

একদিন হন্তদন্ত হয়ে দৌড়ে আসলেন আবু ভাই। দারুণ খুশী খুশী চেহারা। মাথায় লম্বা চুল ঝাঁকিয়ে বললেন—

ঃ হুমায়ুন গুড নিউজ আছে। মিষ্টি খেতে চাও কি না বল।

ঃ চাই চাই।

ঃ ভেরী গুড। নিউজটা পরশু শোনাবো। মিষ্টি জোগাড় করি আগে তারপর। পরশু সন্ধ্যায় সবাইকে মিষ্টি খাওয়াব।

সেই গুড নিউজটি শোনা হয়নি। দারুণ ব্যস্ততা শুরু হল হঠাৎ। ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লাম সবাই। এবং সব শেষে আবু ভাই গেলেন মেথিকান্দা।

আবু ভাইয়ের লাশ হাসান আলী বয়ে এনেছিল। বিশেষ কোন কথা-বার্তা বলেনি। হাউ মাউ করে কাঁদেও নি। অথচ সবাই সেদিন বুঝিছিলাম হাসান আলীর মন ভেঙে গেছে।

AMARBOI.COM

মজিদ ডাকলো—"পা চালিয়ে হুমায়ূন ভাই, আপনি বার বার পিছিয়ে পড়েছেন।" হাসান আলী দেখি হন হন করে এগিয়ে চলছে। এত চুপচাপ থাকে কেন লোকটা ?

হাসান আলী

চেয়ারম্যান সাব কইলেন—

ঃ হাসান আলী রেজাকার হইয়া পর। সত্তুর টাকা মাস মাইনা, তার সাথে খোরাকী আর কাপড়।

চেয়ারম্যান সাব আমার বাপের চেয়ে বেশী। নেকবক্ত পরহেজগার লোক। তাঁর ঘরের খাইয়া এত বড় হইলাম। আমার চামড়া দিয়া চেয়ারম্যান সাহেবের জুতা বানাইলেও ঋণ শোধ হয় না। তাঁর কথা ফেলতে পারি না। রাজাকার হইলাম।

জুম্মাবাদ চেয়ারম্যান সাব আর তার বিবিরে কদমবুসি কইরা গাঁটরি মাথায় লইলাম। চেয়ারম্যান সাব কইলেন, "আল্লাহর হাতে সোপার্দ হাসান আলী, আল্লাহ্ নেকবান। সাচ্চা দিলে কাম করবা। হালাল পয়সা খাইবা।"

যাওনের আগে মসজিদে গেলাম দোওয়া মাঙতে। গিয়া দেখি মাবুদে এলাহী—মসজিদের মাথার উপরে শকুন বইয়া আছে। দুই কুড়ির উপরে বয়স আমার, এত বড় শকুন দেখি নাই। মনডা বড় টানল। বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ কইরা উঠল।

আরো একবার মসজিদের উপরে শকুন বইছিল। আমি তখন ছোড। চেয়ারম্যান সায়বের বাড়ীতে গরু-রাখালের কাম করি। বাপজান কইলেন—"হাছান, শকুন বইছে মসজিদে। বড় খারাপ নিশানা। কেয়ামত নজদিক। বালা মুসিবত আইব।" বাপজানের কথা মিছা হয় নাই। কলেরায় দেশটা সাফা হইয়া গেল।

মসজিদে মওলানা সাব কইলেন—

ঃ হাসান তুমি রাজাকার হইতাছ শুনলাম।

ঃ হ মৌলানা সাব। দোওয়া মাঙতে আইছি।

ঃ বালা করছ। পাকিস্তানের খেদমত কর। কিন্তু হাসান আলী একটা কথা।

ঃ কি কথা মৌলানা সাব—

ঃ শুনতাছি রাজাকার বড় অত্যাচার করে। মানুষ মারে, লুটপাট করে, ঘর জ্বালায়। দেইখ বাবা সাবধান। আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহী হইবা। আখেরাতে নবিজীর শেফায়ত পাইবা না।

AMARBOI.COM

মনডা খারাপ হইল। কামডা বোধ হয় ভুল হইল। তখনও আমরার গ্রামের মধ্যে রাজাকার দল হয় নাই। আমরা হইলাম পরথম দল। সাতদিন হইল ট্রেনিং। লেফট রাইট, লেফট রাইট। বন্দুক সাফ করনের কায়দা শিখলাম। গুলি চালাইতে শিখলাম। "বায়োনেট চারজ" করতে শিখলাম। মিলিটারীরা যত্ন কইরা সব শিখাইল। তারা সব সময় কইত "তুম সাচ্চা পাকিস্তানী, মুক্তি বাহিনী একদম সাফা কর দো।" মনডার মধ্যে শান্তি পাই না। বুকটা কান্দে। রাইতে ঘুম হয় না। আমরার সাথে ছিল রাধানগরের কেরামত মওলা। সে আছিল রাজাকার কমাণ্ডার। আহা ফেরেশতার মত আদমী। আর মারফতি গান যখন গাইতো চউক্ষে পানি রাখন যাইত না। মাঝে মধ্যেই কেরামত ভাইয়ের গান শুনতাম—

"ও মনা
দেহের ভিতরে অচিন পাখী অচিন সুরে গায়
তার নাগল পাওয়া দায়"

যখন হিন্দুর ঘরে আগুন দেওয়া শুরু হইল, কেরামত ভাই কইলেন—"এইটা কি কাণ্ড? কোন দোষ নাই, কিচ্ছু নাই ঘরে কেন আগুন দিমু?" ওস্তাদজী কইলেন—

ঃ ও তো ইন্দু হ্যায় গন্দার হ্যায়।

কেরামত ভাইয়ের সাহসের সীমা নাই। বুক ফুলাইয়া কইল—

ঃ আগুন নেহি দেঙ্গা।

ওস্তাদজী কইলেন, "আও হামারা সাথ।" কেরামত ভাই গেলেন। দুইদিন পরে তার লাশ নদীতে ভাইস্যা উঠলো। ইয়া মাবুদে এলাহী, ইয়া পারওয়ার দেগার, কি দেখলাম। মাথা একেবারে বেঠিক হইয়া গেল। মিলিটারী যা করে তাই করি। নিজের হাতে আগুন লাগাইলাম সতীশ পালের বাড়ী, কানু চক্রবর্তীর বাড়ী, পণ্ডিত সাহেবের বাড়ী। ইস্ মনে উঠলেই কইলজাটা পুড়ায়।

শেষ মেষ মিলিটারীরা শরাফত সাহেবের বড় পুলাডারে ধইরা আনল। আহারে কি কান্দন ছেলের। এখনো চউক্ষে ভাসে। বি, এ পাশ দিয়া এম, এ পড়তো। যেমন সুন্দর চেহারা তেমন আচার ব্যাভার। ভদ্রলোকের ছেলে যেমন হওনের তেমন। একদিন বাজারে বইয়া আছি। শরাফত সাহেবের পুলাডার সাথে দেখা। আমারে দেইখ্যা কইল, "হাসান ভাই ভাল আছেন?" আমি একটা কামলা মানুষ। আমারে আপনে কওনের কি দরকার? কিন্তু সেই ছেলে শিক্ষিত হইলে কি হইব মনডা

AMARBOI.COM

ছিল ফিরশতার। আহারে বন্দুকের সামনে দাড়াইয়ে কেমন কালা হইয়া গেল চেহারাটা। আমি একটু দূরে খাড়াইয়া আল্লাহ্ রসুলের নাম নিতাছি। আমার মাথার গণ্ডগোল হইয়া গেছে। কি করতাম ভাইব্যা পাইনা। শেষকালে ছেলেডা আমার দিকে চাইয়া কইল—"হাসান ভাই আমারে বাঁচান।" ক্যাপ্টেন সায়বের পাও জড়াইয়া ধরলাম লাভ হইল না। আহারে ভাইরে আমার। কইলজাডা পুড়ায়। আমি একটা কুত্তার বাচ্চা। কিছু করবার পারলাম না।

সইন্ধ্যা কালে শরাফত সায়েবের বাড়ীত গিয়া দেখি ঘর দোয়ার অন্ধকার। ছেলেডার মা একলা বইয়া আছে। তারে কেউ গুলির খবর কয় নাই। আমারে দেইক্যা কইল—"ও হাছান আমার ছেলেডা বাঁইচ্চা আছে? আল্লাহ্‌র দোহাই হাঁচ্ছা কথা কইবা।"

আমি তাঁর পা ছুইয়া কইলাম; "আম্মাজী বাঁইচ্চা আছে। আপনি চাইরডা দানা পানি খান।"

সেই রাইতেই গেলাম মসজিদে। পাক কোরান হাতে লইয়া কিরা কাটলাম। এর শোধ তুলবাম। এর শোধ না তুললে আমার নাম হাসান আলী না। এর শোধ না তুললে আমি বাপের পুলা না। এর শোধ না তুললে আমি বেজম্মা কুত্তা।

রাত্তিরে ক্যাম্পে ফিরতেই হাবিলদার সাব কইলেন—পূবের বাঙ্কারে একটা লাশ পইরা আছে, আমি যেন নদীর মধ্যে ফ্যালাইয়া দিয়া আসি।

কি সর্বনাশের কথা। ইয়া মাবুদে এলাহী। গিয়া দেখি কবিরাজ চাচার ছোট মাইয়াডা। ফুলের মত মাইয়া গো। বারো তেরো বছর বয়স। ইয়া মাবুদ ইয়া মাবুদ। কাপড় দিয়া শইলডা ঢাইক্যা কইলাম—"ভইন মাপ করিস।" এইটা কি, চউক্ষে পানি আসে ক্যান? আরে পোড়া চউখ এখন পানি ফালাইয়া কি লাভ? আগেতো দেখলি না। আগেতো আন্ধা হইয়া রইলি।

সাথের পুলাপানডির বড় পরিশ্রম হইতাছে। আল্লাহ্ আল্লাহ্ কইরা যদি রামদিয়া ঘাটে পৌছাইতে পারি তয় রক্ষা। ইয়া মাবুদ এই পুলাপানডিরে বাঁচাইয়া রাইখোগো। গরম পীরের দরগাত সিন্নি মানলাম। আমি তিন কালের বুড়া। আমি মরলে কি? এক চেয়ারম্যান সাব ছাড়া কেউ এক ফোঁটা চউক্ষের পানি ফালাইত না। মরনের পরে হাশরের মাঠে যদি কবিরাজ চাচার মাইয়ার সাথে দেখা হয় তয় মাইয়ার হাত ধইরা কমু, "ভইন, শোধ তুলছি। এখন কও তুমি আমারে মাফ দিছ কি দেও নাই।"

AMARBOI.COM

আবদুল মজিদ

এখন বাজছে একটা।

আর এক ঘন্টার মধ্যে কি রামদিয়া পৌঁছানো যাবে? আমার মনে হয় না। হাসান আলীকে জিজ্ঞেস করলাম—

ঃ আর কতদূর হাসান আলী?

জানি জবাব দেবে না। তবু জিজ্ঞেস করেছি। কারণ এখান থেকে রামদিয়া কতদূর তা জানে শুধু হাসান আলী। ব্যাটা নবাবের নবাব, কথা জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেবে না। দেব নাকি রাইফেলের বাঁট দিয়ে একটা?

ক্ষিধে যা পেয়েছে বলবার নয়। মনে হচ্ছে একগামলা ভাত খেয়ে ফেলতে পারি। সেবার তালুকদার সাহেবের বাসায় জবর খাইয়েছিল। হারামজাদা ভীতুর একশেষ। মুক্তি বাহিনী এসেছে শুনে ভয়ে পেচ্ছাব করে দেবার মত অবস্থা। আরে ব্যাটা বলদ তুই কি দালাল না-কি রে? তুই ভয় পাস কি জন্যে? সারাক্ষণ হাত জোড় করে হেঁ হেঁ, কি বিশ্রী। তবে যাই হোক খাইয়েছিল জবর। একেবারে এক নম্বর খানা। পোলাও-টোলাও রাঁধিয়ে এলাহী কারবার। 'জিতা রহ ব্যাটা।' কই মাছ ভাজার স্বাদ এখনো মুখে লেগে রয়েছে। আমাদের খাওয়ার কি আর ঠিক আছে? একবার দুদিন শুকনো রুটি খেয়ে থাকতে হল। সে রুটিও পয়সার মাল। আবু ভাই বলেছিলেন—

"এই রুটি দিয়ে ভাল এক জোড়া জুতা বানানো যায়।"

ক্ষিধে পেলে শুধু খাওয়ার কথা মনে হয়। মহসিন হলে ফিস্ট হল একবার। জনে জনে ফুল রোস্ট। সেই সঙ্গে কাবাব, রেজালা আর দৈ মিষ্টি। খেয়ে কুল পাইনা এমন অবস্থা। বাবুর্চি রাঁধতো ফার্স্ট ক্লাস।

পায়ের কাটাটা জানান দিচ্ছে। ভাঙা শামুকের এমন ধার! প্রথমে ভাবলাম সাপে কামড়ালো বুঝি। বর্ষা বাদলা হচ্ছে সাপের সিজন। এ অঞ্চলে আবার শামুক ভাঙা কেউটের ছড়াছড়ি। ছোবল মেরে শামুক ভেঙে খায়। রাতে বিরাতে এ রকম একটা সাপের গায়ে গা দিতে পারলে মন্দ হয় না। বন্দুক নিয়ে তাহলে এ রকম আর ঘুরে বেড়াতে হয় না। নিরবিচ্ছিন্ন শান্তি যাকে বলে।

আমার আর ভাল লাগে না সত্যি। কি হবে দু একটা ঠুশ টাশ করে। মিলিটারী কমছে কই? বন্যার জলের মত শুধু বাড়ছে। রাজাকার পয়দা হচ্ছে হু হু করে। যে অবস্থা,একদিন দেখবো আমরা কয়জন ছাড়া

AMARBOI.COM

সবাই রাজাকার হয়ে বসে আছে। আর হবে নাইবা কেন? প্রাণের ভয় নেই? রাজাকার হলে তাও প্রাণটা বাঁচে। তা'ছাড়া মাসের শেষে বাঁধা বেতন। লুটপাটের ঢালাও বন্দোবস্ত। দেখে শুনে মনে হয় দূর শালা রাজাকার হয়ে যাই।

কি আবোল তাবোল ভাবছি। সোহরাব সাহেবের মত মাথাটাই খারাপ হয়ে গেল নাকি? সোহরাব সাহেবকে দেখে কে বলবে তার মাথাটা পুরা ফরাটি নাইন হয়ে বসে আছে। দিব্যি ভাল মানুষ, মাঝে মাঝে শুধু বলবে "ইস গুলিটা শেষে কপালেই লাগলো।"

দু' মাস ছিল বেচারা মুক্তি বাহিনীতে। সাহসী বেপরোয়া ছেলে। আমগাছ থেকে একবার মিলিটারী জীপে গ্রেনেড মেরে একজন আর্টিলারী ক্যাপ্টেনই সাবার করে দিল। দারুণ ছেলে। একদিন খবর পাওয়া গেল কোন বাজারে গিয়ে নাকি ধুমছে দেশী মদ গিলে ভাম হয়ে পড়ে আছে। মদের ঝোঁকে ভেউ ভেউ করে কাঁদছে আর বলছে—"হায় হায় ঠিক কপালে গুলি লেগেছে।" আবু ভাইয়ের হুকুমে জাফর গিয়ে খুব বানালো—দুই রদ্দা খেয়ে নেশা ছুটে গেল কিন্তু ঐ কথাগুলি গেল না। রাত দিন বলত "ইস কি কাণ্ড শেষ পর্যন্ত ঠিক কপালে গুলি?" ঘুম নেই খাওয়া নেই শুধু এই বুলি। এখন কোথায় আছে কে জানে। চিকিৎসা হচ্ছে কি ঠিক মত? আমারো যদি এ রকম হয় তবেতো বিপদের কথা।

ঃ দাড়ান সবাই দাড়ান।

কে কথা বলে? হাসান আলী নাকি? ব্যাটা আবার হুকুম দিতে শুরু করল কবে থেকে? জায়গাটা ঘুপসী অন্ধকার, চারদিকে বুনো ঝোপ ঝাড়। পচা গোবরের দম আটকানো গন্ধ আসছে। হুমায়ুন ভাই বল্লেন—

ঃ কি হয়েছে হাসান আলী?

ঃ কিছু হয় নাই।

কি হয়েছে তা নিজ চোখেই দেখতে পেলাম। আনিস লম্বালম্বি পড়ে রয়েছে মাটিতে। এত বড় একটা জোয়ান চোখের সামনে আছাড় খেয়ে পড়ে গেল আমি দেখতেও পেলাম না? কি আশ্চর্য! কি ভাবছিলাম আমি? হাসান আলী ধরাধরি করে তুললো আনিসকে। কাদায় পানিতে সারা শরীর মাখামাখি। হুমায়ুন ভাই অবাক হয়ে বললেন—

ঃ কি হয়েছে আনিস?

ঃ কি জানি মাথাটা হঠাৎ ঘুরে উঠলো।

AMARBOI.COM

ঃ দেখি তোমার হাত। আরে এ যে ভীষণ জ্বর। কখন জ্বর উঠলো ?

ঃ কি জানি কখন।

ঃ এসো, আশেপাশের কোন বাড়ীতে তোমাকে রেখে যাই।

ঃ আমি হাঁটতে পারব।

ঃ পারতে হবে না। মজিদ তুমি ওর হাতটা ধর।

গায়ে হাত দিয়ে দেখি সত্যি গা পুড়ে যাচ্ছে। ব্যাটা বলদ, বলবিতো শরীর খারাপ।

হাসান আলী বললো—"সামনেই মোক্তার সাহেবের বাড়ী। আসেন সেই বাড়ীতে উঠি।"

জাফর বললো—"কতদূর হে সেটা ?"

ঃ কাছেই। এক পোয়া মাইল। জুম্মা ঘরের দক্ষিণে।

হাঁটতে হাঁটতে পা ব্যথা হয়ে যায়। জুম্মা ঘরও আসেনা। এক পোয়া মাইলেরও ফুরাবার নাম নেই। যতই জিজ্ঞেস করি—"কতদূর হাসান আলী ?" হাসান আলী বলে—"ঐতো দেখা যায়।"

মোক্তার সাহেবের বাড়ীটি প্রকাণ্ড। গরীব গ্রামের মধ্যে বাড়ীর বিশালত্ব চট করে চোখে পড়ে। বাড়ীর সামনে প্রশস্ত পুকুর। তার চার পাশে সারি বাঁধা তালগাছ। আমরা বাড়ীর উঠোনে দাঁড়াতেই রাজ্যের কুকুর ঘেউ ঘেউ শুরু করল। কি ঝামেলারে বাবা। বাড়ীর ভেতর থেকে কেউ একজন পরিত্রাহী চেঁচাতে লাগলো—"আসগর মিয়া আসগর মিয়া, ও আসগর মিয়া।"

AMARBOI.COM

জাফর তার স্বভাবসুলভ উঁচু গলায় ডাকলো—"বাড়ীতে কে আছেন। দরজা খোলেন।"

হঠাৎ করে বাড়ীর সব শব্দ থেমে গেল। আর কোন সাড়া শব্দ নেই। জাফর আবার বললো—"ভয় নাই আমরা মুক্তি বাহিনীর লোক।" তাও কোন সাড়াশব্দ নেই। শেষ পর্যন্ত হাসান আলী বললো—"গনি চাচা আমি হাসান।" তখনি খুট করে দরজা খুলে গেল। একটি ভয় পাওয়া মুখ বেরিয়ে এল হারিকেন হাতে।

হাসান আলীর কারবার দেখে গা জ্বলে যায়। তার গলা শুনলে যখন দরজা খুলে দেয় তখন গলাটা একটু আগে শোনালেই হয়। জাফর বললো—

ঃ বিরক্ত করলাম, কিছু মনে করবেন না। এই ছেলেটার শোয়ার বন্দোবস্ত করেন। আর আমাদের ভাত খাওয়াতে পারবেন ?

ঃ জ্বি জ্বি নিশ্চয়ই পারব।

ঃ আপনার নাম কি ?

ঃ গনি। আব্দুল গনি।

ঃ ডাক্তার আছে এদিকে ?

ঃ আছে হোমিওপ্যাথ।

ঃ দুভোরি হোমিওপ্যাথ।

গনি সাহেব ছাড়া আরো দুজন লোক জড় হয়েছে। তারা চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে। আনিস তোষকহীন একটি চৌকিতে শুয়ে পড়েছে। গনি সাহেব বললেন—

ঃ কি হয়েছে ওনার ? গুলি লেগেছে নাকি।

ঃ না। আপনি ভেতরে গিয়ে আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করেন।

ঃ জ্বি জ্বি।

বুড়ো ভদ্রলোক ব্যস্তসমস্ত হয়ে চলে গেলেন। দেখতে দেখতে বাড়ী জেগে উঠলো। কত রকম ধ্বনি শোনা যাচ্ছে—“আমিনা ও আমিনা।” ‘হারিকেনটা কই ?’ “দূর ধুমসী ঘুমায় কি?”

ভাগ্য ভাল বাড়ীটি একপাশে। পাড়ার লোক সেই কারণেই ভেঙে পড়লো না। গনিসাহেব একধামা মুড়ি আর গুড় দিয়ে গেলেন। বললেন—অল্পক্ষণের মধ্যেই রান্না হবে। আনিসকে তুলতে গিয়ে দেখি সে অচৈতন্য। মুখ দিয়ে ফেনা ভাঙছে।

আনিসের শরীর যে এতটা খারাপ ধারণা করিনি। নৌকায় ওঠার সময় অবশ্যি একবার বলেছিল বমি বমি লাগছে। কিন্তু এ রকম অসুস্থ হয়ে পড়বে কে ভেবেছিল ? আনিসটা মেয়ে মানুষের মত চাপা।

দেখতে পাচ্ছি আনিসকে নিয়ে ব্যস্ততা শুরু হয়েছে। হাসান আলী পানি ঢালছে মাথায়। জাফর প্রবল বেগে হাতের তালুতে গরম তেল মালিশ করছে। বাড়ীর কর্তা, মোক্তার সাহেব বিপন্ন মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি পেছন থেকে দেখতে মোক্তার সাহেবকে অনেকটা আমার বাবার মত দেখায়। ঠিক সে রকম ভরাট শরীর, প্রশস্ত কাঁধ। আশ্চর্য মিল।

আনিসের জ্ঞান ফিরলো অল্পক্ষণেই এবং সে লজ্জিত হয়ে পড়ল। হুমায়ূন ভাই বললেন—“নাও দুধটা খাও আনিস।”

ঃ দুধ লাগবে না। দুধ লাগবে না।

ঃ আহা খাও।

AMARBOI.COM

আনিস বিব্রতমুখে দুধের গ্লাসে চুমুক দিল। আনিসকে কিম্ভূত-কিমাকার দেখাচ্ছে। তার ভেজা মাথা থেকে পানি গড়িয়ে পড়ছে সারা শরীরে। মুখময় দাড়ি গোঁফের জঙ্গল। তার মধ্যে সরু একটা নাক ঢাকা পরে আছে। জাফর বললো—"আনিস থাক এখানে।" হুমায়ুন ভাই বললেন—"নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।"

রাত দুটো বাজতে বেশী দেরী নেই। রামদিয়ায় আমাদের জন্যে টুনু মিয়ার দল অপেক্ষা করছে। হুমায়ুন ভাই বললেন—"আনিস কয়টা বাজে দেখতো।"

ঃ একটা পঁয়ত্রিশ।

ঃ বল কি ?

ঃ মোক্তার সাহেব, রামদিয়া কতদূর এখান থেকে ?

ঃ দূর না। দশ মিনিটের পথ।

হাসান আলী বললো—'দুইটার আগে পৌঁছাইয়া দিমু।' ভুলেই গিয়াছিলাম যে হাসান আলীর মত একজন করিৎকর্মা লোক আছে আমাদের সঙ্গে। সে নাকি যা বলে তাই করে। প্রমাণতো দেখতেই পাচ্ছি।

বাড়ীর ভেতরে রান্না শুরু হয়েছে বুঝতে পারছি। চিকণ গলায় কে একজন মেয়ে ঘন ঘন ডাকছে—"ও হালিমা ও হালিমা।" সেই সঙ্গে দমকা হাসির আওয়াজ। একটা উৎসব উৎসব ভাব। বেশ লাগছে।

সেরেছে। আনিস দেখি বমি করছে। ব্যাপার কি। চোখ হয়েছে টকটকে লাল। নিঃশ্বাস পড়ছে ঘন ঘন। মরে টরে যাবে নাতো আবার ? দুত্তেরি কি শুধু আজে বাজে কথা ভাবছি। বুঝতে পারছি অতিরিক্ত পরিশ্রম আর মানসিক দুশ্চিন্তায় এ রকম হয়েছে। আজ রাতটা রেষ্ট নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। একটি ছেলে পাখা করছে আনিসের মাথায়। খুব বাহারী পাখা দেখি। চারিদিকে রঙিন কাপড়ের ঝালর।

জাফরও শুয়েছে লম্বা হয়ে। জাফরের শোয়া মানেই ঘুম। ঘুম তার সাধা, কোন মতে বিছানায় মাথাটা রাখতে পারলেই হল। ভাত রান্না হতে হতে সে তার সেকেণ্ড রাউণ্ড ঘুম সেরে ফেলবে। ফার্ষ্ট রাউণ্ডতো নৌকাতেই সেরেছে। জাফরের ঘুম আবার সুরেলা। ফুরুৎ ফুরুৎ করে নাক ডাকবে। এই কথা বলেছিলাম বলে একদিন কি রাগ। মারতে আসে আমাকে। বেশ লোক দেখি তুমি ! ফুরুৎ ফুরুৎ করে নাক ডাকাতে পারবে আর আমরা বলতেও পারব না ? করলে দোষ নয় বললে দোষ ?

AMARBOI.COM

ঠিক আমার বাবার মত। রাতদিন কারণে অকারণে চেঁচাচ্ছেন। আর সেও কি চেঁচানি। রাস্তার মোড় থেকে শুনে লোকে খবর নিতে আসে 'বাসায় কি হয়েছে।' মা একদিন বিরক্ত হয়ে বললেন—"কি রাতদিন চেঁচাও", ওমনি বাবার রাগ ধরে গেল। ঘাড় টার ফুলিয়ে বিকট চিৎকার—

ঃ কি আমি চেঁচাই?

মা সহজ সুরে বললেন—"এখন কি করছ, চেঁচাচ্ছ না?"

"চুপ রাও। একদম চুপ।"

বাবার কথাটা মনে হলেই এই হাসির কথাটা মনে পড়ে। এমন সব ছেলেমানুষী ছিল তার মধ্যে। একবার খেয়াল হল আমাদের সবাইকে নিয়ে বেড়াতে যাবেন সীতাকুণ্ড তাঁর এক বন্ধুর বাড়ী। দুমাস ধরে চললো আয়োজন। বাবার ব্যস্ততার সীমা নেই। যাবার দিন এক ঘণ্টা আগে স্টেশনে নিয়ে গেলেন সবাইকে আর সেকি চেঁচানি—"এটা ফেলে এসেছ ওটা ফেলে এসেছ।" ট্রেন আসলে সবাই উঠলাম। পাহাড় প্রমাণ মাল তোলা হল। এক সময় ট্রেন ছেড়ে দিল, দেখা গেল বাবা উঠতে পারেন নি। প্রাণপনে দৌড়াচ্ছেন। হাতের কাছে যে কোন একটা কামরায় উঠে পরলেই হয়, না তা উঠবেন না। আমরা যে কামরায় উঠেছি ঠিক সে কামরায় ওঠা চাই। এক সময় দেখলাম বাবা হোঁচট খেয়ে পড়েছেন। হুঁস হুঁস করে তাঁর চোখের সামনে দিয়ে ট্রেন চলে যাচ্ছে। আচ্ছা, মৃত মানুষরা কি মানুষের মনের কথা টের পায়? যদি পায় তা হলে বাবা নিশ্চয়ই আমি কি ভাবছি বুঝতে পারছেন? আচ্ছা ধরা যাক একটি লোককে সবাই মিলে ফাঁসি দিচ্ছে, তাহলে সেই হতভাগ্য লোকটির চোখে মুখে কি ফুটে উঠবে? হতাশা, ঘৃণা, ভয়—আমার মাথাটাই খারাপ হয়ে গেল নাকি? নয়তো এ রকম অর্থহীন চিন্তা কেউ করে? ওকি আনিস আবার বমি করছে নাকি? জোর করে দুধটা না খাওয়ালেই হত।

মোক্তার সাহেব এসে চুপি চুপি কি বলছেন হুমায়ূন ভাইকে। কে জানে এর মধ্যেই এমন কি গোপনীয় কথা তৈরী হয়েছে যা কানের কাছে মুখ নিয়ে বলতে হবে। আরে আরে এই ব্যাপার। এটা আবার কানাকানি বলতে হবে নাকি? বললেই হয়—"ভাত দেয়া হয়েছে খেতে আসেন।" যত বেকুবের দল। হাসান আলী বললো—"তাড়াতাড়ি করেন সময় নাই।" মাতব্বর কোথাকার। সময় নেই সেটা তোর কাছে জানতে হবে নাকি?

AMARBOI.COM

খেতে বসে দেখি ক্ষিধে মরে গেছে। তরকারীতে লবণ হয়েছে বেশী। ভাত হয়েছে কাদার মত নরম। চিবোতে হয় না, কোঁৎ কোঁৎ করে গিলে ফেলা যায়। ভাল হল না মোটেই। জাফর বললো— "হু নোজ দিস মে বি আওয়ার লাস্ট মিল।" কথায় কথায় ইংরেজী বলা জাফরের স্বভাব। তার ধরন ধারণও ইংরেজের মত। এই মহা দুর্যোগেও ভোরবেলা উঠেই তার শেভ করা চাই। দুপুরে সাবান মেখে গোসল সারা চাই। দিনের মধ্যে দশবার চিরুণীর ব্যবহার হচ্ছে। রূপ যাদের আছে তারাই রূপ সচেতন হয়। এবং এত উলঙ্গভাবে হয় যে বড় চোখে লাগে।

আমাদের পাশের বাড়ীর রেহানা দশ এগারো বছর বয়স পর্যন্ত কি চমৎকার মেয়েই না ছিল। কিন্তু যেই তার বয়স তেরো পেরিয়ে গেল, যেই সে বুঝলো তার চোখ ধাঁধানো রূপ আছে, ওম্নি সে বদলে গেল। আহ্লাদী ধরনের টেনে টেনে কথা বলা—'ম-জি-দ ভা-ই' ঘন ঘন ভ্রূ কোঁচকানো। জঘন্য জঘন্য।

হুমায়ূন ভাই বোধ হয় কোন একটা রসিকতা করলেন। ভ্যাক ভ্যাক করে হাসছে সবাই। আমি অন্যমনস্ক ছিলাম বলে শুনতে পাইনি। এখন সবাই হাসছে, আমি মুখ কালো করে বসে আছি। নিশ্চয়ই বোকা বোকা লাগছে আমাকে। খোদা জানে রসিকতাটা হয়ত আমাকে নিয়েই। সবাই যে ভাবে তাকাচ্ছে আমার দিকে তাতে তাই মনে হয়। ওকি হাসান আলীও হাসছে দেখি।

হাস বাবা হাস। যত ইচ্ছে হাস। কিছুক্ষণ পরই যখন বম বম করে মর্টারের শেল ছোঁড়া শুরু হবে তখন এত রস আর থাকবে না। কাজেই এই হচ্ছে 'গোল্ডেন আওয়ার'।

ঃ পান আনবো? পান খাবেন?

জিজ্ঞেস করল কে যেন। আমি মাথা নাড়লাম। পান টান লাগবেনারে বাবা। বিনা পানেই চলবে। মুড নেই। পান, সিগারেট, চা এসব হচ্ছে মুডের ব্যাপার, মুড না থাকলে বিষের মত লাগে।

হুমায়ূন ভাই বললেন—"আমরা রওনা হচ্ছি। আনিস তুমি থাক। ফেরবার পথে তোমাকে নিয়ে যাব।" তিনি তাহলে ফেরবার চিন্তাও করছেন। ভুলে গেছেন নাকি মেথিকান্দা মুক্তিবাহিনীর মৃত্যুকূপ! আজ যাত্রা থেকেই অলক্ষণ শুরু হয়েছে। নৌকাও ছাড়লো, বৃষ্টিও নামলো। হুমায়ূন ভাই একটা প্রচণ্ড উল্কাপাত দেখলেন। আনিস হয়ে পড়লো অসুস্থ। শেষটায় কি হবে কে জানে।

AMARBOI.COM

বড় অস্থির লাগছে। "ইয়া মুকাদ্দেমু, ইয়া মুকাদ্দেমু, ইয়া মুকাদ্দেমু" কে যেন বলেছিল যুদ্ধের সময় এই হচ্ছে সবচে ভাল দোয়া, যার অথ 'হে অগ্রসরকারী।' এই দোয়া পড়ে শুধু এগিয়ে যাওয়া।

না বড় খারাপ লাগছে। ভালয় ভালয় ফিরে আসলে আর যাব না। সম্ভব হলে ফিরে যাব মৈমনসিংহ। কিন্তু গিয়ে করবটা কি? মা কোথায় আছেন কে জানে? বাবা বেচারা মরে বেঁচেছেন। কোন দায় দায়িত্ব নেই। কিন্তু আমিই বা কোন্ দায়িত্ববান সুপুত্রটি? বাবাকে ধরে নিয়ে গেল মিলিটারী, আমিও আসলাম পালিয়ে অথচ নিশ্চিত জানি মায়ের কোন সহায় সম্বল নেই। বোনগুলি বোকার বেহদ্দ। ফিরে গিয়ে হয়ত দেখব "অল কোয়ায়েট ইন দি ওয়েস্টার্ণ ফ্রন্ট। কেউ নেই সব সাফ হয়ে গেছে। মন্দ হয়না খুব। বাঁধা বন্ধনহীন বল্গাহারা জীবন। কি আনন্দ!

অবশ্যি এমনও হতে পারে—দেশ স্বাধীন হবে। আমি মৈমনসিংহ ফিরে যাব। বাবাকে হয়তো তারা প্রাণে মারেনি। তিনি জেল থেকে বেরিয়ে আসবেন। আবার আমরা সীতাকুণ্ড যাব। পাহাড় প্রমাণ জিনিসপত্র তোলা হবে ট্রেনে। এক সময় ট্রেন ছেড়ে দেবে, দেখবো বাবা প্রাণপণে দৌড়াচ্ছেন—। আহ্ চোখে জল আসে কেন?

ঃ মোক্তার সাহেব দোয়া রাখবেন। খোদা হাফেজ আনিস।

ঃ খোদা হাফেজ। খোদা হাফেজ।

AMARBOI.COM

আনিস সাবেত

আমার মন বলছে আজকের যুদ্ধে হুমায়ুন ভাই মারা যাবেন। নৌকার ছাদে বসে তিনি যখন আপন মনে গুন গুন করছিলেন তখনি আমার এ কথাটা মনে হয়েছে। কিছুক্ষণ পর তিনি নেমে এসে বললেন— "অনেকগুলি উল্কাপাত হল। একটা তো প্রকাণ্ড।" তখনি আমি নিশ্চিত হয়েছি। আমার মনের মধ্যে যে কথাটি ওঠে তাই সত্যি হয়। এ আমি অনেকবার দেখেছি।

সেবার স্বরূপহাটির রেলওয়ে কালভার্ট ওড়াতে গিয়েছি আমি রহমান আর ওয়াহেদ। রহমানের আবার খুব চায়ের নেশা। খুঁজে খুঁজে চায়ের দোকানও একটা বের করেছে। বিস্বাদ তেতো চা, তাতে চুমুক দিয়ে রহমান চেঁচিয়ে উঠলো—'ফার্স্ট ক্লাস চা।' আর তখনি কেন জানি আমার মনে হল রহমানের কিছু একটা হবে। হল তাই। হুমায়ুন ভাইয়ের বেলাও কি তাই হবে?

হুমায়ূন ভাইয়ের ঢাকার বাসার ঠিকানা আছে আমার কাছে। ১০/৭ বাবর রোড। মোহাম্মদপুর। ঢাকা-৭। দোতালায় থাকেন তাঁর বাবা মা। যদি সত্যি কিছু হয় তাহলে এই ঠিকানায় খবর দিতে আমি নিজেই যাব। তাঁর মা নিশ্চয়ই জানতে চাইবেন তাঁর ছেলে কি ভাবে থাকতো, কি করত। সব বলব আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। তাঁরা হয়ত ছেলে কোথায় মারা গেছে দেখতে চাইবেন। আমি নিজেই তাঁদের নিয়ে আসব। আমরা আজ যে পথে এসেছি সেই পথেই আনব। বলব—"রাতটা ছিল অন্ধকার। নক্ষত্রের আলোয় আলোয় এসেছি। পথে মোক্তার সাহেবের বাড়ীতে ভাত খেয়েছি।" হুমায়ূন ভাইয়ের মা হয়ত মোক্তার সাহেবকে দেখতে চাইবেন। মোক্তার সাহেবকে হয়ত তিনি বলবেন—"আপনি আমার ছেলেকে শেষবারের মত ভাত খাইয়েছেন। আল্লাহ্ আপনার মঙ্গল করুক।"

ঃ ক্যান কান্দেন?

আমাকে যে ছেলেটি বাতাস করছিল সে অবাক হয়ে আমার কাঁদবার কারণ জানতে চাইছে। ইচ্ছে করে কি আর কাঁদছি? হঠাৎ চোখে জল আসল।

ঃ মাথার মধ্যে পানি দিবেন একটু?

ঃ না।

ঃ মাথাটা টিপা দিমু?

ঃ না না।

সে দেখি আমার সেবা না করে ছাড়বেনা। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। কিন্তু আমার সহ্য হচ্ছেনা। আমিতো দিব্যি আরাম করে শুয়ে আছি। আর ওরা নিশ্চয়ই কাদা ভেঙে দ্রুত গতিতে এগুচ্ছে। রামদিয়া থেকে আরো দু মাইল উত্তরে মেথিকান্দা। সেখানে তারা হাঁটা পথে যাবে না নৌকায়?

টুনু মিয়ার দলে মোট কতজন ছেলে আছে? হুমায়ূন ভাই একবার বলেছিলেন কিন্তু এখন দেখি ভুলে বসে আছি। ওদের দু ইঞ্চি মর্টারও আছে। মেথিকান্দা আজ নিশ্চয়ই দখল হবে। সুজনতলির রেলওয়ে পুলও উড়িয়ে দেয়া হবে। সমস্ত অঞ্চলটা বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে স্বাধীন বাংলার ফ্ল্যাগ উড়িয়ে দেব। ফাইন। কে জানে এত গোলমালে কেউ কি আর জাতীয় পতাকার কথাটা মনে রাখবে? স্থানীয় লোকজনের কাছে নিশ্চয়ই স্বাধীন বাংলার ফ্ল্যাগ পাওয়া যাবে। আগেতো ঘরে ঘরে ছিল। মিলিটারী আসবার পর সবাই হয় পুড়িয়ে ফেলেছে

AMARBOI.COM

নয়তো এমন জায়গায় লুকিয়েছে যে ইঁদুরে খেয়ে গিয়েছে। এমন দিনে একটা ঝকঝকে নতুন ফ্ল্যাগ চাই।

এত দিন শুধু ছোট খাটো হামলা করেছি। বিভিন্ন থানায় ছোট খাটো খণ্ডযুদ্ধের পর রাতারাতি সরে এসেছি নিরাপদ স্থানে। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল ব্যতিব্যস্ত করে রাখা। মুহূর্তের জন্যেও শান্তির ঘুম না দেয়া। কিন্তু আজকের ব্যাপার অন্য। আজ আমরা খুঁটি গেড়ে বসব। আহ্ আবার চোখে জল আসে কেন?

পর্দার আড়াল থেকে সুশ্রী একটি মেয়ে উঁকি দিয়ে আমায় দেখে গেল। বেশ মেয়েটি। ইচ্ছে হচ্ছিল ডেকে কথা বলি। কিন্তু ইচ্ছেটা গিলে ফেলতে হল। এ বাড়িতে কিছু সময় থাকতে হবে আমাকে। এ সময় এমন কিছু করা উচিত নয় যাতে এ বাড়ীর লোকজন বিরক্ত হয়।

ঃ স্লামালিকুম।

ঃ অলায়কুম সালাম।

ঃ আমি গণি মিয়ার চাচাতো ভাই। উত্তরের বাড়ীতে থাকি। মিয়া সাহেরের শরীলডা এখন কেমুন?

ঃ ভাল।

শুধু গণি মিয়ার চাচাতো ভাই-ই নয়, আরো অনেকেই জড় হয়েছে। সম্ভবত আরো লোকজন আসবে। আমার বিরক্তি লাগছে আবার ভালও লাগছে। বিরক্তি লাগছে কথা বলতে হচ্ছে বলে, ভাল লাগছে লোক-জনদের কৌতূহলী চোখ দেখে। তোমরা তাহলে শেষ পর্যন্ত কৌতূহলী হয়েছ? দেখতে এসেছ মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের? বেশ বেশ।

ইস কি দিনই না গিয়েছে শুরুতে। গ্রামবাসী দল বেঁধে মুক্তি-বাহিনী তাড়া করেছে এমন ঘটনাও ঘটেছে। অবশ্যি তাদেরই বা দোষ দিই কি করে। মিলিটারী রয়েছে ওত পেতে। যেই শুনেছে অমুক গ্রামে মুক্তিবাহিনী ঘোরাফেরা করছে, হুকুম হল—"দাও ঐ গ্রাম জ্বালিয়ে।" যেই শুনেছে অমুক লোকের বাড়ী মুক্তিবাহিনী একরাত্রি ছিল, ওম্নি হুকুম হল "অমুক লোককে গুলি করে মার গ্রামের মধ্যিখানে যাতে সবার শিক্ষা হয়।" আহ্, শুরুতে বড় কষ্টের দিন গিয়েছে।

কয়টা বাজে এখন? আমার কাছে ঘড়ি নেই। সময়টা জানা থাকলে হত। বুঝতে পারতাম কখন গুলির আওয়াজ পাব। অবশ্যি প্রথম শুনবো ব্রীজ উড়িয়ে দেবার বিকট আওয়াজ। ব্রীজটা ওড়াতে

AMARBOI.COM

পারবেতো ঠিকমত ? শুনেছি রেঞ্জাররা পাহারা দেয় সারা রাত। খুব অস্থির লাগছে। ওদের সঙ্গে গেলেই হত। না হয় একটু দূরে বসে থাকতাম। রেসের ঘোড়ার মত হল দেখি। রেসের ঘোড়া বুড়ো হয়ে গেলে শুনেছি অর্ধ উম্মাদ হয়ে যায়। রেস শুরু হলে পাগলের মত পা নাচায়।

ঃ আপনার জন্যে দুধ আনব এক গ্লাস ?

সেই সুশ্রী মেয়েটি ঘরের ভেতর ঢুকেছে দেখে অবাক লাগছে। গ্রাম-ঘরের বাড়ীতে এ রকমতো হয় না! বেশ কঠিন পর্দার ব্যাপার থাকে। আমার খানিকটা অস্বস্তি লাগছে। গণি মিয়ার ভাই, যিনি আমার বিছানার পাশে বসেছিলেন তিনিও আমার অস্বস্তি লক্ষ্য করলেন। মেয়েটি আবার বললো—

ঃ আনব আপনার জন্যে এক গ্লাস দুধ ?

ঃ না না দুধ লাগবে না।

ঃ খান ভাল লাগবে। আনি ?

ঃ আন।

গণি মিয়ার ভাই বললেন—

ঃ বড় ভাল মেয়ে। শহরে পড়ে।

ঃ কি পড়ে ?

ঃ বি. এ. পড়ে। হোস্টেলে থাকে।

শুনে আমি অপ্রস্তুত। তুমি তুমি করে বলছি, কি কাণ্ড! কামিজ পরে আছে বলেই বোধ হয় এত বাচ্চা দেখা যায়। তা ছাড়া তার হাব ভাবও ছেলেমানুষীর।

মেয়েটি মোক্তার সাহেবের বড় ভাইয়ের মেয়ে। বড় ভাই ও ভাবী দুজনেই মেয়েটিকে ছোট রেখে মারা গেছেন। মেয়েটি মোক্তার সাহেবের কাছেই বড় হয়েছে। পড়াশোনার খুব ঝোঁক। ঢাকায় হোস্টেলে থেকে পড়ে। গণ্ডগোলের আভাস পেয়ে আগে ভাগেই চলে এসেছিল।

মেয়েটি দুধের গ্লাস আমার সামনের টেবিলে নামিয়ে রাখলোনা। হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। আমি বললাম—

ঃ তোমার নাম ?

ঃ হামিদা। হামিদা বানু।

AMARBOI.COM

আমি চুপ করে রইলাম। কি বলব ভেবে পেলাম না। অথচ মেয়েটি দাঁড়িয়েই আছে। হয়ত কিছু কথা শুনতে চায়। যুদ্ধের গল্প শুনতে মেয়েদের খুব আগ্রহ। হামিদা এক সময় বললো—

ঃ আমার নামটা খুব বাজে। একেবারে চাষা চাষা নাম।

আমি বললাম—'নাম দিয়ে কি হয়?'

ঃ হয়না আবার! আমার বন্ধুদের কি সুন্দর সুন্দর নাম। একজনের নাম 'কিন্নরী', একজনের নাম 'স্বাতী'।

মোক্তার সাহেব বললেন—

ঃ আপনার জন্যে ডাক্তার আনতে লোক গেছে। ভাল ডাক্তার—এল. এম. এফ। হামিদা আম্মাজি, ভেতরে যান।

বাহ্ কি সুন্দর আম্মাজি ডাকছে। মেয়েটি বোধ হয় সবার খুব আদরের। মোক্তার সাহেবের কথায় সে ঘাড় ঘুরিয়ে হাসল। আমাকে দেখতে আসা লোকগুলি চলে যাচ্ছে একে একে। এত তাড়াতাড়ি কৌতূহল মিটে গেল? মোক্তার সাহেব অবশ্যি লোকজনদের ঝামেলা না করবার জন্যে বলছেন। তবুও তাদের আগ্রহ এত কম হবে কেন?

অন্দর মহলের ফিসফিসানি শোনা যাচ্ছে। পর্দার ওপাশে জটলা পাকানো মেয়েদের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। হামিদা বললো—

ঃ ওরা আপনাকে দেখতে চায়। মুক্তিবাহিনী কোন দিনতো দেখে নাই।

ঃ তুমি দেখেছ নাকি?

ঃ এইত আপনাকে দেখলাম।

বাহ্ বেশ মেয়েতো। বেশ গুছিয়ে কথা বলে। ইউনিভার্সিটিতে আমাদের সঙ্গে পড়ত—শেলী রহমান। সেও এরকম গুছিয়ে কথা বলত—এক একবার আমাদের হাসিয়ে মারত। শেলী রহমানের বাবাতো পুলিশ অফিসার ছিলেন। মিলিটারীর হাতে মারা যাননিতো?

ঃ কয় ভাই বোন আপনারা?

ঃ আমি একা। ভাইবোন নেই কোন।

ঃ ভাইবোন না থাকা খুব বাজে।

একি গুলির আওয়াজ শুনলাম না? তাহলে কি শুরু হল নাকি? তিনটা বেজে গেছে এর মধ্যে! আমি ছটফট করে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম—"কয়টা বাজে হামিদা? একটু জেনে আসবে?"

AMARBOI.COM

মোক্তার সাহেব বললেন—"দুটো পঁচিশ।" কি আশ্চর্য, এখনো তো যুদ্ধ শুরুর সময় হয়নি। হামিদা বললো—

ঃ কি হয়েছে ?

ঃ গুলির আওয়াজ শুনলাম।

ঃ কই নাতো।

ঃ আমিতো শুনলাম নিজ কানে।

মোক্তার সাহেব বললেন—"না গুলির আওয়াজ নয়। গুলির আওয়াজ হলে বুঝতাম। কতবার যুদ্ধ হলো এখানে।"

মেথিকান্দার আশেপাশে যারা থাকে গুলির শব্দ তারা অনেকবারই শুনেছে। অনেকবার ব্যর্থ আক্রমণ হয়েছে এখানে। কিন্তু কেউ মুক্তি-বাহিনী দেখেনি এটা কেমন কথা! হয়তো সবাই বিল পার হয়ে ছোট খাল ধরে এগিয়েছে। আমাদের মত গ্রামের ভিতর দিয়ে রওনা হয়নি। যাই হোক এ নিয়ে ভাবতে ভাল লাগছে না। বমি বমি লাগছে। মাথাটা এমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে কেন ? ব্রীজটা ঠিকমত ওড়াতে পারবেতো ? এমন যদি হতো সবাই ঠিক ঠিক ফিরে এসেছে, কারো গায়ে আঁচড়টি লাগেনি। তাকি আর হবে। কি একটা গান আছে না সুবীর সেনের —"মন নিতে হলে মনের মূল্য চাই" ওকি, মাথা ঘুরছে নাকি ?

ঃ আপনার কি হয়েছে, এ রকম করছেন কেন ?

ঃ কিছু হয়নি। এইতো, এইতো গুলির শব্দ পাচ্ছি।

ঃ হামিদা যুদ্ধ শুরু হল।

ঃ বাতাসে জানালা নড়ার শব্দ শুনছেন।

ঃ মর্টারের শেল ফাটার আওয়াজ পাচ্ছ না ?

ঃ আপনি চুপ করে শুয়ে থাকুন। মাথায় পানি দেই ?

মেয়েটির মাথা নীচু হয়ে এসেছে। কিন্নরি না নাম ? উঁহু হামিদা। তাহলে কিন্নরি কার নাম ? বেশ সুশ্রী মেয়েটি। গলাটা কি লম্বা! ফর্সা, হাঁসের মত। ঐতো আবার শেল ফাটার আওয়াজ। আহ্ পুরোদমে ফাইট চলছে।

ঃ আপনি নড়াচড়া করবেন না। চুপ করে শুয়ে থাকুন।

অনেক অপরিচিত মহিলা ঘরের ভেতরে ভীড় করছেন। মোক্তার সাহেবকে দেখছি না তো। মোক্তার সাহেব কোথায় ? এই দাড়িওয়ালা লোকটি কে ?

AMARBOI.COM

রামদিয়ার ঘাটে তারা যখন পৌঁছিল তখন আকাশ আবার মেঘাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। গুড় গুড় করে মেঘ ডাকছে। বিজলী চমকাচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে। দমকা বাতাসে শোঁ শোঁ শব্দ উঠছে বাঁশবনে। হুমায়ুন পিছিয়ে পড়েছিল। হোঁচট খেয়ে তার পা মচকে গিয়েছে। সে হাঁটছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। জাফর গলা উঁচিয়ে ডাকলো—

ঃ হুমায়ুন ব্রাদার, হুমায়ুন ব্রাদার।

তার ডাকার ভঙ্গিটা ফূর্তিবাজের ভঙ্গি। সব সময় এ রকম থাকে না। মাঝে মধ্যে আসে। হুমায়ুন হাসলো মনে মনে। সেও খুব তরল গলায় সাড়া দিল—

ঃ কি ব্যাপার জাফর ?

ঃ বৃষ্টি আতা হ্যায়। বহুত মজাকা বাত।

বলতে বলতেই টুপ টুপ করে বিচ্ছিন্ন ভাবে বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে লাগলো। জাফর হেসে উঠলো হো হো করে। যেন এ সময় বৃষ্টি আসাটা খুব একটা আনন্দের ব্যাপার।

AMARBOI.COM

হাসান আলী মাথার বাক্স নামিয়ে তার উপর বসে ছিল। যদিও বেশ বেগে হাওয়া বইছে, তবু সে মনে গামছা দুলিয়ে নিজেকে হাওয়া করছিল। বৃষ্টি আসতে দেখে সেও কি মনে করে যেন হাসল।

মজিদ একটা সিগারেট ধরিয়েছে। ফুস ফুস করে ধোঁয়া ছাড়ছে। সে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। এখানে দাঁড়িয়ে তার ক্লান্তি আরো বেড়ে গেল। বিরক্ত হয়ে বললো—

ঃ কি ব্যাপার হাসান আলী, টুনু মিয়ার দল কোথায় ?

হাসান আলী সে কথার জবাব দিল না, গামছা দুলিয়ে হাওয়া করতেই লাগলো। মজিদ গলা উঁচিয়ে বললো—

ঃ কথা বলনা যে, কি ব্যাপার ?

ঃ নৌকা আসতাছে। বিশ্রাম করেন মজিদ ভাই।

হুমায়ুন ও জাফর এসে বসলো হাসান আলীর পাশে। বৃষ্টি নামতে নামতে আবার থেমে গেছে। বসে থাকতে মন্দ লাগছে না তাদের। রামদিয়ার ঘাটে টুনু মিয়ার দলকে না দেখতে পেয়ে তারা সে রকম অবাক হল না। জাফর হঠাৎ সুর করে বললো—"ওগো ভাবীজান, বাইচ বাইতে মর্দ লোকের কাম !"

তারা সবাই মিনিট দশেক বসে রইল। চারদিকে ঘন অন্ধকার। মাঝে মাঝে সিগারেটের ফুলকি আগুন জ্বলছে নিভছে। ঝিঁঝিঁ পোকার একটানা বিরক্তিকর আওয়াজ ছাড়া অন্য আওয়াজ নেই। হাসান আলী হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললো—

ঃ নৌকা দেখা যায়। উঠেন সবেই উঠেন।

দেশী ডিঙ্গি নৌকা ঠেলে উজানে নিয়ে আসছে।

হাসান আলী উঁচু গলায় সাড়া দিল—হই হই হই-হ। নৌকা থেকে একজন চেঁচিয়ে উঠল—

ঃ হাসান ভাই নাকিগো ? ও হাসান ভাই।

ঃ কি ?

ঃ ঠিকমত পেঁছিছেন দেহি।

হাসান আলী আচমকা প্রগলভ হয়ে উঠলো। নৌকা পাড়ে ভিড়তেই নৌকার দড়ি ধরে শিশুর মত চেঁচিয়ে উঠল—

ঃ টুনু মিয়া, ও টুনু মিয়া।

ঃ কি গো মিয়া ?

নৌকার ভেতর থেকে এক সঙ্গে উঁচু স্বরগ্রামে হেসে উঠলো সবাই। টুনু মিয়া লাফিয়ে নামলো নৌকা থেকে। বেঁটে খাটো মানুষ। পেটা শরীর। মাথার চুল ছোট ছোট করে কাটা। সে হাসি মুখে এগিয়ে গেল হুমায়ুনের দিকে।

ঃ আমারে চিনছেন কমাণ্ডার সাব ? আমি টুনু। বাজিতপুরের টুনু মিয়া। বাজিতপুর থানায় আপনার সাথে ফাইট দিছি।

হুমায়ুন বললো—"তোমরা দেরী করে ফেলেছ, আড়াইটা বাজে।"

ঃ আগে কন আমারে চিনছেন কিনা।

ঃ চিনেছি চিনেছি। চিনবোনা কেন ?

ঃ বাজিতপুর ফাইটে আমার বাম উড়াতে গুলি লাগলো। আপনি আমারে পিঠে লইয়া দৌড় দিলেন। মনে নাই আপনার ?

ঃ খুব মনে আছে।

ঃ বাঁচনের আশা ছিলনা। আপনে বাঁচাইছেন। ঠিক কইরা কন আমারে চিনছেন ? সেই সময় আমার লম্বা চুল আছিল।

হুমায়ুন অবশ্যি সত্যি চিনতে পারেনি, তবু আজকের এই মধ্যরাতে স্বাস্থ্যবান হাসি খুশী এই তরুণটিকে অচেনা মনে হলনা। দলের অন্যান্য

AMARBOI.COM

সবাই নেমে এসেছে। হাসান আলী তাদেরকে কি যেন বলছে আর তারা ক্ষণে ক্ষণে হেসে উঠছে। কে বলবে এই সব ছেলেদের জীবন মৃত্যুর সীমারেখা কিছুক্ষণের মধ্যেই সম্পূর্ণ মুছে যাবে।

জাফর বললো—আর লোকজন কোথায়?

ঃ আছে, জায়গা মতই আছে।

ঃ তাহলে আর দেরী কেন? নৌকা ছাড়া যাক। হুমায়ূন ভাই কি বলেন?

ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ উঠে পড় সবাই।

নৌকায় উঠে বসতেই বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামলো। নৌকা যদিও ভাটির দিকে যাচ্ছে, তবু বাতাসের ঝাপটায় এগুচ্ছে ধীর গতিতে। মাঝে মাঝে তীরে গজিয়ে ওঠা বেত ঝোপে আটকে যাচ্ছে। যতবারই নৌকা আটকে যাচ্ছে ততবারই মাঝি দুটি গাল পাড়ছে—"ও হালার পুত! ও হারামীর বাচ্চা।" গ্রামের ভেতর দিয়ে নৌকা যাবার সময় মেঘ ধরে গেল। তীরে বৃষ্টি অগ্রাহ্য করে অনেক কৌতূহলী লোক বসে আছে। দু'একজন সাহস করে নীচু গলায় বলছে "জয় বাংলা"। মুক্তিবাহিনী চলাচল হচ্ছে এ খবর কি করে পেল কে জানে। হুমায়ূন একটু বিরক্ত হল। মুখে কিছুই বললো না। অবশ্য ভয় পাবার তেমন কিছু নেইও। মিলিটারীরা কিছুতেই এই রাত্রিতে থানার নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে বাইরে বেরুবেনা। মজিদ বললো—

ঃ হুমায়ূন ভাই পজিশন নেব কোথায়? সব খানাখন্দ তো পানিতে ভর্তি। সাপ-খোপও আছে কিনা কে জানে।

নৌকার অনেকেই এই কথায় হেসে উঠলো। মজিদ রেগে গিয়ে বললো—'হাসো কেন? ও মিয়ারা হাসো কেন?' মজিদ রেগে যাওয়াতেই হাসিটা হঠাৎ করেই থেমে গেল। নৌকা নীরব হল মুহূর্তেই। তখনি শোনা গেল বাইরে ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি হচ্ছে। মাঝি দুজন ভিজে চুপসে গেছে। জাফর বললো—মাঝিরা তো দেখি গোসল সেরে ফেলেছ।

ঃ হগো ভাই তিন দফা গোসল হইল।

জাফর সুর করে বললো—"বাইচ বাইতে মর্দ লোকের কাম।"

মজিদ ক্রমাগতই বিরক্ত হচ্ছিল। ভয় করছিল তার। ভয় কাটানোর জন্যেই জিজ্ঞেস করলো—

ঃ মর্টার কোথায় ফিট করেছো তোমরা? থানা থেকে কতদূর।

ঃ গোসাই পাড়ায়। বেশী দূর না। পরতমে সেইখানে যাইবেন?

AMARBOI.COM

ঃ না না, যাওয়ার দরকার কি? তাদের কাজ তারা করবে। হুমায়ূন ভাই কি বলেন?

হুমায়ূন কিছু বললোনা। চুপ করে রইল। তার মচকে যাওয়া পা ব্যাথা করছিল। সে মুখ কুঁচকে বসে রইলো। তীর থেকে কে একজন চেঁচিয়ে ডাকলো—

ঃ কার নাও? কার নাও?

নৌকার মাঝি রসিকতা করলো, হেঁড়ে গলায় বললো—তোমার নাও।

ঃ নাও ভিড়াও মাঝি খবর আছে। নাও ভিড়াও।

নৌকা ভিড়লোনা, চলতেই থাকলো। এবং কিছুক্ষণ পরেই তীব্র টর্চের আলো এসে পড়লো নৌকায়। নৌকা ভিড়াও মাঝি, সামনে রাজাকার আছে।

ঃ কোন্‌খানে?

ঃ শেখজানির খালের পারে বইসা আছে।

ঃ থাকুক বইসা, তুমি কেডা গো?

ঃ আমি শেখজানি হাই স্কুলের হেড মাষ্টার আজিজুদ্দীন। মুক্তি বাহিনীর নাও নাকি?

ঃ মনে লয় হেই রকমই।

নৌকা ভিড়লোনা, কারণ নৌকা শেখজানির খালে যাচ্ছে না। আজিজুদ্দীন মাষ্টার হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। এই মাঝরাত্রে সে ছয় ব্যাটারীর টর্চ হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন কে জানে।

এখান থেকেই গ্রামের চেহারাটা বদলাতে শুরু করেছে। দুটি আস্ত বাড়ী, তার পর পরই চারটি পুড়ে যাওয়া বাড়ী। আবার একটা গোটা বাড়ী নজরে আসছে, আবার ধ্বংসস্তূপ। মিলিটারীরা প্রায় নিয়মিত আসছে এদিকে। লোকজন পালিয়ে গেছে। ফসল বোনা হয়নি। চারদিক জনশূন্য। নৌকা যতই এগিয়ে যায়, ধ্বংসলীলার ভয়াবহতা ততই বেড়ে ওঠে। আর এগোনো ঠিক নয়। রাজাকারদের ছোটখাটো দল প্রায়ই নদীর তীর ঘেঁসে ঘুরে বেড়ায়। নজর রাখে রাতদুপুরে কোন রহস্যজনক নৌকা চলাচল করছে কিনা। তাদের মুখোমুখি পড়ে গেলে তেমন ভয়ের কিছু নেই। তবে আগে ভাগেই গোলাগুলির শব্দে চারিদিক সচকিত করে লাভ কি?

AMARBOI.COM

ঃ রুস্তম ভাই? হই রুস্তম ভাই।

ঃ কেলা গো?

ঃ আমি চান্দু পাঞ্জাবী মিলিটারী হি হি হি। নৌকা থামান।

নৌকার গতি থেমে গেল সঙ্গে সঙ্গে। একটি ছোটখাটো রোগা মানুষ লাফিয়ে উঠলো নৌকায়। জাফর বললো—কি ব্যাপার, কি চাও তুমি? কে তুমি?

ঃ আমি কেউ না, আমি চান্দু।

ঃ কি কর তুমি?

ঃ আমি খবরদারী করি। আপনেরার সাথে যামু। যা করবার কন করমু।

রুস্তম বললো—"চান্দুরে লন সাথে, খুব কামের ছেলে। গ্রেনেড নিয়া এক্কেবারে থানার ভিতরে ফালাইব দেখবেন।" চান্দু গম্ভীর হয়ে বললো—

ঃ নামেন গো ভাল মানুষের পুলারা। জিনিসপত্র যা আছে আমার মাথায় দেন।

পিন পিনে বৃষ্টি মাথায় করে দলটি নেমে পড়লো। সবে মাটিতে পা দিয়েছে ওমনি দুরাগত বিকট আওয়াজ কানে এলো। কি হলো কি হলো। দলটি দাঁড়িয়ে পড়লো হঠাৎ। মজিদ উৎকন্ঠিত স্বর বের করলো—হুমায়ুন ভাই কি ব্যাপার? উতর দিল চান্দু—"কিছু না। পুল ফাটাইয়া দিছে। সাবাস ব্যাটা বাপের পুত।"

তা হলে ব্রীজ উড়িয়ে দেয়া হয়েছে। আহ্ কি আনন্দ। ভয় কমে যাচ্ছে সবার। সবাই দাঁড়িয়ে থাকলো কিছুক্ষণ। বিকট শব্দ হুম হুম করে প্রতিধ্বনি তুললো। থানার হলুদ রঙের দালানটি দেখা যাচ্ছে। রঙ দেখা যাচ্ছে না। কাঠামোটা স্পষ্ট নজরে আসছে। থানার আশেপাশে দু'শ গজের মত জায়গা পরিস্কার করে ফেলা হয়েছে। ঘরবাড়ী নেই, গাছপালা নেই। খাঁ খাঁ করছে। অনেক দূর থেকে যাতে শত্রুর আগমন টের পাওয়া যায় সেই জন্যেই এই ব্যবস্থা।

তিনটি দলে ভাগ হয়ে অপেক্ষা করছে ছেলেরা। এদেরও অনেক পেছনে আধ ইঞ্চি মর্টার নিয়ে অপেক্ষা করছে একটি ছোট্ট দল। যে দলে পেন্সনভোগী একজন বৃদ্ধ সুবাদার আছেন—পুরনো লোক। তাঁর উপর বিশ্বাস করা চলে। উত্তর দিকের ঢালু অঞ্চলটায় রুস্তম একাই আঁট হয়ে বসেছে। মাটি হয়েছে পিছল। এল, এম, জির পা পিছলে আসে। কিন্তু সে সব এখন না ভাবলেও চলে।

AMARBOI.COM

চান্দু বসে আছে জাফরের পাশে। তার ইচ্ছে বুকে হেঁটে থানার সামনে যে দুটি বাঙ্কার সেখানে গ্রেনেড ছুঁড়ে আসে। এ কাজ নাকি সে আগেও করেছে। জাফর কান দিচ্ছে না তার কথায়।

বৃষ্টি থেমে গিয়ে আকাশ আবার পরিষ্কার হয়েছে। তারা দেখা যাচ্ছে। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে হু হু করে। ঘণ্টা দু একের ভেতরই অন্ধকার কেটে গিয়ে আকাশ ফর্সা হবে। শুরু হবে আরেকটি সূর্যের দিন।

কর্দমাক্ত ভেজা জমি; চারপাশে গাঢ় অন্ধকার, ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা। এর মধ্যেই নিঃশব্দে অপেক্ষা করছে সবাই। কেমন যেন অদ্ভুত লাগে। রুস্তম ফিস ফিস করে বলে—"পায়ের উপর দিয়ে কি গেল সাপ নাকি? ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগলো।" তার কন্ঠস্বর অন্য রকম শোনায়। কেউ কোন জবাব দেয় না। সবাই অপেক্ষা করবে সেই মুহূর্তটির জন্যে, যখন মনে হবে পৃথিবীতে আমি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। রাইফেলের উপর ঝুঁকে থাকা এক একটি শরীর আবেগে ও উত্তেজনায় কাঁপতে থাকবে থর থর করে।

AMARBOI.COM

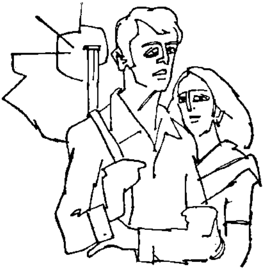

নির্বাসন

রাত্রিতে তাঁর ভাল ঘুম হয়নি।

বার বার ঘুম ভেঙেছে—তিনি ব্যস্ত হয়ে ঘড়ি দেখেছেন। না—এখনো রাত কাটেনি। একবার হিটার জ্বালিয়ে কফি বানালেন। কিছুক্ষণ পায়চারি করে আসলেন ছাদে। আবার বিছানায় ফিরে গিয়ে ঘুমুতেও চেষ্টা করলেন। ছাড়া ছাড়া ঘুম, অর্থহীন এলোমেলো স্বপ্ন দেখে আবার ঘুম ভাঙলো।

ভোর হতে আর কতো দেরী? আকাশে সামান্য একটু আলোর রেখা কখন ফুটবে? কা কা করে কাক ডাকছে। অন্ধকার একটু যেন ফিকে হয়ে গেলো। আর হয়তো বেশী দেরী নেই। তিনি এই শীতেও ঘরের দরজা জানালা সব খুলে দিলেন। জানালার সমস্ত পর্দা গুটিয়ে ফেললেন। অন্ধকারে কিছুই নজরে আসছে না। কিন্তু তিনি বাতি জ্বালালেন না। হাতড়ে হাতড়ে ইজিচেয়ারটি খুঁজে বের করলেন। এখানে শুয়ে থেকেই রেডিওগ্রামের সুইচ নাগাল পাওয়া যায়। রেডিও-গ্রামে সানাইয়ের তিনটি লং প্লেইং রেকর্ড সাজানো আছে। সুইচ টিপলেই প্রথমে বেজে উঠবে বিসমিল্লাহ খাঁর মিয়া কি টোড়ী। তিনি সুইচে হাত রেখে ভোরের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। তাঁর বহুদিনের শখ জরীর বিয়ের দিনের ভোরবেলা সানাইয়ের সুর শুনিয়ে ঘুম ভাঙা-বেন। ঘুম ভাঙতেই সবাই যেন বুঝতে পারে জরী নামের এ বাড়ীর একটি মেয়ে আজ চলে যাবে। বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ তাঁর চোখে

জল আসলো। বয়স হবার পর থেকে এই হয়েছে, কারণে অকারণে চোখ ভিজে ওঠে। সুখ এবং দুঃখের অনুভূতি বড় তীব্র হয়ে বুকে বাজে।

একতলায় কার যেন পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। ঘটাং ঘটাং শব্দে টিউবওয়েলে কেউ একজন পানি তুলছে। মোরগ ডাকছে। ভোর হলো বুঝি। তিনি সুইচ টিপলেন।

সানাই শুনলে এমন লাগে কেন? মনে হয় বুকের মাঝখানটা হঠাৎ ফাঁকা হয়ে গেছে। তাঁর অদ্ভুত এক রকমের কষ্ট হতে লাগলো। তিনি ঘর ছেড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। হু হু করে শীতের হিমেল বাতাস বইছে। এবার বড় আগেভাগে শীত পড়ে গেল। খুব শীত পড়লেই তাঁর ছোটবেলার কথা মনে পড়ে। স্পষ্ট দেখতে পান কমলালেবু হাতে আট বছরের একটি বাচ্চা ছেলে বারান্দায় বসে হু হু করে কাঁপছে। আজও তার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ল। আহ্, পুরনো কথা ভাবতে এত ভাল লাগে। তিনি মনে মনে বললেন, 'ভাগ্যিস জন্তু জানোয়ার না হয়ে মানুষ হয়ে জন্মেছি।'

জরী কি এখনো ঘুমুচ্ছে? আজ ঘুম ভাঙলে তার কেমন লাগবে কে জানে? তাঁর খুব ইচ্ছে হচ্ছে জরীকে ঘুম ভাঙিয়ে নিয়ে আসেন। সে আজ তাঁর সঙ্গে ছাদে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখুক। দেখুক খুব ভোরে চেনা পৃথিবী কেমন অচেনা হয়ে পড়ে। হালকা কুয়াশায় ঢাকা শীতের সকালে কি অপরূপ সূর্যোদয়!

AMARBOI.COM

কিন্তু জরীটা বড্ড ঘুমকাতুরে। তিনি কত চেষ্টাই করেছেন সকালে জেগে ওঠার অভ্যাস করাতে। সে বরাবর আটটার দিকে উঠেছে। বিছানা না ছেড়েই চিৎকার, 'ও মা, চা দাও, ও মা চা দাও।' বাসি মুখে চায়ে চুমুক দিতে দিতে সে উঠে এসেছে দোতলায়। তিনি হয়ত ততক্ষণ রেয়াজ শেষ করে উঠবেন উঠবেন করছেন। জরী হাসি মুখে বলেছে, বড় চাচা আজকেও আপনার গান শুনতে পারলাম না।'

তিনি বিরক্ত হয়ে বলেছেন, 'দশটায় ঘুম ভাঙলে কি গান শুনবে জরী? আমার গান শুনতে হলে রাত কাটার আগে উঠতে হবে।'

কাল ঠিক উঠব বড় চাচা। এই আপনার তানপুরা ছুঁয়ে বলছি। বলতে বলতেই তানপুরার তারে টোকা দিয়েছে জরী। 'গাঁও' করে একটি গম্ভীর আওয়াজ উঠেছে। শুনে জরীর সে কি হাসি।

তিনি মনে মনে বললেন, 'আজ শুধু জরীর কথা ভাববো।' তিনি জরীর মুখ মনে করতে চেষ্টা করলেন। আশ্চর্য, মনে আসছেনাতো! এ রকম হয়। খুব ঘনিষ্ঠ লোকজন, যারা সব সময় খুব কাছাকাছি থাকে, হঠাৎ করে তাদের মুখ মনে করা যায় না। তাই ভ্রূ কুঞ্চিত করে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে ছাদে উঠে গেলেন।

এ বাড়ীর ছাদটি প্রকাণ্ড। ছাদের চার পাশে বড় বড় ফুলের টবে অযত্নে কিছু গোলাপ চারা বড় হচ্ছে। তিনি ছাদের কার্নিসে ঝুঁকে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে সামনে হাত বাড়ালেন। ছাদের এ দিকটায় দু'টি প্রকাণ্ড আমগাছ দিনের বেলাতেও অন্ধকার করে রাখে। চারদিকে অন্ধকার ফিকে হয়ে আসলেও এখানে কালো রঙ জমাট বেঁধে আছে। কেমন একটা মিষ্টি গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। শীতকালে আমের মুকুল হয় নাকি?

বড় চাচা।

তিনি চমকে পিছনে ফিরলেন। আশ্চর্য! জরী দাঁড়িয়ে আছে পেছনে। ঘুম জড়ানো ফোলা ফোলা মুখ। মেয়েটিকে আজ বড় অচেনা মনে হচ্ছে। এত রূপসীতো জরীকে কখনো মনে হয়নি। বিয়ের আগের দিন সব মেয়ে নাকি গুটিপোকার মত খোলস ছেড়ে প্রজাপতি হয়ে বেরিয়ে আসে। তিনি হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে রইলেন।

বড় চাচা কি করছেন এখন একা?

সানাই শুনছি।

আজ আমি খুব ভোরে উঠেছি। আপনি খুশী হয়েছেন চাচা?

তিনি হাসলেন। জরী একটা হলুদ রঙের চাদর গায়ে জড়িয়েছে। একটু একটু কাঁপছে শীতে।

জরী তোর শীত লাগছে?

উঁহু। আপনি আজ রেওয়াজ করবেন না চাচা?

না মা। আজ আমার ছুটি।

দুজনে খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। জরী অস্ফুট স্বরে বললো, 'ইস, কি কুয়াশা পড়েছে বাবা।'

তিনি এক সময় বললেন, 'সানাই শুনতে ভাল লাগছে জরী?'

লাগছে।

কে বাজাচ্ছে জান?

কে বাজাচ্ছে?

AMARBOI.COM

বিসমিল্লাহ খাঁ, এখন বাজছে মিয়া কি টোড়ী। জরী আরো কাছে সরে এসে কার্ণিশে ভর দিয়ে দাঁড়াল। মৃদু গলায় বললো, ‘কি সুন্দর লাগছে, আগে জানলে রোজ ভোরে উঠতাম।’ তিনি জরীর দিকে তাকিয়ে সস্নেহে হাসলেন। জরী বললো, ‘একটা হাল্কা সুবাস পাচ্ছেন বড় চাচা?’

পাচ্ছি।

বলুনতো কিসের?

তিনি ভাবতে চেষ্টা করলেন। শিউলী ফুলের নাকি? বাগানে একটি শিউলী গাছ আছে। কিন্তু সে ফুলের গন্ধতো হাল্কা।

এতক্ষণে সূর্য উঠলো। গাছে গাছে কাক ডাকছে। কিচির-মিচির করতে করতে দু'টি শালিক এসে বসলো ছাদে। জরী হাত বাড়িয়ে দুটি আমের পাতা ছিঁড়ে এনে গন্ধ শুঁকলো। তিনি দেখলেন জরী কাঁদছে। তিনি চুপ করে রইলেন। আহা একটু কাঁদুক। এমন একটি সময়ে না কাঁদলে মানায় না। তাঁর ভীষণ ভাল লাগলো। তিনি কোমল গলায় বললেন, জরী দেখ সূর্য উঠছে। এমন সুন্দর সূর্যোদয় কখনো দেখেছিস?

জরী চোখ মুছে ধরা গলায় বললো, ‘শান্তাহার যাবার সময় একবার ট্রেনে দেখেছিলাম।’

দেখ, আজকে আবার দেখ।

জরী ফিস ফিস করে বললো, ‘কি সুন্দর!’

বলতে বলতে জরী আবার চোখ মুছলো। তিনি নরম গলায় বললেন, ‘বোকা মেয়ে আজকের দিনে কেউ কাঁদে? ঐ দেখ দু'টি শালিক পাখী। দুই শালিক দেখলে কি হয় মা?’

জরী ফিস ফিস করে বললো, ‘ওয়ান ফর সরো টু ফর জয়।’

ঠিক তখনি জরীর বন্ধুরা নীচ থেকে জরী জরী করে চেঁচাতে লাগলো। জরী নিঃশব্দে নিচে নেমে গেল।

তিনি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। ভোরের এ রকম অচেনা আলোয় মন বড় দুর্বল হয়ে যায়। আপনাকে ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিৎকর মনে হয়। বড় বেশী মনে পড়ে দিন ফুরিয়ে গেল। তিনি সুর করে পড়লেন, ‘ফাবিআয়ে আলা রাব্বিকুমা তুকাজ জি বান।’

কাল রাতে চার বান্ধবী জরীকে নিয়ে এক খাটে ঘুমিয়েছিল। এরা অনেক দিন পর এক সঙ্গে হয়েছে। লায়লার সঙ্গে জরীর দেখা হয়েছে

AMARBOI.COM

প্রায় চার বছর পর। আভা ও কনক ময়মনসিংহ থাকলেও দেখা সাক্ষাৎ প্রায় হয়না বললেই চলে। রুনু জরীর দূর সম্পর্কের বোন। স্কুলের পড়া শেষ হবার পর একমাত্র তার সঙ্গেই জরীর রোজ দেখা হয়। পুরোনা বন্ধুদের মধ্যে শেলী ও ইয়াসমীন আসেনি।

অনেকদিন পর মেয়ে বন্ধুরা একত্রিত হলে একটা দারুণ ব্যাপার হয়। আচমকা সবার বয়স কমে যায়। প্রতিনিয়ত মনে হয় বেঁচে থাকাটা কি দারুণ সুখের ব্যাপার।

জরীর বন্ধুরা গত পরশু থেকে ক্লান্তিহীন হৈ চৈ করে যাচ্ছে। গুজ গুজ করে খানিকক্ষণ গল্প, পরমুহূর্তেই উচ্ছ্বসিত হাসি। আবার খানিকক্ষণ গল্প, আবার হাসি। একজনকে হয়তো দেখা গেল হঠাৎ কি কারণে দল ছেড়ে দৌড়ে পালাচ্ছে। তার পিছনে পিছনে ছুটছে বাকী সবাই। খিল্ খিল্ হাসির শব্দে সচকিত হয়ে উঠছে বাড়ীর লোকজন।

গতরাতটা তাদের জেগেই কেটেছে। আভা তার প্রেমের গল্প বলেছে রাত একটা পর্যন্ত। তার প্রেমিকটি একজন অধ্যাপক। আভার বর্ণনানুসারে দারুণ স্মার্ট ও খানিকটা বোকা। সে তার স্মার্ট প্রেমিকটির দুটি চিঠিও নিয়ে এসেছিল বন্ধুদের দেখাতে। কাড়াকাড়ি করে দেখতে গিয়ে সে চিঠির একটি ছিঁড়ে কুটি কুটি। অন্যটি থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবাই বানান ভুল বের করতে লাগলো। এক একটি ভুল বের হয় আর আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে সবাই।

মাঝরাতে লায়লার হঠাৎ চা খাবার ইচ্ছে হল। কনক বললো, 'চমৎকার, চল সবাই ছাদে বসে চা খাই।' রুনু রাজী হল না। তার নাকি ঘুম পাচ্ছে। সে বললো, 'এই শীতে ছাদে কেন? এখনেই তো বেশ গল্পগুজব করছিস।'

কনক বললো, 'ছাদে আমি গান শোনাব।' সঙ্গে সঙ্গে দলটি চেঁচিয়ে উঠল। গত দুদিন ধরেই কনককে গাইবার জন্যে সাধাসাধি করা হচ্ছে। লাভ হয়নি। কনক কিছুতেই গাইবে না। লায়লা একবার বলেই ফেলল, 'একটু নাম হয়েছে, এতেই এতো তেল, টাকা না পেলে আজকাল তুই আর গাস না?' কনক কিছু বলেনি, শুধু হেসেছে।

দুর দার শব্দ করে সবাই যখন ছাদে উঠল তখন নিশীথ রাত। চারদিক ভীষণ অন্ধকার। জরী বললো, 'দুর ছাই জোছনা নেই। আমি ভেবেছিলাম জোছনা আছে।' আভা বললো, 'আমার ভয় করছে ভাই, গাছের ওপর ওটা কি?'

AMARBOI.COM

ওটা হচ্ছে তোর অধ্যাপক প্রেমিকের এঞ্জেল বডি। তোকে দেখতে এসেছে। সবাই হো হো করে হেসে উঠলো। এই হাসির মধ্যেই গান শুরু করলো কনক, 'সঘন গহন রাত্রি...'

গান শুরু হতেই সবাই চুপ করে গেল। আভা চাপা গলায় বললো, কি সুন্দর গায়, বড় হিংসা লাগে।

কনকের গলা খুব ভাল। স্কুলে থাকাকালীন কিন্তু কেউ বুঝতে পারেনি অল্প সময়ে কনকের এত নাম ধাম হয়ে যাবে। রেডিওতে প্রথম যখন গায় তখন সে কলেজে পড়ে। তার পরপরই তার গানের প্রথম ডিস্ক বের হয়—যার এক পিঠে, 'আমি যখন তার দুয়ারে ভিক্ষা নিতে যাই', অন্য পিঠে, 'ওগো 'শেফালী বনের মনের কামনা'।

কনক পর পর চারটি গান গাইল। গানের মাঝখানে জরীর মা আসলেন চায়ের পট নিয়ে। মৃদু অনুযোগের সুরে বললেন, 'নাও তোমাদের চা। এত রাত্রে ছাদে গান বাজনা কি ভাল? চা খেয়ে ঘুমুতে যাও সবাই।' কেউ নড়ল না। রুনু বললো, 'কনক, আজ সারারাত তোমাকে গাইতে হবে।' জরীর মাও এক পাশে বসে পড়লেন। জরীর বড় চাচাও উঠে এলেন ছাদে। আসর যখন ভাঙল তখন রাত দুটো! জরীর বড় চাচা বললেন, 'বড় ভাল গাইলো মা, বড় মিঠা গলা। জরীর গলাও ভাল ছিল। কিন্তু সেতো আর শিখলো না।'

আভা বললো, 'এখন শিখবে।'

সবাই খিল খিল করে হেসে উঠলো। কনক বললো, 'আপনার একটা গান শুনি?'

অন্যদিন, আজ অনেক রাত হয়েছে। তোমরা ঘুমুতে যাও।

সে রাতে কারোরই ভাল ঘুম হল না। জরীর বড্ড মন কেমন করতে লাগল। তার ইচ্ছে করলো মার কাছে গিয়ে ঘুমোয়। কিন্তু সে মরার মত পড়ে রইল। আভা একবার ডাকলো, 'জরী ঘুমিয়েছিস?' জরী তার জবাব দিল না। এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল সবাই। শুধু জরী জেগে রইল। বিয়ের আগের রাতে কোন মেয়ে কি আর ঘুমুতে পারে?

ইনিয়ে বিনিয়ে ভৈরবীর সুরে সানাই বাজছে। যে সুরটি ওঠানামা করছে সেটি যেন একটি শোকাহত রমণীর বিলাপ। অন্য যে সুরটি ক্রমাগত বেজে যাচ্ছে সেটি যেন বলছে, 'কেঁদোনা মেয়ে শোন তোমায় কি চমৎকার গান শোনাচ্ছি।'

AMARBOI.COM

জরীর বন্ধুদের ঘুম ভেঙেছে। জরী ঘরে নেই। লায়লা গাঢ় স্বরে ডাকলো, 'ও কনক, কনক'।

কি ?

সানাই শুনছিস ?

শুনছি।

ভাল লাগছে তোর ?

না। খুব মন খারাপ করা সুর।

তারা সবাই ঘর ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। আভা গলা উঁচিয়ে ডাকল, 'জরী জরী।' জরী ছাদ থেকে নেমে আসতেই সবাই দেখলো তার চোখ ঈষৎ রক্তাভ ও ফোলা ফোলা। রুনু বললো, 'রাতে তোর ঘুম হয়নি, না রে ?'

খুব হয়েছে।

এখন তোর কেমন লাগছে জরী ?

কেমন আর লাগবে। ভালই। আয় বাগানে বেড়াতে যাই।

তারা বাগানে নেমে গেল। এ বাড়ীর বাগানটি পুরোনো। জরীর দাদার খুব ফুলের সখ ছিল। মালী রেখে চমৎকার বাগান করেছিলেন। বসরাই গোলাপের প্রকাণ্ড একটি ঝাড় ছাড়া এখন আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। বাড়ির সর্ব দক্ষিণে বেশ কিছু হাস্নাহেনা গাছ আছে। সেখানে হাঁটু উঁচু বড় বড় ঘাস গজিয়েছে। ওদিকটায় কেউ যায় না।

আভা বললো, 'এত সুন্দর বাগান কেউ যত্ন করেনা কেনরে ?' জরী বললো, 'বাগানের শখ নেই কারো। এক পরী আপার ছিল, সেতো আর থাকেনা এখানে।' লায়লা বললো, 'পরী আপা কি আগের মত সুন্দর আছে ?'

আসলেই দেখবি।

কখন আসবেন ?

সকাল সাড়ে আটটায় ময়মনসিংহ এক্সপ্রেসে।

কনক বললো, 'এত বড় গোলাপ হয় নাকি ? আশ্চর্য, জরী গোলাপ তুলবো একটা ?'

তোল না।

চারজন ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে লাগলো। সবাই কিছু পরিমাণে গম্ভীর। লায়লা ঘন ঘন কাশছে। কাল রাতে তার ঠাণ্ডা লেগেছে। কনকের দেখাদেখি সবাই গোলাপ ছিঁড়ে খোঁপায় গুঁজেছে। আভা হঠাৎ করে বললো, 'তোদের এখানে বকুল গাছ নেই, না ?'

উঁহু।

আমার হঠাৎ বকুল ফুলের কথা মনে পড়ছে। আমাদের স্কুলের বকুল গাছটার কথা মনে আছে তোদের ?

সবাই এক সঙ্গে হেসে উঠলো। স্কুলের বকুল গাছটা নিয়ে অনেক মজার মজার ব্যাপার আছে।

জরীর মা দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে মেয়েদের দেখছিলেন। তিনি সেখান থেকে চেঁচিয়ে ডাকলেন, 'ও জরী, জরী ?'

কি মা ?

কি করিস তোরা ?

কনক বললো, 'বেড়াচ্ছি—আপনিও আসুন না খালাম্মা।'

জরীর মা হাসি মুখে নেমে এলেন। মনে হলো মেয়েদের দলের ভীড়ে তাঁর বয়স যেন হঠাৎ করে কমে গিয়েছে। তিনি খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বললেন, 'গত রাত্রে একটা মজার স্বপ্ন দেখেছি। দেখলাম জরী যেন খুব ছোট হয়ে গিয়েছে। ফ্রক পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে বাগানে। আর জেগে দেখি সত্যিই তাই।'

হুঁ বললেই হল। আমি বুঝি ফ্রক পরে ঘুরে বেড়াচ্ছি ?

জরীর মা হাসতে লাগলেন। অন্যরকম গলায় বললেন, 'আমার যখন বিয়ে হয় তখন এ বাগানটা আরো বড় ছিল। আমি রোজ সকালে এখানে এসে একটা করে ফুল খোঁপায় গুঁজতাম।

বলেই তিনি হঠাৎ লজ্জা পেয়ে গেলেন। লায়লা বললো, 'আসুন খালা আজ আপনার খোঁপায় একটি ফুল দিয়ে দি।'

কি যে বল মা ছিঃ ছিঃ !

কিন্তু ততক্ষণে কনক একটি ফুল ছিঁড়ে এনেছে। জরীর মা আপত্তি করবার আগেই তারা সেটি খোঁপায় পরিয়ে দিল। তিনি বিব্রত ভঙ্গিতে বললেন, 'আমি তোমাদের চায়ের যোগাড় করি। আর দেখ হাস্নুহেনা ঝাড়ের দিকে যেয়োনা। খুব সাপের আড্ডা ঐদিকে।'

শীতকালে সাপ কোথায় খালা ?

না থাক। তবু যাবে না।

জরীর মা চলে যেতেই আভা বললো, 'খালা এখনো যা সুন্দর, দেখলে হিংসা লাগে।'

পরী আপাও ভীষণ সুন্দর, তাই না জরী ?

হ্যাঁ। আর আমি কেমন ?

AMARBOI.COM

পরী আপা ফার্স্টক্লাস হলে তুই ইন্টারক্লাস আর আমাদের কনক হচ্ছে এয়ার কণ্ডিশন ফার্স্টক্লাস।

কনক একটু গম্ভীর হয়ে পড়ল। জরীর দিকে তাকিয়ে বললো, 'তোর খুব মায়াবী চেহারা জরী। রূপবতী হওয়া খুব বাজে ব্যাপার।'

বাজে হলেও আমি রূপবতী হতে রাজি।

সবাই হেসে উঠলেও কনক হাসলো না। অসাধারণ সুন্দরী হয়ে জন্মানোয় সে অনেকবার বাথরুমে দরজা বন্ধ করে কেঁদেছে। অনেকবার তার মনে হয়েছে সাধারণ একটি বাঙালী মেয়ে হয়ে সে যদি জন্মাতো। শ্যামলা রঙ একটু বোকা বোকা ধরনের মায়াবী চেহারা। কিন্তু তা হয়নি। পুরুষের লুব্ধ দৃষ্টির নীচে অনেক যন্ত্রণার মধ্যে তাকে বড় হতে হয়েছে। অথচ ছোট বেলায় কেউ যখন বলতো, 'কনকের মত সুন্দর একটি মেয়ে দেখেছি আজ', তখন কি ভালই না লাগতো।

কুয়াশা কেটে রোদ উঠেছে। ধানী রঙের নরম রোদ। শিশির ভেজা মাটি থেকে আর্দ্র এক ধরনের গন্ধ উঠছে।

মেয়েদের দলটি গোল হয়ে বসে আছে শিউলী গাছের নীচে। এই গাছটি একসময়ে প্রচুর ফুল ফোটাতো। আজ আর সে ক্ষমতা নেই। ইতস্তত কয়েকটি সাদা সাদা ফুল পড়ে আছে। শীতের বাগানে যখন ধানী রঙের রোদ ওঠে এবং সেখানে যদি কয়েকটি মেয়ে চুপচাপ গোল হয়ে বসে থাকে তাহলে বাগানের চেহারাই পাল্টে যায়। বড় চাচা অবাক হয়ে দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বিয়ে বাড়ীর লোকজন ক্রমে ক্রমে জেগে উঠছে। বাচ্চা ছেলেমেয়েদের হুটোপুটি আর কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছে। টিউবওয়েলের ঘটাং ঘটাং শব্দ করে ক্রমাগত পানি তোলা হচ্ছে। ডেকোরেটরের দোকান থেকে লোকজন এসে গেটের জন্য মাপজোক শুরু করেছে, জরীর বাবা অকারণে একতলা থেকে দোতলায় ওঠানামা করছেন। মাঝে মাঝে তাঁর উঁচু গলা শোনা যাচ্ছে, 'এক ঘন্টা ধরে বলছি এক কাপ চা দিতে। শুধু এককাপ চা, এতেই এত দেরী? মেয়ের বিয়ে কি আর কারো হয় না?'

আভা হঠাৎ বললো, 'জরী তোর ছোট চাচার ছেলে কি আমেরিকা চলে গেছে?'

না। সতেরো তারিখে যাবে।

একাই যাচ্ছে?

না। বড় চাচা সঙ্গে যাবেন।

কনক বললো, 'কি জন্যে যাচ্ছেন ? কই আমি তো কিছু জানি না ?'

জরী অস্বস্তি বোধ করলো। থেমে থেমে বললো, 'চিকিৎসা করাতে যাচ্ছে। মেরুদণ্ডে গুলি লেগেছিল, সেই থেকে পেরাপ্লেজিয়া হয়েছে। কোমরের নিচ থেকে অবশ।'

আমাকে তো কিছু বলিসনি তুই, গুলি লাগল কি করে ?

আর্মির লেফটেন্যান্ট ছিলেন। কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে যখন পাক আর্মির সাথে যুদ্ধ হয় তখন গুলি লেগেছে।

লায়লা বললো, 'জরীর এই ভাইটিকে তো চিনিস কনক। মনে নেই একবার আমরা সবাই দল বেঁধে আনন্দমোহন কলেজে থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলাম, তখন যে একটি ছেলে সন্ন্যাসী সেজেছিল। হঠাৎ নাটকের মাঝখানে তার দাড়ি খুলে পড়ে গেল। ঐতো আনিস। যা মুখচোরা ছিল।'

জরী একটু হেসে বললো, 'ছোটবেলায় আনিস ভাই ভীষণ বোকা ছিল। একেকবার এমন হাসির কাণ্ড করতো। তাকে নিয়ে কোথাও বেড়াতে গেলেই হয়েছে, হয় সেখানে একটা কাপ ভাঙবে, নয় চেয়ার নিয়ে হঠাৎ গড়িয়ে পড়বে।'

রুনু বললো, 'বাঘের গল্পটা বল জরী, ওটা ভীষণ মজার।'

না থাক।

বল না শুনি।

একবার আমরা সবাই 'জঙ্গল বয়' ছবি দেখে এসেছি। আনিস ভাই ফিরে এসেই বড় চাচার সোয়েটার গায়ে দিয়ে বাঘ সেজেছে। আর আমরা সেজেছি হরিণ। আনিস ভাই হালুম শব্দ করে আমার ঘাড় কামড়ে ধরলো। কিছুতেই ছাড়বে না। রক্ত-টক্ত বেরিয়ে সারা, শেষে বড় চাচা এসে ছাড়িয়ে দিলেন। দেখ এখনো দাগ আছে।

জরীর মা দোতলা থেকে ডাকলেন, 'ও মেয়েরা চা দেয়া হয়েছে এসো শিগগীর।' সবাই দেখলো তাঁর মুখ খুব উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। একজন সুখী চেহারার মা, যার খোঁপায় গোঁজা ফুলটি এখনো রয়েছে। হয়ত ফেলে দিতে তাঁর মনে নেই কিংবা ইচ্ছা করেই ফেলেননি। আভা বললো, 'চা খেয়ে আমরা আনিস ভাইয়ের সঙ্গে একটু গল্প করব, কেমন জরী ?'

বেশতো করবি।

যুদ্ধের গল্প শুনতে আমার খুব ভাল লাগে।

AMARBOI.COM

কনক বললো, 'কই, আর সানাইয়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে নাতো?

সানাই বাজছিল ঠিকই, কিন্তু বিয়ে বাড়ীর হৈ চৈ এত বেড়েছে যে শোনা যাচ্ছে না।

তারা সবাই দোতলায় উঠে এলো। সিঁড়িতে জরীর বাবার সঙ্গে দেখা। তিনি দ্রুত নামছিলেন। জরীকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত গলায় বললেন, 'শুনেছিস কারবার, রশীদ টেলিফোন করেছে—দৈ নাকি পাওয়া যাবে না। জরী তুই আমার সোয়েটার বের করে দে, আমি নিজেই যাই। তাড়াতাড়ি কর, এমন গাধার মত দাঁড়িয়ে আছিস কেন?' বলে তাঁর খেয়াল হল। বিব্রত ভঙ্গিতে বললেন, 'আমি নিজেই খুঁজে নেব।' জরীর বন্ধুরা হাসতে লাগল।

সমস্ত শরীর মনে হচ্ছিল অবশ হয়ে যাচ্ছে। কোমরের কাছে চিন-চিনে ব্যথা ক্রমশ তীব্র ও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। সে তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছল। ব্যথাটা শুরু হলেই ভীষণ ঘাম হয় ও পানির প্রবল তৃষ্ণা হয়। আজ টেবিলে পানির জগটি শূন্য। বিয়েবাড়ীর ব্যস্ততার জন্যেই হয়তো রাতে পানি রেখে যেতে কারো মনে নেই। আনিস উল্টোদিকে একশ থেকে গুণতে শুরু করলো। একশ, নিরানব্বই, আটানব্বই...। কোন একটা ব্যাপারে নিজেকে ব্যস্ত রাখা, যাতে ব্যথাটা ভুলে থাকা যায়।

AMARBOI.COM

ঘড়িতে সাড়ে ছ'টা বাজে। অন্যদিন এই সময়ে টিংকু এসে পড়ে। আজ আসেনি। বিয়েবাড়ীর হৈ-চৈ ফেলে সে যে আসবে এ রকম মনে হয় না। তবু দরজার পাশে কোন একটা শব্দ উঠতেই আনিস উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। না টিংকু নয়। আবার তোয়ালে দিয়ে মুখের ঘাম মুছে আনিস কাৎরাতে থাকে। আশি, উনআশি, আটাত্তর সাতাত্তর...। সাতটা বেজে গেছে। আজ তাহলে টিংকু আর আসলোই না।

অন্যদিন ভোর ছটার মধ্যেই দরজায় ছোট ছোট হাতের থাবা পড়তো। চিনচিনে গলা শোনা যেত,

আনিস আনিস।

কি টিংকুমনি?

আমি এসেছি দরজা খোল।

আনিসের খাটটি এমনভাবে রাখা যে সে শুয়ে শুয়েই দরজার হুক নাগাল পায়। টিংকুর সাড়া পেলেই সে দরজা খুলে দিত। দেখা যেত

ঘুম ঘুম ফোলা মুখে চার বছরের একটি বাচ্চা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার মাথা ভর্তি লাল চুল। গায়ে কোন ফ্রক নেই বলে শীতে কাঁপছে। দরজা খুলতেই সে গম্ভীর হয়ে বলবে, 'আনিস তোমার ব্যথা কমেছে?'

হ্যাঁ টিংকু।

আচ্ছা।

তারপর সেই লাল চুলের মেয়েটি ঝাঁপিয়ে পড়বে বিছানায়। তার হৈ চৈ-এর কোন সীমা থাকবে না। এক সময় বলবে আমি হাতী হাতী খেলবো। তখন কালো কম্বলটা তার গায়ে জড়িয়ে দিতে হবে। একটি কোলবালিশ ধরতে হবে তার নাকের সামনে এবং সে ঘন ঘন হুংকার দিতে থাকবে। আনিস বার বার বলবে, 'আমি ভয় পাচ্ছি, আমি ভয় পাচ্ছি।' এক সময় ক্লান্ত হয়ে কম্বল ফেলে বেরিয়ে আসবে সে। হাসি মুখে বলবে, 'আনিস এখন সিগারেট খাও।' টিংকু নতুন দেয়াশলাই জ্বালাতে শিখেছে। সে সিগারেট ধরিয়ে দেবে। কিন্তু আজ দিনটি শুরু হয়েছে অন্যরকম ভাবে।

আজ টিংকু আসেনি। আনিস আবার ঘড়ি দেখল। সাড়ে সাতটা বাজে। এ সময়ের মধ্যে অন্যদিন তার দাড়ি কামানো হয়ে যেত। বাসি জামা কাপড় বদলে ফেলতো। ভোরের প্রথম কাপ চা খাওয়াও শেষ হত। আজ হয়নি। রাত থাকতেই যে অসহ্য ব্যথা শুরু হয়েছে দিনের আলোর সঙ্গে সঙ্গে তা যেন ক্রমেই বাড়ছে। পিপাসায় বুক মুখ শুকিয়ে কাঠ।

AMARBOI.COM

খুট করে শব্দ হল দরজায়। আনিস চমকে উঠে বললো, 'কে টিংকু নাকি? টিংকু?' কিন্তু টিংকু আসেনি। কে একটি অপরিচিত ছেলে উঁকি দিচ্ছে। আনিস কড়া গলায় ধমকালো, 'গেট এওয়ে গেট এওয়ে।'

ভয়ে ছেলেটির চোখে জল এসে গেল। তার পড়নে স্ট্রাইপ দেয়া লাল বেলজারের সার্ট ও মাপে বড় একটি সাদা প্যান্ট। প্যান্টটা বার বার খুলে পড়ছে আর সে টেনে টেনে তুলছে। আনিস ক্ষেপে গিয়ে বললো, 'যাও এখান থেকে—যাও।'

ছেলেটি প্যান্ট ছেড়ে দিয়ে হাত দিয়ে চোখের জল মুছল। অনেক দূর নেমে গেল প্যান্ট। সে ভয় পাওয়া গলায় বললো, 'আমি হারিয়ে গেছি। আম্মাকে খুঁজে পাই না।'

কি নাম তোমার?

বাবু।

আনিস খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল বাবুর দিকে। হঠাৎ গলার স্বর পাল্টে কোমল সুরে বললো, 'ভেতরে এসো বাবু।'

বাবু সংকুচিত ভঙ্গিতে ভেতরে এসে ঢুকল। ইতস্তত করে বললো, 'তুমি কাঁদছ কেন?'

আমার অসুখ করেছে।

পেটে ব্যথা?

হুঁ।

বস তুমি চেয়ারে। তোমার আম্মাকে খুঁজে দেব। কোথায় থাক?

বাসায় থাকি।

কি নাম তোমার?

বলেছিতো একবার।

ও, তোমার নাম বাবু। বসো একটু।

আনিস তোয়ালে দিয়ে আবার কপালের ঘাম মুছল। ন'টা বেজে গেছে। রোদ এসেছে ঘরের ভেতরে। একটা ভ্যাপসা ধরনের গরম পড়েছে। বাসি বিছানা থেকে এক ধরনের ভেজা গন্ধ আসছে। বাবু বসে আছে চুপচাপ, সে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আনিসের দিকে।

আনিস ভাই ভেতরে আসব?

দরজার ওপাশে জরীর বন্ধুরা কৌতূহলী চোখে উঁকি দিচ্ছে। এদের মধ্যে এক রুনুকেই আনিস চিনতে পারল। আনিস বললো, 'জরী আসেনি?'

না। সে একতলায় আটকা পড়েছে।

জরীর গায়ে হলুদের আয়োজন চলছে নীচে। পরীর জন্যে অপেক্ষা করতে করতেই গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান পিছিয়ে গেল। পরীর আসবার সময় হয়েছে। তাকে আনতে স্টেশনে গাড়ী গিয়েছে।

চিত্রিত পিঁড়িতে বসে আছে জরী। কলসীতে করে পানি এনে রাখা হয়েছে। জরীর সামনে ডালায় বিচিত্র সব জিনিসপত্র সাজানো। সেখানে আবার দু'টি প্রদীপ জ্বলছে। রাজ্যের মেয়েরা ভীড় করেছে সেখানে। বরের বাড়ী থেকে পাঠানো গায়ে হলুদের শাড়ী নিয়ে বেশ হৈ চৈ হচ্ছে। কাজের বেটিরাও নাকি এত কম দামী শাড়ী পরে না—এ ধরনের কথা শোনা যাচ্ছে। রুনু এই ফাঁকে তার বন্ধুদের দোতলায় নিয়ে এসেছে। কনক তখন থেকেই আনিসের সঙ্গে দেখা করবার কথা বলছিল।

আনিস বললো, 'ভেতর এসো রুনু। কি ব্যাপার?'

আনিস ভাই, এরা সবাই জরী আপার বন্ধু, তোমার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছে।

আনিস বিরক্তি চেপে কোনমতে বললো, 'তোমরা বস।'

ঘরে বসবার কিছু নেই। একটি মাত্র চেয়ার ছিল, সেটিতে বাবু গম্ভীর হয়ে বসে আসে। আনিস কি বলবে ভেবে পেল না। বিব্রতভাবে বললো, 'হঠাৎ আমার সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছে হ'ল কেন?'

কেউ সে কথার জবাব দিল না। রুনু কনককে দেখিয়ে বললো, এর নাম কনক, খুব নামকরা মেয়ে আনিস ভাই। রেডিওতে রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়। সেই আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বেশী ব্যস্ত।

কনক চুপ করে রইল। আভা বললো, আপনি 'আমাদের যুদ্ধের গল্প বলুন আনিস ভাই।'

আনিস থেমে থেমে বললো, 'আমি যুদ্ধের কোন গল্প জানিনা।'

কেন আপনি পাক আর্মীর সঙ্গে যুদ্ধ করেননি?

করেছি।

সেই গল্প বলুন।

আমি যুদ্ধের গল্প বলি না।

আভা মুখ কালো করে ফেললো। শায়লা বললো, 'চল কনক যাই, গায়ে হলুদের সময় হয়ে গেছে।' কনক নড়ল না, থেমে থেমে বললো, 'যুদ্ধের সময় আমি বড় কষ্ট করেছি আনিস ভাই। বরিশালের কাছে এক জঙ্গলে আমি, আমার মা আর দুই খালা এক সপ্তাহ লুকিয়ে ছিলাম। এক খালা সেই জঙ্গলেই ভয় পেয়ে মারা গিয়েছিলেন।'

আনিস বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইল কনকের দিকে। কনক গাঢ় স্বরে বললো, 'খুব কষ্ট করেছি বলেই যারা যুদ্ধ করেছে তাদের আমার সব সময় খুব আপন মনে হয়।'

কনকের কথার মাঝখানে আনিস হঠাৎ বলে উঠল, 'আমি খুব অসুস্থ। তোমার সঙ্গে পরে আলাপ করব। রুনু এই ছেলেটিকে নিয়ে যা। সে তার মাকে খুঁজে পাচ্ছে না।'

বাবুকে রুনু কোলে তুলে নিতে গেল। বাবু চেয়ারে আরও ভাল করে সেঁটে বসল। আনিসের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বললো, 'আমি যাব না। আমি এখানে থাকব।' রুনু তাকে দুহাত ধরে উপরে তুলতেই সে পা ছুঁড়ে কাঁদতে শুরু করল। রুনু বললো, 'আনিস ভাই আমরা যাই?'

AMARBOI.COM

আচ্ছা যাও। কিছু মনে করো না কনক।

না না আনিস ভাই, আমি কিছু মনে করিনি।

আনিস হাঁপাতে শুরু করল। অসহ্য! দর দর করে ঘামছে সে। বুক শুকিয়ে কাঠ। দাঁতে দাঁতে চেপে সে মনে মনে গুণল—একশ, নিরানব্বই....। দরজায় টোকা পড়ল। আনিস তাকালো ঘোলা চোখে। বাবু আবার ফিরে এসেছে। আনিস চোখ বন্ধ করে ফেললো। বাবু বললো, 'আমি এসেছি।'

আনিস কোন মতে বলালো, 'বাবু এক গ্লাস পানি আন।'

আনিসের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। পেথিড্রিন দিতে হবে নাকি কে জানে। বড়চাচাকে খবর দেয়া প্রয়োজন।

বাবু পানির খোঁজে বেরিয়ে একা একা ঘুরে বেড়াতে লাগলো। হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল ছাদে। সেখানে মিস্তিরীরা সামিয়ানা খাটাচ্ছে। সে অনেকক্ষণ তাই দেখলো। তারপর নেমে এলো দোতলায়। দোতলা খাঁ খাঁ করছে। সবাই গিয়েছে গায়ে হলুদে। সে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

জরীর বড়চাচা তাঁর রেডিওগ্রাম বন্ধ করে দিয়ে বিরক্ত হয়ে বারান্দায় বসেছিলেন। বাবু তাঁকে গিয়ে বললো, 'পানি খাব।' তিনি তাকে পানি খাইয়ে দিলেন। বাবু শান্ত হয়ে আনিসের ঘর খুঁজে বেড়াতে লাগল।

AMARBOI.COM

পরীর ট্রেন ভোর সাড়ে আটটার মধ্যে ময়মনসিংহ পৌঁছানোর কথা। কিন্তু গফরগাঁ আসতেই পৌনে ন'টা হয়ে গেল। মেল ট্রেন অথচ ছোট বড় সব স্টেশন ধরছে। লোক উঠেছে বিস্তর। ছাদে পর্যন্ত গাদাগাদি ভিড়। ফার্স্ট ক্লাশ কামরাগুলি অপেক্ষাকৃত ফাঁকা ছিল। কিন্তু কাওরাইদে এক দঙ্গল ছাত্র উঠে পড়ল। বিপদের ওপর বিপদ, পরীর মেয়ে লীনা কদিন ধরেই সর্দিতে ভুগছিল। ট্রেনে ওঠার পর থেকে তার জ্বর হু হু করে বাড়তে লাগল। পরী মেয়েকে কোলে করে জানালার এক পাশে বসেছে, তার অন্য পাশে বসেছে পান্না। পান্না এক দণ্ডও কথা না বলে থাকতে পারে না। সে ক্রমাগত মাকে প্রশ্ন করে যাচ্ছে। এটা কি মা? ঐ লোকগুলি নৌকায় কি করছে মা? ঐ নৌকাটার পাল লাল আর এইটার সাদা কেন?

হোসেন সাহেব ট্রেনে উঠেই একটা বই তার নাকের সামনে ধরে রেখেছেন। গাড়ীর ভীড়, লীনার জ্বর বা পান্নার প্রশ্নমালা কিছুই তাকে বিচলিত করতে পারছে না। পরীর বিরক্তি ক্রমেই বাড়ছিল। এক সময় সে ঝাঁঝিয়ে উঠলো, 'রাখ তোমার বই। দেখ মেয়েটার কেমন জ্বর।'

হোসেন সাহেব হাত বাড়িয়ে মেয়ের উত্তাপ দেখলেন। শান্ত গলায় বললেন, 'ও কিছু নয়, এক্ষুণি রেমিশন হবে।' তিনি বইয়ের পাতা ওল্টাতে লাগলেন। পান্না বললো, 'মা রেমিশন কি?'

কি জানি। চুপ করে বসে থাক।

গাড়ীর অনেকেই কৌতূহলী হয়ে তাকিয়েছিল পরীর দিকে। পরী সেই ধরনের মহিলা যাদের দিকে পুরুষেরা সব সময় কৌতূহলী হয়ে তাকায়। চোখে চোখ পড়লেও দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয় না।

রূপবতী মেয়েদের প্রায়ই বড় রকমের কোন ত্রুটি থাকে। পরীর একটিমাত্র ত্রুটি, সে বোকা। হোসেন সাহেব পরীকে বিয়ে করে বেশ হতাশ হয়েছেন। শুধুমাত্র রূপ এক একটি পুরুষকে দীর্ঘদিন মুগ্ধ করে রাখতে পারে না। পরীর মেয়ে দুটি মায়ের মত রূপবতী হয়নি দেখে হোসেন সাহেব খুশী হয়েছেন। মেয়ে দুটি বাবার গায়ের রঙ শ্যামলা পেয়েছে। চোখ মুখ নাক ফোলা ফোলা। অনেকখানি মিল আছে চাইনিজ বাচ্চাদের সঙ্গে। এবারডীন হসপিটালের এক নার্স হোসেন সাহেবকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'বাচ্চাদের মা কি চাইনীজ?' পরী তার মেয়ে দুটিকে নিয়ে মাঝে মাঝে দুশ্চিন্তায় ভোগে। বড় হলে বিয়ে দিতে ঝামেলা হবে এই সব ভাবনা তাকে মাঝে মধ্যেই পায়। হোসেন সাহেবকে সে কথা বলতেই তিনি হো হো করে হাসতে থাকেন। পরী রাগী গলায় বলে, 'এর মধ্যে হাসির কি হল? কালো মেয়েদের কি ভাল বিয়ে হয়? আমি যদি কালো হতাম তুমি আমাকে বিয়ে করতে?' হোসেন সাহেব একটু অপ্রস্তুত হন। মাঝে মধ্যে পরী বেশ গুছিয়ে কথা বলে। হোসেন সাহেব বলেন, 'আমার সঙ্গে তোমার বিয়েটা তাহলে খুব ভাল বিয়ে বলতে চাও?'

পরী তার জবাব দেয় না। কারণ মাঝে মাঝে তার নিজেরই সন্দেহ হয়। যদিও হোসেন সাহেব একটি নিখুঁত ভদ্রলোক এবং তাঁকে বিয়ে করবার ফলেই পৃথিবীর অনেকগুলি বড় বড় দেশ ঘুরে বেড়িয়েছে, তবু কোথাও কিছু অমিল আছে। লণ্ডনে থাকাকালীন প্রথম এটি পরীর চোখে পড়ে। পরীকে সারাদিন একা একা থাকতে হতো ফ্ল্যাটে। রেকর্ড

AMARBOI.COM

বাজিয়ে আর রান্না করে কতটুকু সময়ই বা কাটে। গল্প করার কোন লোক নেই। পরী ইংরেজী জানলেও বলতে পারে না, আবার বিদেশী উচ্চারণ বুঝতেও পারে না। সারাটা দিন কাটতো কয়েদীর মত। হোসেন সাহেব ফিরতেন সন্ধ্যাবেলায়। চা খেয়েই তার পড়াশোনা শুরু হত। পরী হয়তো কিছু একটা গল্প শুরু করেছে, হোসেন সাহেব হাসিমুখে তাকিয়ে আছেন তার দিকে। কিন্তু কিছুদূর বলবার পরই পরী বুঝতে পারতো হোসেনের গল্প শোনার মুড নেই। সে তাকিয়ে আছে পরীর দিকে ঠিকই কিন্তু ভাবছে অন্য কিছু। পরী আচমকা গল্প বন্ধ করত। হোসেন সাহেব বলতেন, 'তারপর কি হল?'

'থাক। আর ভাল লাগছে না।' বলেই গম্ভীর হয়ে উঠে যেত পরী। তার আরো খারাপ লাগতো যখন দেখতো হোসেন গল্প বন্ধ হওয়ায় খুশীই হয়েছে।

পরী বললো, 'ময়মনসিংহ আর কতদূর?'

হোসেন সাহেব বই থেকে চোখ তুলে বললেন, 'দূর আছে।'

পরী বললো, 'বাই রোডে আসলে বড়ো ভাল হতো।' হোসেন সাহেব জবাব দিলেন না। পান্না বললো, 'বাই রোডে আসলে ভাল হতো কেন মা?'

'আর একটা কথা বললে চড় খাবি পান্না।' পরী ঝাঁঝিয়ে উঠলো। পান্না উসখুস করতে লাগল। আরেকটা কথা জানবার জন্যে তার খুব ইচ্ছে হচ্ছে। সে কয়েকবার মার দিকে তাকাল। মা ভীষণ গম্ভীর। কাজেই সে ঝুঁকে আসলো বাবার কাছে। ফিস ফিস করে কানে কানে বললো, 'বাবা একটা কথা শোন।'

বল।

ঐ যে কারেন্টের তারে পাখী বসে আছে দেখেছ?

হুঁ দেখলাম, শালিক পাখী।

ঐ পাখীগুলি শক খায় না কেন?

টেলিগ্রাফের তারে বসে আছে। টেলিগ্রাফের তারে কারেন্ট নেই।

অ বুঝেছি।

পরী দেখল মেয়ে ও বাবা খুব আলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। সে আগেও দেখেছে মেয়ের সঙ্গে আলাপে হোসেনের কোন ক্লান্তি নেই। তখন আর্জেন্ট কলের কথাও মনে থাকে না। জরুরী টেলিফোন করতে হবে বলে হঠাৎ উঠে পড়ারও প্রয়োজন হয় না। পরীর মনে হল সে দারুণ অসুখী

AMARBOI.COM

ও দুঃখী। এ রকম মনোভাব তার প্রায়ই হয়। সে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলো।

বিলেতে থাকাকালীনও পরী লক্ষ্য করেছে তার ব্যাপারে হোসেনের যেন কোন আগ্রহ নেই। প্রায়ই এক গাদা চিঠি আসতো পরীর। হোসেন সাহেব ভুলেও জিজ্ঞেস করতেন না চিঠি কে লিখলো। সে সব চিঠির জবাব লিখতে এক সময় গভীর রাত হয়ে যেত। ঘড়ির কাঁটার নিয়মে ঘুমুতে যেতেন হোসেন সাহেব, ভুলেও জিজ্ঞেস করতেন না এতো রাত জেগে কোথায় চিঠি লেখা হচ্ছে।

হোসেনের এক বন্ধু প্রায়ই আসতো বাসায়। পরীর সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা আলাপ করতো সে। পরী কোন কোন দিন ইচ্ছে করেই সেই বন্ধুটির সঙ্গে বেড়াতে যেতো। ফিরতে রাত হতো প্রায় সময়ই। পরী চাইতো হোসেনের মনে একটু সন্দেহ দেখা দিক। ঈর্ষার কিছু জীবাণু কিলবিল করে উঠুক তার মনে। কিন্তু সে রকম কিছুই হয়নি। হোসেন নির্বিকার ও নিরাসক্ত। হাল ছেড়ে দিয়ে নিজেকে গুটিয়ে নিল পরী। লীনা পান্না আসলো সংসারে। জমজ মেয়ে একা সামলান মুশকিল। রাত জাগা, কাপড় বদলে দেয়া, ঘড়ি দেখে দেখে দুধ বানানো—এসব করতে করতে এক সময় পরীর মনে হলো সংসারটা এমন কিছু খারাপ জায়গা নয়। হোসেনের মতো স্বামী নিয়ে সুখী হতে বাধা নেই।

কিন্তু হোসেন যদি আরেকটু কাছে আসতো! পরীর কত কি আছে গল্প করবার। সে সব যদি সে মন দিয়ে শুনতো। কথার মাঝখানে থেমে গিয়ে যদি না বলতো, 'পরী আজ বড় ঘুম পাচ্ছে।' তাহলে জীবনটা অনেক বেশী অর্থবহ ও সুরভিত হতো না?

ময়মনসিংহ এসে গেল প্রায়। এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটি স্টেশনে গাড়ী এসে থেমেছে। ছাত্রদের দলটি নেমে যাওয়াতে কামরাটি একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে। হোসেন সাহেব বই বন্ধ করে জানালা দিয়ে গলা বের করলেন। চমৎকার ইউনিভার্সিটি। সবুজে ছয়লাপ। সাদা রঙের বড় বড় দালানগুলিকে দ্বীপের মত লাগছে। রাস্তার দু পাশে নারকেল গাছের সারি। পরী বললো, 'লীনার জ্বর আর নেই। দেখতো ক'টা বাজে।'

দশটা পনেরো। আড়াই ঘন্টা লেট।

পান্না বললো, 'আড়াই ঘন্টা লেট হলে কি হয় বাবা?'

খুব মজা হয়। জুতো পরে নাও পান্না, আর দেরী নেই।

লীনাকে শুইয়ে রেখে পরী টয়লেটে গিয়ে চুল আঁচড়াল। পান্নার জুতো পরিয়ে দিল। লীনার ঘুম ভাঙিয়ে তার জামা বদলে দিল। বেশ

AMARBOI.COM

লাগছে তার। পরী হালকা গলায় বললো, 'জরীর গায়ে হলুদ কি হয়ে গেল?'

তোমার জন্যে নিশ্চয়ই অপেক্ষা করবে।

পরী হাসিমুখে বললো, 'বউ সাজলে জরীকে কেমন দেখাবে কে জানে?' হোসেন সাহেব জবাব দিলেন না। তিনি খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন।

দূর থেকে স্টেশনের লাল দালান দেখা যাচ্ছে। লাইন বদল হওয়ার ঘটাং ঘটাং শব্দ আসছে। হোসেন সাহেব হঠাৎ বললেন, 'পরী, আনিসের চিঠির কথাটা মনে আছে? বড় কষ্ট লাগছে।'

পরী বললো, 'আনিস বাঁচবে তো?'

না। স্পাইনাল কর্ডের লম্বোসেকরেল রিজিওন ডেমেইজড। তাছাড়া শুধু পেরাপ্লেজিয়া নয়, আরো সব জটিলতা দেখা দিয়েছে। শুনেছি পেথিড্রিন দিতে হয়।

পরী গম্ভীর হয়ে পড়ল। হোসেন সাহেব বললেন, 'কাল রাত থেকে আনিসের চিঠির কথা মনে পড়ছে। তোমার কাছে আছে সেটা?'

চিঠিটি আনিস পরীকে অনেক ভণিতা করে লিখেছিল। লণ্ডনে থাকাকালীন পাঁচ বৎসরে আনিস মাত্র চারটি চিঠি লিখেছিল। ছয় সাত লাইনের দায়সারা গোছের চিঠি। কিন্তু শেষ চিঠিটি ছিল সুদীর্ঘ। চিঠিতে অনেক কায়দা-কানুন করে লিখেছে সে জরীকে বিয়ে করতে চায়। কাউকে বলতে লজ্জা পাচ্ছে। তবে জরীর কোন আপত্তি নেই। এখন একমাত্র ভরসা পরী। পরী যদি দয়া করে কিছু একটা করে তাহলে সারা জীবন সে...... ইত্যাদি ইত্যাদি।

পরী এ চিঠি পেয়ে হাসবে কি কাঁদবে ভেবে পায়নি। সে জোর গলায় বলেছে, 'জরী কিছুতেই রাজী হবে না। ভাই বোনের মত মানুষ হয়েছি ছোট বেলায়, সবাই এক খাটে ঘুমাতাম।'

কিন্তু হোসেন সাহেব খুব শান্ত গলায় বলেছেন, 'খুব রাজী হবে। আনিসের মত ছেলে হয় না। তুমি লেখ শ্বশুর সাহেবকে। আমিও লিখবো।'

আনিসের চিঠি পড়ে হোসেন সাহেবের বুঝতে একটুও অসুবিধে হয়নি যে চিঠিটা আসলে লিখেছে জরী। আনিস শুধু কপি করেছে। চিঠিতে পাঁচবার 'আশ্চর্য' শব্দটি আছে। ঘন ঘন আশ্চর্য ব্যবহার করা জরীর পুরোনো অভ্যেস। তার সব চিঠি শুরু হয় এইভাবে, 'আশ্চর্য, বহুদিন আপনাদের চিঠি পাই না।'

AMARBOI.COM

আনিস খুবই ভাল ছেলে এতে সন্দেহের কোন কারণ নেই। তবু পরী জানতো বাবা রাজী হবেন না। তিনি কোন একটি বিচিত্র কারণে আনিসকে সহ্য করতে পারতেন না। তাছাড়া আনিসের মা বিধবা হবার পর পরই আরেকটি ছেলেকে বিয়ে করে খুলনা চলে যান। এই নিয়েও অনেক কথা ওঠে। সব জেনে শুনে পরীর বাবা আনিসকে পাত্র হিসেবে পছন্দ করবেন কেন? তাছাড়া এত ঘনিষ্ঠভাবে চেনা একটি ছেলেকে কি বিয়ে করা উচিত? পরী খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল।

এর পরপরই স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু হল। পরীকে চিঠি লিখতে আর হলো না। সে যখন দেশে ফিরে আসলো তখন আনিস কম্বাইণ্ড মিলিটারী হসপিটালে। সেখান থেকে পি. জি-তে।

জরী আনিসকে দেখে খুব কেঁদেছিল। আনিস সান্ত্বনার ভঙ্গিতে বলেছে, 'একটা যুদ্ধে অনেক কিছু হয় জরী।' কতবার জরী গিয়েছে হাসপাতালে। কত কথাইতো হয়েছে, কিন্তু ভুলেও আনিস সেই চিঠির উল্লেখ করেনি। জরীও সে প্রসঙ্গ তোলেনি। যেন তাদের মনেই নেই তারা দুজনে মিলে চমৎকার একটি চিঠি লিখেছিল পরীকে।

গাড়ী ইন করেছে স্টেশনে। হোসেন সাহেব বললেন, 'লীনাকে আমার কোলে দিয়ে তুমি নামো পরী।' পরীকে দেখতে পেয়ে এক দল ছেলেমেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'ইস এত দেরী, এদিকে বোধহয় গায়ে হলুদ হয়ে গেল।'

পরী তাদের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলো।

AMARBOI.COM

বিয়ে বাড়ি খুব জমে উঠেছে।

বাড়ির সামনের খোলা মাঠে ছেলেমেয়েরা হৈ হৈ করে চি বুড়ি খেলছে। তাদের চিৎকারে কান পাতা দায়। শিশুদের আরেকটি দল গম্ভীর হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেখানে বাবুর্চিরা রান্না বসিয়েছে, সেখানেও অপেক্ষাকৃত কম বয়সী শিশুদের জটলা। ছাদে সামীয়ানা খাটানো হয়ে গেছে। সেখানে চেয়ার টেবিল সাজানো হয়েছে। অনেকেই ভারিক্কি চালে চেয়ারে বসে আছে।

কিশোরী মেয়েদের ছ-সাতজনের একটি দল জোট বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিয়ে উপলক্ষে তারা আজ সবাই শাড়ী পরেছে। সবাই আপ্রাণ চেষ্টা করছে যেন তাদেরকে মহিলার মত দেখায়। এদের

মধ্যে শীলা নামের একটি মেয়ে বাড়ি থেকে এক প্যাকেট দামী সিগারেট এনেছে। বিয়ে বাড়ীর একটি নির্জন আড়াল খুঁজে পেলেই সিগারেট টানা যায়। কিন্তু কোথাও সে রকম জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না। কিশোরীর এই দলটির সবাই কিছু পরিমাণে উত্তেজিত। তারা কথা বলছে ধীরে ধীরে। মাঝে মাঝেই হেসে উঠছে, তবে সে হাসির স্বরগ্রামও খুব নীচু।

শেষ পর্যন্ত তারা একটি জায়গা খুঁজে পেল। দোতলায় সবচেয়ে দক্ষিণের একটি ঘর। পুরনো আসবাবে সে ঘরটি ঠাসা। দুটি জানালাই বন্ধ বলে ঘরের ভেতরটা আর্দ্র ও অন্ধকার। একটি নিষিদ্ধ কিছু করবার উত্তেজনায় সবাই চুপচাপ।

বড় রকমের একটি ঝগড়াও শুরু হয়েছে বিয়েবাড়িতে। এসব ঝগড়াগুলি সাধারণত শুরু করেন নিমন্ত্রিত গরীব আত্মীয়রা। তারা প্রথমে খুব উৎসাহ নিয়ে বিয়েবাড়িতে আসেন। যেন একটা কাজ করবার জন্যে ঘুরে বেড়ান কিন্তু কিছু করতে না পেরে ক্রমশই বিমর্ষ হয়ে ওঠেন। এক সময় দেখা যায় একটি তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে তারা মেতে উঠেছেন। চিৎকারে কান পাতা যাচ্ছে না। বরপক্ষীয়দের তরফ থেকে দুটি রুই মাছ পাঠানো হয়েছিলো। মাছ দুটি নাকি পচা। এই হচ্ছে আজকের ঝগড়ার বিষয়।

তবে সব বিয়েতেই চরম গণ্ডোগোলগুলি যেমন ফস করে নিভে যায়, এখানেও তাই হল। দেখা গেল বরপক্ষীয় যারা বিয়ের তত্ত্ব নিয়ে এসেছিল (দুটি মেয়ে, একটি অল্প বয়সী ছেলে এবং একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক) মহানন্দে রঙ খেলায় মেতে গেছেন। বরের বাড়ীর রোগামত লম্বা মেয়েটিকে দু-তিনজন জাপটে ধরে সারা গায়ে খুব করে কালো রঙ মাখাচ্ছে। মেয়েটি হাত পা ছুঁড়ছে এবং খুব হাসছে।

রঙ ছোঁড়াছুড়ির ব্যাপারটা দেখতে দেখতে ক্ষ্যাপামীর মত শুরু হল। এক দল মেয়ে দৌড়ুচ্ছে, তাদের পিছু পিছু আরেক দল যাচ্ছে রঙের কৌটো নিয়ে। খিল খিল হাসি, চিৎকার আর ছোটাছুটিতে চারদিক সরগরম। ছেলেদের দলও বেমালুম জুটে গিয়েছে। অর্ধ-পরিচিত অপরিচিত মেয়েদের গালে রঙ মাখিয়ে দিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করছে না। মেয়েরাও যে এ ব্যাপারে কিছু একটা মনে করছে তা মনে হচ্ছে না।

AMARBOI.COM

পরী যখন এসে পৌঁছল তখন বরের বাড়ীর রোগা মেয়েটিকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। তাকে দেখাচ্ছে ভূতের মত। পান্না ভয় পেয়ে বললো, 'মা একটা পাগলী, ওমা একটা পাগলী।'

পরীকে দেখতে পেয়ে সবাই ছুটে এলো। নিমিষের মধ্যে পরীর ধবধবে গাল আর লালচে ঠোঁট কালো রঙে ডুবে গেল। লীনা ও পান্না দুজনেই হতভম্ব। লীনা বললো, 'এরকম করছে কেন?'

হোসেন সাহেব ব্যাপার দেখে সটকে পড়েছেন। সটান চলে গিয়েছেন দোতলায়।

লীনা ও পান্না হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ততক্ষণে রঙ খেলা চরমে উঠেছে। ভেতরের বাড়ীর উঠোনে বালতি বালতি পানি ঢেলে ঘন কাদা করা হয়েছে। মাঝবয়েসী একটি ভদ্রমহিলাকে সবাই মিলে গড়াগড়ি খাওয়াচ্ছে সেই কাদায়। ভদ্রমহিলার শাড়ী জড়িয়ে গেছে, ব্লাউজের বোতাম গিয়েছে খুলে। তিনি ক্রমাগত গাল দিচ্ছেন। কিন্তু সেদিকে কেউ কান দিচ্ছে না। সবাই হাসছে। সবাই চেঁচাচ্ছে। লীনা ও পান্নার বিমর্ষ ভাব কেটে গিয়েছে। তারাও মহানন্দে জুটে পড়েছে সে খেলায়। পান্না স্ফূর্তিতে ঘন ঘন চেঁচাচ্ছে। এমন মজার ব্যাপার সে বহুদিন দেখেনি।

জরী এসে দাঁড়িয়েছে বারান্দায়। সে সবার দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছে। তার একটু লজ্জা লজ্জা করছে। পরী কাদামাখা শরীরে জরীকে জড়িয়ে ধরলো। জরী বললো, 'আপা কখন এসেছিস?'

এইতো এখন। তোর কেমন লাগছে জরী?

কি কেমন লাগছে?

বিয়ে।

জরী হাসতে লাগলো।

রঙ ছোঁড়াছুঁড়ির হাত থেকে বাঁচবার জন্য হোসেন সাহেব অতিরিক্ত ব্যস্ততায় দোতলায় উঠে এসেছেন। তাঁর গায়ে শার্ক স্কীনের দামী কোট—নষ্ট হলে হলো। বিয়ে টিয়ের সময় মেয়েদের কোন কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। উঠোনের কাদায় গড়াগড়ি করাতেও তাদের বাঁধবে না।

দোতলায় তিনি আনিসের ঘরটি খুঁজে পেলেন না। হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলেন শেষ প্রান্তে। সেখানে কিশোরী মেয়েদের দলটি সিগারেট টানছে। তারা হোসেন সাহেবকে দেখে হতভম্ব হয়ে পড়ল। তিনি

AMARBOI.COM

সাক্ষাৎ তেমন হয় না, কিন্তু যখনি হয় আনিসের সময়টা চমৎকার কাটে। হোসেন সাহেব বললেন, 'বাইরে খুব রঙ খেলা হচ্ছে, তোমার এখানে আশ্রয় নিতে এলাম।'

খুব ভাল করেছেন? কখন এসেছেন?

এই মাত্র, কেমন আছো বলো?

খুব ভালো।

তবে যে শুনলাম খুব পেন হয়। মাঝে মাঝে পেথিড্রিন দিতে হয়।

তা হয়। কিন্তু এখন ভাল।

হোসেন সাহেব কোট খুলে হ্যাংগারে ঝুলিয়ে দিলেন। চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, 'তোমার জন্যে গল্পের বই পাঠিয়েছিলাম, পেয়েছিলে?'

জ্বি পেয়েছি।

পড়েছ নাকি সব?

কিছু কিছু পড়েছি।

কি যে রস পাও গল্পের বইয়ে তোমরাই জানো। তোমার পরী আপার তো বই পেলে আর কথাই নেই। একবার কি একটা বই পড়ে ফিচ ফিচ করে এমন কান্না; দুপুরে ভাত খেলো না, রাত্রেও না।

কি বই সেটি?

কি জানি কি বই। জিজ্ঞেস করো ওকে। যে লেখক লিখেছে সে নিশ্চয়ই লেখবার সময় খাওয়া-দাওয়া ঠিকঠাকই করেছে।

হোসেন সাহেব হাসতে লাগলেন। আনিসও হাসলো। হোসেন সাহেব বললেন, 'এক কাপ চা খেলে ভালো হতো।'

আমার এখানে চায়ের সরঞ্জাম আছে। কাউকে ডেকে আনেন।

ডাকতে হবে না, আমিই পারব।

হোসেন সাহেব নিঃশব্দে উঠে গিয়ে হিটার জ্বালালেন। চা, চিনির পট খুঁজে বের করলেন। দুটি কাপ ধুয়ে টেবিলে এনে রাখলেন। আনিস দেখলো, তিনি মৃদু হাসছেন। এই লোকটির বেশ কিছু বিচিত্র অভ্যেস আছে। আপন মনে হাসা, আপন মনে কথা বলা তার মধ্যে পড়ে। এছাড়াও আরো অদ্ভুত অভ্যেস আছে। যেগুলি পরী জানে। কিন্তু পরী সেসব নিয়ে কারো সঙ্গে গল্প করতে পারে না। তার স্বামী সম্পর্কে সে খুব সজাগ। কেউ তার কোন দোষ ধরুক, তাকে নিয়ে হাসি তামাসা করুক এসব সে সহ্য করতে পারে না। বড়চাচা একবার পরীকে বলেছিলেন, 'তোর ভদ্রলোকটি এমন মিনমিনে কেনরে?' এতেই

AMARBOI.COM

পরী কেঁদে কেঁদে অস্থির হয়েছিল। বড়চাচা অপ্রস্তুতের একশেষ। আবার এও ঠিক হোসেন সাহেবের সঙ্গে পরীর বনিবনা হয়নি। কুমারী অবস্থায় পরী যেসব কথা ভেবে একা একা লাল হতো তার কোনটিই বাস্তবের সঙ্গে মেলেনি। এ নিয়ে গোপন ব্যথা আছে। আনিস তা জানে। সে হঠাৎ বললো, 'পরী তার বাচ্চা দুটিকে কেমন আদর করে দুলাভাই?'

খুব, যাকে বলে এনিমেল লাভ।

আর আপনাকে?

আমাকে ভয় করে। নাও তোমার চা। মিষ্টি লাগবে কিনা বল।

আনিস চায়ে চুমুক দিল। পেটের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠছে। সকালে নাশতা হয়নি, এখন বেলা হয়েছে বারোটা। ক্ষিধে জানান দিচ্ছে। হোসেন সাহেব বললেন, 'এ রকম করছ কেন? ব্যাথা শুরু হল নাকি?'

না ও কিছু নয়।

হোসেন সাহেব সিগারেট ধরালেন। আনিস খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বললো, 'আপনি কি সুখী?'

সামটাইমস। একটি মানুষ সারাক্ষণ সুখী থাকতে পারে না। মাঝে মাঝে সুখী হয়। এখন আমি সুখী।

কেন?

কি জানি কেন? হঠাৎ এসব কথা জিজ্ঞেস করছ যে?

দুলাভাই, মাঝে মাঝে আমি এসব নিয়ে ভাবি। কিচ্ছু করবার নেইতো, এই জন্যে। মাঝে মাঝে আমার মনে হয় আসলে হেপিনেস বলে আলাদা কিছু নেই।

আনিসের কথা শেষ হবার আগেই দারুণ হৈ হৈ ও চেঁচামেচি শোনা যেতে লাগল। একটি তীক্ষ্ম মেয়েলী গলায় কে কেঁদে উঠলো। ছাদের উপর থেকে হুড়মুড় শব্দ করে এক সঙ্গে অনেক লোক নীচে নেমে এল। হোসেন সাহেব আধখাওয়া চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

গোলমালটা যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিল, তেমনি হঠাৎ থেমে গেল। একটি বিয়েবাড়ির হৈ চৈ হঠাৎ থেমে গেলে বুকে ধক করে ধাক্কা লাগে। আনিস নিদারুণ অস্বস্তি নিয়ে অপেক্ষা করছিল। হোসেন সাহেবের ফিরে আসতে দেরী হল না। তিনি আবার তাঁর ঠাণ্ডা চায়ের

AMARBOI.COM

কাপে চুমুক দিলেন। আনিসের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে হাসলেন। আনিস বললো, 'কি হয়েছে দুলাভাই?'

আমার মেয়ে পান্না ডুবে গিয়েছিল পুকুরে।

বলেন কি!

সঙ্গে সঙ্গে তুলে ফেলেছে।

পুকুরে গেল কি করে?

মেয়েরা সবাই রঙ খেলে গিয়েছিল গা ধুতে, পান্নাও গিয়েছে।

হোসেন সাহেব আরেকটি সিগারেট ধরালেন। আনিস দেখলো আগুন জ্বালাতে গিয়ে তার হাত কাঁপছে, দেশলাইয়ের কাঠি বার বার নিভে যাচ্ছে। আনিস বললো, 'আপনি পরীর কাছে যান।'

যাই। সিগারেটটা শেষ করে নিই। পরী কি করছে জান? লীনা পান্না—তার দুবাচ্চাকে জড়িয়ে ধরে বসে আছে। মাঝে মাঝে অবিকল গরুর মত গলায় চিৎকার করে কাঁদছে।

দুলাভাই আপনি পরীর কাছে যান।

যাই। আনিস তুমি হেপিনেস সম্পর্কে জানতে চাইছিলে....

পরে বলবেন। এখন পরীর কাছে যান।

হ্যাঁ তাই যাই।

হোসেন সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। আনিস দেখলো তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। তিনি অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে হাসলেন।

হৈ চৈ শুনে বড়চাচা নীচে নেমে গিয়েছিলেন।

ততক্ষণে পান্নাকে পানি থেকে তোলা হয়েছে এবং পান্নার চার পাশে একটি জটলার সৃষ্টি হয়েছে। ছোট ছেলে মেয়ে সবকটি তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। বড়চাচা কয়েকবার জানতে চেষ্টা করলেন কি হয়েছে। কিন্তু সবাই হৈ-চৈ করছে, কেউ কিছু বলছে না। তিনি ভিড়ের মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখলেন পরী তার দুই মেয়েকে জড়িয়ে ধরে ঠক ঠক করে কাঁপছে। পরীর গা ভেজা, তার মাথায় কচুরিপানার ছোট ছোট পাতা লেগে রয়েছে। বড় চাচা ভীষণ অবাক হয়ে গেলেন। গলা উঁচিয়ে বললেন, 'কি হয়েছে পরী?'

পান্না পানিতে ডুবে গিয়েছিল। আভা কোন মতে তুলেছে। পরী ঘন ঘন চোখ মুছতে লাগল। বড়চাচা বললেন, 'তুলেইতো ফেলেছে, তবু কাঁদছিস?'

AMARBOI.COM

বড়চাচা হাসতে লাগলেন। পরীর কাণ্ড দেখে বেশ মজা লাগছে তাঁর। তিনি একবার ভাবলেন জিজ্ঞেস করেন, পরী নিজেই যে ছোটবেলায় পুকুরে পড়ে মরতে বসেছিল, সেটি কি তার মনে আছে? কিন্তু তিনি কিছুই বললেন না। নিঃশব্দে নিজের ঘরে চলে গেলেন। তাঁকে এখন খুব হাসিখুশি লাগছে।

তেইশ বছর আগে একবার পরী ডুবতে বসেছিল। তাকে সেদিন টেনে তুলেছিল পরীর বড় চাচী। তেইশ বৎসর পর আবার একজন পরীর মেয়েকে টেনে তুললো। বাহ্! বেশ মজার ব্যাপার তো। কিন্তু পরীর কি সেই শৈশবের কথা মনে আছে? অনেক বড় বড় ঘটনা মানুষ চট করে ভুলে যায়। আবার অর্থহীন সামান্য অনেক অকিঞ্চিৎ ব্যাপার মানুষের অন্তরে দাগ কেটে বসে যায়।

বড়চাচার এগারো বছরের বিবাহিত জীবনে কত বড় ঘটনাই তো ঘটেছে। কিন্তু সে সব ছবি বড় ঝাপসা। কষ্ট করে দেখতে হয়, ঠিক ঠিক মনে পড়তে চায় না। শিরীন মরবার সময় তাকে যেন কি সব বলেছিল। সে সব কেমন আবছাভাবে মনে আসে। এমন কি শিরীনের চেহারাও ঠিক ঠিক মনে পড়েনা। কিন্তু একটি ছোট্ট ঘটনা, একটি অতি সামান্য ব্যাপার আজও কি পরিষ্কার ভাবে মনে আছে তার।

সেদিন ভীষণ গরম পড়েছে। দুপুরে একটু ঘুমিয়ে ছিলেন। ঘেমে একেবারে নেয়ে গেছেন। ঘুম যখন ভাঙলো তখন বেলা পড়ে গেছে। তিনি বারান্দার ইজিচেয়ারে এসে বসেছেন। একটি কাক কোত্থেকে এসে কা কা শুরু করেছে। তিনি হাত নেড়ে কাক তাড়িয়ে দিলেন, সেটি আবার এলো, আর ঠিক তখনই শুনলেন ঘরের ভেতর থেকে শিরীন খুব মৃদু স্বরে সুর করে বলছে, 'রসুন বুনেছি, রসুন বুনেছি।'

কতদিন হয়ে গেল, তবু তাঁর যেন মনে হয় সেদিনের ঘটনা। কাকটির তাকানোর ভঙ্গিটিও তাঁর মনে আছে। এ রকম হয় কেন মানুষের কে জানে। বড় বিচিত্র মন আমাদের।

বড়চাচা দুপুরের খাবার খেতে আনিসের ঘরে চলে গেলেন। আনিস অসুস্থ হয়ে এখানে পড়ে আছে প্রায় এগারো মাস। এই এগারো মাসের প্রতি দুপুরে তিনি আনিসের সঙ্গে খেতে বসেছেন। খাওয়ার ঘন্টাখানিক সময় তিনি আনিসের ঘরে কাটান। এটা সেটা হালকা গল্পগুজব করেন। আজ ঘরে ঢুকে দেখলেন খাবার দিয়ে গিয়েছে এবং আনিস গোগ্রাসে খাচ্ছে। সে চাচাকে দেখে লজ্জিত হয়ে বললো, 'বড় ক্ষিধে পেয়েছে চাচা।'

AMARBOI.COM

ক্ষিধে পেলে খাবি। আমার জন্য অপেক্ষা করতে হবে নাকি রে গাধা।

আপনি হাত ধুয়ে আসুন।

তোর শরীর কেমন বল।

ভাল।

ব্যথা হয়নি, না?

সকালের দিকে অল্প হয়েছিল, এখন নেই।

বড়চাচা খেতে বসে আনিসের দিকে বার বার তাকাতে লাগলেন। আনিসের চেহারায় তার বাবার চেহারার আদল আছে। খুব পুরুষালী গড়ন। তবে মেয়েদের মতো ছোট্ট বরফি কাটা চিবুক। এই—এই-টুকুতেই তার চেহারায় অনেকখানি ছেলেমানুষী এসে গেছে। আনিস বললো, 'বড়চাচা আপনার সানাই শুনে আজ জেগেছি।'

সানাইয়ের কথায় বড়চাচার মন খারাপ হয়ে গেল। তিনি যেমনটি হবে ভেবেছিলেন তেমন হয়নি। তিনি চেয়েছিলেন বিয়ের এই আনন্দ উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে একটি সকরুণ সুর কাঁদতে থাকুক। সবাইকে মনে করিয়ে দিক এ বাড়ীর সবচেয়ে আদরের একটি মেয়ে আজ চলে যাচ্ছে। আর কখনো সে জ্যোৎস্না রাত্রিতে ছাদে দাপাদাপি করে ভুল সুরে রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইবে না। কিন্তু তিনি যেমন চেয়েছিলেন তেমন হল না। অল্প বেলা বাড়তেই তুমুল হৈ চৈ-এ সানাইয়ের সুর ডুবে গেল। তিনি মনমরা হয়ে রেডিওগ্রাম বন্ধ করে দিলেন।

AMARBOI.COM

বড়চাচা হাত ধুয়ে এসে বসলেন আনিসের বিছানায়। আচমকা প্রশ্ন করলেন, 'তোর কি খুব খারাপ লাগছে আনিস?'

কই নাতো!

আমেরিকা থেকে ফিরে এসে একটা সাদাসিধা ভাল মেয়ে বিয়ে করিস তুই।

আনিস হেসে ফেললো। বড়চাচা গম্ভীর হয়ে বললেন, 'হাসির কি হল? হাসছিস কেন?'

আমি আর বাঁচব না। দিস ইজ এ লাস্ট গেম।

বড়চাচা কথা বললেন না। আনিসের সিগারেট খেতে ইচ্ছে হচ্ছিল, কিন্তু বড় চাচা না যাওয়া পর্যন্ত সেটি সম্ভব নয়। সে অপেক্ষা করতে লাগল, কখন তিনি ওঠেন। কিন্তু তিনি উঠলেন না। আনিসের সিগারেট পিপাসা আরো বাড়িয়ে দিয়ে একটি চুরুট ধরালেন। আনিসের

দিকে সরু চোখে তাকিয়ে বললেন, 'কোন কারণে আমার উপর তোর কি কোন রাগ আছে ?'

কি যে বলেন চাচা।

না, সত্যি করে বল।

কি মুশকিল, আমি রাগ করবো কেন। কি হয়েছে আপনার বলেন ?

আমার কিছু হয়নি।

বড়চাচা হঠাৎ ভীষণ অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। কাল রাত থেকে তাঁর মনে হচ্ছিল, আনিসের মনে তাঁর প্রতি কিছু অভিমান জমা আছে। আনিস যদিও এখন হাসছে, তবু তাঁর সেই হাসি মুখ দেখে কষ্ট হতে থাকলো। তিনি নিজের মনে খানিকক্ষণ বিড়বিড় করলেন, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে—যাই আনিস বলে ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

বড়চাচা হচ্ছেন সেই মানুষ যারা সামান্য বিষয়ে অভিভূত হন না। আজ অনিসকে দেখে তিনি অভিভূত হয়েছেন। তিনি চাইছিলেন কিছু একটা করেন, কিন্তু কি করবেন তা জানা নেই। আনিসের জন্যে তাঁর একটি গাঢ় দুর্বলতা আছে। কিন্তু দুর্বলতাকে তিনি কোন কালেই প্রকাশ করতে পারেন না। প্রকাশ করবার খুব একটা ইচ্ছাও তাঁর কোন কালে ছিল না। কিন্তু আজ তাঁর মন কাঁদতে লাগল। ইচ্ছে হল এমন কিছু করেন যাতে আনিস বুঝতে পারে এই গৃহে আনিসের জন্যে একটি কোমল স্থান আছে। কিন্তু আনিস বড় অভিমানি হয়ে জন্মেছে। তার জন্যে কিছু করা সেই কারণেই হয়ে ওঠে না।

খুব ছোটবেলায়ই আনিসের যখন এগারো বার বৎসর বয়স তখনই বড়চাচা আনিসের তীব্র অভিমানের খোঁজ পান। বড় হয়েছে বলে আনিস তখন আলাদা ঘরে ঘুমায়। তার ঘরটি একতলায়। পাশের ঘরে আনিস, জরী ও পরীদের মাস্টার সাহেব থাকেন। এক রাত্রিতে খুব ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে। বড়চাচা আনিসের ঘরের পাশ দিয়ে আসবার সময় শুনলেন আনিস কাঁদছে। তিনি ডাকলেন, 'আনিস কি হয়েছে রে ?'

আনিস ফুঁপিয়ে বললো, 'ভয় পাচ্ছি।'

আয় আমার ঘরে, আমার সঙ্গে থাকবি ?

না।

তাহলে আমি সঙ্গে শুই ?

না।

দরজা খোল তুই।

AMARBOI.COM

আনিস দরজা খুলল না। তিনি অনেকক্ষণ বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন।

বড়চাচার মনে হল জরীর বিয়ের এই দিনটি আনিসের জন্যে খুব একটা দুঃখের দিন। কিন্তু তাঁর কিছুই করবার নেই।

যে ছেলেটির সঙ্গে জরীর বিয়ে হচ্ছে তার খোঁজ বড়চাচাই এনেছিলেন। তাঁর আবাল্যের বন্ধু আশরাফ আহমেদের বড় ছেলে। নম্র ও বিনয়ী। লাজুক ও হৃদয়বান। দেখতে আনিসের মত সুপুরুষ নয়। রোগা ও কালো। জরীর বাবা আপত্তি করেছিলেন। বার বার বলেছেন, ছেলের ধরন ধারণ যেন কেমন, জরীর মারও ঠিক মত নেই। মিন মিন করে বলেছেন, ইউনিভার্সিটির মাস্টার, কয় পয়সা আর বেতন পায়। কিন্তু বড়চাচার প্রবল মতের বিরুদ্ধে কোন আপত্তিই টিকল না। তাঁর যুক্তি হচ্ছে জরীর মতো একটি ভাল মেয়ের জন্যে এ রকম ভাবুক ছেলেই দরকার। যে গল্প কবিতা লেখে। জরী সুখ পাবে। কিন্তু আপত্তি উঠল সম্পূর্ণ ভিন্ন জায়গা থেকে। বড়চাচা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

তিনি সেদিন শয্যাশায়ী। দাঁতের ব্যথায় কাতর। সন্ধ্যাবেলা ঘরে বাতি জ্বালেননি। অন্ধকারে শুয়ে আছেন। জরী এসে কোমল গলায় ডাকলো, 'বড় চাচা।'

কি জরী?

আপনাকে একটা কথা বলতে এসেছি।

বড়চাচা বিছানায় উঠে বসলেন। বিস্মিত হয়ে বললেন, 'বাতি জ্বালা জরী!'

না বাতি জ্বালাতে হবে না।

জরী এসে বসল তাঁর পাশে। তিনি অবাক হয়ে বললেন, 'কি হয়েছে জরী?'

বড়চাচা আমি....

বল কি ব্যাপার?

জরী থেমে থেমে বললো, 'বড়চাচা আমি ঐ ছেলেটিকে বিয়ে করব না।'

কেন কি হয়েছে?

বড়চাচা আমি আনিস ভাইকে বিয়ে করতে চাই।

জরী কাঁদতে লাগলো। বড় চাচা স্তম্ভিত হয়ে বললেন, 'আনিস জানে?'

AMARBOI.COM

জরী ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো, 'জানে। তাকে আসতে বলেছিলাম, তার নাকি লজ্জা লাগে।'

দুজনেই বেশ কিছু সময় চুপচাপ কাটালো। বড়চাচা এক সময় বললেন, 'আচ্ছা ঠিক আছে।'

সে রাতে তিনি একটুও ঘুমোতে পারলেন না। অনেকবার তাঁর ইচ্ছে হল তিনি আনিসের কাছে যান। কিন্তু তিনি নিজের ঘরেই বসে রইলেন। তাঁর অনেক পুরনো কথা মনে পড়তে লাগলো।

জরীর অনেক অদ্ভুত আচরণ অর্থবহ হল। একটি মেয়েতো শুধু শুধু একা ছাদে বসে কাঁদতে পারে না। সেই চোখের জলের কোন না কোন কোমল কারণ থাকে। আশ্চর্য, এ সব তাঁর চোখ এড়িয়ে গেল কি করে!

বিয়ে বড়চাচাই ভেঙে দিয়েছিলেন। যদিও কাউকেই বলেননি, এত আগ্রহ যে বিয়ের জন্যে ছিল, হঠাৎ তা উবে গেল কেন।

আজ জরীর বিয়ে হচ্ছে এবং আশ্চর্য, সেই ছেলেটির সঙ্গেই। মাঝখানে একটি ভালবাসার সবুজ পর্দা দুলছে ঠিকই, কিন্তু তাতে কি? জীবন বহতা নদী। একটি মৃত্যুপথযাত্রী যুবকের জন্যে তার গতি কখনো থেমে যায় না।

বড়চাচার কষ্ট হতে লাগলো। জরীর জন্যে কষ্ট। আনিসের জন্যে কষ্ট এবং সেই সঙ্গে তাঁর মৃতা স্ত্রীর জন্যে কষ্ট। তাঁর ইচ্ছে হল আবার আনিসের ঘরে যান। তার মাথায় হাত রেখে মৃদু গলায় বলেন, 'আনিস তোর মনে আছে, একবার আমার সঙ্গে জন্মাষ্টমীর মেলায় গিয়েছিলি, সেখানে...

তিনি আবার আনিসের ঘরে ফিরে আসলেন।

আনিস পা দোলাতে দোলাতে সিগারেট টানছিল। বড়চাচাকে দেখে সে সিগারেট লুকিয়ে ফেলল।

কিছু বলবেন চাচা?

না না কিছু বলবোনা।

বড়চাচা আবার ফিরে গেলেন।

দুপুরের রোদ সরে গেছে।

শীতের বিকেল বড্ড দ্রুত এসে যায়। বেলা তিনটা মোটে বাজে, এর মধ্যেই গাছের ছায়া হয়েছে দীর্ঘ, রোদ গিয়েছে নিভে। বৈকালিক চায়ের জোগাড়ে ব্যস্ত রয়েছেন জরীর মা। হাতে সময় খুব অল্প, সন্ধ্যা

AMARBOI.COM

সাতটার আগেই বরযাত্রী এসে যাবে। তারা খবর পাঠিয়েছে, ন'টার মধ্যেই যেন সব শেষ করে বিদায় দিয়ে দেওয়া হয়।

রান্নাবান্না হয়ে গিয়েছে। ছাদে টেবিল চেয়ার সাজানোও শেষ। একশ বরযাত্রীকে এক বৈঠকেই খাইয়ে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। বাড়ীর সামনে ডেকোরেটররা চমৎকার গেট বানিয়েছে। সন্ধ্যার পর পরই ইলেকট্রিক বাল্বের আলোয় সেই গেট ঝলমল করবে।

জরীর বাবার অফিস সুপারিনটেনডেন্ট কি মনে করে যেন দুপুর বেলাতেই এসে পড়েছেন। জরীর বাবা সারাক্ষণ তাঁর সঙ্গেই আছেন। জরীর মার হাতে যদিও কোন কাজ নেই, তবু তিনি মুহূর্তের জন্যেও ফুরসত পাচ্ছেন না। আজ তাঁর গোসলও করা হয়নি, দুপুরের খাওয়াও হয়নি। সারাক্ষণই ব্যস্ত হয়ে ঘুর ঘুর করছেন।

এখন তাঁর প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। তবু এই মাথা ধরা নিয়েই বিরাট এক কেটলী চা বানিয়ে নিয়ে এসেছেন।

পাড়ার মেয়ে এবং জরীর বন্ধুরা জরীকে ঘিরে বসেছিল। চা আসতেই খামোখা একটা ব্যস্ততা শুরু হলো। কনক বললো, 'জরী তুই চা খাবি এক কাপ?'

না, আমার শরীর খারাপ লাগছে।

খা না এক ঢোক।

চায়ে প্রচুর চিনি ও এলাচ থাকায় পায়েসের মত গন্ধ। তবু চমৎকার লাগছে খেতে। জরীর মা বললেন, 'চপ আনতে বলেছি। যে কয়টা পার খেয়ে নাও সবাই—রাতে খেতে দেরী হবে।'

আবার একটা হল্লোড় উঠলো।

কন্যাপক্ষীয় মেহমানদের আসবার বিরাম নেই। রিকসা এসে থামছে। হাসিমুখে নামছে চেনা লোকজন। কিছুক্ষণের মধ্যেই মিশে যাচ্ছে বিয়েবাড়ীর ভিড়ে। এ রকম একটা উৎসবে কাউকেই আলাদা করে চেনা যায় না। সবাই বাড়ীর লোক হয়ে যায়। আনিসের মা তাই রিকশা থেকে নেমে হকচকিয়ে গেলেন।

আনিসের মা যে আসবেন তা সবাই জানত। তাঁকে চিঠি লিখে জানানো হয়েছে, আনিস সতেরো তারিখ আমেরিকা যাচ্ছে, জটিল অপারেশন হবে। এবার যেন তিনি আসেন। সেই চিঠি পেয়ে আনিসের মা যে এত আগেভাগে এসে পড়বেন তা কেউ ভাবেনি।

অনেকদিন পরে দেখা, তবু জরীর মা ঠিকই চিনলেন। চিনলেও না চেনার ভান করলেন। বললেন, 'আপনাকে চিনতে পারলামনাতো!'

AMARBOI.COM

আনিসের মা কুণ্ঠিত হয়ে বললেন, 'আমি আরাফী, আনিসের মা।' তাঁর স্বামী ভদ্রলোকটি মোটাসোটা ধরনের গোবেচারা ভালমানুষ। তিনি বিনীত হেসে বললেন, 'আপা ভাল আছেন? কার বিয়ে?'

আমার সেজো মেয়ের।

বলতে গিয়ে জরীর মার একটু লজ্জা লাগলো। কারণ পরীর বিয়ের সময় এদের কোন খবর দেননি, জরীর বিয়েতেও না। জরীর মা বললেন, 'আপনারা হাত মুখ ধোন। আনিসের সঙ্গে দেখা করলে দোতলায় যান।'

আনিসের মা দোতলায় উঠলেন না। তাঁর হয়ত কোন কারণে লজ্জা বোধ হচ্ছিল। বিয়েবাড়ীতে অতিথি হিসেবেও নিজেকে অবাঞ্ছিত লাগছে। কিন্তু তাঁকে তো আসতেই হবে। কারণ এই বাড়ীতে তাঁর একটি অসুস্থ ছেলে আছে। সেই ছেলেটি একসময় এতটুকুন ছিল। দুটি ছোট ছোট দুধ দাঁত দেখিয়ে অনবরত হাসত। কথা শিখল অনেক বয়সে। তাও কি, 'ম' বলতে পারতনা। আম্মাকে ডাকতো 'আন্না' বলে। আহ, চোখে জল আসে কেন?

পুরনো কথায় বড় মন খারাপ হয়ে যায়। তিনি ছোট ছোট পা ফেলে ভীড়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এ বাড়ীর লোকজন অনেকেই আজ তাকে চিনতে পারছে না এও এক বাঁচোয়া। চিনতে পারলে আরো খারাপ লাগতো। মাঝবয়েসী এক মহিলা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি জরীর কে হন?'

তিনি থতমত খেয়ে কি একটা বললেন। লোকজনের সঙ্গ ছেড়ে চলে গেলেন ভেতরের দিকে।

এ বাড়ীর অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তিনি যখন বউ হয়ে আসেন তখন দোতলায় একটিমাত্র ঘর ছিল, সেখানে বড় ভাশুর থাকতেন। পুকুর পাড়েও কোন আলাদা ঘর ছিল না। বাড়ীর কোন নামও ছিল না। লোকে বলতো 'উকিল বাড়ী।' রিকশা থেকে নেমেই পেতলের নেমপ্লেটে বাড়ীর নাম দেখলেন 'কারা কানন।' কে রেখেছে এ নাম কে জানে! বোধ হয় বড় ভাশুর। এ বাড়ী এখন আর চেনা যায় না। অনেক সুন্দর হয়েছে ঠিকই কিন্তু ফুলের বাগানটি নষ্ট হয়ে গেছে। গোলাপঝাড়ে মাত্র অল্প কটি ফুল দেখছেন। অথচ এক সময় অগুণতি গোলাপ ফুটতো।

এই গোলাপ নিয়েই কত কাণ্ড। আনিসের বাবার শখ হল গোলাপ দিয়ে খাঁটি আতর বানাবেন। রাশি রাশি ফুল কুচিকুচি করে পানিতে

AMARBOI.COM

চোবানো হল। সেই পানি জ্বাল দেয়া হল সারাদিন। সন্ধ্যাবেলা আতর তৈরী হল, বোটকা গন্ধে তার কাছে যাওয়া যায় না। বাড়ীতে মহা হাসাহাসি। আনিসের বাবার মনমরা ভাব কাটাবার জন্যে তিনি সে আতর মাখলেন। সেই থেকে তাঁর নাম হয়ে গেল 'আতর বৌ।' কি লজ্জা কি লজ্জা! বড় ভাশুর পর্যন্ত াতর বৌ বলে ডাকতেন। পরী তখন সবে কথা বলা শিখেছে। 'র' বলতে পারে না, সে ডাকতো 'আতল, আতল।' আজ কি সেই পুরনো স্মৃতিময় নাম কারো মনে আছে? জরীর মা যখন নাম জানতে চাইলেন তখন তিনি কেন সহজ সুরে বললেন না, আমি আতর বৌ।

না আজ তা সম্ভব নয়। এ বাড়ীতে আতর বৌ বলে কেউ নেই। পুরোনো দিনের সব কথা মনে রাখতে নেই। কিছু কিছু কথা ভুলে যেতে হয়। তিনি হাঁটতে হাঁটতে বাড়ীর পেছনের খোলা জায়গাটায় এসে পড়লেন। এখানে একটি প্রকাণ্ড পেয়ারা গাছ ছিল, 'সৈয়দি পেয়ারা' বলত সবাই, ভেতরটা লাল টুকটুক করত। গাছটি আর নেই। আতর বৌ হাঁটতে হাঁটতে পুকুরপাড়ে চলে গেলেন। কি পরিষ্কার পানি! আয়নার মত ঝকঝক করছে। পুকুরপাড়ের ঘাটটি বাঁধানো। তাঁর সময় ছিল না। সে সময় কাঠের তক্তা দিয়ে ঘাট বাঁধা ছিল। শ্যাওলা জমে পিচ্ছিল হয়ে থাকতো সে ঘাট। পা টিপে টিপে পানিতে নামতে হত। একবারতো পিছলে পড়ে হাত কেটে গেল অনেকখানি।

রক্ত বন্ধ হয়না কিছুতেই, শাড়ী দিয়ে হাত চেপে ধরে ঘরে উঠে এসেছেন। সারা শাড়ী রক্তে লাল। দেখতে পেয়ে আনিসের বাবা সঙ্গে সঙ্গে ফিট। এমন জোয়ান মানুষ অথচ একটু আধটু রক্ত দেখলেই হয়েছে কাজ। আতর বৌ ছোট একটি নিঃশ্বাস ফেললেন।

তাঁর ক্ষণিকের জন্য মনে হল এ বাড়ী থেকে চলে গিয়ে তিনি ভুল করেছেন। এখানে থাকলে জীবন এমন কিছু মন্দ কাটত না। পর মুহূর্তেই এ চিন্তা ছেঁটে ফেললেন তিনি। পুরনো জায়গায় ফিরে আসবার জন্যই এরকম লাগছে হয়তো। তিনি আসলে মোটেই অসুখী নন। তাঁর স্বামী ও পুত্র কন্যাদের নিয়ে কোন গোপন দুঃখ নেই। নিজের চারদিকে নতুন জীবনের সৃষ্টি করেছেন। সেখানে দুঃখ হতাশা ও গ্লানির সঙ্গে ভালোবাসাও আছে। শুধু যদি আনিস তাঁর সঙ্গে থাকতো! ছেলেমেয়েদের সঙ্গে হেসে খেলে বড় হত!

AMARBOI.COM

কিন্তু এ বাড়ির সবাই অহংকারী ও নিষ্ঠুর। আনিসকে তারা কিছুতেই ছাড়ল না। অবিমিশ্র সুখী কখনো বোধহয় হতে নেই।

আতর বৌ এসেছ ?

আতর বৌ চমকে দেখলেন বড় ভাশুর নিঃশব্দে পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি হাসিমুখে বললেন, 'তুমি বড় রোগা হয়ে গেছ আতর বৌ।'

তাঁর মুখে পুরনো দিনের ডাক শুনে আতর বৌ-এর চোখে পানি আসলো। বড় ভাশুর বললেন, 'তোমার ছেলেমেয়েরা সবাই ভাল ?'

জ্বী ভাল।

তাদের নিয়ে আসলে না কেন, দেখতো তাদের আনিস ভাইকে।

আপনিতো চিঠিতে তাদের আনবার কথা লেখেননি।

আতর বৌ আঁচলে চোখ মুছলেন। বড় ভাশুর বললেন, 'কাঁদছ কেন ?'

না কাঁদছি না।

আনিসের সঙ্গে দেখা হয়েছে তোমার ?

না।

তাহলে তার পাশে গিয়ে একটু বসো। তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দাও। আজ আনিসের বড় দুঃখের দিন।

আতর বৌ বিস্মিত হয়ে বললেন, 'কেন ? আজ দুঃখের দিন কেন ?'

বড় ভাশুর চুপ করে রইলেন। অনেকদিন পর আতর বৌকে দেখে তাঁর বড় ভাল লাগছে। তিনি হঠাৎ কি মনে করে বললেন, 'আতর বৌ আনিসের বাবাকে কখনো স্বপ্নে দেখ ?'

আতর বৌ খানিকক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে থেকে শান্ত গলায় বললেন, 'দেখি।'

তুমি কিছু মনে করলে নাতো ?

না। কিছু মনে করিনি।

আনিস লোকটিকে সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারল। আগে আরো দু একবার দেখা হয়েছে। আজ যদিও অনেকদিন পরে দেখা তবু চিনতে একটুও দেরী হল না তার। লোকটি ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছিল। আনিসকে তাকাতে দেখে মৃদু গলায় বললো, 'ভেতরে আসব ?'

আসুন।

AMARBOI.COM

লোকটি ঘরের ভেতরে এসে দাঁড়াল। মাথার চুল পেকে গেছে। কপালের চামড়া কোঁচকানো। চোখ দুটি ভাসা ভাসা। সমস্ত মুখাবয়বে একটা ভালমানুষি আত্মভোলা ভঙ্গি আছে।

আমি একটু বসলে তোমার অসুবিধে হবে?

বসুন বসুন। অসুবিধে হবে কেন?

আমাকে চিনেতে পেরেছ তো বাবা?

হ্যাঁ।

আমি তোমার মাকে নিয়ে এসেছি।

আনিস চুপ করে রইল। লোকটির বসবার ধরন কেমন অদ্ভুত। পা তুলে পদ্মাসন হয়ে চেয়ারে বসেছেন। সারাক্ষণই হাসছেন আপন মনে। আনিস কি কথা বলবে ভেবে পেল না। দুজন লোক চুপচাপ কতক্ষণ বসে থাকতে পারে? এক সময় আনিস বললো, 'আপনার ছেলেমেয়ে কয়টি?'

দুই মেয়ে এক ছেলে। বড় মেয়ে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। কেমিস্ট্রিতে অনার্স, এইবার সেকেণ্ড ইয়ার।

ছেলেমেয়েদের কথা বলতে পেরে ভদ্রলোকের চোখ উজ্জল হয়ে উঠলো। তিনি ঝুঁকে আসলেন আনিসের দিকে। গাঢ় স্বরে বলতে লাগলেন, 'বড় মেয়ের নাম নীলা। তোমার মা রেখেছেন। ছোট মেয়ের নাম আমি রেখেছি ইলা। ছেলেটির নাম শাহীন।'

ভদ্রলোক মহা উৎসাহে পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরালেন। তেমনি অন্তরঙ্গ সুরে বলতে লাগলেন, 'গত ঈদের সময় নীলা তোমাকে একটা ঈদকার্ড পাঠিয়েছিল। নিজেই এঁকেছে, নদীতে সূর্যাস্ত হচ্ছে। দুটি বক উড়ে যাচ্ছে। তুমি পাওনি বাবা?'

পেয়েছিলাম।

নীলা ভেবেছিল তুমিও তাকে একটা পাঠাবে। সে রোজ জিজ্ঞেস করতো, বাবা তোমার ঠিকানায় আমার কোন ঈদকার্ড এসেছে?

আনিস লজ্জা পেল খুব। লজ্জা ঢাকবার জন্য জিজ্ঞেস করলো, 'ইলা কত বড় হয়েছে?'

ক্লাস নাইনে পড়ে। বৃত্তি পেয়েছে ননরেসিডেনশিয়াল।

দেখতে কেমন হয়েছে?

আমার কাছে খুব ভাল লাগে। তবে শ্যামলা রং। নাকটা একটু চাপা। স্কুলের মেয়েরা তাকে চায়না ডেকে ক্ষেপায়।

AMARBOI.COM

আনিস হো হো করে হেসে ফেললো। নীলা ও ইলার সঙ্গে দেখা হলে খুব ভাল হতো। আনিস মনে মনে ভাবলো ইলার সঙ্গে যদি কখনো দেখা হয় তাহলে সে বলবে—

ইলা হল চায়না
ব্যাঙ ছাড়া খায় না।

ভদ্রলোক বললেন, 'তোমার ভাই বোনগুলির খুব শখ ছিল তুমি কিছুদিন তাদের সঙ্গে থাক। একবার তোমার মা খুব করে লিখেছিলো না?'

আনিস লজ্জিত হয়ে মাথা নাড়ল। তার মা সেবার শুধু চিঠিই লেখেননি, একশটি টাকাও পাঠিয়েছিলেন। সে টাকা ফেরত পাঠানো হয়েছিল। ভদ্রলোক উৎসাহের সঙ্গে বলতে লাগলেন, 'ইলা আবার কবিতাও লেখে। স্কুল ম্যাগাজিনে ছাপা হয়েছে তার কবিতা—'রুগ্ন হওয়ার রহস্য' কবিতার নাম। ভীষণ হাসির কবিতা। দাঁড়াও তোমাকে শোনাই। আমার মনে আছে কবিতাটা।' ভদ্রলোক চেয়ার থেকে পা নামিয়ে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে আবৃত্তি করতে লাগলেন,

কয়েক হাঁড়ি পাটালি গুড়
সঙ্গে কিছু মিষ্টি দই
সেরেক খানিক চিঁড়ে ছাড়াও
লাগবে তাতে ভাল খই..... কি সবটা বলবো?

আনিস সে কথার জবাব দিল না। ঘোলাটে চোখে তাকালো। তার নিঃশ্বাস ভারী হয়ে এসেছে। ভদ্রলোক উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন, 'কি হয়েছে বাবা, তুমি খুব ঘামছো!'

সেই ব্যথাটি আবার শুরু হয়েছে। পা দুটো কেউ যেন জ্বলন্ত আগুনে ঠেসে ধরলো। আনিস গোঙাতে শুরু করলো। ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। মৃদু স্বরে ডাকলেন, 'ও বাবা শোন, ও আনিস!'

আনিস বিকৃত স্বরে বললো, 'আপনি এখন যান। একা থাকতে দিন আমাকে।' ভদ্রলোক নড়লেন না। একটা হাতপাখা দিয়ে সজোরে বাতাস করতে লাগলেন। মাঝে মাঝে বলতে লাগলেন, 'পানি খাবে বাবা? মাথায় হাত বুলিয়ে দেব?'

আনিস কথা বলতে পারছিল না। ভদ্রলোক অসহায় গলায় বললেন, 'কেউ কি একজন ডাক্তার ডেকে আনবে, আহা বড় মায়া লাগে।'

AMARBOI.COM

আনিসের মা ঘরের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি সেখান থেকে দেখলেন আনিস চোখ বন্ধ করে বিছানায় পড়ে আছে আর ইলা নীলার বাবা প্রবল বেগে হাওয়া করছেন। আনিসের মা ঘরের ভেতর ঢুকলেন না। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন বাইরে। শুনলেন ইলার বাবা মৃদুস্বরে বলছেন, 'ইয়া রহমানু, ইয়া রহমানু ইয়া রহিমু ইয়া মালিকু।'

যখন নীচে তুমুল হৈ চৈ-এর সঙ্গে 'বর এসেছে বর এসেছে' শোনা গেল, আতর বৌ তখন নীচে নামলেন। তাঁকে একজন ডাক্তার খুঁজতে হবে। আনিসের জন্যে একজন ডাক্তার প্রয়োজন।

একটি লাজুক ভদ্র ও বিনয়ী ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল জরীর। মুসলমানদের বিয়ে বড় বেশী সাদাসিদা। কয়েক মিনিটের মধ্যেই উৎসবের সমাপ্তি। যে ছেলেটির সঙ্গে কোন জন্মেও জরীর পরিচয় ছিল না, আজ তার সঙ্গে পরম পরিচয়ের অনুষ্ঠানটি এত ক্ষুদ্র হতে দেখে ভাল লাগে না। মন খারাপ হয়ে যায়। মনে হয় কি যেন একটা বাকি থেকে গেল।

জরীর দিকে চোখ তুলে তাকানো যায় না। শ্যামলা রংয়ের এই মেয়েটি এত রূপ কোথায় লুকিয়ে রেখেছিল! দেখে দেখে বুকের ভেতরে আশ্চর্য এক ব্যাথার অনুভূতি হয়। ভয়, সেই লাজুক ভদ্র ও বিনয়ী ছেলেটি কি এই রূপের ঠিক মূল্য দেবে? হয়ত দেবে, কারণ ছেলেটি কবি, মাঝে মাঝে গল্পও লেখে। হয়ত দেবে না, না চাইতে যা পাওয়া যায় তারতো কোন কালেই কোন মূল্য মেলে না।

জরী বসে আছে সম্রাজ্ঞীর মতো। তার যে বন্ধুরা এতক্ষণ গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছিল তারা এখন খানিকটা দূরে সরে বসেছে। বিয়ের পর পরই অবিবাহিত মেয়েদের চেয়ে বিবাহিতরা আলাদা হয়ে পড়েন। আভা জিজ্ঞেস করলো, 'কেমন লাগছে জরী?'

জরী হাসলো। কনক বললো, 'আমার এখনো বিশ্বেস হচ্ছে না, তোর বিয়ে হয়ে গেছে।'

জরীর মা ক্লান্ত ও অবসন্ন ভঙ্গিতে পাশেই বসে। বিয়ে হয়ে যাবার পর থেকেই তিনি অবিশ্রান্ত কাঁদছেন। জরী অনেকটা সহজ হয়েছে, হালকা দু-একটা কথাও বলছে। বরের ছোট বোন জরীকে নিয়ে কি একটা রসিকতা করায় সবার সঙ্গে গলা মিলিয়ে জরীও হেসেছে। এক সময় সে বললো, 'মা বড়চাচা কোথায়?'

AMARBOI.COM

আনিসের ঘরে, আনিসের অসুখটা খুব বেড়েছে, ডাকব তোর চাচাকে ?

না। আনিস ভাইয়ের মার সঙ্গে একটু আলাপ করবো।

আতর বৌ ছেলের কাছে ছিলেন না। বারান্দায় একা একা দাঁড়িয়ে ছিলেন। জরী ডাকছে শুনে ঘরে এলেন। জরী বললো, 'ভাল আছেন চাচী ?'

হ্যাঁ মা।

জরী হঠাৎ তাঁর পা ছুঁয়ে সালাম করলো। আতর বৌ বললেন, 'স্বামী ভাগ্যে ভাগ্যবতী হও, লক্ষ্মী মা।'

বরের ছোট বোনটি আবার কি একটা হাসির কথা বলে সবাইকে হাসিয়ে দিল। আতর বৌ বললেন, 'এই ছোট্টটি দেখেছি জরীকে। কি দুষ্টুই না ছিল। এখন কেমন বৌ সেজে বসে আছে। অবাক লাগে।'

অনেকেই এসে জড় হয়েছে আনিসের ঘরে। বড়চাচা, হোসেন সাহেব, আনিসের মা, ইলা-নীলার বাবা, আনিসকে যে ডাক্তারটি চিকিৎসা করেন তিনি এবং পরী। সবাই চুপ করে আছে। ব্যথায় আনিসের ঠোঁট নীল হয়ে উঠেছে, তার চোখ টকটকে লাল। সে এক সময় বিকৃত স্বরে বললো, 'দুলাভাই, আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিন। পেথিড্রিন দিন।'

হোসেন সাহেব আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন। বড়চাচা বললেন, 'হোসেন তুমি পেথিড্রিন দাও।'

হোসেন সাহেব সিরিঞ্জ পরিষ্কার করতে লাগলেন। আনিসের মা থর থর করে কাঁপছিলেন। এক ফাঁকে হোসেন সাহেব তাঁকে বললেন, 'আপনি ভয় পাবেন না, এক্ষুণি ঘুমিয়ে যাবে।'

আনিসের মা বিড় বিড় করে কি বললেন ভাল শোনা গেল না।

ইনজেকশনের পর পরই আনিস পানি খেতে চাইলো। রাত কত হয়েছে জানতে চাইলো। হোসেন সাহেব বললেন, 'ঘুম পাচ্ছে আনিস ?'

হ্যাঁ।

আনিসের মা বললেন, 'এখন আরাম লাগছে বাবা ?'

লাগছে।

আনিসের মা দোয়া পড়ে ফুঁ দিলেন ছেলের মাথায়। আনিস জড়িয়ে জড়িয়ে বললো, 'বাতি নিভিয়ে দাও, চোখে লাগে।'

বাতি নিভিয়ে তারা সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে আসল।

নীচে জরীর বিদায়ের আয়োজন চলছে। রাত হয়েছে দশটা। বরযাত্রীরা আর এক মিনিটও দেরী করতে চাইছে না। কিন্তু ক্রমাগতই

AMARBOI.COM

দেরী হচ্ছে। কনে বিদায় উপলক্ষে খুব কান্নাকাটি হচ্ছে। জরীর মা দু-বার ফিট হয়েছেন। জরীকে ধরে রেখেছেন।

বর-কনেকে বারান্দায় দাঁড় করিয়ে ছবি তোলা হবে। জরী শেষবারের মত বাড়ী ছেড়ে চলে যাচ্ছে—তার ছবি। ভাড়াকরা ফটোগ্রাফার ক্যামেরা স্ট্যাণ্ডে লাগিয়ে অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছে। বর এসে দাঁড়িয়ে আছে কখন থেকে। কনের দেখা নেই। জরীকে বারবার ডাকা হচ্ছে।

ঘরের সব ঝামেলা চুকিয়ে জরী যখন বারান্দায় ছবি তোলবার জন্যে রওনা হয়েছে তখনি হোসেন সাহেব বললেন, 'জরী, আনিসের সঙ্গে দেখা করে যাও। তার সঙ্গে আর দেখা নাও হতে পারে।' জরী থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। হোসেন সাহেব বরকে বললেন, 'তুমি ভাই আর দুমিনিট অপেক্ষা কর। এ বাড়ির একটি ছেলে খুবই অসুস্থ, জরী তার সঙ্গে দেখা করে যাক।'

যদি বলেন, তবে আমিও যাব আপনাদের সঙ্গে।

না ভাই তোমার কষ্ট করতে হবে না। তুমি একটু অপেক্ষা কর। এস জরী।

জরীর সঙ্গে অনেকেই উঠে আসতে চাচ্ছিল। কিন্তু হোসেন সাহেব বারণ করলেন, দল বল নিয়ে রোগীর ঘরে গিয়ে কাজ নেই।

আনিসের ঘর অন্ধকার। বাইরে বিয়েবাড়ীর ঝলমলে আলো। সে আলোয় আনিসের ঘরের ভেতরটা আবছা আলোকিত। জরী ঘরের ভেতরে এসে দাঁড়ালো। হালকা একটি সৌরভ ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। জরী কি সেন্ট মেখেছে কে জানে। সে খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো, তারপর মৃদু স্বরে ডাকলো, 'আনিস ভাই।'

কেউ সাড়া দিল না। হোসেন সাহেব বললেন, 'বাতি জ্বালাব জরী?'

না, না দুলাভাই।

জরী নীচু হয়ে আনিসের কপাল স্পর্শ করল। ভালবাসার কোমল স্পর্শ। যার জন্যে একটি পুরুষ আজীবন তৃষিত হয়ে থাকে। হোসেন সাহেব বললেন, 'ছিঃ জরী কাঁদে না। এসো আমরা যাই।'

ঘরের বাইরে বড়চাচা দাঁড়িয়েছিলেন। জরী তাঁকে জড়িয়ে ধরলো। তিনি শুধু বললেন; 'সব ঠিক হয়ে যাবে মা।'

ফি আমানুল্লাহ, ফি আমানুল্লাহ।

নীচে তুমুল হৈ চৈ হচ্ছিল। জরী নামতেই তাকে বরের পাশে দাঁড় করিয়ে দিল। ক্যামেরাম্যান বললো, 'একটু হাসুন আপনি, হাসুন।'

AMARBOI.COM

সবাই বললো, 'হাসো জরী হাসো, ছবি উঠবে।' জরীর চোখে জল টলমল করছে, কিন্তু সে হাসলো।

আনিসের ঘুম যখন ভাঙলো তখন কোলাহল স্তিমিত হয়ে এসেছে। সে কতক্ষণ ঘুমিয়েছে ঠিক বুঝতে পারছে না। জরী কি চলে গিয়েছে নাকি? উঠোনে সারি সারি আলো জ্বলছে।

গেটের বাতিগুলি জ্বলছে নিভছে। তার বিছানার খানিকটা অংশ বারান্দার বাতিতে আলোকিত হয়ে রয়েছে।

আনিস ঘাড় উঁচু করে জানালা দিয়ে তাকালো। না, বরের গাড়ী এখনো যায়নি। জরী এখনো এই বাড়ীতেই আছে। যাবার আগে দেখা করতে এখানে আসবে নিশ্চয়ই। আনিস তখন কি বলবে ভেবে পেল না। খুব গুছিয়ে কিছু একটা বলা উচিত, যাতে জরীর মনের সব গ্লানি কেটে যায়। কিন্তু আনিস কোন কথাই গুছিয়ে বলতে পারে না।

জরীকে বিয়ের সাজে কেমন দেখাচ্ছে কে জানে। আনিস হয়তো দেখে চিনতেই পারবে না। জরী কি হুট করে তাকে সালাম করে বসবে নাকি? এই একটি বিশ্রী অভ্যাস আছে তার। ঈদের দিন কথা নেই বার্তা নেই সেজে গুজে এসে টুপ করে এক সালাম। কিছু বললে বলবে—সিনিওরিটির একটা ভ্যালু আছে না? তারপরই খিল খিল হাসি।

আনিস অন্ধকার ঘরে চুপচাপ শুয়ে রইলো। ঘড়িতে সাড়ে দশটা বাজে। বরযাত্রীরা তৈরী হয়েছে বিদায় নিতে। সবাই জরীকে ধরা-ধরি করে উঠোনে নিয়ে এলো। রাজ্যের লোক সেখানে এসে ভিড় করেছে। যাবার আগে সবাই একটু কথা বলবে। দুএকটি কি আচার অনুষ্ঠানও আছে।

আনিস জানালা দিয়ে নীচে তাকিয়ে আছে। বরের সাজানো গাড়ী ব্যাক করে আরো পেছনে আনা হচ্ছে। গাড়ীতে উঠতে যেন কনেকে হাঁটতে না হয়। ওপর থেকে জরীর ঝলমলে লাল শাড়ীর খানিকটা চোখে পড়ে। খুব আগ্রহ নিয়ে আনিস সেদিকে তাকিয়ে রইলো। যাবার আগে জরী নিশ্চয়ই ঘাড় ফিরিয়ে তাকাবে।

আনিস আনিস?

কে?

আমি টিংকুমণি। আমি এসেছি।

এসো এসো।

তোমার ব্যথা কমেছে?

AMARBOI.COM

কমেছে।

আচ্ছা।

সারাদিনের ক্লান্তিতে মেয়েটির মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। চুল এলোমেলো। আজ কেউ তার দিকে নজর দেবারই সময় পায়নি। আনিস তাকে বুকের কাছে টেনে নিল। জানালার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললো, ঐ দেখ টিংকু। জরী চলে যাচ্ছে।

টিংকু সে কথায় কান দিল না। কাঁদো কাঁদো গলায় বললো, 'আমি ব্যথা পেয়েছি, হাত ভেঙে গেছে।'

আহা আহা! একটু হাতী হাতী খেলবে টিংকু?

না, আমার ঘুম পাচ্ছে।

ছোট ছোট হাতে আনিসের গলা জড়িয়ে ধরে টিংকু কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়ল।

ক্রমে ক্রমে রাত বাড়তে লাগলো। বিয়েবাড়ির আলোগুলি নিভে যেতে লাগলো। বাগানের গোলাপ আর হাস্নাহেনার ঝাড় থেকে ভেসে এলো ফুলের সৌরভ। অনেক দূরে একটি নিশি পাওয়া কুকুর কাঁদতে লাগলো।

তারও অনেক পরে আকাশে এক ফালি চাঁদ উঠলো। তার আলো এসে পড়লো নিদ্রিত শিশুটির মুখে। জ্যোৎস্নালোকিত একটি শিশুর কোমল মুখ, তার চারপাশে কি বিপুল অন্ধকার! গভীর বিষাদে আনিসের চোখে জল আসলো। যে জীবন দোয়েলের, ফড়িংয়ের, মানুষের সাথে তার কোনকালেই দেখা হয় না।

AMARBOI.COM

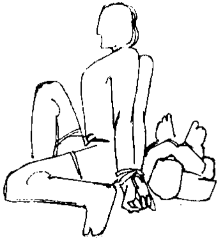

১৯৭১

মীর আলি চোখে দেখে না।

আগে আবছা আবছা দেখতো। দুপুরের রোদের দিকে তাকালে হলুদ কিছু ভাসতো চোখে। গত দুবছর ধরে তাও ভাসছে না। চারদিকে সীমাহীন অন্ধকার। তার বয়স প্রায় সত্তুর। এই বয়সে চোখ কান নষ্ট হতে শুরু করে। পৃথিবী শব্দ ও বর্ণহীন হতে থাকে। কিন্তু তার কান এখনো ভাল। বেশ ভাল। ছোট নাতনীটি যতবার কেঁদে ওঠে ততবারই সে বিরক্ত মুখে বলে—'চুপ, শব্দ করিস না।' মীর আলি আজকাল শব্দ সহ্য করতে পারে না। মাথার মাঝখানে কোথায় যেন ঝন ঝন করে। চোখে দেখতে পেলেও বোধহয় এরকম হত—আলো সহ্য হত না। বুড়ো হওয়ার অনেক যন্ত্রণা। সবচেয়ে বড় যন্ত্রণা—রাত দুপুরে বাইরে যেতে হয়। একা একা যাওয়ার উপায় নেই। তাকে তলপেটের প্রবল চাপ নিয়ে মিহি সুরে ডাকতে হয়—'বদি, ও বদি। বদিউজ্জামান।'

বদিউজ্জামান তার বড় ছেলে। মধুবন বাজারে তার একটা মনিহারী দোকান আছে। রোজ সন্ধ্যায় দোকান বন্ধ করে সাত মাইল হেঁটে সে বাড়ি আসে। পরিশ্রমের ফলে তার ঘুম হয় গাঢ়। সে সাড়া দেয় না। মীর আলি ডেকেই চলে—'বদি। ও বদি। বদিউজ্জামান।' জবাব দেয় তার ছেলের বউ অনুফা। অনুফার গলার স্বর অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। সেই তীক্ষ্ণ স্বর কানে এলেই মীর আলির মাথা ধরে, তবু সে মিষ্টি সুরে বলে—ও বৌ, এট্টু বাইরে যাওন দরকার। বদিরে উঠাও।

AMARBOI.COM

অনুফা তার স্বামীকে জাগায় না। নিজেই কুপি হাতে এগিয়ে এসে শ্বশুরের হাত ধরে। বড় লজ্জা লাগে মীর আলির। কিন্তু উপায় কি? বুড়ো হওয়ার অনেক যন্ত্রণা। অনেক কষ্ট। মীর আলি নরম স্বরে বলে—চাঁদনি রাইত নাকি ও বৌ?

: জ্বি না।

: চউখে ফসর ফসর লাগে। মনে হয় চাঁদনি।

: না চাঁদনি না। এইখানে বসেন। এই নেন বদনা।

অনুফা দূরে সরে যায়। মীর আলি ভারমুক্ত হয়। অন্য রকম একটা আনন্দ হয় তার। ইচ্ছে করে আরো কিছুক্ষণ বসে থাকতে। অনুফা ডাকে—আব্বাজান, হইছে?

: হুঁ।

: উঠেন। বইসা আছেন কেন?

: ফজর ওয়াক্তের দেরী কত?

: দেরী আছে। আব্বাজান উঠেন।

মীর আলি অনুফার সাহায্য ছাড়াই [illegible] ফিরে আসে। দক্ষিণ দিক থেকে সুন্দর বাতাস দিচ্ছে। রাতের দ্বিতীয় প্রহর শেষ হয়েছে বোধ হয়। একটা দুটো করে শেয়াল ডাকতে শুরু করেছে। মীর আলি হৃষ্ট গলায় বলে—'রাইত বেশী বাকি নাই।' অনুফা জবাব দেয় না, হাই তোলে।

: একটা জলচৌকি দেও, উঠানে বইয়া থাকি।

: দুপুর রাইতে উঠানে বইবেন কি? যান ঘুমাইতে যান।

মীর আলি বাধ্য ছেলের মত বিছানায় শুয়ে পড়ে। একবার ঘুম ভাঙলে বাকি রাতটা তার জেগে কাটাতে হয়। সে বিছানায় বসে ঘরের স্পষ্ট অস্পষ্ট সব শব্দ অত্যন্ত মন দিয়ে শোনে।

বদি খুক খুক করে কাশছে। টিনের চালে ঝটপট শব্দ। কিসের শব্দ? বানর? চৌকির নিচে সবগুলো হাঁস একসঙ্গে প্যাঁক প্যাঁক করল। বাড়ির পাশে শেয়াল হাঁটাহাঁটি করছে বোধ হয়। পরীবানু কেঁদে উঠল। দুধ খেতে চায়। অনুফা দুধ দেবে না। চাপা গলায় মেয়েকে শাসাচ্ছে। বদি আবার কাশছে। ঠাণ্ডা লেগেছে নাকি? পরশু দিন ভিজে বাড়ি ফিরেছে। জ্বরতো হবেই। বদির কথা শোনা যাচ্ছে। ফিস ফিস করে কি যেন বলছে। কি বলছে? এত ফিসফিসানি কেন? মীর আলি কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করে। কাক ডাকল। সকাল হচ্ছে

AMARBOI.COM

নাকি ? মীর আলি ভোরের প্রতীক্ষা করে—তার তলপেট আবার ভারী হয়ে ওঠে।

ঃ বদি, ও বদি। বদিউজ্জামান।

ঃ কি ?

ঃ এট্টু বাইরে যাওন দরকার।

বদি সাড়া শব্দ করে না। পরীবানু তারস্বরে কাঁদে। দুধ খেতে চায়।

ঃ ও বদি। বদিউজ্জামান।

ঃ আসি আসি।

ঃ তাড়াতাড়ি কর।

ঃ আরে দুত্তোরি! এক রাইতে কয়বার বাইরে যাইবেন ?

বদি প্রচণ্ড একটা চড় বসায় পরীবানুর গালে। বিরক্ত গলায় বলে —টর্চটা দাও অনুফা। টর্চ খুঁজে পায়, কিন্তু অন্ধকারে ব্যাটারী খুঁজে পায় না।

মীর আলি অপেক্ষা করতে করতে এক সময় অবাক হয়ে বুঝতে পারে তার প্রস্রাব হয়ে গেছে। বিছানার একটা অংশ ভেজা। সে অত্যন্ত বিচলিত বোধ করে। এরকম আগে কখনো হয়নি।

ঃ আসেন যাই। যত ঝামেলা। দেখি হাতটা বাড়ান।

বদি তার হাত ধরে। মীর আলি খুব দুর্বল ও অসহায় বোধ করে।

ঃ এখন থাইক্যা ঘরের মইদ্যে একটা পাতিলে পেশাব করবেন। ঝামেলা ভাল লাগে না।

ঃ আইচ্ছা।

ঃ আর পানি কম খাইবেন। বুঝলেন ?

ঃ আইচ্ছা।

বদি তাকে উঠনের এক মাথায় বসিয়ে দেয়। মীর আলি প্রস্রাব করার চেষ্টা করে। প্রস্রাব হয় না—ভোঁতা একটা যন্ত্রণা হয়। বদি হাঁক দেয়।

ঃ কি হইছে? রাইত শেষ করবেন নাকি ?

আর ঠিক তখন মীর আলির সামনে দিয়ে সরসর শব্দ করে একটা কিছু চলে যায়। কি এটা, সাপ? মীর আলির দেখতে ইচ্ছে করে।

ঃ আরে বিষয় কি, ঘুমাইয়া পড়ছেন নাকি ?

ঃ নাহ্। একটা সাপ গেলো সামনে দিয়া।

ঃ আরে দুত্তোরী সাপ—উঠেন দেখি।

AMARBOI.COM

ঃ মনে হয় জাতি সাপ। বিরাট লম্বা মনে হইল।

ঃ আরে ধুৎ, উইঠা আসেন।

মীর আলি উঠে দাঁড়ায়। আর ঠিক তখন আজান হয়। মীর আলি হাসি মুখে বলে—আজান দিছে। ও বদি আজান দিছে।

ঃ দিছে দেউখ। ঘরে চলেন।

ঃ ওখন আর ঘরে গিয়া কি কাম? গোসলের পানি দে। গোসল সাইরা নামাজটা পড়ি।

বদি বিরক্ত গলায় বলে—অজু কইরা নামাজ পড়েন। গোসল ক্যান?

ঃ শইলডা পাক না। নাপাক শইল।

ঃ আপনে থাকেন বইয়া, অনুফারে পাঠাই। যত ঝামেলা।

বদিউজ্জামান তার বাবাকে একটা জলচৌকির ওপর বসিয়ে ভেতরে চলে যায়। আর আসে না। পরীবানু ঘ্যান ঘ্যান স্বরে কাঁদে। মীর আলি বসে থাকে চুপচাপ।

তার কিছুক্ষণ পর পঞ্চাশ জন সৈন্যের মোট একটা দল গ্রামে এসে ঢোকে। মার্চ টার্চ না, এলোমেলো ভাবে চলা। তাদের পায়ের বুটে কোন শব্দ হয় না। তারা যায় মীর আলির বাড়ির সামনে দিয়ে। এবং তাদের একজন মীর আলির চোখে পাঁচ-ব্যাটারী টর্চের আলো ফেলে। মীর আলি কিছু বুঝতে পারে না। শুধু উঠনে বসে থাকা কুকুরটা তারস্বরে ঘেউ ঘেউ করতে থাকে। মীর আলি ভীত স্বরে ডাকে—বদি। ও বদি। বদিউজ্জামান।

কুকুরটি একসময় আর ডাকে না। দলটির পেছনে পেছনে কিছু দূর গিয়ে থমকে দাঁড়ায়, তারপর দ্রুত ফিরে আসে মীর আলির কাছে। মীর আলি উঁচু গলায় ডাকে—ও বদি। ও বদিউজ্জামান।

ঃ কি হইছে, বেহুদা চিল্লান কেন?

ঃ বাড়ির সামনে দিয়া কারা যেন গেল।

ঃ আরে দুত্তোরী। যত ফালতু ঝামেলা। চুপ কইরা বইয়া থাকেন।

মীর আলি চুপ করে যায়। চুপ করে থাকে কুকুরটিও। নিম্নশ্রেণীর প্রাণীরা অনেক কিছু বুঝতে পারে। তারা টের পায়।

গ্রামের নাম নীলগঞ্জ। পহেলা মে। উনিশ শ একাত্তর। ক্ষুদ্র সৈন্য বাহিনীর অধিনায়ক একজন মেজর—এজাজ আহমেদ। কাকুল

মিলিটারি একাডেমীর একজন কৃতী ক্যাডেট। বাড়ি পেশোয়ারের এক অখ্যাত গ্রামে। তার গাঁয়ের নাম—রেশোবা।

ময়মনসিংহ—ভৈরব লাইনের একটি স্টেশন নান্দাইল রোড।

ছোট্ট গরীব স্টেশন। মেল ট্রেন থামে না। লোকাল ট্রেন মিনিট খানেক থেকেই ফ্ল্যাগ উড়িয়ে পালিয়ে যায়। স্টেশনের বাইরে ইট বিছানো রাস্তায় চার পাঁচটা রিকশা ঠুন ঠুন করে ঘন্টা বাজিয়ে যাত্রী খোঁজে। সুরেলা গলা শোনা যায়, রুয়াইল বাজার যাওনের কেউ আছুইন। রুয়াইল বা-জা-র।

রুয়াইল বাজার এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় বাজার। নান্দাইল রোড থেকে সোজা উত্তরে দশ মাইল। খুবই খারাপ রাস্তা। বর্ষাকালে রিকশা চলে না। হেঁটে যেতে হয়। এঁটেল মাটিতে পা ডুবে যায়, থিক থিক ঘন কাদা। নান্দাইল রোড থেকে রুয়াইল বাজার আসতে বেলা পুইয়ে যায়।

বাজারটি অন্য সব গ্রাম্য বাজারের মত। তবে স্থানীয় লোকদের খুব অহংকার একে নিয়ে। কি নেই এখানে? ধানচালের আড়ত আছে। পাটের গুদাম আছে। ধান ভাঙানোর কল আছে। চায়ের দোকান আছে। এমন কি রেডিও সারাবার একজন কারিগর পর্যন্ত আছে। গ্রামের বাজারে এর চেয়ে বেশী কী দরকার?

রুয়াইল বাজারকে পেছনে ফেলে আরো মাইল ত্রিশেক উত্তরে মধুবন বাজার। যাতায়াতের একমাত্র ব্যবস্থা গরুর গাড়ী। তাও শীতকালে। বর্ষায় হাঁটা ছাড়া অন্য উপায় নেই। উজান দেশ। নদী নালা নেই যে নৌকো চলবে।

মধুবন বাজার পেছনে ফেলে পুব দিকে সাত আট মাইল গেলে ঘন জঙ্গল। স্থানীয় নাম মধুবনের জঙ্গলা-মাঠ। কাঁটা-ঝোপ, বাঁশ আর জারুলের মিশ্র বন। বেশ কিছু গাব ও ডেফল জাতীয় অন্ত্যজ শ্রেণীর গাছও আছে। জঙ্গলা-মাঠের এক অংশ বেশ নীচু। সেখানে মোরতা গাছের ঘন অরণ্য। শীতকালে সেই সব মোরতা কেটে এনে পাটি বোনা হয়। পাকা লটকনের খোঁজে বালক বালিকারা বনের ভেতর ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু বর্ষাকালে কেউ যায় না সেদিকে। খুব সাপের উপদ্রব।

AMARBOI.COM

বনে ঢুকে প্রতি বছরই দু-একটা গরু ছাগল সাপের হাতে মারা পড়ে।

জঙ্গলা মাঠের পেছনে নীলগঞ্জ গ্রাম। দরিদ্র, শ্রীহীন ত্রিশ চল্লিশ ঘরের একটি বিচ্ছিন্ন জনপদ। বিস্তীর্ণ জলাভূমি গ্রামটিকে কাস্তের মত দু দিকে ঘিরে আছে। সেখানে শীতকালে প্রচুর পাখি আসে। পাখি মারা জাল নিয়ে পাখি ধরে বাজারে বিক্রি করে পাখি-মারারা। চাষবাস যা হয় দক্ষিণের মাঠে। জমি উর্বর নয় কিংবা এরা ভাল চাষী নয়। ফসল ভাল হয় না। তবে শীতকালে এরা প্রচুর রবিশস্য করে। বর্ষার আগে আগে করে তরমুজ ও বাঙ্গি। দক্ষিণের জমিতে কোন রকম যত্ন ছাড়াই এ দুটি ফল প্রচুর জন্মায়।

গ্রামের অধিকাংশ ঘরেই খড়ের ছাউনি। সম্প্রতি কয়েকটি টিনের ঘর হয়েছে। বদিউজ্জামানের ঘরটি টিনের। তার হাতে এখন কিছু পয়সাকড়ি হয়েছে। টিনের ঘর বানানো ছাড়াও সে একটা সাইকেল কিনেছে। চালানো শিখে ওঠেনি বলে এখনো সে হেঁটেই মধুবন বাজারে যায়। সপ্তাহে একবার নতুন সাইকেলটি ঝাড়পোঁছ করে।

গ্রামের একমাত্র পাকা দালানটি প্রকাণ্ড। দুবিঘা জমির ওপর একটা হুলস্থূল ব্যাপার। সুসং দূর্গাপুরের মহারাজার নায়েব চন্দ্রকান্ত সেন মশাই এ বাড়ি বানিয়ে গৃহপ্রবেশের দিন সর্পাঘাতে মারা পড়েন। চন্দ্রকান্ত সেন প্রচুর ধনসম্পদ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর সেসবের কোন হদিশ পাওয়া যায়নি। সবার ধারণা, সোনাদানা পেতলের কলসিতে ভরে তিনি যখ করে গেছেন। তাঁর উত্তরাধিকারীরা পেতলের কলসির খোঁজে প্রচুর খোঁড়াখুড়ি করেছে। কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। চন্দ্রকান্ত সেন মশায়ের বর্তমান একমাত্র উত্তরাধিকারী নীলু সেন প্রকাণ্ড দালানটিতে থাকেন। তাঁর বয়স প্রায় পঞ্চাশ। দেখায় তারচেয়েও বেশী। নীলু সেনকে গ্রামে যথেষ্ট খাতির করা হয়। যাবতীয় সালিসীতে তিনি থাকেন। বিয়ে শাদীর কোন কথাবার্তা তাঁকে ছাড়া কখনো হয় না। লোকটি অত্যন্ত মিষ্টভাষী।

AMARBOI.COM

এ গ্রামে সবচে' সম্পদশালী ব্যক্তি হচ্ছে জয়নাল মিয়া। প্রচুর বিষয় সম্পত্তির মালিক। মধুবন বাজারে তার দুটি ঘরও আছে। লোকটি মেরুদণ্ডহীন। সবার মন রেখে কথা বলার চেষ্টা করে। গ্রাম্য সালিসীতে সবার কথাই সমর্থন করে বিচার সমস্যা জটিল করে তোলে। তবু সবাই তাকে মোটামুটি সহ্য করে। সম্পদশালীরা এই সুবিধাটি সব জায়গাতেই ভোগ করে।

দু জন বিদেশী লোক আছেন নীলগঞ্জে। একজন নীলগঞ্জ মসজিদের ইমাম সাহেব। এত জায়গা থাকতে তিনি এই দুর্গম অঞ্চলে ইমামতী করতে কেন এসেছেন, সে রহস্যের মীমাংসা হয়নি। তিনি মসজিদেই থাকেন। মাসের পনেরো দিন জয়নাল মিয়ার বাড়িতে খান। বাকী পনেরো দিন পালা করে অন্য ঘরগুলোতে খান। কিছুদিন হল তিনি বিয়ে করে এই গ্রামে স্থায়ীভাবে থাকবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

প্রস্তাবটিতে কেউ এখনো তেমন উৎসাহ দেখাচ্ছে না। ধানী জমি দিতে পারে জয়নাল মিয়া। সে প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাচ্ছে। শুনেও না শোনার ভান করছে।

দ্বিতীয় বিদেশী লোকটি হচ্ছে আজিজ মাস্টার। সে নীলগঞ্জে প্রাইমারী স্কুলের হেড মাস্টার। প্রাইমারী স্কুল সরকারী সাহায্যের তিন বৎসর আগে শুরু হয়। উদ্দেশ্য বোধহয় একটিই—দুর্গম অঞ্চলে শিক্ষার আলো পৌঁছানো। উদ্দেশ্য সফল হয়নি। শিক্ষকরা কেউ বেশী দিন থাকতে পারে না। খাতাপত্রে তিনজন শিক্ষক থাকার কথা। এখন আছে একজন—আজিজ মাস্টার। লোকটি রুগ্ন, নানান রকম অসুখ-বিসুখ। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে হাঁপানী। শীতকালে এর প্রকোপ হয়। গরম কালটা মোটামুটি ভালই কেটে যায়।

আজিজ মাস্টার একজন কবি। সে গত তিন মাসে চার নম্বরি একটি রুলটানা খাতা কবিতা লিখে ভরিয়ে ফেলেছে। প্রতিটি কবিতাই একটি রমণীকে উদ্দেশ্য করে লেখা, যাকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়েছে, যেমন—স্বপ্ন-রানী, কেশবতী, অচিন পাখি ইত্যাদি। তার তিনটি কবিতা নেত্রকোণা থেকে প্রকাশিত মাসিক কিষাণ পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। আজিজ মাস্টারের কাব্য প্রতিভা সম্পর্কে গ্রামের লোকজন ওয়াকিবহাল। তারা এই কবিকে যথেষ্ট সমীহ করে। সমীহ করার আরেকটি কারণ হলো আজিজ মাস্টার গ্রামের সবচেয়ে শিক্ষিত মানুষ। বি. এ. পর্যন্ত পড়েছিল। পরীক্ষা দেয়া হয়নি। তার আবার পরীক্ষা দেয়ার কথা।

সে জয়নাল মিয়ার একটি ঘরে থাকে। তার স্ত্রীকে সে ভাবীসাব ডাকে, কিন্তু তার বড় মেয়েটিকে দেখলেই কেমন যেন বিচলিত বোধ করে। মেয়েটির নাম মালা। মাঝে মাঝে মালা তাকে ভাত বেড়ে দেয়। সে সময়টা আজিজ মাস্টার বড় অস্বস্তি বোধ করে। সে যখন বলে—মামা আরেকটু ভাত দেই? তখন কোন কারণ ছাড়াই আজিজ মাস্টারের কান টান লাল হয়ে যায়। আজিজ মাস্টার কয়েক দিন আগে

AMARBOI.COM

'মালা রানী' নামের একটি দীর্ঘ কবিতা রচনা করেছে। কবিতাটি কিষাণ পত্রিকায় পাঠাবে কি না, এ নিয়ে সে খুব চিন্তিত। হয়ত পাঠাবে।

নীলগঞ্জের যে দিকটায় জলাভূমি, একদল কৈবর্ত থাকে সেদিকে। গ্রামের সঙ্গে তাদের খুব একটা যোগ নেই। মাছ ধরার সিজনে জলমহালে মাছ মারতে যায়। আবার ফিরে আসে। কর্মহীন সময়টাতে চুরি ডাকাতি করে। নীলগঞ্জের কেউ এদের ঘাঁটায় না।

গত বৎসর কৈবর্ত পাড়ায় খুন হল একটা। নীলগঞ্জের মাতবররা এমন ভাব করলেন, যেন তারা কিছুই জানেন না। থানা পুলিশ কিছুই হল না। যে বাড়ির ছেলে খুন হল, সে বাড়ির চিত্রা বুড়ি কিছুদিন ছোটাছুটি করল নীলু সেনের কাছে। নীলু সেন শুকনো গলায় বলল—তোদের ঝামেলা তোরা মিটা। থানাওয়ালার কাছে যা। বুড়ি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল—থানাওয়ালার কাছে গেলে আমারে দহের মইধ্যে পুইত্তা থুইব কইছে। নীলু সেন গম্ভীর হয়ে গেল। টেনে টেনে বলল—এদের ঘাঁটাঘাঁটি করা ঠিক না। রক্ত গরম জাত। কি করতে কি করে।

ঃ বিচার অইত না ?

নীলু সেন তার জবাব দিতে পারল না। অস্পষ্টভাবে বলল—এখন বাদ দে। পরে দেখি কিছু করা যায় কিনা।

বুড়ি আরো কিছুদিন ছোটাছুটি করল। এবং একদিন দেখা গেল কৈর্বতরা দল বেঁধে জলমহালে মাছ মারতে গিয়েছে বুড়িকে সঙ্গে না নিয়েই। বুড়ি আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করল কিছু দিন। নীলু সেনের দালানের এক প্রান্তে থাকতে লাগল। চরম দুর্দিন। কৈবর্তরা ফিরে এল তিন মাস পর—কিন্তু বুড়ির জায়গা হল না। সে এ-বাড়ি ও-বাড়ি ভিক্ষা করে খেতে লাগল। হতদরিদ্র নীলগঞ্জের প্রথম ভিক্ষুক।

সব গ্রামের মত এই গ্রামে একজন পাগলও আছে। মতি মিয়ার শালা নিজাম। সে বেশীর ভাগ সময়ই সুস্থ থাকে। শুধু দু একদিন মাথা গরম হয়ে যায়। তখন তার গায়ে কোন কাপড় থাকে না। গ্রামের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত ছোটাছুটি করতে থাকে। দুপুরের রোদ খুব বেড়ে গেলে মধুবন জঙ্গলায় ঢুকে পড়ে। পাগলদের সাপে কাটে না—প্রবাদটি হয়তো সত্যি। নিজাম বহাল তবিয়তেই বন থেকে বেরিয়ে আসে। ছোটাছুটি করা এবং বনের ভেতরে বসে থাকা ছাড়া সে অন্য কোন উপদ্রব করে না। গ্রামের পাগলদের গ্রামবাসীরা খুব স্নেহের চোখে দেখে। তাদের প্রতি অন্য এক ধরনের মমতা থাকে সবার।

AMARBOI.COM

চিত্রা বুড়ি রাতে একনাগাড়ে কখনো ঘুময় না।
ক্ষণে ক্ষণে জেগে উঠে চেঁচায় —'কেলা যায় গো? লোকটা কে?'

তার ঘুমবার জায়গাটা হচ্ছে সেন বাড়ির পাকা কালি মন্দিরের চাতাল। নীলু সেন তাকে থাকবার জন্যে একটা ঘর দিয়েছিলেন। সেখানে নাকি তার ঘুম হয় না। দেবী মূর্তির পাশে সে বোধ হয় এক ধরনের নিরাপত্তা বোধ করে। গভীর রাতে দেবীর সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ কথাবার্তা হয়, যেমন--দেখিস হেই মা কালি, হেইগো নেংটা বেটি, আমার পুতরে যে মারছে, তুই তার কইলজাটা টাইন্যা খা। তরে আমি জোড়া পাঠা দিমু। বুক চিইড়া রক্ত দিমু--হেই মা কালী, দেখিসরে বেটি, দেখিস।

মা কালী কিছু শোনেন কিনা বলা মুশকিল। কিন্তু চিত্রা বুড়ির ধারণা তিনি শোনেন এবং তিনি যে শুনছেন তার নমুনাও দেন। যেমন, এক রাত্রিতে খল-খল হাসির শব্দ শোনা গেল। বুড়ির রক্ত জল হয়ে যাবার মত অবস্থা। সে কাঁপা গলায় ডাকল—হেই মা, হেই গো নেংটা বেটি? হাসির শব্দ দ্বিতীয়বার আর শোনা গেল না। দেবীরা তাদের মহিমা বার বার করে দেখাতে ভালবাসেন না।

চিত্রা বুড়ি আজ রাতেও মা কালীর সঙ্গে সুখদুঃখের অনেক কথা বলল। জোড়া পাঠার আশ্বাস দিয়ে ঘুমতে গেল। তারপর জেগে উঠে চেঁচাল—কেলা যায় গো, লোকটা কে? কেউ জবাব দিল না, কিন্তু বুড়ির মনে হল অনেকগুলো মানুষ যেন এদিকে আসছে। শব্দ করে পা ফেলছে। হুঁহাঁ হুঁহাঁ—এরকম একটা আওয়াজও আসছে। ডাকাত নাকি? চিত্রা বুড়ি ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। তার চোখের সামনে দিয়ে মিলিটারির দলটি পার হল। আলো কম। স্পষ্ট কিছু দেখা যাচ্ছে না।

চিত্রা বুড়ি কিছু বুঝতে পারল না। এরা কারা? এই রাতে কোত্থেকে এসেছে? বুড়ি দেখল সেনবাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বেশ কয়েকবার টর্চের আলো ফেলল। তার মানে কি ডাকাত? কিন্তু সেনবাড়িতে ডাকাত আসার কথা নয়। সেনরা এখন হতদরিদ্র। এই বিশাল বাড়ির ইটগুলো ছাড়া ওদের আর কিছুই নেই।

AMARBOI.COM

ওরা আবার চলতে শুরু করেছে। জুম্মাঘরের কাছে এসে আবার সেনবাড়ির ওপর টর্চের আলো ফেলল। কোনদিকে যাচ্ছে? কৈবর্ত পাড়ার দিকে? ওদের আগেভাগে খবর দেয়া দরকার। সেনবাড়ির পেছন দিক দিয়ে ছুটে গিয়ে খবর দেবে? চিত্রা বুড়ির কাছে সমস্ত ব্যাপারটা অস্বাভাবিক লাগছে। এই রাতের বেলা দল বেঁধে এরা কেন আসবে?

না, কৈবর্ত পাড়ার দিকে যাচ্ছে না। জুম্মাঘর পেছনে ফেলে এরা সড়কে উঠে গেল। টর্চের আলো এখন আর ফেলছে না। বুড়ির মনে হল, এরা স্কুলঘরের দিকে যাচ্ছে। আজিজ মাস্টারকে খবর দেয়া দরকার। কিন্তু তারও আগে খবর দেয়া দরকার কৈবর্ত পাড়ায়। বিপদের সময় নিজ গোত্রের মানুষের কথাই প্রথম মনে পড়ে।

চার পাঁচটা কুকুর একসঙ্গে চেঁচাচ্ছে। এরা কিছু টের পেয়েছে। কুকুর বেড়াল অনেক কিছু আগে ভাগে জানে। বুড়ি কালী মন্দিরের চাতাল থেকে নেমে এল। সে কোনদিকে যাবে মনস্থির করতে পারছে না।

AMARBOI.COM

গ্রামে মিলিটারি ঢুকছে এটা প্রথম বুঝতে পারলেন নীলগঞ্জ মসজিদের ইমাম সাহেব। পাকা মসজিদের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে তিনি সুরা ইয়াসিন পড়ছিলেন। আযান দেবার আগে তিনি তিনবার সুরা ইয়াসিন পড়েন। দ্বিতীয়বার পড়বার সময় অবাক হয়ে পুরো দলটাকে দেখলেন। এরা স্কুল ঘরের দিকে যাচ্ছে।

প্রথম কয়েক মুহূর্ত তিনি ব্যাপারটা বুঝতেই পারলেন না। সুরা ইয়াসিন শেষ করে দীর্ঘ সময় মসজিদের সিঁড়িতে বসে রইলেন। অন্ধকার এখনো কাটেনি। পাখপাখালি ডাকছে। ইমাম সাহেব মনস্থির করতে পারছেন না, এখানে বসে থাকবেন, না খবর দেয়ার জন্যে ছুটে যাবেন। কিছুক্ষণ পর তাঁর মনে হল, সিঁড়িতে এরকম প্রকাশ্যে বসে থাকা ঠিক নয়। মসজিদের ভেতরে থাকা দরকার। কিন্তু নীলগঞ্জের মসজিদে তিনি কখনো একা ঢোকেন না। এই মসজিদে জ্বীন নামাজ পড়ে--এরকম একটা প্রবাদ আছে। অনেকেই দেখেছে। তিনি অবিশ্যি এখনো দেখেন নি। কিন্তু তাঁর ভয় করে।

একা বসে থাকতে থাকতে তাঁর মনে হল, এই যে তিনি দেখলেন একদল মিলিটারি, এটা চোখের ভুল নয় তো? নান্দাইল রোডে মিলিটারি

আসেনি, সোহাগীতে আসেনি। এখানে আসবে কেন? এখানে আছেটা কি? নেহায়েতই অজ পাড়া গাঁ।

ইমাম সাহেব ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন। স্কুল ঘর বাঁশবনের আড়ালে পড়েছে—কিছুই দেখা যাচ্ছে না। মুসুল্লীরা কেউ আসছে না কেন? নাকি মিলিটারির খবর জেনে গেছে সবাই? তাঁর প্রবল ইচ্ছে হতে লাগল, নামাজ না পড়েই ঘরে ফিরে যেতে। আকাশ ফর্সা হতে শুরু করেছে, অথচ কারো দেখা নেই।

দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করবার পর মতি মিয়াকে আসতে দেখা গেল। মতি মিয়া একটা মামলায় জড়িয়ে ইদানীং ধর্মে কর্মে অতিরিক্ত রকমের উৎসাহী হয়ে পড়েছে। ইমাম সাহেব নিচু গলায় বললেন—এই মতি, কিছু দেখলা?

ঃ কি দেখমু? কিসের কথা কন?

ঃ কিছু দেখ নাই?

ঃ নাহ্। বিষয়ডা কি?

ইমাম সাহেব আর কিছু না বলে চিন্তিত ভঙ্গিতে আজান দিতে গেলেন। আজান শেষ করে মতি মিয়াকে আবার জিজ্ঞেস করলেন—ইস্কুল ঘরের কাছে কিছুই দেখ নাই?

ঃ নাহ। ব্যাপারডা কি খুইলা কন।

ঃ মনে হয় গেরামে মিলিটারি ঢুকছে।

ঃ কি ঢুকছে?

ঃ মিলিটারি।

ঃ আরে কি কন? এই গেরামে মিলিটারি আইব ক্যান?

ঃ আমি যাইতে দেখলাম।

ঃ চউক্ষের ধান্ধা। আন্ধাইরে কি দেখতে কি দেখছেন। নান্দাইল রোডে তো এখন তক মিলিটারি আসে নাই।

ঃ তুমি জানলা ক্যামনে?

ঃ আমার শালা আইছে গতকাইল। নেজামের বড় ভাই।

ঃ আমি কিন্তু নিজের চউক্ষে দেখলাম।

ঃ আরে না। মিলিটারি আইলে এতক্ষণে গুলি শুরু হইয়া যাইত। মিলিটারি কি সোজা জিনিস?

ইমাম সাহেব নামাজ শুরু করবার আগেই আরো তিনজন নামাজী এসে পড়ল। তারাও কিছু জানে না। একজন এসেছে স্কুলঘরের সামনে দিয়ে, সেও কিছু দেখেনি।

AMARBOI.COM

ইমাম সাহেব আজ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত নামাজ পড়লেন। নামাজের শেষে সাধারণত তিনি হাদিস-কোরানের দুই একটি কথা বলেন। আজ কিছুই বললেন না। বাড়ির দিকে রওনা হলেন। বেশ আলো চারদিকে, অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। জোড়া শিমুল গাছের কাছে এসে তিনি আড়চোখে স্কুলঘরের দিকে তাকালেন। বারান্দায় সারি সারি সৈন্য বসে আছে। ইমাম সাহেবের মনে হল স্কুল কম্পাউণ্ডের গেটের কাছে দাঁড়ানো একটা লোক হাত ইশারা করে তাকে ডাকছে। লোকটির পরণে ফুল প্যান্ট এবং নীল রঙের একটা হাফ সার্ট। কিন্তু তাকে ডাকছে কেন? নাকি তিনি ভুল দেখছেন? ইমাম সাহেবের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমল। তিনি একবার আয়াতুল কুর্সি ও তিনবার দোয়া ইউনুস পড়ে স্কুলঘরের দিকে এগুলেন।

নীল সার্ট পরা লোকটিও এগিয়ে আসছে তার দিকে। ব্যাপার কি? এ কে? তিনি অতি দ্রুত দোয়া ইউনুস পড়তে লাগলেন—লাই লাহা ইল্লা আন্তা সোভহানাকা ইন্নি কুনতু মিনাজ্জুয়ালেমিন। এই দোয়াটি খুব কাজের। হযরত ইউনুস আলায়হেস সালাম মাছের পেটে বসে এই দোয়া পড়েছিলেন।

নীল সার্ট পরা লোকটা এগিয়ে আসছে। কি চায় সে?

: আপনি কে?

: আমি এই গেরামের ইমাম।

: আচ্ছালামু আলায়কুম ইমাম সাহেব।

: ওয়ালাইকুম সালাম ওয়ারহমতুল্লাহ।

: আপনি একটু আসেন আমার সাথে।

: কই যাইতাম?

: আসেন। মেজর সাব আপনাকে ডাকেন। ভয়ের কিছু নাই, আসেন।

ইমাম সাহেব তিনবার ইয়া মুকাদ্দেমু পড়ে ডান পা আগে ফেললেন। সঙ্গের নীল সার্ট পরা লোকটি মৃদু স্বরে বলল--এত ভয় পাচ্ছেন কেন? ভয়ের কিছুই নাই।

আজিজ মাস্টারের অনিদ্রা রোগ আছে।

অনেক রাত পর্যন্ত তাকে জেগে থাকতে হয় বলেই অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমতে হয়। আজ তাকে ভোরের আলো ফোটার আগেই জাগতে হল।

AMARBOI.COM

কারণ স্কুলের দপ্তরী ও দারোয়ান রাসমোহন প্রচণ্ড শব্দে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। যেন ভূমিকম্প হচ্ছে, এক্ষুণি আজিজ মাস্টারকে ঘর থেকে বের করতে হবে। বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে আজিজ মাস্টার কথা বলল, এই রাসমোহন, কি ব্যাপার?

ঃ আপনারে ডাকে, আপনারে ডাকে।

ঃ কে ডাকে?

ঃ মিলিটারি। গেরামে মিলিটারি আসছে। ইস্কুলঘরে।

ঃ কি বলছিস রাসমোহন?

ঃ আপনারে স্যার ডাকে।

আজিজ মাস্টার দরজা খুলে দেখল, রাসমোহনের থুতনি বেয়ে ঘাম পড়ছে। গায়ের ফতুয়াটাও ঘামে ভেজা। স্কুল থেকে দৌড়ে এসেছে বোধ হয়। শব্দ করে শ্বাস টানছে। রাসমোহন আবার বলল, মিলিটারি আপনারে ডাকে স্যার। আজিজ মাস্টার রাসমোহনের কথা মোটেও বিশ্বাস করল না। সময়টা খারাপ। খাকি পোশাকের একজন পিওন দেখলেও সবাই ভাবে পাঞ্জাবী মিলিটারি। রাসমোহনের রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়েছে। থানাওয়ালারা কেউ এসেছে কেন্দুয়া থেকে। খুব সম্ভব চিত্রা বুড়ির ছেলের ব্যাপারে। মার্ডার কেইসে পুলিশের খুব উৎসাহ। দল বেঁধে চলে আসে। নগদ বিদায়ের ব্যবস্থা আছে। এখানেও তাই হয়েছে। আজিজ মাস্টার অনেকখানি সময় নিয়ে হাত মুখ ধুল। তার মাথায় চুল নেই, তবু যত্ন করে চুল আঁচড়াল। পরিষ্কার একটা পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে রাস্তায় বেরুল। অর্ধেক পথ আসার পর তার মনে পড়ল চাবি ফেলে এসেছে। আবার ফিরে গেল চাবি আনতে। বাড়ি ফেরবার পথে সত্যি সত্যি বুঝল গ্রামে মিলিটারি এসেছে। তার মতি মিয়ার সঙ্গে দেখা হল। রতন মাঝির সঙ্গে দেখা হল। বাড়ি ঢোকবার মুখে জয়নাল মিয়াকেও ছাতা মাথায় দিয়ে আসতে দেখা গেল। রাসমোহন এদের প্রত্যেককে একবার একবার করে তার অভিজ্ঞতার কথা বলল।

রাসমোহনের বর্ণনা মত, সে স্কুলঘরের বারান্দায় ঘুমচ্ছিল। তখনো চারদিক অন্ধকার। কে যেন তার পায়ে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে মুখে টর্চের আলো ফেলল। সে উঠে বসে দেখে স্কুলে মিলিটারি গিজ গিজ করছে।

জয়নাল মিয়া নিচু গলায় বলল—আন্দাজ কত জন হইব?

ঃ চাইর পাঁচশ'র কম না।

ঃ কও কি তুমি!

ঃ বেশীও হইতে পারে। সবটি সস্ত জোয়ান।

AMARBOI.COM

: জোয়ানতো হইবই। মিলিটারি দুবলা পাতলা হয় নাকি ?

: হাতে অস্ত্রপাতি আছে ?

জয়নাল মিয়া বিরক্ত মুখে বলল—অস্ত্রপাতি তো থাকবই। এরা কি বিয়া করতে আইছে ? আজিজ মাস্টার গম্ভীর গলায় বলল—তারপর কি হয়েছে রাসমোহন ?

: তারা আমার নাম জিগাইল।

আজিজ মাস্টার বলল—কোন ভাষায়, উর্দু না ইংরেজী ?

: বাংলায়। পরিস্কার জিগাইল—তোমার নাম কি ? তুমি কে ? কি কর ?

: তা কিভাবে হয় ? এরা তো বাংলা জানে না।

: আমি স্যার পরিস্কার হুনলাম। নিজের কানে হুনলাম।

: তারপর বল। তারপর কি হল ?

: আমি কইলাম, আমার নাম রাসমোহন। আমি ইস্কুলের দপ্তরী। তখন তারা কইল—হেডমাস্টাররে ডাইক্যা আন।

: বাংলায় বলল ?

: জ্বি স্যার।

: আরে কি যে বলে পাগল ছাগলের মত, এরা বাংলা জানে নাকি ? কি শুনতে কি শুনেছ।

আজিজ একটা সিগারেট ধরাতে গিয়ে লক্ষ্য করলো তার হাত কাঁপছে, এবং প্রস্রাবের বেগ হচ্ছে। খুব খারাপ লক্ষণ। এক্ষুণি হাঁপানির টান শুরু হবে। অতিরিক্ত উত্তেজনায় তার হাঁপানির টান ওঠে। এখন সিগারেট খাওয়াটা ঠিক হবে না জেনেও আজিজ মাস্টার লম্বা টান দিতে শুরু করল। সে সাধারণত জয়নাল মিয়ার সামনে সিগারেট খায় না।

জয়নাল মিয়া গম্ভীর গলায় বলল—তুমি যাও মাস্টার, বিষয়ডা কি জাইন্যা আস।

: আমি, আমি কি জন্যে যাব ?

: আরে, ডাকতাছে তোমারে। তুমি যাইবা নাতো যাইবটা কে ?

আজিজ মাস্টারের সত্যি সত্যি হাঁপানির টান উঠে গেল। সিগারেট ফেলে দিয়ে সে লম্বা লম্বা শ্বাস নিতে শুরু করল। জয়নাল মিয়া গম্ভীর গলায় বলল—এরা এইখানে থাকবার জন্যে আসে নাই, বুঝলা ? যাইতাছে অন্য কোনখানে। ভয়ের কিছু নাই। একটা পাকিস্তানী পতাকা হাতে নিয়া যাও। একটা পতাকা আছে না ? বাঁশের আগায় বান্ধ।

: আমি একলা যাব ? বলেন কি !

AMARBOI.COM

ঃ একসঙ্গে বেশী মানুষ যাওয়া ঠিক না।

ঃ ঠিক বেঠিক যাই হোক, আমি একা যাব না।

ঃ এই রকম করতাছ কেন মাস্টার, এরা বাঘও না ভাল্লুকও না।

ঃ একা যাব না। আপনারা চলেন আমার সাথে।

বেলা প্রায় সাতটার দিকে ছ'জনের, একটি ছোট্ট দলকে একটি পাকিস্তানী ফ্ল্যাগ হাতে নিয়ে স্কুলঘরের দিকে এগুতে দেখা গেল। রোগা আজিজ মাস্টার দলটির নেতৃত্ব দিচ্ছে। সে স্কুলঘরের কাছাকাছি এসে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করল—পাকিস্তান! দলের অন্য সবাই আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে বলল—জিন্দাবাদ!!

ঃ কায়দে আযম!

ঃ জিন্দাবাদ!!

ঃ লিয়াকত আলী খান!

ঃ জিন্দাবাদ!!

ঃ মহাকবি ইকবাল!

ঃ জিন্দাবাদ!!

AMARBOI.COM

রোদ উঠে গেছে।

বৈশাখ মাস—অল্প সময়েই রোদ ঝাঁঝাল হয়ে ওঠে।

ছোট্ট দলটি, যার নেতৃত্ব দিচ্ছে আজিজ মাস্টার, রোদে দাঁড়িয়ে ঘামছে। তাদের মুখ রক্তশূন্য। তারা বুকের মাঝে এক ধরনের কাঁপুনি অনুভব করছে।

রাস্তার ওপাশে চার পাঁচটা জারুল গাছ। গাছের নিচে গেলে ছায়া পাওয়া যায়। কিন্তু সেখানে যাওয়া ঠিক হবে কি না, আজিজ মাস্টার বুঝতে পারছে না। তারা জড়াজড়ি হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে ধ্বনি দেয়। আড়চোখে মিলিটারিদের দিকে তাকায়। সরাসরি তাকাতে সাহসে কুলোয় না। সমস্ত বারান্দা জুড়ে মিলিটারিরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কেউ বসে আছে, কেউ মাথার নিচে হ্যাভার স্যাক দিয়ে ঘুমের মত পড়ে আছে। পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে এগিয়ে আসা দলটির প্রতি তাদের কোন উৎসাহ দেখা গেল না। তাদের দৃষ্টি সন্ন্যাসীদের মত নির্লিপ্ত। যেন জগতের কোন কিছুতেই তাদের কিছু এসে যায় না।

পাকিস্তানের ফ্ল্যাগটি মতি মিয়ার হাতে। সে হাত উঁচু করে ফ্ল্যাগটি দোলাচ্ছিল—হাত ব্যাথা হয়ে গেছে, কিন্তু নামাবার সাহস হচ্ছে না। আজিজ মাস্টার খুক খুক করে কয়েকবার কাশল। সেই শব্দে বারান্দায় বসা কয়েকজন তাকাল তার দিকে। আজিজ মাস্টার প্রাণপণে কাশি চাপতে চেষ্টা করল। সময়টা খারাপ। এ রমক সময়ে কাউকে অযথা বিরক্ত করা ঠিক নয়। কিন্তু ক্রমাগত কাশি উঠছে। আজিজ মাস্টার লক্ষ্য করল উঠনে চেয়ার পেতে যে অফিসারটি বসে আছেন, তিনি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তার দিকে।

অত্যন্ত রূপবান একজন মানুষ। মিলিটারি পোশাকেও তাঁকে রাজপুত্রের মত লাগছে। এঁর চোখে মুখে কোন ক্লান্তি নেই। তবে বসে থাকার ভঙ্গিটি শ্রান্তির ভঙ্গি। তিনি তাঁর সামনের টেবিলে পা তুলে দিয়েছেন। পায়ে খয়েরী রঙের মোজা। মানুষটি প্রকাণ্ড, তবে সেই তুলনায় পায়ের পাতা দুটি ছোট।

তাঁর কাছাকাছি যে রোগা লোকটি দাঁড়িয়ে আছে, তাকে দেখতে বাঙালীদের মত লাগছে। তার গায়ে চকচকে নীল রঙের একটা সার্ট। এই লোকটি খুব ঘামছে। ময়লা একটা রুমালে ক্রমাগত ঘাড় মুছছে। অফিসারটি মৃদু স্বরে কি যেন বলল নীল সার্ট পরা লোকটিকে। নীল-সার্ট তীক্ষ্ম গলায় বলল—আপনাদের মধ্যে হেড় মাস্টার সাহেব কে?

আজিজ মাস্টারের বুকের মধ্যে শির শির করতে লাগল।

ঃ কে আপনাদের মধ্যে হেড মাস্টার?

মতি মিয়া আজিজ মাস্টারের পিঠে মৃদু ধাক্কা দিল। আজিজ মাস্টার কাশির বেগ থামাতে থামাতে বলল—জ্বি আমি।

ঃ আপনি থাকেন। অন্য সবাইকে যেতে বলেন। যান ভাই, আপনারা সবাই যান। ভয়ের কিছুই নাই।

আজিজ মাস্টার একা দাঁড়িয়ে রইল। অন্যরা মনে হলো হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে। তবে তারা চলেও গেল না। জুম্মাঘরের কাছে ছাতিম গাছের নিচে বসে রইল চুপচাপ। ব্যাপারটা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। মাস্টার ফিরে না আসা পর্যন্ত কিচ্ছু পরিষ্কার হবে না।

মতি বিড়ি ধরিয়ে টানতে লাগল। সে জয়নাল মিয়ার সামনে বিড়ি খায় না। এই কথা তার মনে রইল না। সময়টা খারাপ। এই সময় কোন কিছু মনে থাকে না। ছোট চৌধুরীও সিগারেট ধরালেন। তিনি সকাল থেকেই ঘামছেন।

মতি মিয়া বলল—ভয়ের কিছু নাই, কি কন?

AMARBOI.COM

ঃ নাহ, ভয়ের কি ? এরা বাঘও না, ভাল্লুকও না।

ঃ একেবারে খাঁটি কথা।

ঃ অন্যায় তো কিছু করি নাই। অন্যায় করলে একটা কথা আছিল।

ঃ একেবারে খাঁটি কথা। অতি লেহ্য কথা।

জয়নাল মিয়া উৎসাহিত বোধ করে। মতি বলল—নীলু চাচার বাড়িত যাই চলেন। কথাটা তার খুব মনে ধরে। কিন্তু আজিজ মাস্টার ফিরে না আসা পর্যন্ত নড়তেও ইচ্ছে করে না। রোদ চড়তে শুরু করে। ছাতিম গাছের নিচে একটি দুটি করে মানুষ জমতে শুরু করে। সবার মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা। ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ।

উত্তর বন্দে বোরো ধান পেকে আছে। কাটতে হবে। কিছু কিছু জমিতে পাট দেয়া হয়েছে। ক্ষেত নিরানির সময় এখন। দক্ষিণ বন্দে আউশ বোনা হবে। কিন্তু আজ মনে হয় এ গ্রামের কেউ কোথাও যাবে না। আজকের দিনটা চাপা উত্তেজনা নিয়ে সবাই অপেক্ষা করবে। এ গ্রামে বহুদিন এরকম ঘটনা ঘটেনি।

বদিকে দেখা গেল ফর্সা জামা গায়ে দিয়ে হন হন করে আসছে। তার বগলে ছাতা। ছাতিম গাছের নিচে একসঙ্গে এতগুলো মানুষ দেখে হকচকিয়ে গেল।

ঃ বিষয় কি ?

মতি মিয়া ঠাণ্ডা গলায় বলল—জান না কিছু ?

ঃ কি জানুম ?

ঃ আরে মসিবত ! জান লইয়া টানাটানি, আর কিছুই জান না ?

বদি চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকায়। কিছু বুঝতে পারে না। জয়নাল মিয়া ঠাণ্ডা গলায় বলে—গেরামে মিলিটারি আইছে।

ঃ এইটা কি কন ? এইখানে মিলিটারি আইব ক্যান ?

ঃ ইস্কুলঘরে গিয়া নিজের চউক্ষে দেখ। আজিজ মাস্টাররে রাইখ্যা দিছে।

ঃ এঁ্যা !

ঃ আজ মধুবনে গিয়া কাম নাই, বাড়িত যাও।

বাদি রাস্তার ওপর বসে পড়ে। ফিসফিস করে বলে—কি সর্বনাশ জয়নাল মিয়া বিরক্ত হয়ে বলে—সর্বনাশের কি আছে ? আমরা কি করলাম ? কিছু করছি আমরা ? বদি মুখ লম্বা করে বসে থাকে। একসময় মৃদু স্বরে বলে—মুসলমানের জন্যে ভয়ের কিছু নাই এরা

AMARBOI.COM

মুসলমানদের খুব খাতির করে। তবে পাক্কা মুসলমান হওয়া লাগে। চাইর কলমা জিজ্ঞেস করে।

সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। চার কলেমা কারো জানা নেই। বদি উৎসাহিত হয়ে বলে—সুন্নত হইছে কিনা এটাও দেখে। কাপড় খুইল্লা দেখে।

: তুমি জানলা ক্যামনে?

: নান্দাইল রোডে হনছি। সুন্নত না থাকলেই দুম। গুল্লি।

: কও কি তুমি!

: মিলিটারি মানুষ। রাগ বেশি। আমরার মত না। রাগ উঠলেই দুম।

বদি আরেকটি বিড়ি ধরিয়ে দ্রুত টানতে থাকে। তার মধুবনে যাওয়া অত্যন্ত দরকার। কে জানে হয়তো মধুবনেও মিলিটারি এসে দোকানপাট জ্বালিয়ে দিয়েছে। সে উঠে দাঁড়াল। মতি মিয়া বলল—যাও কই? বদি তার উত্তর না দিয়ে উল্টোদিকে হাঁটা শুরু করল। স্কুলঘরকে পাশ কাটিয়ে যেতে হবে। হাঁটতে হবে অনেকটা পথ।

কড়া রোদ উঠেছে। আকাশে মেঘের লেশমাত্র নেই। চারদিকে ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ। বদি হন হন করে ছুটছে।

AMARBOI.COM

রোগা নীল সার্ট পরা লোকটি বাঙালী।

সে আজিজ মাস্টারের দিকে তাকিয়ে শুকনো গলায় বলল—ইনি মেজর এজাজ আহমেদ, ইনারে সালাম দেন। আজিজ মাস্টার যন্ত্রের মত বলল—স্লামালিকুম। মেজর এজাজ পরিষ্কার বাংলায় বললেন—আপনার নাম কি?

: জ্বি আমার নাম আজিজুর রহমান মল্লিক।

: সে ইট এগেইন।

আজিজ মাস্টার নীল সার্ট পরা লোকটির দিকে তাকাল। সে ঠাণ্ডা গলায় বলল—নামটা আরেক বার বলেন। স্পষ্ট করে বলেন। গলায় জোর নাই? আজিজ মাস্টার বলল—আজিজুর রহমান মল্লিক।

: আপনি বসুন।

কোথায় বসতে বলছে? বসার দ্বিতীয় কোন চেয়ার নেই। মাটিতে বসতে বলছে নাকি? আজিজ মাস্টারের গলা শুকিয়ে গেল। রোগা লোকটি স্কুলঘর থেকে একটি চেয়ার নিয়ে এল। ঠাণ্ডা গলায় বলল—বসেন। স্যার বসতে বলেছেন, বসেন। আজিজ মাস্টার সঙ্কুচিত ভঙ্গিতে বসল। মেজর সাহেব দীর্ঘ সময় কোন কথাবার্তা বললেন না। সরু চোখে তাকিয়ে রইলেন আজিজ মাস্টারের দিকে। আজিজ মাস্টার কাঁপা গলায় বলল—স্যার ভাল আছেন? রোগা লোকটি বলল—শুনেন ভাই, আগ বাড়িয়ে কিছু বলতে যাবেন না। যা জিজ্ঞেস করবে শুধু তার জবাব দিবেন। ইনি লোক ভাল, ভয়ের কিছু নাই। স্যার বাংলা বলতে পারেন না, কিন্তু ভাল বুঝেন।

ঃ জ্বি আচ্ছা।

ঃ আপনার ভয়ের কিছু নাই। আরাম করে বসেন।

আজিজ মাস্টার আরাম করে বসার একটা ভঙ্গি করল। মেজর সাহেব একটা সিগারেট ধরালেন। প্যাকেটটি বাড়িয়ে দিলেন আজিজ মাস্টারের দিকে। আজিজ মাস্টার ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল। রোগা লোকটি বলল, স্যার দিচ্ছেন যখন নেন। বললাম না ইনি লোক ভাল। আজিজ মাস্টার একটা সিগারেট নিল। কি আশ্চর্য, মেজর সাহেব নিজে সিগারেটটি ধরিয়ে দিলেন। আজিজ মাস্টার তার ভদ্রতায় মুগ্ধ হয়ে গেল। অত্যন্ত শরিফ আদমি।

পরবর্তী সময়ে তাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কথাবার্তা হল। মেজর সাহেব প্রশ্ন করলেন ইংরেজীতে, আজিজ মাস্টার জবাব দিল বাংলায়। কিছু প্রশ্ন আজিজ মাস্টার বুঝতে পারল না। নীল সার্ট পরা লোকটি সুন্দর করে বুঝিয়ে দিল।

ঃ তোমার নাম আজিজুর রহমান মল্লিক?

ঃ জ্বি স্যার।

ঃ মল্লিক মানে কি?

ঃ জানি না স্যার।

ঃ এই গ্রামে কত জন মানুষ?

ঃ জানি না স্যার।

ঃ কত জন হিন্দু আছে?

ঃ জানি না স্যার।

ঃ তুমি দেখি কিছুই জান না।

ঃ স্যার আমি বিদেশী মানুষ।

AMARBOI.COM

: বিদেশী মানুষ মানে? তুমি পাকিস্তানী না?

: জ্বি স্যার।

: তাহলে তুমি বিদেশী হলে কিভাবে?

মেজর সাহেব চোখ বন্ধ করে জবাবের প্রতিক্ষা করতে লাগলেন। আজিজ মাস্টারের মাথায় কোন জবাব এল না।

: তুমি ইকবাল জিন্দাবাদ বলছিলে, ইকবাল কে?

: কবি স্যার। বড় কবি। মহাকবি।

: তুমি তাঁর কবিতা পড়েছ?

: জ্বি না স্যার।

: পড় নি—চীন অওর আরব হামারা, সারা যাঁহা হ্যায় হামারা?

: জ্বি না স্যার।

মেজর সাহেব আরেকটি সিগারেট ধরালেন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলেন। আজিজ মাস্টার লক্ষ্য করল, লোকটিকে দূর থেকে যত অল্প-বয়স্ক মনে হচ্ছিল, আসলে তার বয়স তত অল্প নয়। চোখের নিচে কালি। কপালের চামড়ায় সূক্ষ্ম ভাঁজ। কত বয়স হতে পারে? পঁয়ত্রিশের কম নয়। আজিজ মাস্টারের বয়স আটত্রিশ। এই লোকটি তার চেয়ে তিন বছরের ছোট। অথচ এই লোকটির সামনে নিজেকে কেমন কেঁচোর মত লাগছে।

মেজর সাহেব নড়েচড়ে বসলেন। পা থেকে মোজা জোড়া টেনে খুলে ফেললেন। আবার প্রশ্ন উত্তর শুরু হল।

: এ গ্রামে কোন দুষ্ট লোক আছে?

: জ্বি না স্যার।

: মুক্তিবাহিনী আছে?

: জ্বি না স্যার।

: তুমি ঠিক জান?

: জ্বি স্যার। এই গ্রামের সবাইকে আমি চিনি।

: তোমার ধারণা, এই গ্রামে মুক্তিবাহিনী নেই?

: জ্বি না।

মেজর সাহেব মৃদু হাসলেন। কেন হাসলেন কে জানে। তিনি কি বিশ্বাস করছেন না? আজিজ মাস্টার আবার বলল—মুক্তিবাহিনী নাই স্যার।

: শেখ মুজিবের লোকজন আছে?

: জ্বি না স্যার।

AMARBOI.COM

: তুমি জ্বি না স্যার ছাড়া অন্য কিছু বলছ না কেন? তুমি কি ভয় পাচ্ছ? ভয় পাচ্ছ তুমি?

: জ্বি না স্যার।

: গুড। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমার দিকে ভাল করে তাকাও। তাকাও ভাল করে।

আজিজ মাস্টার তাকাল। মেজর সাহেবের চোখ দুটি তার কাছে একটু নীলচে মনে হল। বিড়াল-চোখা নাকি?

: আমাকে দেখে কি মনে হয়, আমি খারাপ লোক?

: জ্বি না স্যার।

: কফি খাবে?

আজিজ মাস্টার চোখ তুলে তাকাল। রোগা লোকটি বলল—খেতে চাইলে বলেন—খাব। আমার দিকে তাকান কেন? অভ্যাস না থাকলে বলেন—খাব না। ব্যাস। বার বার আমার দিকে তাকাবেন না।

: কি, কফি খাবে?

: জ্বি না স্যার।

: না কেন, খাও। কফি তৈরি হচ্ছে। তুমি কি কফির সঙ্গে ক্রীম খাও?

আজিজ মাস্টার না বুঝেই মাথা নাড়ল। কফি এসে পড়ল কিছুক্ষণের মধ্যে। অতি বিস্বাদ জিনিস। আজিজ মাস্টার চুক চুক করে কফি খেতে লাগল। কাপ নামিয়ে রাখার সাহস হল না।

: বুঝলে আজিজ—পাকিস্তানী মিলিটারির নামে আজগুবি সব গল্প ছড়ানো হচ্ছে। আমরা নাকি কোথায় কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে দুটি মুক্তিবাহিনীর ছেলেকে মেরেছি। গল্পটা তোমার বিশ্বাস হয়?

আজিজ মাস্টার জবাব দিল না। মেজর সাহেব অনেকটা সময় নিয়ে সিগারেট ধরালেন। তারপর ঠাণ্ডা গলায় বললেন—আমরা কাঠুরে হলে সেটা করতাম। কিন্তু আমরা কাঠুরে নই, আমরা সৈনিক। আমরা গুলি করে মারব। ঠিক না?

: জ্বি স্যার।

: হিন্দুস্থান বেতারে এসব প্রচার চালাচ্ছে। এবং অনেকেই এসব শুনছে। ঠিক না? বল ঠিক বলছি কি না?

: জ্বি স্যার ঠিক।

: আচ্ছা এ গ্রামে ট্রেনজিস্টার আছে কার কার? তোমার আছে?

আজিজ মাস্টারের গলায় কফি আটকে গেল। তার আছে এবং সে স্বাধীন বাংলা বেতার শোনে।

AMARBOI.COM

ঃ কি, আছে ?

ঃ জ্বি স্যার।

ঃ কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই শোন না ?

ঃ মাঝে মাঝে শুনি স্যার।

ঃ শুনলেও নিশ্চয়ই বিশ্বাস কর না। ঠিক না ?

ঃ মাঝে মাঝে বিশ্বাস হয়।

ঃ আজিজ।

ঃ জ্বি স্যার।

ঃ তুমি একজন সৎলোক। অন্য কেউ হলে বলতো বিশ্বাস হয় না। আমার মনে হয় তুমি মিথ্যা একেবারেই বলতে পার না। আচ্ছা এখন বল, আর কার ট্রানজিস্টার আছে ?

ঃ নীলু সেনের আছে। জয়নাল মিয়ার আছে।

ঃ ওরা কেমন লোক ?

ঃ ভাল লোক স্যার। নির্বিরোধী মানুষ। এই গ্রামে খারাপ মানুষ কেউ নাই।

ঃ তাই নাকি ?

ঃ জ্বি স্যার।

ঃ আচ্ছা ঠিক আছে। তুমি যাও। ভয়ের কিছু নাই।

আজিজ মাস্টার উঠে দাঁড়াল। তার মনে হল, মেজর সাহেব একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক।

ঃ স্লামালিকুম স্যার।

ঃ ওয়ালাইকুম সালাম।

আজিজ মাস্টারের কেন যেন মনে হল এক্ষুণি তাকে আবার ডাকা হবে। সে এগোতে লাগল খুব সাবধানে। কিন্তু কেউ তাকে ডাকল না। প্রায় ত্রিশ গজের মত যাওয়ার পর সে ভয়ে ভয়ে একবার পেছনে তাকাল—মেজর সাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। তার সঙ্গের রোগা লোকটিও চিন্তিত মুখে তাকিয়ে আছে। আজিজ মাস্টারের বুক ধ্বক করে উঠল। কেন উঠল কে জানে। একবার পেছন ফিরে আবার মুখ ফিরিয়ে চলে যাওয়া যায় না। আজিজ মাস্টার দ্বিতীয়বার বলল—স্লামালিকুম।

মেজর সাহেব তখন তাকে হাত ইশারা করে ডাকলেন। নীল সার্ট পরা লোকটি বলল—এই যে মাস্টার সাহেব, এদিকে আসেন ভাই। স্যার ডাকেন। আজিজ মাস্টার ফিরে এল। মেজর সাহেব

AMARBOI.COM

হাসি মুখে বললেন—শুনলাম তুমি কবিতা লেখ। আজিজ মাস্টার বেকুবের মত তাকাল। সে কিছুই বুঝতে পারছে না।

ঃ এখানকার মসজিদের যে ইমাম সাহেব আছে, তার কাছে শুনলাম। তার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তুমি কি সত্যি কবিতা লেখ ?

ঃ জ্বি স্যার।

ঃ বেশ। একটা কবিতা শোনাও। কবিতা আমি পছন্দ করি। শোনাও একটা কবিতা।

আজিজ মাস্টার তাকাল নীল সার্ট পরা লোকটির দিকে। সে শুকনো গলায় বলল—স্যার শোনাতে বলছে শোনান। চেয়ারে বসেন, বসে শোনান। ভয়ের কিছু নাই।

আজিজ মাস্টার হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল। মেজর সাহেব বললেন---বল বল, সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না। লেটেস্ট কবিতাটি বল।

আজিজ মাস্টার যন্ত্রের মত চার লাইন বলে গেল---

আজি এ নিশিথে তোমারে পড়িছে মনে
হৃদয়ে যাতনা উঠিছে জাগিয়া প্রতি ক্ষণে,
তুমি সুন্দর চেয়ে থাকি তাই অন্য লোকের চোখে
ভালবাসা ছাড়া নাই কিছু আর মোর মরুময় বুকে।

নীল সার্ট সেটি অনুবাদ করে দিল। মেজর সাহেব বললেন---এটিই তোমার লেটেস্ট ?

ঃ জ্বি স্যার।

ঃ ভাল হয়েছে। বেশ ভাল। তা মেয়েটি কে ?

ঃ জ্বি স্যার ?

ঃ কবিতার মেয়েটি কে ? ওর নাম কি ?

ঃ মালা।

ঃ মেয়েটি এখানেই থাকে ?

আজিজ মাস্টার কপালের ঘাম মুছল। শুকনো গলায় বলল-- এইখানেই থাকে।

ঃ তোমার স্ত্রী নাকি ?

ঃ জ্বি না স্যার। আমি বিয়ে করিনি।

ঃ এই মেয়েটিকে বিয়ে করতে চাও ?

আজিজ মাস্টার ঢোক গিলল। বলে কি এই লোক !

ঃ কি হল ? চুপ করে আছ কেন ? নাকি মেয়ের বাবা তোমার

AMARBOI.COM

মত বুড়োর কাছে বিয়ে দিতে চায় না?

আজিজ মাস্টার খুক খুক করে কাশতে লাগল। নীল-সার্ট তীক্ষ্ম গলায় বলল, স্যারের কথার জবাব দেন। স্যার রেগে যাচ্ছেন।

মেজর সাহেব কৌতূহলী হয়ে তাকালেন। তাঁর চোখ দুটি খুশি খুশি।

ঃ বল, মেয়েটির বয়স কত?

ঃ বয়স কম।

ঃ কত?

ঃ তের চোদ্দ।

ঃ তের চোদ্দ বছরের মেয়েই তো ভাল। যত কম বয়স তত মজা।

আজিজ মাস্টার স্তম্ভিত হয়ে গেল। কি বলছে এসব!

ঃ মেয়েটির সঙ্গে তোমার যৌন সম্পর্ক আছে?

ঃ না।

ঃ মাথা নিচু করে আছ কেন? মাথা তোল।

আজিজ মাস্টার মাথা তুলল।

ঃ মেয়েটির বুক কেমন আমাকে বল। আমি শুনেছি বাঙালী মেয়েদের বুক খুব সুন্দর, কথাটা কি ঠিক?

ঃ আমি জানি না।

ঃ জান না! বল কি! তুমি এখনো কোন মেয়ের বুক দেখনি?

ঃ আমি বিয়ে করিনি।

ঃ তাতে কি?

আজিজ মাস্টারের কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। বমি বমি ভাব হল। মেজর সাহেব হঠাৎ সুর পাল্টে নরম স্বরে জিজ্ঞেস করলেন—মেয়েটি কার? আই মিন ওর বাবার নাম কি? আজিজ মাস্টার জবাব দিল না। মেজর সাহেব অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললেন—শুধু শুধু দেরী করছ, বলে ফেল। নীল-সার্ট বলল—কেন শুধু শুধু রাগাচ্ছেন? বলে দেন না।

ঃ জয়নাল মিয়ার মেয়ে। উনার বড় মেয়ে।

ঃ যার বাড়িতে ট্রানজিস্টার আছে?

আজিজ মাস্টার বেশ অবাক হল। এই লোকটির স্মৃতিশক্তি বেশ ভাল। মনে রেখেছে।

ঃ তুমি এখন আর আগের মত স্বতঃস্ফূর্তভাবে কথা বলছ না। প্রতিটি প্রশ্ন দু'বার করে করতে হচ্ছে। কারণ কি?

আজিজ মাস্টার জবাব দিল না।

ঃ তুমি কি আমার উপর রাগ করেছ? বল রাগ করেছ?

AMARBOI.COM

: না।

: এখন তুমি আর স্যার বলছ না। কেন? নিশ্চয়ই তুমি আমার উপর রাগ করেছ।

: জ্বি না স্যার।

মেজর সাহেব অনেকখানি ঝুঁকে এলেন আজিজ মাস্টারের দিকে। গলার স্বর নিচে নামিয়ে বললেন—শোন, ঐ মেয়েটির সঙ্গে আমি তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আজ রাতে সম্ভব হবে না। আজ রাতে আমরা ব্যস্ত। কাল ভোরে। কি, তুমি খুশি তো?

আজিজ মাস্টার তাকিয়ে রইল।

: কি, কথা বলছ না যে? বল, শুকরিয়া।

: শুকরিয়া।

: আমি কথার খেলাফ করি না। যা বলেছি তা করব। এখন তুমি আমার কয়েকটি প্রশ্নের জবাব দাও।

মেজর সাহেব সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিলেন। নিজে একটি ধরালেন। তাঁর চোখে এখন আর হাসি ঝিকমিক করছে না।

: তোমাদের এই জঙ্গলা-মাঠে কি আছে?

: কিছু নাই। জঙ্গল।

: আমরা জানি, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বেশ কিছু জোয়ান এবং কয়েকজন অফিসার এখানে লুকিয়ে আছে।

আজিজ মাস্টারের চোখ বড় বড় হয়ে গেল।

: ওরা আমাদের দু'জন অফিসারকেও নিয়ে গেছে। একজন হচ্ছে আমার বন্ধু মেজর বখতিয়ার। ফুটবল প্লেয়ার।

: আমি কিছুই জানি না স্যার।

: কিছুই জান না?

: জ্বি না স্যার।

: আমি যতদূর জানি, এ গ্রাম থেকেই তো ওদের খাবার যাচ্ছে।

: আমি স্যার কিছুই জানি না।

: আমি ভাবছিলাম জান।

: জানি না স্যার।

মেজর সাহেব চোখ বন্ধ করে সিগারেট টানতে লাগলেন। প্রচণ্ড প্রস্রাবের বেগ হয়েছে আজিজ মাস্টারের। সে ভয়ে ভয়ে বলল—স্যার আমি যাই?

AMARBOI.COM

মেজর সাহেব চোখ না খুলেই বললেন—সেটা কি ঠিক হবে? আমরা ওদের ধরতে এসেছি। এখন তোমাকে যেতে দিলে খবরটা ওদের কাছে পৌঁছে যেতে পারে। পারে না?

আজিজ মাস্টার ঢোক গিলল।

: তুমি ঐ ঘরে আজ রাতটা কাটাও। আমরা অপারেশন শুরু করব বিকেলের দিকে। আরেকটি বড় কোম্পানী আসবে আমাকে সাহায্য করতে। ওদের জন্যেই অপেক্ষা করছি।

আজিজ মাস্টারের হাঁপানির টান উঠে গেল। টেনে টেনে শ্বাস নিতে লাগল। মেজর সাহেব হালকা গলায় বললেন—তোমাকে অনেক গোপন খবর দিয়ে দিলাম। তবে অসুবিধা নেই, তুমি বন্ধু মানুষ। যাও, ঐ ঘরে চলে যাও।

: স্যার, আমি কিছুই জানি না।

: জান না, সেতো আগেই বলেছো। সবাই কি তার সব কিছু জানে? জানে না। যাও ঐ ঘরে গিয়ে বসে থাক।

রোদ থেকে এসেছে বলেই কি না কে জানে, এত পরিচিত ঘরও আজিজ মাস্টারের কাছে অচেনা মনে হতে লাগল। অথচ এটা টিচার্স রুম। আজিজ মাস্টার রোজ এখানে বসে।

: মাস্টার সাব।

: কে?

আজিজ মাস্টার অবাক হয়ে দেখল একটা চেয়ারে ইমাম সাহেব জড়সড় হয়ে বসে আছেন। ইমাম সাহেবের নাক মুখ ফুলে গেছে। নিচের ঠোঁটটি কেটে গেছে। তাঁর সাদা পাঞ্জাবীতে রক্তের ছোপ। কাটা ঠোঁট দিয়ে হলুদ রঙের রস বেরুচ্ছে। আজিজ মাস্টার দীর্ঘ সময় তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল এবং নিজের অজান্তেই এক সময় তার প্রস্রাব হয়ে গেল।

ইমাম সাহেব তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন, মেঝেতে প্রস্রাব গড়াচ্ছে। তাঁর কোন ভাবান্তর হল না।

দিনের বেলা মীর আলির কাজ হচ্ছে পরীবানুকে কোলে নিয়ে বারান্দায় বসে থাকা। পরীবানুর বয়স তিন। দাদাকে সে খুবই পছন্দ

AMARBOI.COM

করে। মীর আলিও জগতের অনেক জটিল বিষয় নিয়ে তার সঙ্গে কথা বলে। মীর আলির কথা বলার ভঙ্গি দেখে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, সে পরীবানুর মতামতকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়।

আজ ভোরবেলাও সে নাতনিকে কোলে নিয়ে মুড়ি খেতে বসেছিল। দাঁত না থাকায় মুড়ি চিবোতে পারে না। একগাল মুড়ি নিয়ে তাকে অনেকক্ষণ বসে থাকতে হয়। ঘরে আম আছে। একটা পাকা আমের রস মুড়ির বাটিতে ঢেলে দিলেই সমস্যার সমাধান হয়। অনুফা সেটা করবে না। বদি বাড়িতে না থাকলে সে তার শ্বশুরের খাওয়া-দাওয়ার দিকে তেমন নজর দেয় না।

আজ তার চা খেতে ইচ্ছে হচ্ছে। ঘরে চায়ের পাতা আছে, গুড় আছে। বদি এনে রেখেছে। তার বাবার জন্যেই এনেছ। সে নিজের কানে শুনেছে বদি বলছে—বাজানরে মাঝে মধ্যে দিও। বুড়া মানুষ। চা'য় কাশির আরাম হয়।

মীর আলি প্রতিদিন ভোরেই বেশ সাড়ম্বরে অনেকক্ষণ কাশে, যাতে অনুফার চায়ের কথাটা মনে পড়ে। বেশির ভাগ দিনই তার মনে পড়ে না। আজও হয়ত পড়বে না। তবু সে কাশতে লাগল। কাশতে কাশতেই পরীবানুকে বলল—চা হইল সর্দি কাশের বড় অষুধ। বুঝছস পরী?

পরী উত্তর দিল না।

ঃ বড় জামবাটির এক বাটি চা যদি সকালে খায় কেউ তা হইলে সর্দি কাশি, বাত সব যায়। চা খুব বড় অষুধ।

মীর আলির জন্য আজ দিনটি সম্ভবত খুব শুভ। কারণ অনুফা তাকে এক বাটি চা দিয়ে দিল। সেই চা'য়ে তেজপাতা দেয়ায় বেশ সুন্দর একটা গন্ধ। অভিভূত হয়ে পড়ল মীর আলি।

ঃ মিষ্টি হইছে কি না দেখেন।

ঃ হইছে গো বেটি হইছে। জবর বালা হইছে।

অনুফাকে দু'একটা সুন্দর সুন্দর কথা বলতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু কি বললে সে খুশী হয়, তা মীর আলির জানা নেই।

ঃ মুড়ি চায়ের মইধ্যে ভিজাইয়া চামুচ দিয়া খান। চামুচ দিতাছি।

মীর আলি অনুফার প্রতি বড় মমতা বোধ করল। সংসারের আয় উন্নতি যা হচ্ছে, এই মেয়েটির কারণেই হচ্ছে। ঘরে এখন চামচ আছে। নতুন সাইকেল আছে। গত বৎসর বদি তাকে লেপ বানিয়ে দিয়েছে। বলতে গেলে গত শীত কোন দিকে গিয়েছে বুঝতেই পারা যায়নি। অথচ বদিকে বিয়ে করানোর আগে কি হাল ছিল সংসারের। সব ভাগ্য।

AMARBOI.COM

একেকজনের একেকরকম ভাগ্য। অনুফা এ সংসারে ভাগ্য নিয়ে এসেছে। মীর আলি ভাবতে চেষ্টা করল, অনুফা এ বাড়িতে আসার পর তারা কি কখনো একবেলা না খেয়ে থেকেছে? না। নীলগঞ্জে এরকম ভাগ্য কয়জনের আছে? অথচ কত ঝামেলা বদির বিয়েতে। শেষ মুহূর্তে বিয়ে ভেঙে যাওয়ার অবস্থা। বদির মামা বলল—এই মেয়ের মা নাই। জামাইয়ের কোন আদর হইত না। কথা খুবই সত্য। কিন্তু বিয়ের কথা ঠিকঠাক হবার পর বিয়ে ভেঙে দেয়াটা ঠিক না। মনে খুঁতখুঁতানি নিয়ে সে ছেলে নিয়ে গেল। কি ঝড় বিয়ের রাতে। লণ্ডভণ্ড অবস্থা। দুপুর রাতে ছেলে বৌ নিয়ে বাড়ি ফিরে দেখল ঝরে গ্রামে কারোর কোন ক্ষতি হয়নি। শুধু তার ঘরটি পড়ে গেছে। কি অলক্ষণ।

: দাদা চা দেও।

: পুলাপান মাইনষের চা খাওন নাই।

: চা দেও দাদা।

মীর আলি হাঁক দিল—বৌ মা, আরেকটা বাটি দেও। এই সময় এক ঝাঁক গুলি হল। হালকা মেশিনগানের কানে তালা ধরানো ক্যাট ক্যাট শব্দ। পরীবানু আকাশ ফাটিয়ে কাঁদতে লাগল। মীর আলি উঠে দাঁড়াতে গিয়ে চায়ের বাটি উল্টে ফেলল পরীবানুর পায়ে।

AMARBOI.COM

নীলগঞ্জ গ্রামে ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেল। দ্বিতীয় একটা সৈন্যদল এসে ঢুকল। তারা ছন্দে মার্চ করে। গর্বিত ভঙ্গিতে। তাদের সঙ্গে আছে চল্লিশ জন রাজাকারের একটি দল। তালে তালে পা ফেলবার একটা প্রাণান্ত চেষ্টা করছে তারা। দলটি অনেক দূর থেকে আসছে। এদের চোখে মুখে ক্লান্তি। হয়তো সারারাত ধরেই হাঁটছে। কোথাও বিশ্রাম নেয়নি।

বদিউজ্জামান হন হন করে হাঁটছিল। হাঁটা না বলে একে দৌড়োনো বলাই ঠিক হবে। কয়েকদিন বৃষ্টি না হওয়ায় রাস্তাঘাট শুকনো। দ্রুত হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে না। তার একমাত্র চেষ্টা, কত তাড়াতাড়ি মধুবন বাজারে গিয়ে পৌঁছোনো যায়। মাঝামাঝি পথে সে মত বদলাল— ফিরে চলল নীলগঞ্জের দিকে। যা হবার হোক, এই সময় বাড়ি ছেড়ে বের হওয়া ঠিক নয়। জঙ্গলা মাঠের কাছাকাছি আসতেই সে দ্বিতীয় মিলিটারি দলটিকে দেখতে পেল। ওরা আসছে উত্তর দিক থেকে। বদিউজ্জামান ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল জঙ্গলা মাঠের দিকে। হুমড়ি খেয়ে পড়ল

নিচু একটা গর্তে। সেখানে এক কোমর পানি। তাকে কেউ সম্ভবত দেখতে পায়নি। বদিউজ্জামান এক কোমর পানিতে ঘণ্টাখানেক বসে রইল। মিলিটারিদের এই সময়ের মধ্যে চলে যাওয়ার কথা। কিন্তু এরা যাচ্ছে না কেন? কিছুক্ষণ পর খুব কাছেই ওদের কথাবার্তা শোনা যেতে লাগল। এর মানে কি?

বদিউজ্জামান মাথা উঁচু করে দেখতে চেষ্টা করল। চোখের ভুল কিনা কে জানে। তার মনে হল মিলিটারিরা জঙ্গলা-মাঠ ঘিরে বসে আছে। বদিউজ্জামান গলা পর্যন্ত পানিতে ডুবিয়ে একটা মোরতা ঝোপের আড়ালে মাথা ঢেকে রাখল। মাথার উপর ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ। কিন্তু পানি বেশ ঠাণ্ডা। বদিউজ্জামানের শীত শীত করতে লাগল। কতক্ষণ বসে থাকতে হবে? গা কুট কুট করছে। সবুজ রঙের একটা গিরগিটি চোখ বড় বড় করে তাকে দেখছে। বদিউজ্জামান হাত ইশারা করে তাকে সরে যেতে বলল। রোদ বাড়ছে। ক্রমেই বাড়ছে। পচা গন্ধ আসছে পানি থেকে। পাট পচানোর গন্ধের মত গন্ধ। গিরগিটিটা পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে। বদিউজ্জামান মৃদু স্বরে বলল, যা হোস। আর তখনি নীলগঞ্জের দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলির শব্দ আসতে লাগল। কি ব্যাপার?

AMARBOI.COM

জয়নাল মিয়া তার দলবল নিয়ে দীর্ঘ সময় ছাতিম গাছের নিচে অপেক্ষা করল—আজিজ মাস্টার ফিরে এল না। কতক্ষণ এভাবে বসে থাকা যায়? রাসমোহন কয়েকবার বাঁশ ঝোপের আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে দেখে এসেছে। আজিজ মাস্টার চেয়ারে বসে কথাবার্তা বলছে। কিন্তু কিছুক্ষণ আগে সে এসে বলল, আজিজ মাস্টারকে আর দেখা যাচ্ছে না। এর মানেটা কি? জয়নাল মিয়া বলল—বিষয়ডা কি রাসমোহন? রাসমোহন শুকনো মুখে বসে রইল।

: মাইরা ফেলছে না কি?

: মারলে গুলির শব্দ হইত। গুলি তো হয় নাই।

: তাও ঠিক।

জয়নাল মিয়া মতি মিয়ার কাছ থেকে একটা বিড়ি নিয়ে ধরাল। তার সিগারেট শেষ হয়ে গেছে। আর তখন মতি মিয়ার পাগল শালা নিজামকে আসতে দেখা গেল। তার মুখ হাসি হাসি। পাগলামীর অন্য কোন লক্ষণ নেই। মতি মিয়া ধমকে উঠল—কই গেছিলা?

নিজামের হাসি আকর্ণ বিস্তৃত হল। সে হাত নেড়ে নেড়ে বলল—ইস্কুলঘরের পিছনের দিক দিয়া আইতেছিলাম, একটা মজার জিনিস দেখলাম দুলাভাই।

ঃ কি দেখলা?

ঃ দেখলাম দুইটা মিলিটারি হাগতে বসছে। লজ্জা-শরম নাই। হাগে আর কথা কয়। আবার হাগে, আবার কথা কয়।

নিজাম হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ল। ঠিক তখন গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে মিলিটারি ও রাজাকারের দ্বিতীয় দলটি গ্রামে উঠে এল। জয়নাল মিয়া উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ল দক্ষিণ দিকে। বাকিরাও তাকে অনুসরণ করল। নিজাম শুধু মুখটি হাসি হাসি করে দাঁড়িয়ে রইল। সমস্ত ব্যাপারটিতে সে বড় মজা পাচ্ছে।

AMARBOI.COM

ইমাম সাহেব এক সময় বললেন—দোয়া ইউনুসটা দমে দমে পড়েন মাস্টার সাব। আজিজ মাস্টার তাকাল তার দিকে। তাকানোর ভঙ্গিতে মনে হয় সে কিছুই বুঝতে পারছে না। গত তিন ঘন্টা যাবৎ এই দুটি মানুষ একসঙ্গে আছে। এই তিন ঘন্টায় তাদের মধ্যে কথাবার্তা বিশেষ কিছু হয়নি। আজিজ মাস্টার তার পায়জামা ভিজিয়ে ফেলার পর থেকেই কেমন অন্যরকম হয়ে গেছে। কোন কিছুতে মন দিতে পারছে না।

ঃ হযরত ইউনুস আলায়হেস-সালাম মাছের পেটে এই দোয়া পড়তেন। এর মরতবাই অন্য। দোয়াটা জানেন?

আজিজ মাস্টার মাথা নাড়ল। সে জানে। কিন্তু ইমাম সাহেবের মনে হল সে কিছু পড়ছে টড়ছে না। বসে আছে নির্বোধের মত।

ঃ মাস্টার সাব।

ঃ জ্বি।

ঃ আমাদের সামনে খুব বড় বিপদ।

ঃ কেন?

ঃ বুঝতে পারতেছেন না?

ঃ না।

ঃ এরা কি জন্যে আসছে সেটা বলেছে?

ঃ হুঁ।

ঃ তবু বুঝতে পারছেন না?

ঃ না।

ইমাম সাহেব চুপ করে গেলেন। আজিজ মাস্টার খোলা দরজা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। এখান থেকে সৈন্যদলের একটা অংশ দেখা যায়। কয়েকজনকে দেখা যাচ্ছে কাগজের একটা বল বানিয়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছে এবং ক্রমাগত হাসছে। কাগজের একটা বল ছুঁড়ে মারার মধ্যে এত আনন্দের কি আছে কে জানে?

স্কুলঘরটি টিনের। রোদে টিন তেতে উঠেছে। ঘরের ভেতর অসহ্য গরম। আজিজ মাস্টারের পানির তৃষ্ণা পেয়ে গেল। শুধু তৃষ্ণা নয়, ক্ষুধাও বোধ হচ্ছে। বেলা অনেক হয়েছে। ক্ষুধা হওয়ারই কথা। অন্য সময় এত দেরী হলে মালা খোঁজ নিত—মামা ভাত বাড়ছে। আসেন। বলেই সে চলে যেত না। দরজা ধরে এঁকে বেঁকে দাঁড়াতো। যেন সঙ্গে করে নিয়ে যাবে।

গতবার ময়মনসিংহ থেকে মালার জন্যে একটা আয়না কিনেছিল আজিজ মাস্টার। খুব বাহারী জিনিস। দুটো আয়না পাশাপাশি। একটি সাধারণ আয়না, অন্যটি একটু অন্যরকম। সেটায় মুখ অনেক বড় দেখা যায়।

আয়নাটা দেয়া ঠিক হবে কি না, তা নিয়ে আজিজ মাস্টার প্রায় এক সপ্তাহ ভাবল। কেউ কিছু মনে করে বসতে পারে। তাহলে খুব লজ্জার ব্যাপার হবে।

কেউ কিছু মনে করল না। মালা অভিভূত হয়ে পড়ল। একটা আয়নায় মুখ বড় দেখায় কেন এই প্রশ্ন বেশ কয়েকবার করা হল। এমন কি মালার মা একদিন পর্দার আড়াল থেকে জিজ্ঞেস করে ফেলল—মুখ বড় দেখালে কি লাভ? আজিজ মাস্টার লাজুক স্বরে বলেছিল—সাজ-গোজের সুবিধা হয় ভাবী।

ঃ কি সুবিধা?

কি সুবিধা সেটি আর ব্যাখ্য করতে পারেনি। কারণ, এটা আজিজ মাস্টারেরও জানা ছিল না।

ইমাম সাহেব নড়ে চড়ে বসলেন।

ঃ মাস্টার সাব।

ঃ বলেন।

ঃ জোহর নামাজের ওয়াক্ত হইছে না?

AMARBOI.COM

ঃ জানি না।

ঃ নামাজটা পড়া দরকার। বের হয়ে ওদের কাছে পানি চাব? ওজু নাই আমার।

ঃ দেখেন আপনি চিন্তা করে।

ঃ আপনিতো আর নামাজ পড়তে পারবেন না, শরীর নাপাক। গোসল লাগবে। পেশাব করে দিয়েছেন তো।

আজিজ মাস্টার জবাব দিল না। ইজিচেয়ারটিতে চোখ বন্ধ করে হেলান দিয়ে পড়ে রইল। ইজি চেয়ারটি নীলু সেনের। শুয়ে থাকতে বড় আরাম।

ঃ মাস্টার সাব ঃ পানি চাইব নাকি বলেন?

ঃ আপনার ইচ্ছা হলে চান।

ঃ এর মধ্যেতো দোষের কিছু নেই। এরাও মুসলমান।

ঃ হুঁ।

ঃ নামাজের পানি চাইলে এরা খুশিই হবে। পাক্কা মুসলমানদের এরা খুব পেয়ার করে। এরাওতো সাচ্চা মুসলমান।

ঃ যান না। গিয়ে চান।

ঃ ভয় লাগে।

ঃ ভয়ের কি আছে?

ইমাম সাহেব নড়েন না। জড়সড় হয়ে চেয়ারেই বসে থাকেন। চোখ বন্ধ করে ইজিচেয়ারে শুয়ে থাকতে থাকতে আজিজ মাস্টারের ঝিমুনি আসে। ঝিমুতে ঝিমুতে এক সময় ঘুমিয়েও পড়ে। এর মধ্যেই ছাড়া-ছাড়া বেশ কয়েকটি স্বপ্ন দেখে। ঘুমের মধ্যেই বুঝতে পারে—এগুলো স্বপ্ন। তবু তার ভালই লাগে।

ইমাম সাহেব বিরক্ত মুখে তাকিয়ে থাকেন তার দিকে। এ কেমন মানুষ—ঘুমিয়ে পড়েছে। তিনি মৃদু স্বরে ডাকেন—এই যে মাস্টার সাব। এই। আজিজ মাস্টার নড়ে চড়ে—কিন্তু তার ঘুম ভাঙে না।

নীলু সেন গত রাতে এক পলকের জন্যেও ঘুমতে পারেনি। দোতলার যে ঘরটিতে তার বিছানা, সে ঘরের বারান্দায় গড়াগড়ি করেছে। নীলু সেনের বোনপো বলাই চোখ বড় বড় করে মামার অবস্থা দেখেছে। রাত দুটোর দিকে বলাই ঠিক করল, মামার জন্যে ডাক্তার আনতে সরাইল বাজারে যাবে। পথঘাট এখন শুকনো। বদিউজ্জামানের সাইকেল নিয়ে

AMARBOI.COM

যাওয়া যাবে। নীলু সেন হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—এতক্ষণ বাঁচব নারে বলাই, এতক্ষণ বাঁচব না। বলাইয়েরও তাই ধারণা হল। এত কষ্ট সহ্য করে কেউ দীর্ঘ সময় বেঁচে থাকতে পারে না। থাকা উচিতও নয়।

ঃ ব্যাথাটা কোনখানে ?

ঃ তলপেটে।

বলাই দ্বিতীয় প্রশ্নের সময় পেল না। নীলু সেনের মুখ দিয়ে গাঁজলা বেরুতে লাগল। সময় শেষ হয়েছে বোধ হয়। এত বড় বাড়িতে দুটি মাত্র প্রাণী। বলাইয়ের ভয় করতে লাগল। কি সর্বনাশ ! এ কি বিপদ !

ঃ মামা, গ্রামের দুই একজন মানুষরে ডাক দিয়া আনি ?

ঃ তুই নড়িস না। আমার সময় শেষ।

বলাই মামার হাত ধরে বসে রইল। তার কাছে মনে হল, মামার গা হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। বলাই ঘামতে লাগল।

কিন্তু শেষরাতে হঠাৎ ব্যথা কমে গেল। নীলু সেন শান্ত স্বরে বলল—ব্যথা নাই। বলাই, ঠাণ্ডা পানি দে এক গ্লাস।

বলাই পানি এনে দেখে মামা মেঝেতেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

নিশ্চিন্ত আরামের ঘুম। বড় মায়া লাগে দেখে।

গ্রামে মিলিটারি আসার এতবড় একটা খবরেও বলাই তার ঘুম ভাঙাল না। আহা বেচারা ঘুমাক।

নীলু সেনের ঘুম ভাঙাল মিলিটারিরা। ডাকাডাকি হৈ চৈ শুনে নীলু সেন দোতলার জানালা দিয়ে মুখ বের করল। কি ব্যাপার ? নীল সার্ট পরা একটি লোক বলল, আপনার নাম কি নীলু ? নীলু সেন ?

ঃ জে আজ্ঞে।

ঃ আপনার বাড়িতে আর কে আছে ?

ঃ বলাই। আমার বোনপো বলাই। আপনারা কে ?

ঃ বলাইকে নিয়ে নিচে নেমে আসেন।

নীলু সেন বলাইকে কোথাও খুঁজে পেল না। গায়ে একটা পাতলা সুজনী চড়িয়ে নিচে নেমে এল। ভারী দরজা খুলতে সময় লাগল। বাইরে থেকে অসহিষ্ণু কন্ঠে কে যেন বলল—এত সময় লাগছে কেন ?

নীলু সেন কিছুই বুঝতে পারছে না। তার ঘুমের ঘোরও বোধ হয় ভাল মত কাটেনি। সে দরজা খুলে বিনীত ভঙ্গিতে বলল—আদাব।

তার কথা শেষ হবার আগেই চার পাঁচটি গুলির শব্দ হল। নীলু সেন কাত হয়ে পড়ে গেল দরজার পাশে। কোন চিৎকার না—নিঃশব্দ

AMARBOI.COM

মৃত্যু। নীল সার্ট পরা লোকটি ডাকল—বলাই। বলাই।

বদিউজ্জামান মাথা নীচু করে কয়েক ঢোক পানি খেল। তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে। তার মনে হল পায়ে আর কোন বোধশক্তি নেই। মাথা কেমন যেন করছে। গিরগিটিটি তাকিয়ে আছে তার দিকে। এর চোখ দুটি মানুষের মত মনে হয় হাসছে। বুড়ো মানুষের মত মাথা ঝুঁকিয়ে ঝুঁকিয়ে হাসা। সে হাত ইশারা করে গিরগিটিটাকে বিদেয় করতে চাইল। কিন্তু সে যাচ্ছে না। তাকিয়ে আছে।

আচ্ছা, মিলিটারিদের সম্পর্কে যে সব গল্প শোনা যায়, সেগুলো কি সত্যি? শুধু শুধু এরা মানুষ মারবে কেন? এরা নাকি নতুন কোন জায়গায় গেলেই প্রথম ধাক্কায় চল্লিশ পঞ্চাশ জন মানুষ মেরে ফেলে ভয় দেখাবার জন্যে। এটা একটা কথা হল? সব গুজব। এরাওতো আল্লাহ্‌র বান্দা। মিলিটারি মানুষ, রক্ত একটু গরম—এই আর কি। এটাতো দোষের কিছু নয়। পোশাকটাই এরকম, গায়ে দিলে রক্ত গরম হয়ে যায়।

বদিউজ্জামান খুক খুক করে দু'বার কাশল। নিজের কাশির শব্দে নিজেই চমকে উঠল। কেমন [illegible] মত কাণ্ড করছে। নির্জন জায়গা। অল্প শব্দ হলেই অনেক দূর থেকে শোনা যায়। আবার কাশি আসছে। বদিউজ্জামান কাশি সামলাবার চেষ্টা করতে গিয়ে ঘড়ঘড় একটা শব্দ বের করল। গিরগিটিটা ভয় পেয়ে চলে যাচ্ছে। না, যাচ্ছে না, আবার দাঁড়িয়ে পড়েছে। পানি খেতে এসেছে বোধ হয়। তাকে দেখে পানি খাবার সাহস হচ্ছে না, আবার তৃষ্ণা নিয়ে চলেও যেতে পারছে না।

বদির আবার তৃষ্ণা বোধ হল। সে মাথা নীচু করে কয়েক ঢোক পানি খেল।

AMARBOI.COM

নীল সার্ট পরা লোকটি বলল—আপনারা দু'জন আসেন আমার সঙ্গে। আজিজ মাস্টার তাকাল ইমাম সাহেবের দিকে। ইমাম সাহেব ভীত স্বরে বললেন—কোথায়? নীল সার্ট পরা লোকটির মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর। তাকে কোন প্রশ্ন দ্বিতীয়বার করার সাহস হয় না। তবু ইমাম সাহেব দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করলেন, কোথায়?

ঃ বিলের কাছে।

ঃ কেন ?

ঃ মেজর সাহেব নিয়ে যেতে বলেছেন।

ঃ কি জন্যে ?

ঃ এত কিছু জিজ্ঞেস করবার দরকার নেই। আপনারা উঠেন। মেজর সাহেব অপেক্ষা করছেন।

ঃ বড় ভয় লাগতেছে ভাই।

ঃ ভয়ের কিছু নাই—আসেন।

ঃ আজিজ মাস্টার একটি কথাও বললো না। নিঃশব্দে বেরিয়ে এল। সবার শেষে বেরুলেন ইমাম সাহেব। তিনি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিলেন।

স্কুলঘরের বারান্দায় কেউ নেই। ধু ধু করছে চারদিক। বসে থাকা সেপাইরা কখন গিয়েছে, কোথায় গিয়েছে কে জানে। ঘরের ভেতরে বসে কিছুই বোঝা যায়নি। হয়তো কোন পাহারা টাহারা ছিল না। ইচ্ছে করলেই পালিয়ে যাওয়া যেত। ইমাম সাহেব অবাক হয়ে বললেন, এরা সব কোথায় গেল ?

নীল সার্ট পরা লোকটি বলল— বেশি কথা বলবেন না। আপনারা মৌলভী মুসুল্লিরা বেশী কথা বলেন আর ঝামেলার সৃষ্টি করেন। কম কথা বলবেন।

ঃ জ্বি আচ্ছা।

ইউনিয়ন বোর্ডের সড়ক ধরল তারা এগুল নিঃশব্দে। জুম্মাঘরের পাশে আট ন'জন সেপাইয়ের একটি দল দাঁড়িয়ে আছে। তারা তাকিয়ে আছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। ইমাম সাহেবের ঘন ঘন নিশ্বাস পড়তে লাগল। তিনি নীল সার্ট পরা লোকটির দিকে তাকিয়ে নরম গলায় বললেন—

ঃ ভাই আপনার নাম কি ?

ঃ রফিক।

ঃ রফিক সাহেব, আমার জোহরের নামাজ কাজা হয়ে গেছে। পানির অভাবে অজু করতে পারি নাই।

রফিক তার কোন জবাব দিল না। আগে আগে হাঁটতে লাগল। কোথাও কোন মানুষ জন নেই। গ্রামের সবাই কি ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে আছে নাকি ? ইমাম সাহেব বললেন—ভাই, আপনার দেশ কোথায় ? বাড়ি কোন জিলায় ?

ঃ বাড়ি দিয়ে কি করবেন ?

ঃ না এম্নি জিজ্ঞেস করলাম। আমার দেশ কুমিল্লা। নবিনগর।

ঃ ভাল।

AMARBOI.COM

ঃ সামনের মাসে ইনশাল্লাহ দেশে যাবো। বহুত দিন যাই না।

রফিক কিছুই বলল না। সে হাঁটছে মাথা নীচু করে। এমনভাবে হাঁটছে, যেন পথ-ঘাট খুব ভাল চেনা। কিন্তু এ লোকটি এই গ্রামে আগে কখনো আসেনি। আজিজ মাস্টার বলল—মেজর সাহেব কেন ডেকেছেন আপনি জানেন?

ঃ জানি।

ঃ জানলে আমাদের বলেন।

রফিক নিস্পৃহ স্বরে বলল—একটি অপরাধীর বিচার হবে। ওর নাম মনা। সে খুন করেছে। সেই খুন নিয়ে কোন থানা পুলিশ হয়নি। এক বুড়ি নালিশ করেছে মেজর সাহেবের কাছে। ঐ বুড়ির নাম চিত্রা বুড়ি।

ইমাম সাহেব বললেন—চিত্রা বুড়ি? খুব বজ্জাত। মসজিদের একটা বদনা চুরি করেছে।

ঃ বদনা চুরি করুক আর না করুক মেজর সাহেব তার কথা শুনে খুব রাগ করেছেন। মনাকে ধরা হয়েছে। ঠিক শাস্তি হবে।

আজিজ মাস্টার ক্ষীণ স্বরে বলল—কি শাস্তি?

ঃ মিলিটারিদের তো আর জেল হাজত নাই যে জেলে ঢুকিয়ে দেবে। ওদের শাস্তি একটাই। ছোট অপরাধের জন্যে যে শাস্তি, বড় অপরাধের জন্যেও সেই শাস্তি।

ঃ কি সেটা?

ঃ বুঝতেইতো পারছেন, আবার জিজ্ঞেস করছেন কেন?

ইমাম সাহেব শুকনো গলায় বললেন—আমরা গিয়ে কি করব?

ঃ আপনারা শাস্তি দেখবেন।

ঃ শাস্তি দেখব?

ঃ হ্যাঁ। এর দরকার আছে।

ঃ কি দরকার?

ঃ মেজর সাহেবের ধারণা এটা দেখার পর আপনারা তাঁর কথা শুনবেন। কোন কিছু জিজ্ঞেস করলে সোজাসুজি জবাব দেবেন।

ঃ ও।

ঃ শুনেন ইমাম সাহেব, আপনি কথা বেশি বলেন। কথা বেশি বলে একবার মার খেয়েছেন। কথা খুব কম বলবেন।

ঃ জ্বি আচ্ছা।

ঃ নিজের থেকে কোন কথা বলবেন না। এখন সময় খারাপ।

AMARBOI.COM

ঃ জ্বি তা ঠিক।

ইমাম সাহেব চুপ করে গেলেন।

মীর আলি বাড়ির উঠনে বসে ছিল। আজ বাড়িতে রান্না হয়নি। খিদের যন্ত্রণায় সে অস্থির হয়ে পড়ল। এই বয়সে খিদে সহ্য হয় না। অনুফাকে কয়েকবার ভাতের কথা বলাও হয়েছে। কিন্তু অনুফা কিছুই করছে না। সে ভয়ে অস্থির হয়ে আছে। ভাত রাঁধায় তার মন নেই। ভয় মীর আলিরও লাগছে। কিন্তু খিদের কষ্ট বড় কষ্ট।

আজিজ মাস্টাররা তার বাড়ির সামনে দিয়ে যাবার সময় সে এক থালা মুড়ি নিয়ে বসেছিল। এই বয়সে মুড়ি চিবোতে কষ্ট হয়, তবু চিবোতে হয়। যা ভাব-সাব, তাতে মনে হচ্ছে আজ আর রান্না হবে না। পায়ের শব্দে মীর আলি চমকে উঠে বলল—কেডা যায়?

ঃ আমি আজিজ। আজিজ মাস্টার।

ঃ তোমার সঙ্গে কেডা যায়?

আজিজ মাস্টার জবাব দিল না।

ঃ কথা কওনা যে, ও মাস্টর। মাস্টর।

রফিক বলল—দাঁড়াবেন না, দেরী হয়ে যাচ্ছে

ঃ ও মাস্টর, কে কথা কয়?

রফিক শীতল স্বরে বলল—আমার নাম রফিক। চাচা মিয়া আপনি ঘরের ভেতরে গিয়ে বসেন।

ঃ মাস্টর, এই লোকটা কে? মিলিটারি?

ঃ না। আমি মিলিটারি না।

ঃ আপনার বাড়ি কোন গ্রাম?

রফিক তার জাবব দিল না। হাঁটতে শুরু করল। ইমাম সাহেব তাল মিলিয়ে হাঁটতে পারছেন না। ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ছেন। তার জন্যে দু'জনকেই মাঝে মাঝে দাঁড়াতে হচ্ছে। রফিক বলল, হাঁটতে কষ্ট হলে আমার হাত ধরে হাঁটেন।

ঃ জ্বি না। কোন কষ্ট নাই।

ঃ লজ্জার কিছু নাই। আমার হাত ধরে হাঁটেন।

ঃ শুকরিয়া। ভাই আপনার বয়স কত?

ঃ আমার বয়স দিয়ে কি করবেন?

ঃ এম্নি জিজ্ঞেস করলাম।

: আপনাকে তো বলেছি বিনা প্রয়োজনে কথা বলবেন না।

: জ্বি আচ্ছা।

: আমার বয়স তিরিশ।

রফিককে দেখে বয়স আরো বেশি মনে হয়। রোগা এবং লম্বা, ছোট ছোট চোখ। কথা বললে চোখ আরো ছোট হয়ে যায়। মনে হয় লোকটি যেন চোখ বন্ধ করে কথা বলছে।

ইমাম সাহেব দোয়া ইউনুস পড়তে লাগলেন। লাই লাহা ইল্লা আনতা সোভাহানাকা ইন্নি কুনতু মিনাজজুয়ালেমিন।

মনা কৈবর্ত তার এগারো বছরের ভাইকে নিয়ে তেঁতুল গাছের নিচে চুপচাপ বসে আছে। মনার শরীর বিশাল—প্রায় দৈত্যের মত। তার ভাইটি অসম্ভব রোগা। সে মনার লুঙ্গির এক প্রান্ত শক্ত করে ধরে আছে। তাকাচ্ছে সবার মুখের দিকে। বার বার কেঁপে কেঁপে উঠছে। মনাকে খুব একটা বিচলিত মনে হচ্ছে না।

মেজর সাহেব প্রায় দশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছেন। তাঁর সঙ্গে একজন ননকমিশন্ড অফিসার। এরা দু'জন নীচু গলায় নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। মেজর সাহেব সম্ভবত কোন রসিকতা করলেন। দু'জনেই উঁচু গলায় হাসতে শুরু করল। মনার ভাইটি চোখ বড় বড় করে তাকাল তাদের দিকে। বিলের পারের উঁচু জায়গায় একদল রাজাকার দাঁড়িয়ে। খুব কাছেই মিলিটারি আছে বলেই হয়তো তারা বুক ফুলিয়ে আছে। অহংকারী গর্বিত ভঙ্গি। এদের মধ্যে শুধু দু'জনের পায়ে স্পঞ্জের স্যাণ্ডেল। বাকি কারোর পায়ে কিছু নেই। এরা নিজেদের মধ্যে গুনগুন করে কথা বলছে। তবে এদের মুখ শুকনো, ভয় পাওয়া চোখ।

AMARBOI.COM

মেজর সাহেব এগিয়ে এলেন মনার দিকে। মনার ছোট ভাইটি শক্ত হয়ে গেল। মনার সঙ্গে মেজর সাহেবের নিম্নলিখিত কথাবার্তা হল। কথাবার্তা হল রফিকের মাধ্যমে। আজিজ মাস্টার ও ইমাম সাহেবকে সরিয়ে দেয়া হল। তারা বসে রইল বিলের পাড়ে। প্রশ্নোত্তর শুরু হল।

: তুমি একটি খুন করেছ?

মনা জবাব দিল না। মাটির দিকে তাকিয়ে রইল।

: চুপ করে থাকবে না। স্পষ্ট জবাব দাও। বল হাঁ কিংবা না।

: হ্যাঁ।

ঃ গুড। স্পষ্ট জবাব আমি পছন্দ করি। এখন বল কেন করেছ? বিনা কারণে তো কেউ মানুষ মারে না।

ঃ সে আমার পরিবারের সঙ্গে খারাপ কাম করছে।

ঃ তাই নাকি?

ঃ জ্বে আজ্ঞে।

ঃ উত্তেজিত হবার মতই একটি ব্যাপার। তোমার স্ত্রীকে কি শাস্তি দিয়েছ?

মনা মাটির দিকে তাকিয়ে রইল। জবাব দিল না। প্রশ্নের ধারা সে বুঝতে পারছে না।

ঃ বল বল। কুইক। সময় বেশি নেই আমার হাতে।

মনা ঘামতে শুরু করেছে।

ঃ আমার মনে হচ্ছে, তুমি কোন শাস্তি দাওনি।

ঃ জ্বি না।

ঃ সে নিশ্চয়ই খুব রূপবতী?

মনা চোখ তুলে তাকাল। কিছুই বলল না।

ঃ বল। চট করে বল। সে কি রূপবতী?

ঃ জ্বি।

ঃ তাহলে অবশ্যি শাস্তি না দিয়ে ভালই করেছ। একটি সুন্দরী নারীকে শাস্তি দেয়ার পেছনে কোন যুক্তি নেই। তোমার স্ত্রীর নাম কি?

মনার চোখে ভয়ের ছায়া পড়ল। মেজর সাহেবের কথাবার্তা কেমন যেন অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে।

ঃ বল তোমার স্ত্রীর নাম বল।

মনা কিছুই বলল না। রফিক বলল—গ্রামের মানুষেরা অপরিচিত মানুষের কাছে স্ত্রীর নাম বলে না।

ঃ কেন বলে না?

ঃ আমি জানি না স্যার।

ঃ তুমিতো অনেক কিছুই জান, এটা জান না?

ঃ আমি অনেক জিনিস জানি না।

মেজর সাহেব মনার দিকে আরো কয়েক পা এগুলেন। আঙুল দিয়ে ইশারা করে বললেন—এই ছেলেটি কি হয় তোমার?

ঃ এ আমার ছোট ভাই।

ঃ ওর নাম কি?

AMARBOI.COM

ঃ বিরু।

মেজর সাহেব তাকালেন বিরুর দিকে। বিরু কুঁকড়ে গেল। মেজর সাহেব শান্ত স্বরে বললেন—বিরু, তুমি লুঙ্গি ধরে টানাটানি করছ কেন? লুঙ্গি ছেড়ে দাও। বিরু লুঙ্গি ছেড়ে দিল না। আরো ঘেঁষে গেল ভাইয়ের দিকে। তার চোখে মুখে ভয়ের ছায়া পড়েছে। শিশুরা অনেক কিছু আগেই বুঝতে পারে। সেও হয়তো পারছে।

ঃ মনা।

ঃ জ্বি?

ঃ তুমি বড় একটা অন্যায় করেছ। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার শাস্তি হবে। তোমার কি বলার আছে?

মনা তাকিয়ে রইল। তার চোখে পলক পড়ছে না। মেজর সাহেব সিগারেট ধরালেন। অস্থির ভঙ্গিতে দৃঢ় স্বরে বললেন—এই দু'জনকে পানিতে দাঁড় করিয়ে দাও। রফিক ইংরেজিতে বললো—এই বাচ্চাটিকেও?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ স্যার, এর কি কোনো প্রয়োজন আছে?

ঃ প্রয়োজন আছে। এর প্রয়োজন আছে। আমি নিষ্ঠুরতার একটা নমুনা দেখাতে চাই।

ঃ স্যার, তার কোনো প্রয়োজন নাই।

ঃ প্রয়োজন আছে। আজ এই ঘটনাটি ঘটবার পর মিলিটারির নাম শুনলে ওরা কাপড় নষ্ট করে দেবে। গর্ভবতী মেয়েদের গর্ভপাত হয়ে যাবে।

ঃ তাতে কি লাভ স্যার?

ঃ লাভ লোকসান আমার দেখার কথা, তোমার না। আমার সঙ্গে তর্ক করবে না।

রফিক চুপ করে গেল। মেজর সাহেব তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন—এসব কথা পরবর্তী সময়ে কেউ মনে রাখবে না। অত্যাচারী রাজারা ইতিহাসে বীরশ্রেষ্ঠ হিসেবে সম্মানিত হন। আলেকজাণ্ডারের নৃশংসতার কথা কি কেউ জানে? সবাই জানে—আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট।

রফিক কিছুই বলল না। মেজর সাহেব সহজ সুরে বললেন—যা করতে বলা হয়েছে কর। আর শোন, ঐ ইমাম এবং ঐ মাস্টার—ওদের দু'জনকে খুব কাছাকাছি কোথাও বসিয়ে দাও। আমি চাই, যাতে ওরা খুব ভালভাবে দৃশ্যটা দেখে।

AMARBOI.COM

: ঠিক আছে স্যার।

: বাই দা ওয়ে, আমি দেখলাম ঐ ইমাম তোমার হাত ধরে ধরে আসছে। কী ব্যাপার ?

: হাঁটতে পারছিল না।

: ঠিকই পারবে। দৃশ্যটি তাদের দেখতে দাও, তারপর ওদের হাঁটতে বললে হাঁটবে, দৌড়াতে বললে দৌড়াবে। লাফাতে বললে লাফাবে। ঠিক নয় কি ?

: হয়ত ঠিক।

: হয়ত বলছ কেন ? তোমার মনে সন্দেহ আছে ?

: জি না স্যার।

: গুড। সন্দেহ থাকা উচিত নয়। রফিক ?

: জি স্যার ?

: তোমাকে সঙ্গে নিয়ে বেরুব। গ্রামটি ভালমত ঘুরে দেখতে চাই।

: ঠিক আছে স্যার।

: মনে হয় দেখার মত ইন্টারেস্টিং অনেক কিছুই আছে এ গ্রামে।

: কিছুই নেই স্যার। এটা একটা দরিদ্র গ্রাম।

রাজাকাররা মনা আর তার ভাইটিকে ঠেলে পানিতে নামিয়ে দিল। বিরু তার ভাইয়ের কোমর জড়িয়ে ধরে আছে। সে কাঁপছে থর থর করে। মনা এক হাতে তার ভাইকে ধরে আছে।

রাইফেল তাক করা মাত্র বিরু চিৎকার করতে লাগল—দাদা বড় ভয় লাগে। ও দাদা ভয় লাগে। মনা মৃদু স্বরে বলল, ভয় নাই। আমারে শক্ত কইরা ধর। বিরু প্রাণপণ শক্তিতে ভাইকে আঁকড়ে ধরল।

ইমাম সাহেব গুলি হবার সময়টাতে চোখ বন্ধ করে ফেললেন। এবং তার পর পরই মুখ ভর্তি করে বমি করলেন। আজিজ মাস্টার সমস্ত ব্যাপারটি চোখের সামনে ঘটতে দেখল। এক পলকের জন্যেও দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল না।

আলো মরে আসছে।

আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছে। মেজর সাহেব আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন—কি রফিক, বৃষ্টি হবে ?

ঃ হতে পারে। এটা ঝড় বৃষ্টির সময়।

ঃ তোমার দেশের এই ঝড় বৃষ্টিটা ভালই লাগে।

রফিক মৃদু স্বরে বলল—তোমার দেশ বললেন কেন? মেজর সাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। কিছু একটা বলতে গিয়েও বললেন না।

কোথাও কোন শব্দ নেই। যেন গ্রামে কোনো জনমানুষই নেই। মেজর সাহেব হাল্কা গলায় বললেন, মানুষকে ভয় পাইয়ে দেবার একটা আলাদা আনন্দ আছে। আছে না?

রফিক জবাব দিল না। মেজর সাহেব বললেন, মানুষের ইনসটিংক্টের মধ্যে এটা আছে। অন্যকে পায়ের নিচে রাখার আকাঙ্ক্ষা। তোমার নেই?

ঃ না।

ঃ আছে, তোমারও আছে। সবারই আছে। থাকতেই হবে।

রফিক কিছুই বলল না। তারা হাঁটছে পাশাপাশি। মেজর সাহেব কথা বলছেন বন্ধুর মত। তাঁর কথার ধরন দেখে মনে হয় রফিককে তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব দেন।

বদিউজ্জামানের বাড়ির সামনে দিয়ে যাবার সময় মীর আলি তীক্ষ্ম কণ্ঠে বলল—কেডা যায়। কেডা যায়, জয়নাল মিয়া?

মেজর সাহেব থমকে দাঁড়ালেন। রফিক বলল—লোকটা স্যার অন্ধ। মেজর সাহেবকে মনে হল এই খবরে বেশ উৎসাহিত বোধ করছেন।

ঃ কে লোকটি, কথা কয় না। কেডা গো?

ঃ আমি রফিক।

ঃ রফিকটা কেডা? কোন বাড়ির?

ঃ ঘরের ভেতর গিয়ে বসেন চাচা।

মেজর সাহেব ঠাণ্ডা গলায় বললেন—তুমি ওকে কি বললে? রফিক ইংরেজীতে বলল—আমি তাঁকে ঘরে যেতে বললাম।

ঃ কেন?

ঃ এমনি বললাম।

মীর আলি ভয় পাওয়া গলায় চেঁচাল—এরা কে? এরা কে? মেজর সাহেব বললেন—তুমি ওকে বল আমি মেজর এজাজ আহমেদ, কমাণ্ডিং অফিসার ফিফটি এইট্‌থ ইনফেন্ট্রি ব্যাটালিয়ান।

ঃ স্যার বাদ দেন। বুড়ো মানুষ।

ঃ তোমাকে বলতে বলেছি তুমি বল। যাও, কাছে গিয়ে বল।

রফিক এগিয়ে গেল। মেজর সাহেব তাকিয়ে রইলেন তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে।

AMARBOI.COM

তিনি কি বুড়োর চোখে মুখে কোন পরিবর্তন দেখতে চাচ্ছিলেন ? কোন রকম পরিবর্তন অবশ্যি দেখা গেল না। রফিক ফিরে আসতেই মেজর সাহেব বললেন—তুমি এই অন্ধ বুড়োকে বল, মেজর সাহেব আপনাকে সালাম জানাচ্ছেন।

রফিক তাকিয়ে রইল। মেজর সাহেব বিরক্ত স্বরে বললেন—দাঁড়িয়ে আছ কেন, যাও। রফিক এগিয়ে গেল। বুড়ো মীর আলি কিছুই বলল না। মাথা নিচু করে বসেই রইল।

আকাশে মেঘ জমছে। প্রচুর মেঘ। কালবৈশাখী হবে নিশ্চয়ই। তারা হাঁটছে নিঃশব্দে। রফিক একটি সিগারেট ধরিয়েছে। মেজর সাহেব তাকে মাঝে মাঝে লক্ষ্য করছেন।

: রফিক।

: জি স্যার।

: তুমিতো জানতে চাইলে না আমি ওকে সালাম জানালাম কেন। জানতে চাও না ?

রফিক কিছু বলল না।

রোশোবা গ্রামে আমার যে বৃদ্ধ বাবা আছেন, তিনি অন্ধ। তিনিও বাড়ির উঠোনে এই বুড়োটির মত বসে থাকেন। পায়ের শব্দ পেলেই এই বুড়োটির মত বলেন উঁয়ে কৌন?

: পৃথিবীর সব জায়গার মানুষই আসলে এক রকম।

: কথাটি কি তুমি বিশেষ কোনো কারণে বললে ?

: না, কোনো বিশেষ কারণে বলিনি।

: রফিক, আমরা একটা যুদ্ধের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি। মারভাই-ভালের প্রশ্ন। এই সময়ে অন্যায় কিছু হবেই। উল্টোটা যদি হতো—ধর বাঙালী সৈন্য আমার গ্রামে ঠিক আমাদের মত অবস্থায় আছে, তখন তারা কি করত ? বল কি করত তারা ? যে অন্যায় আমরা করছি, তারা কি সেগুলো করতে না ?

: না।

: না! কি বলছ তুমি! যুক্তি দিয়ে কথা বল। রাগ, ঘৃণা হিংসা আমাদের মধ্যে আছে, তোমাদের মধ্যেও আছে।

রফিক হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। হাত ইশারা করে বলল—এরা ডেডবডিটা এখনো সরায়নি। মেজর সাহেব দেখলেন দরজার পাশে বুড়োমতো একটি লোক কাত হয়ে আছে। নীল রঙের বড় বড় মাছি ভন ভন করে উড়ছে চারদিকে।

AMARBOI.COM

ঃ স্যার, এই লোকটির নাম নীলু সেন।

ঃ এর কি কোন আত্মীয়স্বজন নেই? এভাবে ফেলে রেখেছে কেন?

রফিক গলা উঁচিয়ে ডাকল—বলাই, বলাই। কোন সাড়া পাওয়া গেলো না।

ঃ কাকে ডাকছিলে?

ঃ বলাইকে। ওর ছেলে কিংবা এরকম কিছু। এরা দু'জন এই বাড়িতে থাকে।

ঃ এত বড় একটা বাড়িতে দুটি মাত্র প্রাণী থাকে!

ঃ এখন থাকে একটি।

ঃ রফিক।

ঃ জ্বি স্যার।

ঃ আমার মনে হয় তুমি সূক্ষ্মভাবে আমাকে কিছু বলবার চেষ্টা করছ।

ঃ স্যার আমি কিছুই বলবার চেষ্টা করছি না। এখন যা বলার তা আপনি বলবেন। আমি শুধু শুনব।

ঃ এর মানে কি?

ঃ কোন মানে নেই স্যার। আপনি এর মানে খুঁজছেন কেন?

দু'জন আবার হাঁটতে শুরু করল। কালিমন্দিরের সামনে মেজর সাহেব থামলেন। কালিমূর্তি তিনি এর আগে দেখেননি। একটি মাত্র দরজা খোলা, পরিষ্কার কিছু দেখা যাচ্ছে না। মেজর সাহেব ঘরের ভেতরে ঢুকে দেখতে চাইলেন। রফিক বলল—স্যার, ঝড় হবার সম্ভাবনা। আমাদের তাড়াতাড়ি ফেরা উচিত।

ঃ ফিরব, তোমাদের কালিমূর্তি দেখে যাই।

ঃ তোমাদের বলা ঠিক নয় স্যার। আমি মুসলমান।

ঃ তোমরা মাত্র পঁচিশ ভাগ মুসলমান, বাকি পঁচাত্তর ভাগ হিন্দু। তুমি মন্দিরে ঢুকে মূর্তিকে প্রণাম করলেও আমি কিছুমাত্র অবাক হবো না।

রফিক কোন জবাব দিল না। মেজর সাহেব দীর্ঘ সময় ধরে আগ্রহ নিয়ে মূর্তি দেখলেন। হাসি মুখে বললেন—চারটি হাতে এই মহিলাটিকে মাকড়সার মত লাগছে। লাগছে না?

ঃ আমার কাছে লাগছে না। আমরা ছোটবেলা থেকেই মূর্তিগুলি এ রকম দেখে আসছি। আমার কাছে এটাকেই স্বাভাবিক মনে হয়।

AMARBOI.COM

মেজর সাহেব একটা সিগারেট ধরালেন। তারপর অত্যন্ত ঠাণ্ডা গলায় বললেন---রফিক !

ঃ জি স্যার ?

ঃ এই মূর্তিটির পেছনে একজন কেউ লুকিয়ে আছে।

রফিক চুপ করে রইল।

ঃ তুমি সেটা আমার আগেই বুঝতে পেরেছ। পারনি ?

রফিক জবাব দিল না।

ঃ বুঝতে পেরেও আমাকে কিছু বলনি।

রফিক ক্লান্ত স্বরে ডাকল—বলাই, বলাই। মূর্তির পেছনে কিছু একটা নড়েচড়ে উঠল।

ঃ তুমি কি করে বুঝলে ও বলাই ?

ঃ আমি অনুমান করছি। মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছে, তাই অনুমান করছি। বলাই নাও হতে পারে। হয়তো অন্য কেউ। হয়তো কানাই।

ঃ মন্দিরে আশ্রয় নিয়ে সে কি ভাবছে, মা কালী ওকে রক্ষা করবেন ?

ঃ ভাবাইতো স্বাভাবিক। অনেক মুসলমানরা এরকম অবস্থায় মসজিদে আশ্রয় নেয়। ভাবে আল্লাহ্ তাদের রক্ষা করবেন।

মেজর সাহেবের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হল। রফিক নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল—অনেক জায়গায় মসজিদ থেকে টেনে বের করে ওদের মারা হয়েছে। আল্লাহ্ তাদের রক্ষা করতে পারেননি।

ঃ তুমি কি বলতে চাও ?

ঃ আপনি যদি বলাইকে মারতে চান---কালিমূর্তি ওকে রক্ষা করতে পারবে না। এটাই বলতে চাচ্ছি, এর বেশি কিছু না।

ঃ ওকে বের হয়ে আসতে বল।

রফিক ডাকল---বলাই, বলাই। বলাই জবাব দিল না।

একটা মৃদু ফোঁপানির শব্দ শোনা গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঝড় শুরু হল। প্রচণ্ড ঝড়। মেজর সাহেব মন্দিরের ভেতর থেকে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। হুম হুম শব্দ উঠছে। দেখতে দেখতে আবহাওয়া রুদ্র মূর্তি ধারণ করল। মন্দিরসংলগ্ন বাঁশঝাড়ে ভয় ধরানো শব্দ হতে লাগল। রফিক এসে দাঁড়াল মেজর সাহেবের পাশে। মেজর সাহেব মুগ্ধ কণ্ঠে বললেন—বিউটিফুল ! কালিমূর্তির পেছনে উবু হয়ে বসে থাকা বলাইয়ের কথা তাঁর মনে রইল না। ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। মেজর সাহেব দ্বিতীয়বার বললেন—বিউটিফুল !

AMARBOI.COM

সামনে খোলা মাঠ। অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। মাঠে ধুলো ও শুকনো পাতায় ঘূর্ণির মত উঠেছে। এর মধ্যেই খালি গায়ে একজনকে ছুটে যেতে দেখা গেল। তার ভাব দেখে মনে হচ্ছে সে মহা উল্লাসিত। মেজর সাহেব বললেন, লোকটিকে দেখতে পাচ্ছ? রফিক নিস্পৃহ স্বরে বললো—ও নিজাম, পাগল। আমাদের সব গ্রামে একটি পাগল থাকে।

ঃ এ গ্রামের সবাইকে কি তুমি এর মধ্যেই চিনে ফেলেছো?

ঃ না, কয়েকজনকে চিনি। সবাইকে না।

ঃ ঐ পাগলটা কি জঙ্গলা মাঠের দিকে যাচ্ছে না?

ঃ মনে হয় যাচ্ছে। পাগলরা বন-জঙ্গল খুব পছন্দ করে। মানুষের চেয়ে গাছকে তারা বড় বন্ধু মনে করে।

ঃ রফিক।

ঃ জ্বি স্যার।

ঃ তোমার পড়াশোনা কতদূর?

ঃ পাসকোর্সে বি. এ. পাস করেছি।

ঃ মাঝে মাঝে তুমি ফিলসফারদের মত কথা বল।

ঃ পরিবেশের জন্যে এরকম মনে হয়। বিশেষ বিশেষ পরিবেশে সাধারণ কথাও খুব অসাধারণ মনে হয়।

ঃ তা ঠিক।

মেজর সাহেব মাঠের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ঝড়ের চাপ ক্রমেই বাড়ছে। মন্দিরের একটা জানালা খুলে গিয়েছে। খট খট শব্দে কানে তালা লেগে যাবার জোগাড়। রফিক বলল, স্যার কি ভেতরে গিয়ে বসবেন?

ঃ না।

পাগল নিজাম সত্যি সত্যি কি বনের ভেতর ঢুকেছে? মেজর সাহেব তাকিয়ে আছেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। তাঁকে অত্যন্ত চিন্তিত মনে হচ্ছে। কপালে ভাঁজ পড়েছে।

ঃ রফিক।

ঃ জ্বি স্যার।

ঃ জর্জ বার্নার্ড শ' মিলিটারি অফিসার সম্পর্কে কি বলেছেন জান?

ঃ জানি না স্যার।

ঃ তিনি বলেছেন, দশজন মিলিটারি অফিসারের মধ্যে ন'জনই হয় বোকা। বাকি একজন রামবোকা।

ঃ জর্জ বার্নার্ড শ'র রচনা আমাদের সিলেবাসে ছিল না। আমি তাঁর কোনো লেখা পড়িনি।

AMARBOI.COM

ঃ লোকটি রসিক। তবে তাঁর কথা ঠিক নয়। মাঝে মাঝে মিলিটারি অফিসারদের মধ্যেও বুদ্ধিমান লোক থাকে। যেমন আমি। ঠিক না?

ঃ জ্বি স্যার।

ঃ আমার কেন জানি মনে হচ্ছে তুমি যাকে পাগল বলছ, সে পাগল নয়। সে জঙ্গলা মাঠে যাচ্ছে খবর দিতে।

ঃ নিজাম আলি পাগল। ওর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।

ঃ কি কথা হয়েছে?

ঃ পাগলদের সঙ্গে যে রকম কথা হয়, সেরকম। বিশেষ কিছু না।

ঃ বুঝলে কি করে ও পাগল?

ঃ ও মিলিটারি আসায় অত্যন্ত খুশি হয়েছে। এর থেকেই বুঝেছি।

ঃ তুমি বলতে চাও মিলিটারি আসাটা কোনো আনন্দের ব্যাপার নয়?

ঃ জ্বি না স্যার।

মেজর সাহেব ভ্রূ কুঞ্চিত করে দূরের বনের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন—চল যাই।

ঃ কোথায়?

ঃ স্কুলে ফিরে যাই।

ঃ এই ঝড়ের মধ্যে!

ঃ হ্যাঁ।

মেজর সাহেব মন্দিরের চত্বর থেকে নেমে পড়লেন। ঝড়ে উড়িয়ে নিতে চাচ্ছে। কিন্তু তিনি হাঁটছেন স্বাভাবিক ভাবেই। সাপের শিষের মত শিষ দিচ্ছে বাতাস। জুম্মাঘরের কাছাকাছি আসতেই মুসলধারে বৃষ্টি শুরু হল। মেজর এজাজ আহমেদ সেই বৃষ্টি গ্রাহ্যই করলেন না। নিজের মনে গুন গুন করতে লাগলেন। কিংস্টোন ট্রিয়োর একটি গান। যার সঙ্গে বর্তমান পরিবেশ সমস্যার কোন সম্পর্কই নেই।

pretty girls are every where
and when you call me I will be there,

মেজর সাহেবের গলা বেশ সুন্দর।

ঝড় স্থায়ী হলো আধ ঘন্টার মত।

ঝড়ে গ্রামের কারোর তেমন কোন ক্ষতি হল না। শুধু বদিউজ্জামানের নতুন টিনের বাড়িটির ছাদ উড়ে গেল। মীর আলি আতঙ্কে অস্থির হয়ে

AMARBOI.COM

চেঁচাতে লাগল অনুফা কি করবে ভেবে পেল না। তাদের বাড়ি গ্রামের বাইরে। ছুটে গ্রামে যাওয়ার কোন প্রশ্ন ওঠে না। গোয়ালঘরটি এখনো টিকে আছে। সেখানে যাওয়া যায়। কিন্তু বাতাসের বেগ এখনো কমেনি। সেই নড়বড়ে চালা কখন মাথার ওপর পড়ে তার ঠিক কি? সে পরীবানুকে কোলে নিয়ে তার শ্বশুরের হাত ধরে দাঁড়িয়ে রইল। মীর আলি ভাঙা গলায় চেঁচাতে লাগল—বদি। বদিরে, ও বদিউজ্জামান।

বদিউজ্জামানের চোখ জবাফুলের মত লাল। এখন আর তার আগের মত কষ্টবোধ হচ্ছে না। পানিতে দাঁড়িয়ে থাকতে তার ভালই লাগছে। ঝড় বৃষ্টির সময় সে নিজের মনে খানিকক্ষণ হেসেছে। কেন হেসেছে সে জানে না। কোন কারণ ছাড়াই হাসি এসেছে। বদিউজ্জামানের ভয়ও কমে এসেছে। কিছুক্ষণ আগে একটি শেয়াল এসে তার দিকে তাকিয়ে ছিল। সে বেশ শব্দ করেই বলেছে—যাহ্ যাহ্। এই শেয়ালটি আবার এসেছে। মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাকে দেখছে। অন্ধকার হয়ে আসছে। টকটকে লাল চোখ নিয়ে বদিউজ্জামান তাকিয়ে আছে শেয়ালটির দিকে। তার ভালই লাগছে। গিরগিটিটি দুপুরের পর থেকেই নেই। বদিউজ্জামানের খুব নিঃসঙ্গ লাগছিল। এখন আর লাগছে না।

মাগরেবের নামাজ আদায় করতে চার পাঁচজন মুসল্লী গিয়েছিল মসজিদে। আযানের পর পরই কয়েকটি গুলির শব্দ হওয়ায় তারা নামাজ না পড়েই ফিরে এল। ফেরার পথে তাদের মনে হল কাজটা ঠিক হল না। এতে আল্লাহর গজব পড়ার সম্ভাবনা। তারা আবার মসজিদে ফিরে গেল। নামাজ পড়ল। মসজিদ থেকে বেরুবার সময় দেখল রাস্তায় মিলিটারি। তারা আবার মসজিদে ফিরে গেল। রাত কাটাল সেখানেই।

সন্ধ্যার পর গ্রামের কোথাও কোন বাতি জ্বলল না। চারদিক অন্ধকারে সবাই বসে রইল। কোন সাড়াশব্দ নেই, শুধু কৈবর্ত পাড়ায় কারা যেন সুর করে কাঁদছে। সেই সুরেলা কান্না ভেসে আসছে অনেক দূর পর্যন্ত। চিত্রা বুড়ি বসে আছে কৈবর্ত পাড়ায়। তাকে কেউ কিছু বলছে না। চিত্রা বুড়িও কাঁদছে। হাউমাউ করে কান্না।

বলাই কোনোখানেই বেশিক্ষণ থাকতে পারছে না। সারাক্ষণই তার মনে হচ্ছিল এই বুঝি তাকে ধরতে আসছে। সে অল্প কিছু সময়ের

মধ্যেই বেশ কয়েকবার জায়গা বদল করল। বেশি দূর কখনো গেল না। সেনবাড়ি, সেনবাড়ির মন্দির—এর মধ্যেই তার ঘোরাফেরা। সন্ধ্যা মেলাবার পর সে চিলেকোঠার লোহার সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে গেল। ছাদে আধহাতের মত পানি জমে আছে। সে বসে রইল পানির মধ্যে। প্রথম কিছুক্ষণ তার ভালই কাটল। তারপরই মনে হতে লাগল লোহার সিঁড়িতে যেন শব্দ হচ্ছে। মিলিটারিরা উঠে আসছে। সিঁড়ি কাঁপছে। তারপর আবার সব চুপচাপ। কেউ আসেনি—মনের ভুল। বলাইয়ের নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে গেল। আবার মনে হল কেউ আসছে। সিঁড়ি কাঁপছে। বলাই দ্রুত নিঃশ্বাস নিতে থাকল।

ঝড়ের সময় একজন মিলিটারি সুবাদার ও তিনজন রাজাকারের একটি দল ছুটতে ছুটতে সদরউল্লাহ্‌র চালাঘরে এসে উঠেছিল। সদর-উল্লাহ্ বাড়িতে ছিল না। মেয়েছেলেদের গ্রাম থেকে দূরে সরিয়ে নেবার কোনো ব্যবস্থা করা যায় কিনা, এ নিয়ে সে আলাপ করতে গিয়েছিল জয়নাল মিয়ার সঙ্গে।

ওরা সদরউল্লাহ্‌র ঘরে ঢুকেই টর্চ টিপল। সেই টর্চের আলো পড়ল জড়সড় হয়ে বসে থাকা সদরউল্লাহ্‌র স্ত্রী ও তার ছোট বোনের মুখে। ছোট বোনটির বয়স বার। মিলিটারি সুবাদার মুগ্ধ কণ্ঠে বলল—এ রকম সুন্দর মেয়ে সে কাশ্মীরেই শুধু দেখেছে। বাঙালীদের মধ্যে এ রকম সুন্দর মেয়ে দেখেনি। সে খুবই সহজ ভঙ্গিতে এগিয়ে এসে বার বছরের মেয়েটির বুকে হাত রাখল। ঝড়ের জন্যে এই দু'বোনের চিৎকার কেউ শুনতে পেল না।

মেয়েদের গ্রামের বাইরে পাঠিয়ে দেবার ব্যাপারে জয়নাল মিয়ার অভিমত হল—এর কোনো দরকার নেই। হিন্দু মেয়েদের কিছুটা ভয় থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু মুসলমান মেয়েদের কোন ভয় নেই। জয়নাল মিয়া দৃঢ় স্বরে বলল—মুসলমানের শইলে এরা হাত দেয় না। এই গ্রামে যে তিনটা মানুষ মারা গেছে, এর মধ্যে মুসলমান কেউ আছে? কও তোমরা, আছে?

কথা খুবই সত্যি। জয়নাল মিয়া নিচু স্বরে বলল, মুসলমানের সঙ্গে ব্যবহারও খুব বালা। মীর আলি চাচারে মেজর সাব সালাম দিছে। বিশ্বাস না হইলে জিগাইয়া আও।

AMARBOI.COM

এই কথাটিও সত্যি। তবু মতি বলল—ঘরের মেয়েছেলেরা বড় অস্থির হইয়া পড়ছে। জয়নাল মিয়া দৃঢ়স্বরে বলল—

ঃ রাইত দুপুরে এইভাবে টানাটানি করার কোন দরকার নাই। যাও, তোমরা বাড়িত গিয়া আল্লাহ্ খোদার নাম নেও। ফি আমানিল্লাহ্। ভয়ের কিছু নাই।

যে অল্প ক'জন এসেছিল, তারা ঝড়ের মধ্যেই চলে গেল। ঝড় থামবার পর জয়নাল মিয়ার কাছে খবর এল—মেজর সাহেব তার সঙ্গে দেখা করতে চান। সে যেন দেরী না করে। জয়নাল মিয়া ভীত স্বরে বলল—যাও, গিয়া বল, আমি আসতাছি। বাঙালী রাজাকারটি বিরক্ত মুখে বলল—আমার সাথে চলেন। সাথে যাইতে বলছে।

সদরউল্লাহ্‌র বাড়ির সামনে এসে জয়নাল মিয়ার মনে হল, ভেতরের বাড়িতে মেয়েছেলে কাঁদছে। সদরউল্লাহ উঠনে বসে আছে। জয়নাল মিয়া জিজ্ঞেস করল—কি হইছে? সদরউল্লাহ্ জবাব দিল না।

ঃ কান্দে কে?

সদরউল্লাহ্ সেই প্রশ্নেরও জবাব দিল না। সঙ্গের রাজাকারটি জয়নাল মিয়ার পিঠে ঠেলা দিয়ে বলল—জলদি হাটেন।

মেজর সাহেব এক মগ কফি হাতে ঘরে ঢুকলেন। তাঁর সমস্ত গা ভেজা। মাথায় টুপি নেই। ভেজা চুল বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়ছে। আজিজ মাস্টার উঠে দাঁড়াল। ইমাম সাহেব বসেই রইলেন। তাঁর উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। কিছু সময় পরপরই তাঁর বমি হচ্ছে। ঘরময় বমির কটু গন্ধ। রফিক একটি হ্যারিকেন টেবিলের ওপর রেখে চেয়ার এগিয়ে দিল মেজর সাহেবের দিকে। তিনি বসলেন। একটি পা রাখলেন চেয়ারে। গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। প্রশ্নগুলো ইমাম সাহেবের প্রতি। রফিককে প্রতিটি প্রশ্ন ও উত্তর ইংরেজী করে দিতে হচ্ছিল। প্রশ্নোত্তর পর্বের গতি হল শ্লথ। সে জন্যে মেজর সাহেবের কোনো ধৈর্যচ্যুতি হল না।

ঃ তারপর, ইমাম ভাল আছো?

ঃ জ্বি।

AMARBOI.COM

ঃ আমিতো খবর পেলাম ভাল নেই। ক্রমাগত বমি হচ্ছে।

ঃ জ্বি হুজুর।

ঃ শাস্তির দৃশ্যটা ভালো লাগে নি ?

ইমাম সাহেব জবাব দিলেন না। বমির বেগ সামলাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। মেজর সাহেবের মুখে ক্ষীণ হাসি দেখা গেল।

ঃ দৃশ্যটি কি খুব কঠিন ছিল ?

ঃ জ্বি।

ঃ তুমি নিজে নিশ্চয়ই গরু ছাগল জবাই কর। কর না ?

ঃ জ্বি করি।

ঃ তখন খারাপ লাগে না ?

ইমাম সাহেব একটি ছোট্ট নিশ্বাস ফেললেন। মেজর সাহেব কফির মগে দীর্ঘ চুমুক দিয়ে জবাবের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। জবাব পাওয়া গেল না।

ঃ ইমাম।

ঃ জ্বি স্যার।

ঃ এখন আমাকে বল তোমাদের ঐ জংগলে মোট কতজন বাঙালী সৈন্য আছে ?

ঃ আমি জানি না স্যার।

ঃ সঠিক সংখ্যাটি না বলতে পারলেও কোন ক্ষতি নেই। অনুমান করে বল।

ঃ আমি জানি না স্যার।

ঃ সৈন্য আছে কি না সেটা বল।

ঃ স্যার আমি জানি না।

ঃ আচ্ছা বেশ সৈন্য নেই, এই কথাটিই তোমার মুখ থেকে শুনি।

ঃ স্যার আমি জানি না। কিছুই জানি না স্যার।

মেজর সাহেব কফির মগ নামিয়ে রাখলেন। সিগারেট ধরালেন। তাঁর কপালের চামড়ায় সূক্ষ্ম ভাঁজ পড়ল।

ঃ তুমি কখনো ঐ বনে যাওনি ?

ঃ জ্বি না স্যার। আমি ধর্মকর্ম নিয়ে থাকি।

ঃ ধর্মকর্ম নিয়ে থাক ?

ঃ জ্বি স্যার।

ঃ মসজিদে লোক হয় ?

AMARBOI.COM

ঃ হয় স্যার।

ঃ সেখানে তুমি কি পাকিস্তানের জন্যে দোয়া কর?

ইমাম সাহেব চুপ করে গেলেন। মেজর সাহেবের কণ্ঠে অসহিষ্ণুতা ধরা পড়ল।

ঃ খুতবার শেষে পাকিস্তানের জন্যে কখনো দোয়া করনি?

ঃ পৃথিবীর সব মুসলমানদের জন্যে দোয়া খায়ের করা হয় স্যার।

ঃ তুমি আমার কথার জবাব দাও। পাকিস্তানের জন্যে দোয়া করনি?

ঃ জ্বি না স্যার।

ঃ বাংলাদেশের জন্যে কখনো দোয়া করেছো?

ইমাম সাহেব চুপ করে রইলেন। মেজর সাহেব হঠাৎ প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে দিলেন। ইমাম সাহেব চেয়ার থেকে উল্টে পড়ে গেলেন। রফিক তাঁকে উঠে বসালো। মেজর সাহেব ঠাণ্ডা স্বরে বললেন—ব্যথা লেগেছে?

ঃ জ্বি না।

ঃ এতটুকু ব্যথা লাগেনি?

ঃ জ্বি না স্যার।

ঃ আমার হাত এতটা কমজোরী তা জানা ছিল না।

মেজর সাহেব হাতের সিগারেট ফেলে দিয়ে দ্বিতীয় চড়টি দিলেন। ইমাম সাহেব গড়িয়ে নিচে পড়ে গেলেন। তাঁর নাক দিয়ে রক্ত পড়তে শুরু করল। রফিক তাঁকে তুলতে গেল। মেজর সাহেব বললেন—ও নিজে নিজেই উঠবে। ইমাম উঠে বস। ইমাম সাহেব উঠে বসলেন।

ঃ এখন বল তুমি শেখ মুজিবর রহমানের নাম শুনেছ?

ঃ জ্বি শুনেছি।

ঃ সে কে?

ইমাম সাহেব চুপ করে রইলেন।

ঃ সে কে তুমি জান না?

মেজর সাহেব এগিয়ে এসে তৃতীয় চড়টি কষালেন। ইমাম সাহেব শব্দ করে দোয়া ইউনুস পড়তে লাগলেন। মেজর সাহেব তাকালেন আজিজ মাস্টারের দিকে।

ঃ তারপর কবি, তুমি কেমন আছ? ভাল আছ?

ঃ জ্বি।

ঃ তুমি শুনলাম বেশ শক্তই ছিলে? বমি টমি কিছু করনি?

আজিজ মাস্টার জবাব দিল না।

AMARBOI.COM

ঃ বাংলাদেশের ওপর কখনো কবিতা লিখেছ ?

ঃ জ্বি না স্যার।

ঃ কেন, লেখনি কেন ?

আজিজ মাস্টার চুপ করে রইল।

ঃ শেখ মুজিবের ওপর লিখেছ ?

ঃ জ্বি না।

আজিজ মাস্টারের পা কাঁপতে লাগল। মেজর সাহেব বললেন—

ঃ তুমি প্রেমের কবিতা ছাড়া অন্য কিছু লেখ না ?

ঃ জ্বি না।

ঃ তুমি দেখি দারুণ প্রেমিক মানুষ। সব কবিতা কি মালা নামের ঐ বালিকাকে নিয়ে লেখা ? জবাব দাও। বল হ্যাঁ কিংবা না।

ঃ হ্যাঁ।

ঃ শোন আজিজ, আমি কথা রাখি। আমি কথা দিয়েছিলাম ঐ মেয়েটির সঙ্গে তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করব, সেটা আমার মনে আছে। আমি ঐ মেয়ের বাবাকে আনতে লোক পাঠিয়েছি। এখন তুমি আমাকে বল ঐ বনে কতজন সৈন্য লুকিয়ে আছে।

ঃ স্যার বিশ্বাস করেন, আমি কিছুই জানি না।

ঃ আমি তোমার কথা বিশ্বাস করলাম না। তুমি বোধ হয় জান না, আমি কি পরিমাণ নিষ্ঠুর হতে পারি। তুমি জান ?

ঃ জ্বি স্যার জানি।

ঃ না, তুমি জান না, তবে এক্ষুণি দেখতে পাবে। রফিক, তুমি ওর জামা কাপড় খুলে ওকে নেংটো করে ফেলো।

আজিজ মাস্টার হতভম্ভ হয়ে তাকাল। এই লোকটা বলে কি! আজিজ মাস্টারের পা কাঁপতে লাগল। মেজর সাহেব বললেন—দেরী করবে না, আমার হাতে সময় বেশি নেই। রফিক!

ঃ জ্বি স্যার।

ঃ এই মিথ্যাবাদী কুকুরটাকে নেংটো করে সমস্ত গ্রামে ঘুরে ঘুরে দেখাবে। বুঝতে পারছ ?

ঃ পারছি।

ঃ আর শোন, একটা ইটের টুকরো ওর পুরুষাঙ্গে ঝুলিয়ে দেবে। এতে সমস্ত ব্যাপারটায় একটা হিউমার আসবে।

আজিজ মাস্টার কাঁপা গলায় বলল—আমি কিছুই জানিনা স্যার। একটা কোরান শরীফ দেন, কোরান শরীফ ছুঁয়ে বলব।

AMARBOI.COM

: তার কোন প্রয়োজন দেখি না। রফিক, যা করতে বলছি কর

রফিক থেমে থেমে বলল—মানুষকে এভাবে লজ্জা দেবার কোনো অর্থ হয় না। মেজর সাহেবের চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হতে থাকল। তিনি তাকিয়ে আছেন রফিকের দিকে। রফিক বলল---আপনি যদি একে অপরাধী মনে করেন তাহলে মেরে ফেলেন। লজ্জা দেবার দরকার কি ?

: তুমি একে অপরাধী মনে কর না ?

: না। আমার মনে হয় সে কিছু জানে না।

: সে এই গ্রামে থাকে, আর এতবড় একটা ব্যাপার জানবে না ?

: জানলে বলতো। কিছু জানে না, তাই বলছে না।

: বলবে সে ঠিকই। ইট বেঁধে তাকে বাড়ি বাড়ি নিয়ে যাও---দেখবে তার মুখে কথা ফুটেছে। তখন সে প্রচুর কথা বলবে।

রফিক ঠাণ্ডা স্বরে বলল---স্যার ওকে এ রকম লজ্জা দেয়াটা ঠিক না।

: কেন ঠিক না ?

: আপনি শুধু ওকে লজ্জা দিচ্ছেন না, আপনি আমাকেও লজ্জা দিচ্ছেন। আমিও ওর মত বাঙালী।

: তাই নাকি ? আমি তো জানতাম তুমি পাকিস্তানী। তুমি কি সত্যি পাকিস্তানী ?

: জি স্যার।

: আমার মনে হয় এটা তোমার সব সময় মনে থাকে না। মনে রাখবে।

: জি স্যার রাখবো।

: এটা তোমার নিজের স্বার্থেই মনে রাখা উচিত।

রফিক চুপ করে গেল। মেজর সাহেব বললেন---একটা মজার ব্যাপার কি জান রফিক ? তুমি যদি আজিজ মাস্টারকে চয়েস দাও, মৃত্যু অথবা লজ্জাজনক শাস্তি—তাহলে সে লজ্জাজনক শাস্তিটাই বেছে নেবে। মহানন্দে পুরুষাঙ্গে ইট বেঁধে মানুষের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াবে। জিজ্ঞেস করে দেখো।

রফিক কিছুই জিজ্ঞেস করল না। মেজর সাহেব কঠিন স্বরে বললেন---আজিজ, পরিষ্কার উত্তর দাও। মরতে চাও, না চাও না ? আমি দ্বিতীয়বার এই প্রশ্ন করবো না। ত্রিশ সেকেণ্ডের ভেতরে জবাব চাই। বল মরতে চাও, না চাও না ?

: মরতে চাই না।

AMARBOI.COM

মেজর সাহেব হাসি মুখে বললেন—বেশ, তাহলে কাপড় খুলে ফেল। তোমাকে ঠিক এক মিনিট সময় দেয়া হল তার জন্য। আজিজ মাস্টার কাপড় খুলতে শুরু করল।

ঃ রফিক, আমার কথা বিশ্বাস হল?

ঃ হল।

ঃ বাঙালীদের মান অপমান বলে কিছু নেই। একটা কুকুরেরও আত্ম-সম্মান থাকে, এদের তাও নেই। আমি যদি ওকে বলি যাও, ঐ ইমামের পশ্চাৎদেশ চেটে আস। ও তাই করবে।

রফিক মৃদু স্বরে বলল—মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ালে অনেকেই এ রকম করবে।

ঃ তুমি করবে?

ঃ জানি না, করতেও পারি। মৃত্যু একটা ভয়াবহ ব্যাপার। মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে কে কি করবে তা আগে থেকে বলা সম্ভব নয়।

ঃ তাই বুঝি?

ঃ জ্বি স্যার। আপনার মত একজন সাহসী মানুষও দেখা যাবে কাপুরুষের মত কাণ্ড কারখানা করছে।

মেজর সাহেব ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। এবং তারো মিনিটখানেক পর জয়নাল মিয়াকে সেই ঘরে ঢুকিয়ে দেয়া হল। আজিজ মাস্টার দু'হাতে তার লজ্জা ঢাকতে চেষ্টা করল। ইমাম সাহেব বেশ স্বাভাবিক গলায় বললেন—জয়নাল মিয়া ভাল আছেন?

জয়নাল কিছু একটা বলতে চেষ্টা করল—বলতে পারল না। আজিজ মাস্টারের মত একজন বয়স্ক মানুষ সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে, এটি এখনো সে বিশ্বাস করতে পারছে না। ইমাম সাহেব বললেন—বড় খারাপ সময় জয়নাল সাব, আল্লাহ্‌ খোদার নাম নেন।

জয়নাল মিয়া আবারো কিছু বলতে চেষ্টা করল, বলতে পারল না। কথা আটকে গেল।

রফিক শান্ত স্বরে বলল—জয়নাল সাহেব, আপনি বসেন। স্যার যা যা জিজ্ঞেস করবেন তার সত্যি জবাব দেবেন। বুঝতেই পারছেন। জয়নাল মিয়া মাটিতে বসে পড়ল। ইমাম সাহেব বললেন—চেয়ারে বসেন, মাটিতে প্রস্রাব আছে। নাপাক জায়গা।

মেঘ নেই।

আকাশে তারা ফুটতে শুরু করেছে।

AMARBOI.COM

রাত প্রায় আটটা, কিন্তু মনে হচ্ছে নিশুতি। হাওয়া থেমে গেছে। গাছের একটি পাতাও নড়ছে না। সদরউল্লাহ্ একটা দা হাতে মাঠে নেমে পড়ল। সে দু'জনকে খুঁজছে। একজন তালগাছের মত লম্বা। গোঁফ আছে। অন্যজন বাঙালী, তার মুখে বসন্তের দাগ। সদরউল্লাহ্ কোনো রকম শব্দ না করে হাঁটছে। ঘুটঘুটে অন্ধকার। তাতে তার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। সে যেভাবে হাঁটছে, তাতে মনে হয় অন্ধকারেও দেখতে পাচ্ছে। কোনো কোনো সময়ে মানুষের ইন্দ্রিয় অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

সে প্রথমে গেল বিলের দিকে। কেউ নেই সেখানে। বেশ কিছু কাটা ডাব পড়ে আছে চারদিকে। সদরউল্লাহ্ দীর্ঘ সময় বিলের পাড়ে দা হাতে বসে রইল। বাতাস নেই কোথাও, তবু বিলের পানিতে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ হচ্ছে। ওরা আবার হয়তো আসবে। পানিতে দাঁড় করিয়ে আরো মানুষ মারবে। সদরউল্লাহ্‌র মনে হল কেউ একজন যেন এদিক আসছে। সে শক্ত করে দা'টি ধরে চেঁচিয়ে বলল, কেডা?

: আমি নিজাম। আপনে কি করেন?

: কিছু করি না।

: অন্ধকারে বইয়া আছেন ক্যান?

সদরউল্লাহ্ ফুঁপিয়ে উঠল। নিজাম বলল—সব মিলিটারি জমা হইতেছে জঙ্গলা মাঠে। দেখবেন? সদরউল্লাহ্ সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল।

: হাতে দাও ক্যান?

: আছে কাম আছে। দাওয়ের কাম আছে।

কৈবর্ত পাড়া খালি হয়ে যাচ্ছে।

এরা সরে পড়ছে নিঃশব্দে। এদের অভ্যাস আছে—অতি দ্রুত সব কিছু গুছিয়ে সরে পড়তে পারে। অন্ধকারে এরা কাজ করে। ওদের শিশুরা চোখ বড় বড় করে দেখে, হৈ চৈ করে না, কিছুই করে না। মেয়েরা জিনিসপত্র নৌকায় তুলতে থাকে। কোন জিনিসই বাদ পড়ে না। হাঁস মুরগি, ছাগল—সবই ওঠানো হয়। এরা কাজ করে নিঃশব্দে। প্রবীণরা হুঁকো হাতে বেশ অনেকটা দূরে বসে থাকে। তাদের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় কি হচ্ছে না হচ্ছে এরা কিছুই জানে না। এরা ঝিমুতে থাকে। ঝিমুতে ঝিমুতেই চারদিকে লক্ষ্য রাখে। বুড়ো বয়সেও এদের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ।

AMARBOI.COM

মীর আলি খুনখুন করে কাঁদে।

ভাতের জন্যে কাঁদে। বদিউজ্জামান বাড়ি ফেরেনি। সে না ফেরা পর্যন্ত অনুফা ভাত চড়াবে না। ঘরে চাল ডাল সবই আছে। চারটা চাল ফোটাতে এমন কি ঝামেলা, মীর আলি বুঝতে পারে না। অনেক রকম ঝামেলা আছে ঠিকই —মাথার ওপর টিনের ছাদ নেই। গ্রামে মিলিটারি মানুষ মারছে। তাই বলে মানুষের ক্ষুধা তৃষ্ণা তো চলে যায়নি। পরী-বানুও বিরক্ত করছে না। ঘুমচ্ছে। অসুবিধা তো কিছু নেই।

মীর আলি মৃদু স্বরে বলল—বৌ, চাইরডা ভাত রাইন্ধা ফেল।

অনুফা তীব্র স্বরে বলল—আপনে মানুষ না আর কিছু?

মীর আলি অবাক হয়ে বলে—আমি কি করলাম!

পনেরো বিশ জন সেপাই বসে আছে স্কুলের বারান্দায়। এরাও ক্ষুধার্ত, সমস্ত দিন কিছু খাওয়া হয়নি। ওদের জন্যে রান্না হবার কথা মধুবনে। ঝড়ের জন্যে নিশ্চয়ই কোন ঝামেলা হয়েছে। রান্না করা খাবার এসে পৌঁছয়নি। কখন এসে পৌঁছবে কে জানে। এরা সবাই দেয়ালে ঠেস দিয়ে শ্রান্ত ভঙ্গিতে বসে আছে। কয়েকজন স্পষ্টতই ঘুমচ্ছে। কিছু বাঙালী রাজাকার ওদের সঙ্গে গল্প জমাবার চেষ্টা করছে। গল্প জমছে না। ওরা হাল ছাড়ছে না, ওস্তাদজী ওস্তাদজী বলেই যাচ্ছে।

বদিউজ্জামানের মনে হল জ্বর এসেছে। সে নিশ্চিত হতে পারছে না। মাথায় হাত দিলে কোন উত্তাপ পাওয়া যায় না। কিন্তু তার কান ঝাঁ ঝাঁ করছে। কিছুক্ষণ আগেও তার শীত করছিল। এখন আর করছে না। খুক খুক করে কে যেন কাশল। না কি সে নিজেই কাশছে। নিজামের মত তারও কি মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে? একবার মনে হল শীতল ও লম্বা একটা কি যেন তার সার্টের ভেতর ঢুকে গেছে। সে প্রায় চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিল। কিন্তু চিৎকার করল না। মনের ভুল। সার্টের ভেতর কিছুই নেই। বদিউজ্জামানের মনে হল সে যেন অনেকের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছে। কথাবার্তা বলতে বলতে কারা যেন এগিয়ে আসছে। এটাও কি মনের ভুল? বদিউজ্জামান উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। সে ঠিক করে রাখল, মিলিটারিরা তাকে মেরে ফেললে সে বলবে—ভাইয়েরা কেমন আছেন? বড় মজার ব্যাপার হবে। বদিউজ্জামান নিজের মনে খুক খুক করে হাসতে লাগল। বাঁ দিকে

AMARBOI.COM

জোড়া সবুজ চোখ তাকিয়ে আছে তার দিকে! শেয়াল। দিনে যে শেয়ালটা তাকে দেখে গিয়েছিল, সে নিশ্চয়ই তার স্ত্রীকে ডেকে নিয়ে এসেছে। ভাবতে বেশ মজা লাগল বদিউজ্জামানের। সে আবার হাসতে শুরু করল। এবার আর নিজের মনে হাসা নয়, শব্দ করে হাসা।

রফিক বাইরে এসে দেখল মেজর সাহেব স্কুলঘরের শেষ প্রান্তের বারান্দায় একাকী দাঁড়িয়ে আছেন। রফিককে দেখে তিনি কিছুই বললেন না। রফিক বারান্দায় নেমে গেল। অপেক্ষা করল খানিকক্ষণ, তারপর হাঁটতে শুরু করল গেটের দিকে। মেজর সাহেব ভারী গলায় ডাকলেন—রফিক।

ঃ রফিক ফিরে এল।

ঃ কোথায় যাচ্ছিলে?

ঃ তেমন কোথাও না।

ঃ তোমাকে একটা কথা বলার প্রয়োজন মনে করছি।

ঃ বলুন।

ঃ তুমি কি জান, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না?

ঃ জানি।

ঃ কখন থেকে অবিশ্বাস করতে শুরু করেছি জান?

ঃ শুরু থেকেই। কোন বাঙালীকেই আপনি বিশ্বাস করেন না।

ঃ তা ঠিক। যারা বিশ্বাস করেছে সবাই মারা পড়েছে। আমার বন্ধু মেজর বখতিয়ার বিশ্বাস করেছিল। ওরা তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছে।

ঃ মেজর বখতিয়ার বিশ্বাস করেছিল কি করেনি সেটা আপনি জানেন না। অনুমান করছেন।

ঃ হ্যাঁ, তাও ঠিক। আমি জানি না।

মেজর সাহেব হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কি ঐ মাস্টারটির বিশেষ অঙ্গে ইট ঝুলিয়ে দিয়েছো?

ঃ না।

ঃ কেন? প্রমাণ সাইজের ইট পাওনি?

রফিক কথা বলল না। মেজর সাহেব চাপা স্বরে বললেন—বাঙালী ভাইদের প্রতি দরদ উথলে উঠেছে।

AMARBOI.COM

ঃ আমার মধ্যেদরদ-টরদ কিছু নেই মেজর সাহেব। ইট খোলানোটা আমার কাছে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছে।

ঃ মোটেই অপ্রয়োজনীয় নয়। আমি ইট-বাঁধা অবস্থায় ওকে ওর প্রেমিকার কাছে নিয়ে যাব। এবং ওকে বলব সেই প্রেমের কবিতাটি আবৃত্তি করতে।

ঃ কেন?

ঃ রফিক।

ঃ জ্বি স্যার।

ঃ তুমি আমাকে প্রশ্ন করার দুঃসাহস কোথায় পেলে?

ঃ আপনি একজন সাহসী মানুষ। সাহসী মানুষের সঙ্গে থেকে থেকে আমিও সাহসী হয়ে উঠেছি।

ঃ আই সি।

ঃ এবং স্যার আপনি একবার আমাকে বলেছিলেন, আমার মনে কোনো প্রশ্ন থাকলে তা বলে ফেলতে।

ঃ বলেছিলাম?

ঃ জ্বি স্যার।

ঃ সেই প্রিভিলেজ এখন আর তোমাকে দিতে চাই না। এখন থেকে তুমি কোন প্রশ্ন করবে না।

ঃ ঠিক আছে স্যার।

ঃ রফিক।

ঃ জ্বি স্যার।

ঃ আজ তোমাকে অস্বাভাবিক রকম উৎফুল্ল লাগছে।

ঃ আপনি ভুল করছেন স্যার। আমাকে উৎফুল্ল দেখানোর কোনো কারণ নেই। এমন কিছু ঘটেনি যে আমি উৎফুল্ল হব।

ঃ তুমি বলতে চাও যে বিমর্ষ হবার মত অনেক কিছু ঘটেছে?

ঃ আমি তাও বলতে চাই না।

মেজর সাহেব পশতু ভাষায় কি যেন বললেন। কোন কবিতা-টবিতা হবে হয়তো। রফিক তাকিয়ে রইল। মেজর সাহেব বললেন—রফিক তুমি পশতু জান?

ঃ জ্বি না স্যার।

ঃ না জানলেও শোন। এর মানে হচ্ছে—বেশী রকম বুদ্ধিমানদের মাঝে মাঝে বড় রকম বোকামি করতে হয়।

AMARBOI.COM

রফিক কিছুই বলল না। মেজর সাহেব বললেন, চল জয়নাল লোকটির কাছ থেকে কিছু জানতে চেষ্টা করি। তোমার কি মনে হয় ও আমাদের কিছু বলবে?

: না স্যার, বলবে না।

: কি করে বুঝলে?

: এরা কিছুই জানে না। কাজেই কিছু বলার প্রশ্ন ওঠে না।

: চল দেখা যাক।

: তোমার নাম জয়নাল?

: জ্বি।

: এই নেংটা মানুষটাকে তুমি চেন?

: জ্বি স্যার।

: ও তোমার মেয়েকে বিয়ে করতে চায়।

জয়নাল মিয়া হতভম্ভ হয়ে তাকাল।

: কিন্তু ওর যন্ত্রপাতি বেশি ভাল বলে মনে হচ্ছে না। আমার মনে হয় ভয় পেয়ে ওটার এই অবস্থা। আমি নিশ্চিত উত্তেজিত অবস্থায় এটা আরো ইঞ্চিখানেক বড় হবে। কি বল জয়নাল?

জয়নালের গা কাঁপতে লাগল। এসব কি শুনছে?

: তবে আমি ঐ যন্ত্রটার জন্যে একটা একসারসাইজের ব্যবস্থা করেছি। আমি ঠিক করেছি ওখানে একটা ইট ঝুলিয়ে দেবো। এতে এটা আরো কিছু লম্বা হবে বলে মনে হয়।

ইমাম সাহেব অস্ফুট একটি ধ্বনি করলেন। মেজর সাহেব বললেন, কিছু বলবে ইমাম?

: জ্বি না স্যার।

: জয়নাল, তুমি কিছু বলবে?

: জ্বি না।

: আমি ঠিক করেছি মাস্টারকে এই অবস্থায় তোমার মেয়ের কাছে নিয়ে যাব। জিজ্ঞেস করব এই সাইজে ওর চলবে কি না। জয়নাল, তোমার মেয়েটি কি বাড়িতে আছে?

জয়নাল মিয়া মাটিতে বসে পড়ল। মেজর সাহেব হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে রইলেন। যেন কিছু শোনার জন্যে অপেক্ষা করছেন। ঘরে একটি শব্দও হল না।

: জয়নাল।

AMARBOI.COM

ঃ জি।

ঃ তোমার মেয়েটি বাড়িতেই আছে আশা করি।

জয়নাল মিয়া হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠল। মেজর সাহেব প্রচণ্ড ধমক দিলেন—কান্না বন্ধ কর। কান্না আমার সহ্য হয় না। চল যাই। দেরী হয়ে যাচ্ছে। চল চল।

আজিজ মাস্টার তখন কথা বলল। অত্যন্ত স্পষ্ট স্বরে বলল—মেজর সাহেব, আমি মরবার জন্যে প্রস্তুত আছি। আমাকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচান।

মেজর সাহেব মনে হল বেশ অবাক হলেন। কৌতূহলী গলায় বললেন, মরতে রাজি আছ?

ঃ জি।

ঃ ভয় লাগছে না?

ঃ লাগছে।

ঃ তবুও মরতে চাও?

আজিজ মাস্টার জবাব না দিয়ে নিচু হয়ে তার পাজামা তুলে পরতে শুরু করল। মেজর সাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে লাগলেন। কিছুই বললেন না।

আজিজ মাস্টারকে তার প্রায় দশ মিনিটের মধ্যে রাজাকাররা নিয়ে গেল বিলের দিকে। আজিজ মাস্টার বেশ সহজ ও স্বাভাবিকভাবেই হেঁটে গেল। যাবার আগে ইমাম সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলল—স্লামালিকুম। ইমাম সাহেব বা জয়নাল মিয়া কেউ কিছু বলল না।

আজিজ মাস্টার চলে যাবার পর দীর্ঘ সময় কেউ কোনো কথা বলল না। মেজর সাহেব গম্ভীর মুখে সিগারেট টানতে লাগলেন। জয়নাল মিয়া কাঁপতে লাগল থর থর করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই স্কুলঘরের পেছনে কয়েকটি গুলির শব্দ হল। ইমাম সাহেব ক্রমাগত দোয়া ইউনুস পড়তে লাগলেন।

মেজর সাহেব বললেন—জয়নাল তুমি আমার প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব দাও। আমাকে রাগিও না। বল মোট কতজন সৈন্য লুকিয়ে আছে তোমাদের জংলা মাঠে? মনে রাখবে আমি একই প্রশ্ন দু'বার করব না। বল কত জন?

ঃ প্রায় একশ।

ইমাম সাহেব চোখ বড় বড় করে তাকালেন। রফিক অন্য দিকে তাকিয়ে রইল। মেজর সাহেব সিগারেট ধরালেন। সিগারেট ধরাতে

গিয়ে তাঁর হাত কাঁপাতে লাগল।

ঃ এরা কবে এসেছে এই বনে?

ঃ পরশু।

ঃ এই গ্রাম থেকে তোমরা ক'বার খাবার পাঠিয়েছো?

ঃ তিনবার।

ঃ আজিজ মাস্টার এবং ইমাম—এরা এ খবর জানে?

ঃ জ্বি না, এরা বিদেশী মানুষ। এদের কেউ বলে নাই?

ঃ ঐ সৈন্যরা এখান থেকে কোথায় যাবে জান?

ঃ জ্বি না।

ঃ কেউ জানে?

ঃ জ্বি না।

ঃ ওদের মধ্যে কতজন অফিসার আছে?

ঃ আমি জানি না।

ঃ ওদের সঙ্গে গোলাবারুদ কি পরিমাণ আছে?

ঃ জানি না স্যার।

ঃ ওদের মধ্যে আহত কেউ আছে?

ঃ আছে।

ঃ কতজন?

ঃ ছয়-সাত জন।

ঃ ওরাও বনেই আছে?

ঃ জ্বি না।

ঃ ওরা কোথায়?

ঃ কৈবর্ত পাড়ায়। জেলে পাড়ায়।

ঃ বনে খাবার নিয়ে কারা যেতো?

ঃ কৈবর্তরা।

মেজর সাহেব থামলেন। জয়নাল মিয়া মাটিতে বসে হাঁপাতে লাগল। রফিক এখানো জানালার দিয়ে তাকিয়ে আছে। মেজর সাহেব বললেন—ঠিক আছে তুমি যাও।

ঃ জ্বি স্যার।

ঃ তুমি যাও। তোমাকে যেতে বললাম।

জয়নাল মিয়া নড়ল না। উবু হয়ে বসে রইল। মেজর সাহেব বললেন—নাকি যেতে চাও না?

ঃ যেতে চাই।

AMARBOI.COM

ঃ তাহলে যাও। দৌড়াও। আমি মত বদলে ফেলবার আগেই দৌড়াও।

জয়নাল মিয়া উঠে দাঁড়াল। নিচু স্বরে বলল--স্যার স্লামালিকুম।

মেজর সাহেব বললেন --ইমাম, তুমিও যাও।

ইমাম সাহেব নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছেন না।

ঃ যাও যাও। চলে যাও। কুইক।

ওরা ঘর থেকে বেরুল। স্কুল গেট পার হয়েই ছুটতে শুরু করল। মেজর সাহেব জানালা দিয়ে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর মুখ অত্যন্ত গম্ভীর।

ঃ রফিক।

ঃ জ্বি স্যার?

ঃ জয়নাল কি সত্যি কথা বলল?

ঃ মনে হয় না স্যার। প্রাণ বাঁচানোর জন্যে অনেক সময় এ জাতীয় কথা বলা হয়।

ঃ কিন্তু আমি জানি ও সত্যি কথাই বলেছে।

রফিক চুপ করে রইল।

ঃ এবং আমার মনে হচ্ছে তুমিও তা জান।

রফিক তাকাল জানালার দিকে। বাইরে ঘন অন্ধকার।

ঃ আমার মনে হয় তুমি আরো অনেক কিছুই জান।

ঃ আমি তেমন কিছু জানি না।

ঃ তুমি শুধু বল, তোমাদের সৈন্যরা এখনো কি বনে লুকিয়ে আছে?

ঃ আমি কি করে জানব?

ঃ তুমি অনেক কিছুই জান। আমি কৈবর্ত পাড়ায় তল্লাসী করতে চেয়েছিলাম, তুমি বলেছিলে—প্রয়োজন নেই।

ঃ আমার ভুল হয়েছিলো। সবাই ভুল করে।

ঃ ঝড়ের সময় একটা পাগল ছুটে গেল বনের ভেতর। যায়নি?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ ওকে বনের ভেতর যেতে দেখে তুমি উল্লসিত হয়ে উঠলে।

রফিক একটি নিঃশ্বাস ফেলল।

ঃ বল তুমি উল্লসিত হওনি?

ঃ ভুল দেখেছেন স্যার।

AMARBOI.COM

ঃ আমার ধারণা ঐ পাগলটি বনে খবর নিয়ে গেছে। এবং সবাই পালিয়েছে ঝড়ের সময়।

মেজর সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। কঠিন কণ্ঠে বললেন—চলো আমার সঙ্গে।

ঃ কোথায়?

ঃ বুঝতে পারছ না কোথায়? তুমি তো বুদ্ধিমান, তোমার তো বুঝতে পারা উচিত। বল বুঝতে পারছ?

ঃ পারছি।

ঃ ভয় লাগছে?

ঃ না।

ঃ ওরা কি ঝড়ের সময় পালিয়েছে?

ঃ হ্যাঁ। এতক্ষণে ওরা অনেক দূর চলে গেছে। খুব তাড়াতাড়ি মধুবনের দিকে গেলে হয়তো এখনো ওদের ধরা যাবে।

ঃ তুমি আবার আমাকে কনফিউজ করতে চেষ্টা করছ। এরা হয়তো বনেই বসে আছে।

রফিক মৃদু হাসল।

ঃ বল ওরা কি বনে বসে আছে?

ঃ হয়ত আছে। গভীর রাতে বের হয়ে আসবে।

ঃ ঠিক করে বল।

ঃ আপনি এখন আমার কোনো কথাই বিশ্বাস করবেন না। কাজেই কেন শুধু শুধু প্রশ্ন করছেন?

AMARBOI.COM

কৈবর্ত পাড়ায় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। চিত্রা বুড়ি অবাক হয়ে আগুন দেখছে। রাজাকাররা ছোটাছুটি করছে। তাদের ছোটাছুটি দেখে মনে হয় খুব উৎসাহ বোধ করছে। আগুন জ্বালানোর জন্যে তাদের যথেষ্ট খাটা-খাটনি করতে হচ্ছে। ভেজা ঘরবাড়ি। আগুন সহজে ধরতে চায় না।

মীর আলি বারান্দায় দাঁড়িয়ে 'আগুন আগুন' বলে চিৎকার করছে। সে চোখে দেখতে পায় না। কিন্তু আগুন দেখতে পাচ্ছে। গ্রামের মানুষ-জন সব বেরিয়ে আসছে ঘর থেকে।

মেজর এজাজ আহমেদ পাড়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর পাশে ডান দিকে, চাইনীজ রাইফেল হাতে দু'জন জোয়ান এসে দাঁড়িয়েছে। রফিক

নেমেছে বিলে।

বিলের পানি অসম্ভব ঠাণ্ডা। রফিক পানি কেটে এগুচ্ছে। কি যেন ঠেকল হাতে। মনার ছোট ভাই বিরু। উপুড় হয়ে ভাসছে। যেন ভয় পেয়ে কাছে এগিয়ে আসতে চায়। রফিক পরম স্নেহে বিরুর গায়ে হাত রেখে বলল—ভয় নাই। ভয়ের কিছুই নাই।

পাড়ে বসে থাকা মেজর সাহেব বললেন—কার সঙ্গে কথা বলছ রফিক ?

ঃ নিজের সঙ্গে মেজর সাহেব।

ঃ কি বলছ নিজেকে ?

ঃ সাহস দিচ্ছি। আমি মানুষটা ভীতু।

ঃ রফিক।

ঃ বলুন।

ঃ ওরা কি বন ছেড়ে চলে গেছে ? সত্যি করে বল।

রফিক বেশ শব্দ করেই হেসে উঠল। আচমকা হাসির শব্দে মেজর সাহেব চমকে উঠলেন।

AMARBOI.COM

কৈবর্ত পাড়ায় আগুন ছড়িয়ে পড়ছে। আলো হয়ে উঠছে চারদিক। রফিককে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে এখন। ছোট খাট অসহায় একটা মানুষ। বুক পানিতে দাঁড়িয়ে আছে। মেজর সাহেব বললেন—রফিক, তুমি কি বেঁচে থাকতে চাও ?

রফিক শান্ত স্বরে বলল—চাই মেজর সাহেব। সবাই বেঁচে থাকতে চায়। আপনি নিজেও চান। চান না ?

মেজর সাহেব চুপ করে রইলেন। রফিক তীক্ষ্ণ স্বরে বলল—মেজর সাহেব, আমার কিন্তু মনে হয় না আপনি জীবিত ফিরে যাবেন এ দেশ থেকে।

মেজর এজাজ আহমেদ সিগারেট ধরালেন, কৈবর্ত পাড়ার আগুনের দিকে তাকালেন। পশতু ভাষায় সঙ্গের জোয়ান দু'টিকে কি যেন বললেন। গুলির নির্দেশ হয়ত। রফিক বুঝতে পারল না। সে পশতু জানে না।

হ্যাঁ গুলির নির্দেশই হবে। সৈন্য দু'টি বন্দুক তুলছে। রফিক অপেক্ষা করতে লাগল।

বুক পর্যন্ত পানিতে ডুবিয়ে লালচে আগুনের আঁচে যে রফিক দাঁড়িয়ে আছে, মেজর এজাজ আহমেদ তাকে চিনতে পারলেন না। এ অন্য রফিক। মেজর এজাজের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে লাগল।

সৌরভ

আমাদের বাড়িতে ইদানীং ভূতের উপদ্রব হয়েছে।

নিচতলার ভাড়াটে নেজাম সাহেবের মতে একটি অল্পবয়েসী মেয়ের ছায়া নাকি ঘুরে বেড়ায়। গভীর রাতে উঁ উঁ করে কাঁদে। রাত বিরাতে সাদা কাপড় পরে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকে।

নেজাম সাহেব লোকটি মহা চালবাজ। ছোট ছোট ধূর্ত চোখ। মাথা নিচু করে এমন ভাবে হাঁটেন যে দেখলেই মনে হয় কিছু একটা মতলব আছে। এই লোকের কথা বিশ্বাস করার কোনোই কারণ নেই, তবু আমি তাঁকে ডেকে পাঠালাম। গলার স্বর যতদূর সম্ভব গম্ভীর করে বললাম, 'কি সব আজে বাজে কথা ছড়াচ্ছেন?'

নেজাম সাহেব এমন ভাব করলেন যেন আমি একটি দারুণ অন্যায় কথা বলে ফেলেছি। মুখ কালো করে বললেন, 'আজে বাজে কথা ছড়াচ্ছি! আমি! বলেন কি ভাই সাহেব?'

'ভূত-প্রেতের কথা বলে বেড়াচ্ছেন লোকজনদের, বলছেন না?'

'ভূত-প্রেতের কথা তো বলিনি। বলেছি একটি মেয়ের ছায়া আছে এই বাড়িতে।'

'ছায়া আছে মানে?'

'বাড়ির মধ্যে আপনার ভাই দোষ আছে।'

বলতে বলতে নেজাম সাহেব এমন একটি ভঙ্গি করলেন, যেন চোখের সামনে ছায়াময়ী মেয়েটিকে দেখতে পেয়েছেন।

'বাড়ি বন্ধনের ব্যবস্থা করা দরকার। বুঝলেন ভাই।'

AMARBOI.COM

আমি কঠিন স্বরে বললাম, 'যা বলেছেন, বলেছেন। আর বলবেন না।'

নেজাম সাহেবকে বিদায় করে ঘরে এসে বসতেই আমার নিজের খানিকটা ভয় ভয় করতে লাগলো। রান্নাঘরে কিসের যেন খুট খুট শব্দ হচ্ছে। বাথরুমের কলটি কি খোলা ছিল? সর সর করে পানি পড়ছে। রান্নাঘরে কেউ যেন হাঁটছে। কাদের কি ফিরে এসেছে নাকি? আমি উঁচু গলায় ডাকলাম, 'এই কাদের। এই কাদের মিয়া।'

কোন সাড়া পাওয়া গেল না। সাড়া পাওয়ার কথাও নয়। কাদের গিয়েছে সিগারেট আনতে। রাস্তার ওপাশেই পান বিড়ির দোকান, তবু তার ঘন্টাখানিক লাগবে ফিরতে।

রান্নাঘরে আবার কি যেন একটা শব্দ হল। তার পরপরই কারেন্ট চলে গিয়ে চারদিক হঠাৎ করে অন্ধকার হয়ে গেল। আমি বারান্দায় এসে দেখি ফকফকা জ্যোৎস্না উঠেছে। নিচতলার নীলু বিলু দু বোন ঘরের বাইরে মোড়া পেতে বসে আছে। নেজাম সাহেব উঠোনে দাঁড়িয়ে গুজ গুজ করে কি যেন বলছেন তাদের। আমাকে দেখে কথাবার্তা থেমে গেল। নেজাম সাহেব তরল গলায় বললেন, 'কেমন চাঁদনী দেখছেন ভাই? এর নাম সর্বনাশা চাঁদনী।'

আমি জবাব দিলাম না। এই জাতীয় লোকদের সঙ্গে কথা যত কম বলা যায় ততই ভাল। নেজাম সাহেব গুন গুন করে বিলুকে কি যেন বললেন। বিলু হেসে উঠলো খিল খিল করে। এ রকম জ্যোৎস্নায় ভরা-বয়সের মেয়েদের খিল খিল হাসি শুনলে গা ঝিম ঝিম করে। আমি নিজের ঘরে ফিরে কাদেরের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। রান্নাঘর থেকে আবার খুট খুট শব্দ উঠলো। বিলু নীলু দু'জনেই আবার শব্দ করে হেসে উঠলো। আমি ধরা গলায় ডাকলাম, 'কাদের, কাদের মিয়া।'

কাদের ফিরলো রাত দশটায়। এবং এমন ভাব করতে লাগলো যেন এক প্যাকেট সিগারেট কিনতে দু ঘন্টা লাগাটা তেমন অস্বাভাবিক কিছু নয়। সে গম্ভীর হয়ে হারিকেন ধরালো। তার চেয়েও গম্ভীর হয়ে বললো, 'অবস্থাডা খুব খারাপ ছোড ভাই।'

আমি চুপ করে রইলাম। কথাবার্তা শুরু করলেই আমার রাগ পড়ে যাবে। সেটা হতে দেয়া যায় না।

'ছোড ভাই, দিন খারাপ।'

আমি ঠাণ্ডা গলায় বললাম, 'ভাত দে কাদের।'

AMARBOI.COM

'আর ভাত। ভাত খাওনের দিন শেষ ছোড ভাই। মিত্যু সন্নিকট।'

যে কোনো গুরু-গম্ভীর আলোচনায় কাদের মিয়া সাধু ভাষা ব্যবহার করে। এই অভ্যাস আগে ছিল না, নতুন হয়েছে।

'সব্বমোট তের লাখ ছয়চল্লিশ হাজার পাঁচশ পাঞ্জাবী এখন ঢাকা শহরে বর্তমান। আরো আসতাছে।'

আমি কোন উত্তর দিলাম না। মনে মনে ঠিক করে রাখলাম, খাওয়া দাওয়ার পর কাদেরকে খুব ঠান্ডা গলায় বলব, ভবিষ্যতে সে যদি ফিরতে পাঁচ মিনিটের জায়গায় দু ঘণ্টা দেরি করে তাহলে তার আর ঘরে ফেরার প্রয়োজন নেই। বিসমিল্লাহ্ বিদায়।

ভাত খাওয়ার সময় কাদের মিয়া আবার তার পাঞ্জাবী মিলিটারির গল্প ফাঁদতে চেষ্টা করল।

'বাচ্চু ভাই দরবেশ কইছে এই দফায় বাঙ্গালীর কাম শেষ।'

আমি জবাব দিলাম না। কাদেরের অভ্যাস হচ্ছে যেসব বিষয় আমি পছন্দ করি না, খাওয়ার সময় সেই সব বিষয়ের অবতারণা করা। গত রাত্রে খাওয়ার সময় সে তার মামাতো ভাইয়ের গল্প শুরু করল। সেই মামাতো ভাইটিকে কে যেন খুন করে একটা গাব গাছে ঝুলিয়ে রেখেছিল। পনরো দিন পর সেই লাশ আবিষ্কার হল। আমি যখন ভাতের সঙ্গে ডাল মাখছি তখন কাদের মিয়া সেই পচা গলা লাশের একটি বীভৎস প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা দিয়ে ফেললো। খাওয়া বন্ধ করে বাথরুমে গিয়ে বমি করতে হল আমাকে। আজকেও যাতে তার পুনরাবৃত্তি না হয় সে জন্যে আমি কথা বলার ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও বললাম, 'বাচ্চু ভাই দরবেশটা কে?'

'চায়ের দোকান আছে একটা। সুফি মানুষ। তাঁর এক চাচা হইলেন হযরত ফজলুল করিম নকশবন্দি।'

'নকশবন্দি জিনিসটা কি?'

'পীর ফকিরের নামের মইধ্যে থাকে ছোড ভাই।'

'নকশবন্দির ভাতিজার কাছে ভবিষ্যতে আর যেন না যাওয়া হয়।'

কাদের মিয়া উত্তর দিল না। আমি ঠাণ্ডা গলায় বললাম, 'এই সব লোকজন আমি মোটেই পছন্দ করি না।'

'দরবেশ বাচ্চু ভাই একজন বিশিষ্ট পীর।

'পীর মানুষ চায়ের দোকান দিয়ে বসে আছে, এটা কেমন কথা?'

'আমাদের নবী এ করিম রসুলুল্লাহ্ নিজেওতো ব্যবসাপাতি করতেন ছোড ভাই।'

আমি সরু চোখে তাকালাম কাদেরের দিকে। মুখে মুখে কথা বলার এই অভ্যাসও কাদেরের নতুন হয়েছে। আমি গম্ভীর গলায় বললাম, 'তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে কাদের।'

কাদেরের সঙ্গে আমি তুই-তুই করে বলি। কোনো কারণে বিশেষ রেগে গেলেই শুধু তুমি সম্বোধন করি। কাদের তখন দারুণ নার্ভাস বোধ করে।

'কি কথা ছোড ভাই ?'

কি কথা বলবার আগেই নিচতলার তিন নম্বর ঘর থেকে কান্নার শব্দ শোনা যেতে লাগলো। আজ এক মাস ধরে এই বাড়ির মেয়েটি কাঁদছে। এপ্রিল মাসের তিন তারিখ জলিল সাহেব বাড়ি ফেরেন নি। তাঁর স্ত্রী হয়তো রোজ আশা করে থাকে আজ ফিরবে। রাত এগারোটা থেকে কার্ফিউ। এগারোটা বেজে গেলে আর ফেরবার আশা থাকে না। মেয়েটি তখন কাঁদতে শুরু করে। মানুষের শোকের প্রকাশ এত শব্দময় কেন? যে মেয়েটির কোনো কথা কোনোদিন শুনিনি, গভীর রাতে তার কান্না শুনতে এমন অদ্ভুত লাগে!

'ছোড ভাই, জলিল সাবের এক ভাই আইছে আইজ।'

'তবে যে শুনলাম, জলিল সাহেবের কোন ভাই নেই!'

'চাচাতো ভাই। মৌলানা সাহেব। বৌ আর পুলাপানটিরে নিতে আইছে।'

'কবে নেবে ?'

'বউটা যাইতে চায় না।'

'কেন যেতে চায় না ?'

'কি জানি। মাইয়া মাইনষের কি বুদ্ধি শুদ্ধি কিছু আছে ?'

আমি চুপ করে রইলাম। কাদের মিয়া বললো, 'সময়ডা খুব খারাপ। কেয়ামত নজদিক।'

ঘুমুতে গেলাম অনেক রাতে। বিছানায় শোবার সঙ্গে সঙ্গে অনেক দূরে কোথায়ও গুলির শব্দ শোনা গেল। গুলির শব্দ দিয়ে এখন আর ভয় দেখানোর প্রয়োজন নেই। তবু ওরা কেন রোজ গুলি ছোঁড়ে কে জানে।

কাদের আমার পাশের ঘরে শোয়। তার খুব সজাগ নিদ্রা। সামান্য খুট-খাট শব্দেও জেগে উঠে বিকট হাঁক দেয়—

'কেডা, কেডা শব্দ করে ?'

AMARBOI.COM

আজকেও গুলির শব্দে জেগে উঠলো। ভীত স্বরে বললো, 'শুনতাছেন ছোড ভাই? কাম সাফ।'

আমি জবাব দিলাম না। আমার সাড়া পেলেই ব্যাটা উঠে এসে এমন সব গল্প ফাঁদবে যে ঘুমের দফা সারা।

'ছোড ভাই ঘুমাইছেন?'

আমি গাঢ় ঘুমের ভান করলাম। লম্বা নিঃশ্বাস ফেললাম।

'ছোড ভাই, ও ছোড ভাই।'

'কি?'

'মিত্যু সন্নিকট ছোড ভাই।'

'ঘুমা কাদের। বক-বক করিস না।'

'আর ঘুম। বাঁচলে তো ঘুম। জীবনই নাই।'

'ঝামেলা করিস না কাদের। ঘুমা।'

কাদের ঘুমায় না। বিড়ি ধরায়। বিড়ির কড়া গন্ধে বমি আসার যোগাড় হয়। চারদিক নীরব হয়ে যায়। জলিল সাহেবের স্ত্রীর কান্নাও আর শোনা যায় না। কিছুতেই ঘুম আসে না আমার। বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করি। একবার বাথরুমে গিয়ে মাথা ধুয়ে এলাম। মাথার নিচে তিনটি বালিশ দিয়ে উঁচু করলাম। আবার বালিশ ছাড়া ঘুমতে চেষ্টা করলাম। কিছুতেই কিছু হয় না। এক সময় কাদের মিয়া বললো, 'ঘুম আসে না ছোড ভাই?'

'না।'

'আমারো না। বড় ভয় লাগে।'

'ভয়ের কিছু নেই কাদের।'

'তা ঠিক। মিত্যু হইল গিয়া কপালের লিখন। না যায় খণ্ডন।'

কাদেরের সঙ্গে আমার কিছু কিছু মিল আছে। সে আমার মতই ভীরু এবং আমার মত তারও কঠিন অনিদ্রা রোগ।

সাড়ে তিনটার দিকে ঘুমের আশা বাদ দিয়ে বারান্দায় এসে বসলাম। কাদের মিয়া চায়ের জন্য কেরোসিনের চুলা ধরালো। চুলাটাও সে নিয়ে এসেছে বারান্দায়। আমার দিকে পিঠ দিয়ে আবার বিড়ি ধরিয়েছে।

নিচতলায়ও কে একজন যেন সিগারেট ধরিয়েছে, বসে আছে জাম গাছের নিচে—অন্ধকারে।

'গাছতলায় ওটা কে বসে আছে কাদের?'

কাদের কিছু না দেখেই বললো, 'নেজাম সাহেব।'

'বুঝলে কি করে নেজাম সাহেব?'

AMARBOI.COM

'নেজাম সাহেবেরও রাইতে ঘুম হয় না।'

বসে থাকতে থাকতে ঝিমুনী ধরে গেল। ঝিমুনীর মধ্যেও মনে মনে ঠিক করে ফেললাম, ভোরবেলা একজন ডাক্তারের কাছে যাব। রাতের পর রাত না ঘুমনোটা ভাল কথা নয়। বড় আপার বাসায়ও যেতে হবে। বড় আপা এর মধ্যে তিনবার খবর পাঠিয়েছে। জলিল সাহেবের ভাইয়ের সঙ্গেও কথা বলা দরকার। তারা যদি সত্যি সত্যি চলে যায় তাহলে ভাড়াটে দেখা দরকার। ভাড়াটে পাওয়া যাবে না বলাই বাহুল্য। শহর ছেড়ে সবাই এখন যাচ্ছে গ্রামে। কিন্তু বড় আপা এই সব শুনবে না। তার ধারণা ঢাকা শহরের চার ভাগের এক ভাগ লোক থাকার জায়গা পাচ্ছে না। রাত দিন 'টু লেট' খুঁজে বেড়াচ্ছে।

চা হয়েছে চমৎকার। চুমুক দিয়ে বেশ লাগলো। চারদিকে সুনসান নীরবতা। চাঁদের ম্লান আলো। শীত শীত হিমেল হাওয়া দিচ্ছে। হয়তো বৃষ্টি হচ্ছে দূরে কোথায়। মনটা হঠাৎ দারুণ খারাপ হয়ে গেল।

সকালবেলা নিচে নামতেই আজিজ সাহেবের সঙ্গে দেখা।

আজিজ সাহেব বিলু-নীলুর বাবা। দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী। চোখেও দেখতে পান না। পায়ের শব্দে মানুষ চিনতে পারেন। আমি পা ঘষটে-ঘষটে বাড়ি ঢুকলেও তিনি চিকন সুরে ডাকবেন—'কে যায়? শফিক না?'

আজিজ সাহেবের সঙ্গে দেখা হওয়া একটা দুর্ঘটনা বিশেষ। দেখা হওয়া মাত্র তিনি বাড়ির কোনো একটি সমস্যার কথা তুলবেন—

'কল দিয়ে পানি লিক করছে।'

'বসার ঘরের সুইচটা নষ্ট, হাত দিলেই শক করে।'

'শোবার ঘরের একটা জানালার পুডিং উঠে গেছে। যে কোনো সময় কাঁচ খুলে পড়বে।'

যে লোক চোখে দেখে না এবং সারাক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকে, সে এত সব লক্ষ্য করে কি করে সে এক রহস্য। বাড়ির প্রসঙ্গ শেষ হওয়া মাত্র তিনি রাজনীতি নিয়ে আসেন। তাঁর রাজনীতিরও কোন আগা-মাথা নেই।

AMARBOI.COM

একেক দিন একেক কথা বলেন। রাজনীতির পরে আসে স্বাস্থ্যবিধি। পৃথিবীর যাবতীয় ব্যাধির কোনো না কোনো টোটকা তাঁর জানা আছে। জলাতঙ্ক রোগের একমাত্র অষুধ যে রসুনের খোসা, সেটি তাঁর কাছ থেকেই আমার শোনা।

সকালবেলা তাঁকে ধরাধরি করে বারান্দার ইজিচেয়ার শুইয়ে দেয়া হয়। দুপুর পর্যন্ত অনবরত ভ্যাজর ভ্যাজর করতে থাকেন। তিনি বারান্দায় থাকলে আমি পারতপক্ষে নিচে নামি না। আজকেও তিনি বারান্দায় ছিলেন না। পায়ের শব্দ শুনে শোবার ঘর থেকে ডাক দিয়েছেন—

'কে শফিক না? আস তো দেখি এদিকে। বাথরুমের ফ্লাসটা থেকে থেকে ঘসর ঘসর শব্দ হয়। পানির কোনো ফ্লো নেই।'

'আমি কাদেরকে বলব আজিজ সাহেব। সে মিস্ত্রী নিয়ে আসবে।'

'আস তো ভেতরে, কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

'আমার একটা জরুরী কাজ আছে আজিজ সাহেব।'

'এক মিনিট বসে যাও। ও নীলু চা দেতো।'

'আজিজ সাহেব, আমার এখন না গেলেই নয়।'

'চা খেতে আর কয় মিনিট লাগে? নীলু তাড়াতাড়ি চা দে।'

বাধ্য হয়ে ঘরে ঢুকতে হয়। আজিজ সাহেব ঘরে ঢোকা মাত্র গলার স্বর নামিয়ে বললেন, 'কালকে রাতে কিছু শুনলে?'

'গুলির কথা বলছেন?'

'আহ্ আস্তে বলো। চারদিকে স্পাই। ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারছ?

'কিসের কথা বলছেন?'

'আরে মিলিটারি তো সব কচুকাটা হয়ে গেল। আছো কোথায় তুমি?'

'তাই নাকি?'

'ভিক্ষা চাই না মা কুত্তা সামলা অবস্থা এখন। হা হা হা। মিলিটারিরা আর বড় জোর এক মাস আছে। বিশ্বেস না হয় লিখে রাখ। গুনে গেঁথে ত্রিশ দিন।'

গণ্ডগোলের দিন থেকেই তিনি মিলিটারিকে হয় এক মাস নয় পনরো দিন সময় দিচ্ছেন। তাঁর হিসেবে রোজ দু থেকে তিন হাজার মিলিটারি খতম হয়ে যাচ্ছে। চিটাগাং এবং কুমিল্লা এই দুই জায়গা থেকে টাইট দেয়া হচ্ছে।

'জিয়া সাহেব কি সহজ লোক? বাঘের মামা টাগ। পাঞ্জাবী সব কাঁচা খেয়ে ফেলবে না? তুমি ভাবছ কি?'

AMARBOI.COM

আজিজ সাহেব এমন মুখভঙ্গি করলেন যেন পাঞ্জাবী মিলিটারিদের আমি লেলিয়ে দিয়েছি। আমি বিরস মুখে বললাম, 'আজিজ সাহেব আজ উঠতে হয়। চা আজকে আর খাব না।'

'আহ্ বস দেখি। এই নীলু চা হয়েছে?'

নীলু সাড়াশব্দও করল না, চা নিয়েও এলো না। আজিজ সাহেব শুরু করলেন যুক্তফ্রন্টের রাজনীতি। ওদের ভুল থেকে আমাদের কি কি শেখা উচিত ছিল এবং না শেখাতে আমাদের কি হয়েছে এই সব। আমার বিরক্তির সীমা রইল না। প্রায় আধা ঘন্টা পর নীলু এসে বললো,—'চা দেরি হবে। চিনি নেই। আনতে গেছে।' তাকিয়ে দেখি নীলু মুখ টিপে হাসছে। চোখে চোখ পড়া মাত্র অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে বললো, 'সত্যি চিনি নেই। বিশ্বেস করুন।'

ছাড়া পেলাম এগারোটায়। টিপ-টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে তখন। এই সময় মগবাজারে বড় আপার বাসায় যাবার কোন অর্থ হয় না। প্রথমত দুলাভাই বাসায় থাকবেন না। দ্বিতীয়ত বৃষ্টিতে ভিজলে আমার টনসিল ফুলে ওঠে। সবচে' ভাল হয় রফিকের বাসায় গিয়ে টেলিফোন করলে। কিন্তু তারও সমস্যা আছে। টেলিফোন রফিকদের শোবার ঘরে। টেলিফোন করতে গেলেই বাড়ির মেয়েরা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। শুনতে চেষ্টা করে কি কথাবার্তা হচ্ছে। এবং টেলিফোনের শেষে রফিকের মা প্রচুর চিনি দিয়ে হিমশীতল এক কাপ চা খেতে দেন। সেই চায়ে দুধের সর এবং কালো রঙের পিঁপড়া ভাসতে থাকে।

'শফিক সাহেব আপনার সঙ্গে একটা কথা।'

লোকটিকে চিনতে পারলাম না। লম্বা দাড়ি। হালকা নীল রঙের একটা লম্বা পাঞ্জাবি—ঝুল নেমে এসেছে হাঁটু পর্যন্ত। গা থেকে আতরের গন্ধ আসছে।

'আমি আব্দুল জলিলের বড় ভাই।'

'ও আচ্ছা। কেমন আছেন?'

'আলহামদুলিল্লাহ্, ভাল আছি। জলিলের বৌ আর বাচ্চাটারে নিতে আসছি। আমি থাকি চাঁনপুরে। মাস্টারী করি।'

'কিছু বলতে চান আমাকে?'

'জ্বি।'

'বলুন।'

'জনাব আমি শুনলাম আপনি জলিলের খোঁজ খবর করতেছেন।'

AMARBOI.COM

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। বলে কি এই লোক। আমি খোঁজ করব কি ? আর খুঁজবই বা কোথায় ?

'আপনার অনেক জানাশোনা আছে। একটু যদি দয়া করেন।'

ভদ্রলোক চোখ মুছতে লাগলেন। একজন বয়স্ক লোকের কান্নার মত কুৎসিত আর কিছুই নেই। আমি ধমক দিয়ে কান্না থামাতে চাইলাম—

'কাঁদবেন না।'

'ঢাকা শহরে আমার চেনা জানা কেউ নাই শফিক সাব।'

'দিন কাল খুব খারাপ এখন। চেনা জানাতে কাজ হয় না।'

'তা ঠিক ভাই। খুব ঠিক। কি করব বলেন, মনটা পেরেশান।'

'মন পেরেশান করে তো লাভ নেই। মন শক্ত করুন।'

'চেষ্টা করি। খুব চেষ্টা করি। বিনাদোষে জেলখানাতে আছে মনে হইলেই মন কান্দে।'

'জেলখানাতে আছে বললো কে ?'

'আপনার সাথে যে ছেলেটা থাকে, কাদের মিয়া—সে বললো। অতি ভাল ছেলে। বিশিষ্ট ভদ্রঘরের সন্তান। দুই তিনবার খোঁজ খবর নেয়। গতকাল এক দরবেশ সাহেবের তাবিজ এনে দিয়েছে। দরবেশ বাচ্চু ভাই। খুব বড় আলেম। নাম শুনেছেন বোধ হয়।

'আমি সাধ্যমত খোঁজ খবর নেব। তবে সময়টা খারাপ, ইচ্ছে থাকলেও কিছু করা যায় না। ও কি, আবার কাঁদেন কেন ?'

'আল্লাহ পাক আপনার ভাল করবেন শফিক ভাই।'

আমার মন খারাপ হয়ে গেল। রাস্তায় নেমে দুটি জিনিস ঠিক করে ফেললাম। রফিকের বাসায় গিয়েই টেলিফোন করবো, আর রফিককে জিজ্ঞেস করবো লোকজন হারিয়ে গেলে কোথায় খোঁজ করতে হয়। রফিক অনেক খবরাখবর রাখে। সে কিছু একটা করবেই।

রফিক বাসায় ছিল না। তার ছোট ভাই গম্ভীর হয়ে বললো, 'টেলিফোন করতে এসেছেন ? আমাদের টেলিফোন নষ্ট।'

রফিকের এই ভাইটিকে আমি একেবারেই সহ্য করতে পারি না। সব সময় চালিয়াতী ধরনের কথাবার্তা বলে।

'আপনি কি বসবেন ? দাদা ঘন্টাখানিকের মধ্যে ফিরবে।'

'তাহলে বসব। ওর সঙ্গে দরকার আছে আমার।'

বসার ঘরের দরজা খুলে সে আমাকে নিয়ে বসালো।

কালকে রাত্রে আপনি কি গুলির শব্দ শুনেছেন ?'

AMARBOI.COM

আমি অম্লান বদনে মিথ্যা বললাম, 'না, কাল খুব ভাল ঘুম হয়েছে, কিছু টের পাইনি।'

'কালকে ভীষণ গুলি হয়েছে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। কি জন্যে হয়েছে জানেন?'

'না, আমি কি করে জানব?'

সে এমন ভাবে তাকালো যেন আমি একটি গরু বিশেষ।

'আপনার কি কোনো কিছুই জানতে ইচ্ছা করে না?'

'না তেমন করে না।'

'ও আচ্ছা।'

ঘন্টাখানিক বসে থেকেও রফিকের খোঁজ পাওয়া গেল না। সর ভাসা চা খেলাম পর পর দু কাপ। রফিকের মাও যথারীতি এক ফাঁকে এসে আহাজারী করে গেলেন।

'রফিকটার পড়াশোনা হয় নি কুসঙ্গে থাকার জন্য। যত ছোট-লোকের সাথে তার খাতির। তুমি আবার কিছু মনে করো না বাবা। তোমাকে কিছু বলছি না।'

'না খালা, মনে করার কি আছে।'

'আমি আবার মনের মধ্যে যা আসে বলে ফেলি।'

'এটাই ভাল। বলে ফেলাই ভাল।'

ঘর থেকে বের হয়ে বড় রাস্তা পর্যন্ত এসে দেখি রফিক আসছে হন হন করে। তার দুহাতে দুটি প্রকাণ্ড বাজারের ব্যাগ। নিখোঁজ লোকদের কোথায় খুঁজতে হবে জিজ্ঞেস করা মাত্রই সে বললো, "লোকটার সামনে দাঁড়িয়ে থাকি। আমি ব্যাগ দুটি রেখে আসছি।"

আমরা গেলাম জনাব ইজাবুদ্দীন সাহেবের বাড়ি। ইজাবুদ্দীন সাহেব শান্তি কমিটির একজন মেম্বার। হলুদ রঙের একটা দোতলা বাড়িতে থাকেন। বাড়ির নাম ভাই ভাই কুটির। নেম প্লেটে লেখা এম. এ. (গোল্ড মেডালিস্ট) এল. এল. বি.। রফিক বললো, 'লোকটার সবচে বড় গুণ হল বিরক্ত হয় না। সব সময় হাসি মুখ।'

কথা খুবই ঠিক। ইজাবুদ্দিন সাহেব মন দিয়ে আমার কথা শুনলেন। খাতা বের করে নাম ধাম লিখে রাখলেন এবং বললেন মিলিটারি জেলে আছে কি-না সে খবর তিনি দুদিনের মধ্যে এনে দেবেন। যখন বেরিয়ে আসছি তখন ইজাবুদ্দীন সাহেব হাসি মুখে বললেন,

AMARBOI.COM

'আপনার বাবার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। বিশিষ্ট ভদ্রলোক ছিলেন তিনি। তাঁর বড় মেয়ের বিয়েতে আমি উপস্থিত ছিলাম। খাওয়া দাওয়া নিয়ে দারুণ ঝামেলা হয়েছিল।'

আমি বললাম, 'আমি এসে খোঁজ নিয়ে যাব।'

'না না আপনার আসতে হবে না, আমি খবর দেব। বাড়ি আমি চিনি, কতবার গিয়েছি। শরীফ আদমী ছিলেন আপনার বাবা।'

রফিককে ছেড়ে দিয়ে নিউ মার্কেট পর্যন্ত চলে এলাম। হাঁটা আমার পক্ষে বেশ কষ্টকর। কিন্তু কোনো এক বিচিত্র কারণে রিকশায় উঠলেই আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। নিঃশ্বাস নিতে পারি না।

নিউ মার্কেটের সামনে একটি প্রকাণ্ড মিলিটারি ট্রাক দাঁড়িয়ে ছিল। তিন চার জন কালো পোশাক পরা মিলিটারি (না-কি মিলিশিয়া? কে যেন বলেছিল কালো পোশাকেরগুলি মিলিশিয়া—আরো ভয়ঙ্কর) জটলা পাকাচ্ছিল। সবার চেহারা দেখতে এক রকম। একজন একটু দূরে দাঁড়িয়ে লম্বা একটা চুরুট টানছে। এর চেহারা অদ্ভুত সুন্দর। পাতলা পাতলা ঠোঁট, টানা চোখ, রাজপুত্রের মত চেহারা।

এরা দাঁড়িয়ে থাকার জন্যেই এই দিক দিয়ে লোক চলাচল একেবারেই নেই। একজন বুড়ো মত মানুষ শুধু একটি ওজনের যন্ত্র নিয়ে শুকনো মুখে বসেছিল। দুটি মিলিটারি ওকে কি সব জিজ্ঞেস করে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করছে। একজন আবার দেখি ওজনের যন্ত্রটায় উঠে দাঁড়িয়েছে। আমি বিনা দ্বিধায় ওদের দিকে এগিয়ে গেলাম। মিলিটারি আমাকে কখনো কিছু জিজ্ঞেস করে না। আইডেনটিটি কার্ড দেখতে চায় না। ছাত্র না চাকরি করি তাও জানতে চায় না। কারণ আমার ডান পাটি বাঁকা। আমি ডান দিকে ঝুঁকে বিচিত্র ভঙ্গিতে হাঁটি। লাঠি দিয়ে শরীরের ভার অনেকটা সামলাতে হয়। আমার দিকে ওদের কোনো আগ্রহ নেই।

শারীরিক অক্ষমতা যে এমন একটি সুখকর ব্যাপার হতে পারে তা আমার জানা ছিল না। আমাকে দেখে রাজপুত্রের মত সেই মিলিটারিটি পরিস্কার বাংলায় বললো, 'ভাল আছেন?'

ওজন মাপা লোকটি অবাক হয়ে তাকাচ্ছে আমার দিকে। আমি হাসিমুখে রাজপুত্রটিকে বললাম, 'আমি ভাল আছি। আপনি ভাল আছেন তো ভাই?'

AMARBOI.COM

বড় আপা আমাকে দেখেই বললো, 'তোর কথাই ভাবছিলাম।'

কথাটা পুরোপুরি মিথ্যে। কারো সঙ্গে দেখা হলেই সে এরকম বলে। তার ধারণা এ ধরনের কথাবার্তায় খুব আন্তরিকতা প্রকাশ পায়। তার আন্তরিকতা প্রকাশের আরেকটি কায়দা হচ্ছে ভাত খাওয়ার জন্যে সাধাসাধি করা। বিকেল চারটার সময় গেলেও সে গলা সরু করে বলবে, 'আজরফ মিয়া টেবিলে ভাত দাও তো। তরকারি গরম কর। লেবু কাট। আর দেখ কাঁচামরিচ আছে কি-না।'

আজকে অবশ্যি সে রকম হল না। সে দেখলাম গম্ভীর হয়ে আছে। চোখ মুখ ফোলা-ফোলা। বালাই বহুল্য দুলাভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। আমি সহজ ভাবে বললাম, 'ব্যাপার কি।'

'ব্যাপার ট্যাপার কিছু না।'

'ঝগড়া হয়েছে না-কি ?'

'নাহ্।'

'তুমি গম্ভীর হয়ে আছ।'

'শীলার জ্বর। তোর দুলাভাইকে বললাম ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে। সে নেবে না। তার ধারণা একটু গা গরম হলেই ডাক্তারের কাছে দৌড় দেয়ার কোনো দরকার নেই।'

'জ্বর কি খুব বেশি ?'

'সকালবেলা ১০২ পয়েন্ট পাঁচ ছিল। এখন ৯৯।'

ডাক্তারের কাছে যাওয়া নিয়েই কি ঝগড়া ?'

'বললাম তো ঝগড়া-টগড়া কিছুই হয় নি। এক কথা বার বার জিজ্ঞেস করিস।'

বড় আপা কাঁদতে শুরু করলো। কান্না তার একটি রোগ বিশেষ। যে কোন তুচ্ছ বিষয় নিয়ে সে কেঁদে বুক ভাসাতে পারে। আমরা তার কান্নায় কখনো কোনো গুরুত্ব দিই না।

'আপা কাঁদছ কেন ?'

'তোর দুলাভাই আমাদের গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দেবে। শহরের অবস্থা নাকি খুব খারাপ।'

'তোমার কাছে খারাপ মনে হচ্ছে না ?'

'মনে হবে না কেন ? তবে তোর আমার জন্যে তো কিছু না। আমরা হিন্দুও না, আমরা আওয়ামী লীগও করি না। আমাদের আবার কিসের অসুবিধা ?

AMARBOI.COM

আমি চুপ করে রইলাম। বড় আপা থেমে থেমে বলতে লাগলো, 'অবস্থাতো অনেক ভাল হয়েছে এখন। পরশুদিন আমি একা একা নিউমার্কেট থেকে বাজার করে আনলাম। আগে কার্ফু ছিল নয়টা থেকে, এখন দশটা থেকে। ঠিক না, তুই বল ?'

'তা ঠিক।'

'তোর দুলাভাইয়ের ধারণা গ্রামে গেলে আর কোনো ভয় নেই। এইখানে ভয়টা কিসের ? পত্রিকায় দিয়েছে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে অনার্স পরীক্ষার ডেট দিয়েছে। অবস্থা খারাপ হলে দিত ?'

'পরীক্ষার ডেট দিয়েছে নাকি ?'

'হুঁ, দৈনিক পাকিস্তানে আছে। দাঁড়া নিয়ে আসছি, নিজের চোখে দেখ।'

'থাক আপা আনতে হবে না।'

'না তুই দেখে যা।'

সারাটা দিন বড় আপার বাসায় কাটাতে হল। দুলাভাইয়ের সঙ্গে দেখা না করে আসা ভাল দেখায় না। তিনি ফিরবেন ছটার দিকে। এতো দীর্ঘ সময় বড় আপার সঙ্গে কাটানো একটি ক্লান্তিকর ব্যাপার। এক গল্পই তার কাছে অনেকবার শুনতে হয়। আজরফ কি করে কাপড় ধোয়া সাবান দিয়ে ধুয়ে তার একটি বেনারসী শাড়ি নষ্ট করেছে, সে গল্প আমাকে চতুর্থ বারের মত শুনতে হল। তারপর শুরু করল দুলাভাইয়ের এক বোনের গল্প। সেই বোনটি বিয়ের পর তার স্বামীর এক বন্ধুর সঙ্গে কি সব নটঘট করতে শুরু করেছে। এই গল্পটিও আগে শোনা।

আমি হাই তুলে বললাম, 'শীলা কোথায় আপা ?'

'ওর বান্ধবী এসেছে।'

'যাই দেখা দিয়ে আসি।'

'দরজা বন্ধ করে রেখেছে ওরা।'

'তাই নাকি ?'

'হুঁ।'

দরজা বন্ধ করার ব্যাপার নিয়েও বড় আপা গুজ গুজ করতে লাগলো।

'দরজা বন্ধ করে কথা বলার দরকারটা কি ? এই সব আমি পছন্দ করি না। মেয়েরা দরজা বন্ধ করলেই তাদের মাথায় আজে বাজে সব খেয়াল আসে।'

AMARBOI.COM

শীলার বয়স এমন কিছু নয়। তের হয়েছে। বড় আপা বলেন সাড়ে এগারো। অবশ্যি শীলাকে বেশ বড় সড় দেখায়। এই তের বছর বয়সেই সে গোটা চারেক প্রেমপত্র পেয়েছে। এর মধ্যে একটি সে আমাকে দেখিয়েছে। (আমার সঙ্গে তার বেশ ভাব আছে।) সেই চিঠিটি এতই কুৎসিত যে পড়া শেষ করে হাত সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হয়। আমি যখন বললাম, 'এই চিঠি তুই জমা করে রেখেছিস? ছিঁড়ে ফেলে দিস না কেন?'

শীলা অবাক হয়ে বলেছে, 'আমার কাছে লেখা চিঠি আমি ফেলব কেন? জান, লুনা একুশটা চিঠি পেয়েছে। এর মধ্যে একটা আছে ষোল পাতার।'

'কি আছে সেই ষোল পাতার চিঠিতে?'

'তোমাকে বলা যাবে না।

লুনা চোখ গোল করে হাসতে লাগলো।

লুনা মেয়েটিই আজকে এসেছে। বড় আপা একে দুচক্ষে দেখতে পারে না। প্রধান কারণ হচ্ছে মেয়েটি অসামান্য রূপসী। আমার ধারণা এই মেয়েটির দিকে তাকালে যে কোন পুরুষের মনে তীব্র ব্যথা বোধ হয়। বড় আপা মুখ লম্বা করে বললো, 'লুনার সঙ্গে অল্পবয়েসী মেয়েদের মিশতে দেয়া উচিত না।'

আমি বলব না বলব না করেও বললাম, 'লুনাও তো অল্পবয়েসী।'

বড় আপা আকাশ থেকে পড়লো, 'অল্প বয়েস কোথায় দেখলি তুই! দুই বছর আগে থেকে শাড়ী পরে এই মেয়ে।'

বিকেলে চা দিতে এসে আজরফ গম্ভীর মুখে বললো, 'বড় রাস্তার মোড়ে একটা মিলিটারি জীপ।' আপা এটা শুনেই রেগে গেল।

'মিলিটারি জীপ হয়েছে তো কি হয়েছে? মিলিটারি তোকে খেয়ে ফেলেছে? গরু কোথাকার!' যা আমার সামনে থেকে।'

আজরফ সামনে থেকে নড়ল না। মুখ আগের চেয়েও গম্ভীর করে চা ঢালতে লাগলো।

আপা থমথমে গলায় বললো, 'মিলিটারি জীপ দেখেছিস, দেখেছিস। এর মধ্যে গল্প করার কি আছে? খবরদার, এই সব নিয়ে গুজব গুজব করবিনা। আমি পছন্দ করি না।'

'আম্মা জীপটার লক্ষণ বালা না। এক জায়গার মধ্যে ঘুরাঘুরি করতাছে।'

AMARBOI.COM

'করুক। তারা তাদের কাজ করবে. তুই করবি তোর।'

'আইচ্ছা।'

'খবরদার, মিলিটারি নিয়ে আর কোন কথা বলবি না।'

'আইচ্ছা।'

আপার বক্তৃতা আজরফের মনে তেমন কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারল না। কারণ খানিকক্ষণ পর শীলা এসে বললো, 'আজরফ ভাই বললো, রাস্তার মোড়ে একটা জীপ ঘোরাঘুরি করছে।'

'করুক, তাতে তোমার কি ?'

'ওরা অল্পবয়সী মেয়েদের ধরে নিয়ে নেংটা করে একটা ঘরের মধ্যে রেখে দেয়।'

বড় আপা স্তম্ভিত হয়ে বললো, 'কে বলেছে এই সব ?'

'লুনা। লুনা বললো।'

'যাও, নিজের ঘরে যাও। যত আজগুবী কথাবার্তা। বলতে লজ্জাও করে না।'

'লজ্জা করবে কি জন্যে ? আমাকে তো আর নেংটো করে রাখেনি।'

শীলা ফিক করে হেসে ফেললো।

'যাও ঘরে যাও। তোমার বন্ধু যাবে কখন ?'

'ও আজ থাকবে আমার সঙ্গে। বাসায় টেলিফোন করে দিয়েছি। মা, তুমি কিন্তু খিচুড়ি করবে রাতে। আমার এখন জ্বর নেই।'

'ঠিক আছে তুমি যাও। আজরফকে পাঠিয়ে দিও।'

আপা দীর্ঘ সময় কোনো কথা বলতে পারল না। আজরফ যখন দ্বিতীয়বার চা দিতে এলো, তখন শুধু গম্ভীর হয়ে বললো, 'আজরফ তোমার চাকরি শেষ। কাল সকাল ন'টায় বেতন-টেতন বুঝে নিয়ে বাড়ি যাবে।'

'জ্বি আচ্ছা আম্মা।'

আজরফকে মোটেই বিচলিত মনে হল না। দিনের মধ্যে কয়েকবার যার চাকরি চলে যায়, তাকে চাকরি নিয়ে বিচলিত হলে চলে না।

দুলাভাই ঠিক ছটার সময় এলেন। তাঁর সব কাজ ঘড়ি ধরা, সময় নিয়ে খানিকটা বাতিকের মত আছে। পাঁচটায় কোথায়ও যাওয়ার কথা থাকলে চারটা পঞ্চাশে গিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবেন এবং ঠিক পাঁচটায় ঢুকবেন। অফিসের লোকরা তাকে ঘড়ি বাবু বলে।

দুলাভাই আমাকে দেখেই বললেন, 'তিন ঠ্যাং-এর শালাবাবু যে ! কি হেতু আগমন ?'

AMARBOI.COM

পা নিয়ে ঠাট্টা আমার ভাল লাগে না। কিন্তু দুলাভাইয়ের ওপর আমি কখনো রাগ করতে পারি না। এই লোকটিকে আমি খুবই পছন্দ করি।

'আছ কেমন শালাবাবু?'

আমি হাসি মুখে বললাম, 'ভাল আছি দুলাভাই।'

'তোমার তিন নম্বর ঠ্যাংটা সাবধানে রাখছ তো? খানায় পড়ার সম্ভাবনা। হা হা হা।'

'সাবধানেই রাখছি।'

আমাকেও হাসির ভান করতে হয়।

'শুনেছ নাকি, ওদের নীলগঞ্জে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'শুনেছি।'

'তোমার আপার ধারণা সে বনবাসে যাচ্ছে। তবে যে পরিমাণে কান্নাকাটি করছে, সীতাও তার বনবাসে এত কাঁদেনি।'

'সীতার সঙ্গে তো রাম ছিল। কিন্তু আপনি তো যাচ্ছেন না।'

'আমিও যাব। ব্যাক টু দা ফরেস্ট। তবে কিছুদিন পর। তুমিও চল।'

'না দুলাভাই। এখানে আমার কোনো অসুবিধা নেই।'

'তা ঠিক। ঢাকা শহরে কানা খোঁড়া অন্ধ এরা বর্তমানে খুব নিরাপদ। হা হা হা।'

আমি চুপ করে রইলাম।

'রাগ করলে নাকি শফিক?'

'জ্বি না।'

'ঠাট্টা করে বলি।'

'ঠিক আছে।'

বড় আপা এসে আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'চা খাবি আরেক বার?'

দুলাভাই বললেন, 'আমি খাব। আমাকে এক কাপ লেবু চা দাও।'

বড় আপা কথা না বলে চলে গেল। দুলাভাই ক্লান্ত স্বরে বললেন, 'তোমার একজন ভাড়াটে যে নিখোঁজ হয়েছিল কি নাম যেন তার?'

'আব্দুল জলিল।'

'ও হ্যাঁ জলিল। কোন খোঁজ হয়েছে?'

'এখনো হয় নি। রফিককে নিয়ে চেষ্টা করছি।'

'তুমি খোঁজাখুঁজির মধ্যে যাবে না। কোনোক্রমেই না। সময় ভাল না এখন। প্রায়ই লোকজন ধরে নিয়ে যাচ্ছে।'

'করছে কি ওদের?'

'কিছুদিন রেখে ছেড়ে দিচ্ছে সম্ভবত। মানুষ মারা তো খুব কঠিন ব্যাপার।'

AMARBOI.COM

'ধরাধরিটাই বা করছে কি জন্যে?'

'মানুষের মনে ভয় ঢুকিয়ে দেবার জন্যে। ভয় ধরানোর এটা খুব ইফেকটিভ ব্যবস্থা। একজন নিখোঁজ হলে পাঁচ হাজার লোক সেটা জানে। সবাই খোঁজাখুঁজি করে।'

বড় আপা থমথমে মুখে চা নিয়ে ঢুকলো। ওর বুদ্ধি শুদ্ধি সত্যি কম। চা এনেছে শুধু আমার জন্যে, দুলাভাইয়ের জন্যে নয়। তিনি একটু হাসলেন এবং হাসিমুখেই বললেন, 'শীলার জ্বর কমেছে? লুনাকে দেখলাম ওর ঘরে।'

আপা জবাব দিল না।

'ও কি আজকে থাকবে? এই সময় কেউ মেয়েদের বাইরে পাঠায়? কি আশ্চর্য!'

আপা তারও জবাব দিল না। আমি বললাম, 'মেয়েটি আজকে থাকবে দুলাভাই। শীলা ওর বাসায় টেলিফোন করে দিয়েছে।'

'মেয়েটিকে তুমি দেখেছ শফিক?'

'দেখেছি।'

'ওরচে সুন্দর মেয়ে তুমি দেখেছ?'

আমি ইতস্ততঃ করে বললাম, 'না।'

'আমি কিন্তু দেখেছি। ঢাকা কলেজে তখন পড়ি। বাহাদুরাবাদ এক্সপ্রেসে করে যাচ্ছি দিনাজপুরে। ময়মনসিংহ স্টেশনে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ জানালা দিয়ে দেখি একটি ষোল সতেরো বছরের মেয়ে প্লাটফরমে টিনের একটা ট্রাঙ্কে বসে আছে। খুবই গরিব ঘরের মেয়ে। পায়ে স্পঞ্জের স্যান্ডেল।'

AMARBOI.COM

আপা রাগি গলায় বলে উঠলো, 'লুনার মধ্যে তুমি সুন্দরের কি দেখলে? সমস্ত মুখ ভর্তি নাক।'

'লুনার কথা তো আমি বলছি না। যার কথা আমি বলছি তার নাম ধাম কিছুই জানি না।

আপা ঘর ছেড়ে চলে গেল। দুলাভাই হাসতে লাগলেন ঘর ফাটিয়ে। আমি বললাম, 'ওদের কবে পাঠাচ্ছেন?'

'এই মাসেই পাঠাব। আমি নিজেও চলে যেতে পারি। রাত্রে আমার ভাল ঘুম হয় না। আরাম করে ঘুমতে ইচ্ছে করে।'

দুলাভাই গাড়ি করে আমাকে পৌঁছে দিতে রওনা হলেন। সাতটা মাত্র বাজে, এর মধ্যেই দোকান পাট সব বন্ধ হয়ে গেছে। রাস্তাঘাটে লোক চলাচল নেই। কেমন খাঁ-খাঁ করছে চারদিক। এত বড় একটা

শহর ঝিম মেরে গিয়েছে। দুলাভাই বললেন, 'সন্ধ্যার পর আর চলাফেরা করা ঠিক না।

'দুলাভাই, আপনার কি ভয় লাগছে?'

'না, ভয় লাগে না। অন্যরকম লাগে। আমার কাছে টিক্কা খানের সই করা পাশ আছে। আমাকে কেউ ধরবে না।'

গাড়ি সায়েন্স ল্যাবরেটরির কাছাকাছি আসতেই দেখি রোড ব্লক দিয়ে তিন চার জন সেপাই দাঁড়িয়ে। ওরা গাড়ি থামিয়ে থামিয়ে কি সব দেখছে। একটি কালো ভক্স ওয়াগনকে দেখলাম রাস্তার পাশে। রোগামত একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে গাড়ির পাশে। এক-জন সেপাই কি সব যেন জিজ্ঞেস করছে। দুলাভাই শুকনো গলায় বললেন, 'তুমি চুপচাপ থাকবে। কথাবার্তা যা বলবার আমি বলব।'

ওরা আমাদের গাড়ি থামাল না। হাত ইশারা করে চলে যেতে বললো। তাকিয়ে দেখি দুলাভাইয়ের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে।

গেটের সামনে গাড়ি থামতেই জলিল সাহেবের স্ত্রীর কান্না শোনা গেল। আজ সকাল সকাল কান্না শুরু হয়েছে। দুলাভাই ভীত স্বরে বললেন, 'কাঁদে কে?'

'জলিল সাহেবের বৌ।'

'রোজ এ রকম কাঁদে?'

'হ্যাঁ।'

'শফিক।'

'জি।'

'তুমি খোঁজখবরের মধ্যে যাবে না। সময়টা খারাপ।'

দুলাভাই কুল কুল করে ঘামতে লাগলেন।

'আসেন ওপরে যাই। চা খেয়ে যান।'

'না থাক। দেরি হয়ে যাবে।'

'দেরি হবে না।'

'না থাক।'

দুলাভাই 'না' বলেও গাড়ি থেকে নেমে আমার সঙ্গে ওপরে উঠতে লাগলেন।

'শফিক, আমিও নীলগঞ্জে চলে যাব।'

'ভালই হবে।'

'আমার ভাল লাগছে না। বড়ই দুঃসময়।'

AMARBOI.COM

বিকেলবেলা চুপচাপ ঘরে বসে আছি, কিছুই ভাল লাগছে না। সম্ভবত জ্বর আসছে। নিঃসন্দেহ হবার উপায় হচ্ছে সিগারেট ধরানো। দুটি টান দিয়ে যদি ছুঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে হয়, তাহলে নির্ঘাৎ জ্বর আসছে। পরীক্ষাটা করবার উপায় নেই, সিগারেট ফুরিয়েছে। কাদের মিয়া আনতে গিয়েছে। কখন ফিরবে কে জানে।

আমি একটি চাদর গায়ে দিয়ে বারান্দায় বসলাম। বিলু আসলো সেই সময়। এই মেয়েটি নিঃশব্দে চলাফেরা করে। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে আসার কোন শব্দ আমি শুনিনি।

'কি ব্যাপার বিলু?'

'আপনাকে বাবা ডাকছেন।'

'আমি তো যেতে পারবো না, আমার জ্বর।'

আমাকে স্তম্ভিত করে দিয়ে বিলু বললো—'কই দেখি?' বলেই সে হাত রাখলো আমার কপালে। আমি কাঠ হয়ে বসে রইলাম।

'জ্বর কোথায়, আপনার শরীর নদীর মত ঠাণ্ডা।'

নিজেকে সামলে নিয়ে সহজ ভাবে বলতে চেষ্টা করলাম, 'কি জন্যে ডাকছেন আমাকে?'

'কি জন্যে তা আমি কি করে বলব?'

বিলু রহস্যময় ভঙ্গিতে হাসতে লাগলো। এই মেয়েটি খুব অদ্ভুত। এমনিতে আমার সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা বলে না। কিছু জিজ্ঞেস করলে হুঁ হাঁ বলে জবাব দেয়। আবার কখনো আপনাতেই অনেক কথা বলে।

'আজকে আমাদের ক্লাসে কি হয়েছে জানেন? নাজমা নামের একটা মেয়ে ফ্লাস্কে করে দুধ নিয়ে এসেছে, টিফিনের সময় খাবে। সেই দুধ আমরা ক্লাসের মধ্যে ঢেলে ফেললাম। তারপর কি হয়েছে জানেন?'

'না'

'আমাদের কেমিস্ট্রির স্যার এসে বললেন—এই.........'

বিলুর বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে সে কোন কথা শেষ করবে না। হঠাৎ কথা থামিয়ে বলবে, 'সর্বনাশ চুলায় গরম পানি দিয়ে এসেছি, মনেই ছিল না। আমি যাই।'

AMARBOI.COM

'তোমাদের সেই কেমিস্ট্রি স্যার দুধ দেখে কি বললেন?'

সে চোখ কপালে তুলে বলবে, 'দূর এই সব শুনে কি করবেন?'

বেশ লাগে আমার বিলুকে।

একটি গরম সুয়েটার গায়ে দিয়ে নামছি, হঠাৎ বিলু নিচু গলায় বললো, 'আমাদের বাসায় দেখবেন একটি লোক বসে আছে। ওর সঙ্গে নীলু আপার বিয়ে হবে।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'তাই নাকি?'

'হুঁ।'

'কবে হচ্ছে বিয়েটা?'

'খুব শিগগীর।'

বিলু দেখলাম বেশ গম্ভীর। যেন এই বিয়ের ব্যাপারটি তার ভাল লাগছে না। আমি বললাম, 'তোমার মনে হচ্ছে মন খারাপ?'

'না, মন খারাপ হবে কেন? আপনি কি যে পাগলের মত কথা বলেন। খুব রাগ লাগে।'

আমি ঘরে ঢুকে দেখি আজিজ সাহেবের সামনে একজন মোটাসোটা ভদ্রলোক বসে আছেন। ভদ্রলোকের মাথা ভর্তি টাক। একটা রুমাল দিয়ে তিনি ক্রমাগত মাথার টাক মুছছেন। আজিজ সাহেব বললেন, 'এই যে শফিক, আসো আসো। তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেই। এ হচ্ছে মতিনউদ্দিন। আমাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়। আমেরিকার নর্থ ডাকোটাতে ছিল অনেক দিন। গত সপ্তাহে হঠাৎ এসে হাজির। দেখনা কাণ্ড। মতিনউদ্দিন—এ হচ্ছে আমাদের বাড়িওয়ালা, তবে আত্মীয়ের চেয়েও বেশি।'

ভদ্রলোক মিহি সুরে বললেন, 'আপনার কথা অনেক শুনেছি।'

আমি বড়ই অবাক হলাম। আমার কথা অনেক শোনার কোনো কারণ নেই। ভদ্রলোক বিদেশ থেকে ফিরে আজই হয়ত প্রথম এখানে এসেছেন। এই সময়ের মধ্যে আমার কথা শুনে ফেলবেন সেটা ঠিক বিশ্বাস্য নয়। আমি হাসি মুখে বললাম, 'কার কাছ থেকে শুনলেন?'

'নীলু বললো।'

আমি অবাক হয়ে তাকালাম নীলুর দিকে। নীলুর এমন একজন বয়স্ক মোটাসোটা লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকবে, তা ঠিক কল্পনা করা যায়না। নীলু রূপসী এবং অহংকারী। এই জাতীয় মেয়েরা মোটাসোটা টাকওয়ালা লোকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে না। ভদ্রলোক

AMARBOI.COM

কৌতূহলী হয়ে বললেন, 'আপনি নাকি একবার একটা কাক পুষেছিলেন? কাকটার নাম ছিল সম্রাট কনিষ্ক।'

আমাকে মানতেই হল ভদ্রলোক আমার কথা আগেই শুনেছেন। প্রথম দিনই কেউ আমার কাক পোষার কথা জানবে, তা বিশ্বাস করা কষ্টকর।

'নীলু আমাকে সব কিছু লিখতো চিঠিতে।'

আমি ভালভাবে তাকালাম ভদ্রলোকের দিকে। তাঁর চোখে মুখে এমন একটি ছেলেমানুষী ভাব আছে, যা ছেলেমানুষদের মধ্যেও সচরাচর দেখা যায় না। ভদ্রলোক চোখ বড় বড় করে বললেন, 'কাকটা না কি রাত দিন আপনার পেছনে পেছনে ঘুরঘুর করতো। সত্যি?'

আমার কাক পোষার ব্যাপারটির মধ্যে এতটা অতিরঞ্জন আছে তা জানা ছিল না। ঘটনাটি খুলে বলা যাক।

কাকটির সঙ্গে আমার পরিচয় খুবই আকস্মিক। একদিন সকালে নাশতা খাবার সময় সে রেলিংয়ের ওপর এসে বসলো। আমি যথারীতি একটি রুটির টুকরো ছুঁড়ে দিলাম। সে রুটির টুকরোটি স্পর্শও করলো না। ঘাড় বাঁকিয়ে অত্যন্ত গম্ভীর গলায় ডাকলো কা কা। খাবার স্পর্শ করে না, এই জাতীয় কাক আমি আগে দেখিনি—কাজেই অবাক হয়ে আরো কয়েক টুকরো রুটি ছুঁড়ে দিলাম। সে যেন আমাকে খুশি করবার জন্যেই একটি টুকরো উঠিয়ে আমার সন্ন্যাসীর মত বসে থাকলো বারান্দায়। সেই তার সঙ্গে আমার পরিচয়। শেষের দিকে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বসে থাকতো রেলিং-এ। আমাকে দেখতে গেলেই গম্ভীর গলায় ডাকতো কা কা। আমাদের মধ্যে কথাবার্তাও হত। যেমন আমি যদি বলতাম, 'কি হে কনিস্ক, শরীর ভাল তো?

'কা কা।'

'তার মানে ভাল নেই। হুঁ। হয়েছেটা কি?'

'কা কা কা' (গম্ভীর আওয়াজ)

কাদের মিয়ার এই কাক নিয়ে দুঃশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। তার ধারণা এটা একটা অলক্ষণ। সে ঝাঁটা নিয়ে অনেক বার তাড়াতে চেষ্টা করেছে। লাভ হয়নি। ছাব্বিশে মার্চের পর এই কাকটিকে আর দেখা যায়নি। কোথায় গিয়েছে কে জানে?

মতিনউদ্দিন সাহেব বললেন, 'কাকটির নাম কনিষ্ক রাখলেন কেন? কনিষ্ক মানে কি?'

AMARBOI.COM

'কনিস্ক হচ্ছেন কুষান বংশের একজন সম্রাট। ভারতে রাজত্ব করে গেছেন আনুমানিক ১০০ খ্রীষ্টাব্দে।'

মতিনউদ্দিন সাহেব থেমে থেমে বললেন, 'নীলু ঠিকই বলেছে, আপনি ভাই অদ্ভুত লোক।'

নীলু রেগে গিয়ে বললো, 'আমি আবার কখন এই সব বললাম?'

মতিনউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে দুপুরে আমাকে ভাত খেতে হল। অন্যের বাড়িতে ভাত খেতে ভাল লাগে না। বড়ই অস্বস্তি বোধ হয়। সেখানে ভাত মাখাতে হয় ভদ্রভাবে। লক্ষ্য রাখতে হয় ঠোঁটে ভাত লেগে আছে কি না। হাত দিয়ে লবণ না নিয়ে চামচ দিয়ে নিতে হয়। সেই চামচটি আবার ধরতে হয় বাঁ হাতে। আমি নিতান্ত প্রয়োজন না হলে অন্যের বাড়িতে খেতে বসি না। এখানেও নিতান্ত বাধ্য হয়ে বসতেই হল। যখন নীলুর মত একটা মেয়ে নরম স্বরে বলে, 'আপনি না খেলে আমার খুব খারাপ লাগবে। আমি রান্না করেছি আপনার জন্যেই।' তখন অবাক হয়েই খেতে বসতে হয়।

নীলু আমার সঙ্গে কথা-টথা বিশেষ বলে না। মাসের প্রথম দিকে বাড়ি ভাড়ার টাকাটা খামে ভরে দিতে এসে টেনে টেনে বলে—

'টাকাটা গুনে নিন।'

আমি সব সময়ই বলি, 'গুনতে হবে না, ঠিক আছে।'

সে ঠাণ্ডা স্বরে বলে, 'না গুনে নিন।'

আমাকে চোখ মুখ লাল করে টাকা গুনতে হয়। রূপসী একটা মেয়ের সামনে দাঁড়িয়ে টাকা গোনা বিড়ম্বনা বিশেষ। এক সময় সে বলে, 'ঠিক আছে তো?'

'ঠিক আছে।'

মতিনউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে ভাত খেতে খেতে মনে পড়ল—এবার নীলু ভাড়া দিতে এসে টাকা গুনে নেবার কথা বলেনি। আমি যখন নিজ থেকে গুনতে যাচ্ছি তখন বলেছে—

'শফিক সাহেব, আপনার যদি অস্বস্তি লাগে, তাহলে থাক গুনতে হবে না। আমি গুনে এনেছি।'

অন্যবারের মত টাকাটা দিয়েই নিচে নেমে যায়নি, হঠাৎ করে বলেছে—

'আপনার বন্ধু কনিস্কের কোনো খোঁজ পেলেন?'

AMARBOI.COM

'না, এখনো পাইনি।'

'আমার মনে হয় সে মনের দুঃখে বিবাগী হয়েছে।'

নীলু খিল খিল করে হেসে উঠেই গম্ভীর হয়ে বললো, 'আপনি খুব সুখে আছেন শফিক সাহেব। কাজ টাজ কিছু করতে হয় না। বাড়ি ভাড়া নেন আর ঘুরে বেড়ান।'

আমি উত্তর দিলাম না। সে দেখলাম খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বললো, 'বাবা আপনাকে খুব পছন্দ করেন।'

'তাই নাকি?'

'তাঁর ধারণা আপনার মত ভাল ছেলে খুব কম জন্মায়।'

আমি হঠাৎ বলে বসলাম, 'উনি আমার পা দেখতে পান না তো, তাই বলেন।'

এরপর কথা আর এগোয়নি। নীলু মুখ কালো করে নিচে নেমে গেছে। আমি নিজেও ভেবে পাইনি হঠাৎ এই প্রসঙ্গ কেন তুললাম। না ভেবে চিন্তে মানুষ অনেক কিছুই বলে। আমি বলে বলেই আমরা ভাল মানুষ আর মন্দ মানুষকে আলাদা করতে পারি। এই যেমন আজ মতিনউদ্দিন সাহেব ভাত মাখতে মাখতে বললেন, 'মিলিটারিগুলো দেখতে বেশ লাগে। কেমন স্মার্ট।'

ভদ্রলোকের এই কথা থেকেই বোঝা যায়, এর মনে কোন ঘোরপ্যাঁচ নেই। এখনো মিলিটারি দেখে যে মুগ্ধ হয়, সে কিছু পরিমাণে ছেলেমানুষ। স্বামী হিসেবে এ ধরনের মানুষ পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার।

খাওয়া শেষ করে হাত ধুতে যাচ্ছি, তখন কাদের এসে উপস্থিত। সে আমাকে এক কোণায় নিয়ে চোখ ছোট করে বললো, 'ছোড ভাই রোজ কেয়ামত।'

'কি হয়েছে?'

'রফিক সাহেবের ছোড ভাইয়ের খেল খতম।'

'কি বলিস?'

'কোন খোঁজ নাই। তাঁর মা ফিট হয় আর উঠে, আবার ফিট হয়।'

আমি ভালমত বিদায় না নিয়েই গেলাম রফিকের বাসায়। বাসায় দেখি অনেক লোকজনের ভিড়। একটি ছোটমত নীল রঙের গাড়িও দাঁড়িয়ে আছে।

ভেতরে ঢুকে দেখি রফিকের ছোট ভাই বসার ঘরে গম্ভীর হয় বসে আছে। তাকে ঘিরে বহু লোকজন। রফিক আমাকে দেখতে পেয়ে হাসি মুখে এগিয়ে এলো, 'খবর পেলি কার কাছে?

AMARBOI.COM

'হয়েছেটা কি ? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'শুনিসনি কিছু ?'

'না।'

'কাল বিকেলে বাইরে গিয়েছিল। সারা রাত আর ফেরে নি। আমাদের অবস্থাটা তো বুঝতেই পারছিস। মা রাতে তিনবার ফিট হয়েছে।'

'গিয়েছিল কোথায় ?'

'ওর এক বন্ধুর বাড়ি। দেরি হয়েছিল বলে ওরা আর আসতে দেয়নি। বুঝে দেখ আমাদের অবস্থা।'

রফিকের বাড়ি থেকে বেরুবার সময় দেখি আরো লোকজন আসছে। ঢাকা শহরের সব লোকজন কি জেনে গেছে নাকি—রফিকের ছোট ভাই কাল রাতে বাড়ি ফেরেনি ?

ঘরে ফিরে দেখি মতিনউদ্দিন সাহেব দোতলার বারান্দায় বসে সিগারেট টানছেন। জুতো-টুতো খুলে পা তুলে বসেছেন। আমাকে দেখে হাসি মুখে বললেন, 'সিগারেট খাবার জন্যে এলাম। মুরব্বীদের সামনে তো আর খাওয়া যায় না। কি বলেন ?'

'তা তো ঠিকই। চা খাবেন ?'

'তা বেশ তো। চা খেলে তো ভালই হয়। অসুবিধা তো কিছু দেখছি না।'

লোকটির মাথায় কি ছিট আছে ? আমি আড়চোখে তাকালাম তাঁর দিকে। কেমন নিশ্চিন্তে পা তুলে বসে আছেন। কোন ভাবনা চিন্তা নেই।

'শফিক ভাই, আমি বসে বসে এতক্ষণ আপনার কাকটার কথা ভাবছিলাম, যার নাম রেখেছিলেন কনিষ্ক।'

'কি ভাবছিলেন ?'

'না, বলা ঠিক হবে না আপনাকে।'

আমি আচমকা বললাম, 'আমেরিকায় কি করতেন আপনি ?'

'পড়াশোনা। পি. এইচ. ডি করেছি এগ্রনমিতে।'

আমি অবাক হয়েই তাকালাম। কে বলবে এই লোকটির একটি পি. এইচ. ডি ডিগ্রী আছে। কেমন নির্বোধ চোখ। ঢিলেঢালা ভাব-ভঙ্গি। মতিনউদ্দিন সাহেব বিকেল পর্যন্ত আমার বারান্দায় বসে রইলেন। সন্ধ্যার আগে আগে তাঁকে নিতে তাঁর বড় ভাই আসবেন গাড়ি নিয়ে। তিনি গাড়ির জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। আমার বিরক্তির

AMARBOI.COM

সীমা রইল না। বিলু একবার এসে বললো নিচে যেতে। তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন, বারান্দায় বেশ বাতাস, তিনি বাতাস ছেড়ে নিচে যেতে চান না। বিলুকে এইটুকু বলতেই তাঁর কান টান লাল হয়ে একাকার হল।

সন্ধ্যাবেলা কোনো গাড়ি এল না। শোনা গেল ঝিকাতলা এলাকায় কি একটা ঝামেলা হয়েছে। ঝিকাতলা থেকে ধানমণ্ডি পনেরো নম্বর পর্যন্ত প্রতিটি বাড়ি নাকি সার্চ করা হবে। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে একটা জীপে মাইক লাগিয়ে বলা হল, এই অঞ্চলে পরবর্তি নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত কার্ফু ঘোষণা করা হয়েছে। তার কিছুক্ষণ পরই কারেন্ট চলে গেল। কাদের হারিকেন জ্বালিয়ে আবার নিভিয়ে ফেললো। মিলিটারি সার্চের সময় অন্ধকার থাকাই নাকি ভাল। এতে তারা মনে করে বাড়িতে লোকজন নেই। মতিনউদ্দিন সাহেব একেবারেই চুপ হয়ে গেলেন। বিলু যখন এসে বললো, খাবার দেয়া হয়েছে—তিনি বললেন, তাঁর একেবারেই খিদে নেই।

গভীর রাত পর্যন্ত আমি এবং মতিনউদ্দিন সাহেব অন্ধকার বারান্দায় চুপচাপ বসে রইলাম। রাত একটায় বাসার সামনে দিয়ে একটি খোলা জীপ গেল। সেই জীপটিই আবার রাত দেড়টার দিকে ফিরে গেল। আমি বললাম, 'ঘুমাবেন নাকি মতিন সাহেব? কাদের জায়গা করেছে।'

মতিন সাহেব শুকনো গলায় বললেন, 'না ঘুম আসছে না?'

আমি বললাম, ভয় লাগছে না?'

'জ্বি-না। বড্ড মশা।'

মতিন সাহেব সিগারেট ধরিয়ে হঠাৎ বললেন, 'এটা বাংলা কোন মাস?'

তাঁর কথার জবাব দেবার আগেই জলিল সাহেবের স্ত্রীর কান্না শোনা গেল।'

'কে কাঁদে?'

'জলিল সাহেবের স্ত্রী। ওর স্বামীর কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।'

'কি সর্বনাশ, বলেন কি আপনি!'

মতিন সাহেব এমন ভাবে চেঁচিয়ে উঠলেন, যেন এরকম ভয়াবহ কথা এর আগে শোনেননি। সেই খোলা জীপটা এসে থামলো বাসার গেটের কাছে। কাদের ফিস ফিস করে বললো, 'দোয়া ইউনুস পড়েন ছোড ভাই। ভয়ের কিছু নাই।'

AMARBOI.COM

দোয়া ইউনুস কিছুতেই মনে করতে পারলাম না। কাদের মতিন সাহেবের সার্ট টেনে চাপা স্বরে বললো, 'সিগারেট ফেলেন। আগুন দূর থাইক্যা দেখা যায়।'

গাড়িটি এখানে অনন্তকাল দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি? না, চলতে শুরু করেছে। এইতো যাচ্ছে বড় রাস্তার দিকে। আমার দোয়া ইউনুস মনে পড়ল। লাইলাহা ইল্লা আন্তা সোবাহানকা ইনি কুন্তু মিনায যোয়ালেমিন।

জলিল সাহেবের ভাই এখনো দেশে ফেরেননি।

সমগ্র ঢাকা শহর চড়ে বেড়াচ্ছেন। কিভাবে-কিভাবে যেন একজন কর্ণেলের সঙ্গে দেখা করে দরখাস্ত দিয়ে এসেছেন। দৈনিক পাকিস্তানে 'সন্ধান চাই' এই শিরোনামে একটি বিজ্ঞাপনে দিয়েছেন এবং সন্ধান-দাতাকে নগদ পাঁচশ টাকা পুরস্কারের কথাও ঘোষণা করেছেন।

পুরস্কার ঘোষণা কাজে দিয়েছে বলা যেতে পারে। কালো মত লম্বা এক লোক এসে হাজির। তার চোখে নিকেলের চশমা, নিচের পাটির একটি দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো। জলিল সাহেবের ভাই লোকটিকে আমার কাছে এসে হাজির করলেন। লোকটির বক্তব্য বিজ্ঞাপনের বর্ণনা মত একজন লোক মীরপুর বারো নম্বরে আটক আছে। তাকে ছাড়িয়ে আনা যাবে না, তবে এক হাজার টাকা দিলে সে দেখা করিয়ে দিতে পারে। আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। যথাসম্ভব শান্ত স্বরে বললাম, 'আপনি নিজে দেখেছেন?'

'জ্বি জনাব। নিজে না দেখলে বলি কেন? তবে আগের মত নাই, অনেক রোগা হয়ে গেছেন।'

'আপনি দেখলেন কি ভাবে? মীরপুর বারো নম্বরে আপনি কি করেন?'

'আমার চেনাজানা লোক আছে।'

'বাড়ি কোথায় আপনার?'

'বাড়ি দিয়ে আপনার দরকার কি? দেখা করিয়ে দিলেই তো হয়।'

'কখন দেখা করাবেন?'

'এখন বলতে পারব না। খোঁজ খবর নিয়ে বলতে হবে।'

AMARBOI.COM

আমি গম্ভীর গলায় বললাম, 'আপনার সঙ্গে যখন দেখা হয়, তখন এক কাজ করেন না কেন, জলিল সাহেবকে দিয়ে এক লাইনের একটা লেখা লেখিয়ে আনেন, আপনাকে সঙ্গে সঙ্গে এক হাজার টাকা দেয়া হবে।'

লোকটি সঙ্গে সঙ্গে রেগে উঠলো।

'আপনে আমার কথা বিশ্বাস করেন নাই। আপনার সাথে ভাই আমি নাই। আমার এক কথা, আমি দেখা করিয়ে দেব। কিন্তু টাকাটা আমাকে এখন দিতে হবে।'

'এখন দিতে হবে?'

'জি জনাব। অর্ধেক এখন দেন আর বাকি অর্ধেক দেখা হওয়ার দিন দেন। ব্যাস সাফ কথা।'

আমি ঠাণ্ডা গলায় কাদেরকে বললাম, 'এই লোকটাকে ঘাড় ধরে বের করে দে কাদের।'

জলিল সাহেবের ভাই দারুণ অবাক হয়ে বললেন, 'আরে না না। এই সব কি বলছেন। আসেন তো ভাই আপনি আমার সাথে। চা পানি খান। আসেন দেখি। অবিশ্বাস করার কি আছে? মাবুদে এলাহী অবিশ্বাস করবো কেন? আপনি কি আর খামাখা মিথ্যা কথা বলবেন?'

AMARBOI.COM

সন্ধ্যাবেলা খবর পেলাম লোকটিকে পাঁচশ টাকা দেয়া হয়েছে এবং একটা টিফিন কেরিয়ারে করে গোশত পারাটা দেয়া হয়েছে পৌঁছে দেবার জন্যে। লোকটি বলে গেছে সে বৃহস্পতিবার বিকেলে এসে জলিল সাহেবের ভাইকে মীরপুর বাড়ি ঘরে নিয়ে যাবে। লোকটি যে আর আসবে না সেই সম্পর্কে আমি ষোল আনা নিশ্চিত ছিলাম।

কিন্তু সে সত্যি সত্যি বৃহস্পতিবার বেলা দুটার সময় এসে হাজির। খালি টিফিন কেরিয়ারটিও সঙ্গে নিয়ে এসেছে। সে অবশ্যি দেখা করানোর জন্যে জলিল সাহেবের ভাইকে মীরপুরে নিয়ে গেল না। তার জন্যে নাকি অন্য এক বিহারী ব্যক্তির (সুলায়মান খাঁ) সঙ্গে যোগাযোগ হওয়া প্রয়োজন। সেই লোক রোববার আসবে। রোববারে অবশ্যি দেখা হবে। এবারও লোকটি একটি কম্বল, একটি বালিশ এবং দুশ টাকা নিয়ে গেল।

জলিল সাহেবের ভাইয়ের ধৈর্য সীমাহীন। তিনি রোববার ভোরে গেলেন, মঙ্গলবার দুপুরে গেলেন এবং আবার বৃহস্পতিবার সকালে গিয়ে সন্ধ্যাবেলা গায়ে জ্বর নিয়ে ফিরে এলেন। আমি দেখতে গেলাম রাতে।

বেশ জ্বর। ভদ্রলোক লেপ গায়ে দিয়ে কুণ্ডুলী পাকিয়ে শুয়ে ছিলেন। আমাকে দেখে উঠে বসতে চেষ্টা করলেন।

'শুয়ে থাকেন, উঠতে হবে না। আজকেও দেখা হয়নি?'

'জ্বি না। সামনের মাসের দুই তারিখ যাইতে বলে।'

'যাবেন?'

'জ্বি না। ওরা কোন খোঁজ জানে না। শুধু পেরেশানী করে।'

'এতদিনে বুঝলেন?'

'বুঝছি আগেই ভাই, কিন্তু কি করব—মিথ্যাটাই বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়।'

'আরো খোঁজখবর করবেন?'

'জ্বি না, আগামী মঙ্গলবার ইনশাল্লাহ্ দেশের বাড়ি রওনা হব।'

'ঠিক আছে আপনি বিশ্রাম করেন। পরে কথা বলব।'

'না ভাই একটু বসেন। এক কাপ চা খান। আমিনা ও আমিনা।'

আমিনা সম্ভবত জলিল সাহেবের স্ত্রী। কঠিন পর্দা এঁদের। তিনি এলেন না। দরজার ওপাশে খট খট শব্দে জানান দিলেন। জলিল সাহেবের ভাই শান্ত স্বরে বললেন, 'আমিনা, রোজ কেয়ামতের দিন কোনো পর্দা থাকে না। মেয়ে পুরুষ তখন সব সমান। এখন সময়টা কেয়ামতের মত। এখন কোন পর্দা পুশিদা নাই। তুমি আস চা নিয়া।'

জলিল সাহেবের স্ত্রীকে দেখে আমি বড়ই অবাক হলাম। নিতান্ত বাচ্চা একটি মেয়ে। শ্যামলা ছিপছিপে গড়ন। খুব লম্বা ঘন কালো চুল। এই বয়সের মেয়েরা বেনী দুলিয়ে স্কুলে যায়। হাত ভরতি আচার নিয়ে বারান্দায় বসে চেটে চেটে খায়। মেয়েটি নিজে থেকেই বললো, 'আপনার কি মনে হয় তাকে মেরে ফেলেছে?'

আমি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারলাম না। মেয়েটি থেমে থেমে বললো, 'তাকে কেন মারবে বলেন? সে তো কিছুই করে নাই। সে তো মানুষকে একটা কড়া কথা পর্যন্ত বলতে পারে না। সাত বৎসর বয়স থেকে কোন নামাজ কাজা করে নাই। কেন আল্লাহ্ এমন করবেন?'

জলিল সাহেবের ভাই গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আল্লাহ্‌র কাজের কোন সমালোচনা নাই আমিনা। গাফুরুর রাহিম যা জানেন আমরা সেইটা জানি না।'

মঙ্গলবার দুপুরে জলিল সাহেবের ভাই সবাইকে নিয়ে চাঁদপুর চলে গেলেন। একটি ঠিকানা দিয়ে গেলেন কোন খবর থাকলে জানাবার জন্যে। ভদ্রলোক রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে থাকলেন। আমার কিছু

AMARBOI.COM

একটা বলা উচিত। কোন একটা আশার কথা। অর্থহীন কোন সান্ত্বনার বাণী। কিছুই বলতে পারলাম না।

রাত্রে অনেকদিন পর কোনো কান্না শোনা গেল না। তাদের তালা দেয়া বাড়ির সামনে একটা কুকুর এসে শুয়ে থাকলো। রাত দশটার দিকে দেখি সেই বাড়ির বারান্দায় বসে নেজাম সাহেব সিগারেট টানছেন। জলিল সাহেবের ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর বেশ খাতির হয়েছিল। প্রায়ই দেখতাম দুজন এক সঙ্গে বেরুচ্ছেন।

মতিনউদ্দিন সাহেব আজকাল খুব ঘন ঘন আসেন। আজিজ সাহেবের ঘরে না গিয়ে সরাসরি উঠে আসেন দোতলায়। আমার খোঁজ করেন না, চিকন সুরে কাদেরকে ডাকেন, 'ও কাদের মিয়া। কাদের আছ নাকি?'

কাদের সাড়া দিলেই তিনি অসঙ্কোচে বলেন, 'কাদের মিয়া, রাতে এখানে খাবো।'

বড়ই আশ্চর্য লাগে আমার কাছে। একদিন বিকেলে এসে দেখি ভদ্রলোক আমার বিছানায় চাদর মুড়ি দিয়ে নির্বিঘ্নে ঘুমচ্ছেন। কাদের আমাকে ফিস ফিস করে বললো, 'ইনার শরীলডা খারাপ। গায়ে জ্বর।'

'কাদের, রাত্রে আমি ভাত খাব না। রুটি করবে।'

আমাকে বললেন, 'জ্বর গায়ে ভাত খাওয়াটা ঠিক হবে না। কি বলেন শফিক ভাই।'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, 'আপনি কি এখানেই থাকবেন নাকি?'

ভদ্রলোক আমার চেয়েও আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'জ্বরজ্বারি নিয়ে যাব কোথায়? কাজের জন্যে যে ছেলে রেখেছিলাম সেটাও চলে গেছে। একা একা থাকি কি করে?'

তাকিয়ে দেখি ভদ্রলোক দুটি প্রকাণ্ড কালো রঙের স্যুটকেস সাথে করে নিয়ে এসেছেন।

বিলু ভদ্রলোকের কাণ্ড দেখে টেনে টেনে খুব হাসতে লাগলো। আমার সামনেই নীলুকে বললো, 'আমি তোমাকে কতবার বলেছি, ভদ্রলোকের মাথা পুরোপুরি খারাপ। তুমি তো বিশ্বাস কর না।'

নীলু খুবই রাগ করলো। একেবারে কেঁদে ফেলার মত অবস্থা। চোখ মুখ লাল করে বললো, 'কি মনে করে ঘরবাড়ি নিয়ে আপনি অন্যের বাড়িতে উঠে আসলেন?'

'একলা থাকতে পারি না নীলু। ভয় লাগে।'

'ভয় লাগে! আপনি কচি খোকা নাকি?

AMARBOI.COM

নীলু সত্যি সত্যি কেঁদে ফেললো। আমি অবস্থা সামলাবার জন্যে বললাম, 'এই সময় একা একা থাকাটা ভয়েরই কথা।'

নিচ থেকে নেজাম সাহেব হৈ চৈ শুনে এসেছিলেন। তিনি মহা উৎসাহে বললেন, 'কোনো অসুবিধা নাই। আপনি ভাই আমার সঙ্গে থাকেন। ভূতের উপদ্রপ এই বাড়িতে। একা একা থাকতে আমারো ভয় লাগে।'

মতিনউদ্দিন সাহেব পরদিন কাদেরকে নিয়ে বাড়ি থেকে সব জিনিসপত্র নিয়ে এলেন। মোহাম্মদপুরের বাবর রোডে বিরাট এক একতলা বাড়ি ভাড়া করে থাকতেন। কাদেরের ভাষায় ঐ বাড়িতে একা একা জ্বীনও থাকতে পারে না। আশপাশে কোনো বাড়িতে কোনো লোক নেই। এই কদিন ভদ্রলোক কি করে একা একা ছিলেন তাই না-কি এক রহস্য।

কাদেরের কাছ থেকে আরো জানা গেল যে মতিনউদ্দিন সাহেব এই দেশে থাকবেন না, আবার চলে যাবেন। ভিসার জন্যে দরখাস্ত করেছেন। নতুন ব্যবস্থায় আজিজ সাহেব মহা খুশি। তার মতে এটি একটি উত্তম ব্যবস্থা। সব দিক থেকেই ভাল। নীলুর মনোভাব ঠিক বোঝা যায় না। তাকে মতিনউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে গল্প টল্প করতে দেখি না, তবে একদিন দেখলাম জামগাছের নিচে দুজনে কথা বলতে বলতে হাঁটছে। আমাকে দেখতে পেয়ে নীলু চট করে আড়ালে সরে গেল। কি জন্যে কে জানে।

আজিজ সাহেব আজকাল আর আগের মত আমাকে ডেকে পাঠান না। তাঁর ব্যস্ততা হঠাৎ করে খুব বেড়েছে। তিনি স্থির করেছেন ছাব্বিশে মার্চের পর থেকে কোথায় কি হচ্ছে সব লিখে রাখবেন। লেখার কাজটা করবে বিলু। তিনটি আলাদা আলাদা খাতা করা হয়েছে। একটিতে লেখা হচ্ছে পাকিস্তান রেডিওর খবর, অন্যটিতে আকাশবাণী কলকাতার। তৃতীয়টি হচ্ছে স্বাধীন বাংলা, বি বি সি এবং ভয়েস অব আমেরিকার জন্যে।

জুন মাসে ঢাকার অবস্থা অনেক ভাল হয়ে গেল। কার্ফু সময়সীমা কমিয়ে রাত বারোটা থেকে সকাল ছটা করা হল। রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় যে সব মিলিটারি চেকপোস্ট ছিল, সেখান থেকে মিলিটারি সরিয়ে পুলিশ বসানো হল। ঢাকার সমস্ত পুলিশ মিলিটারির সঙ্গে যুদ্ধে মারা গেছে বলে যে খবর পেয়েছিলাম সেটি বোধ হয় পুরোপুরি সত্যি নয়। চারদিকে প্রচুর পুলিশ দেখা যেতে লাগলো।

AMARBOI.COM

সেন্ট্রাল শান্তি কমিটি থেকে বলা হল, সমগ্র দেশের অবস্থা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। একজন ফরাসী সাংবাদিক পত্রিকায় বিবৃতি দিলেন। দেশের শান্তি শৃঙখলার সার্বিক উন্নতি হয়েছে। তেমন কোন অস্বাভাবিকতা তাঁর চোখে পড়েনি। জনগণের মধ্যে আস্থার ভাব পুরোপুরি ফিরে এসেছে।

নীলক্ষেতের রাস্তা দিয়ে আসবার সময় দেখি মহসিন হলের অনেকগুলো জানালা খোলা। ছেলেরা দড়িতে সার্ট শুকোতে দিয়েছে। সত্যি সত্যি হল খুলে দেয়া হয়েছে না-কি? হতেও পারে। পত্রিকায় দেখলাম আসন্ন রমজান উপলক্ষ্যে রেশনে ঘি এবং সুজি দেয়া হবে।

ঠিক এই সময় রফিকের ছোট ভাইটির বিয়ে হয়ে গেল। হঠাৎ করেই নাকি সব ঠিক হয়েছে। দুপুরবেলায় বিয়ে। আমাকে বরযাত্রী যেতে হল। রফিককে মনে হল বেশ সঙ্কুচিত। তাকে বাদ দিয়ে ছোট ভাইয়ের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে, এই কারণেই কি-না কে জানে।

বিয়েবাড়িতে গিয়ে দেখি হুলস্থূল কারবার। গেটের সামনে ব্যাণ্ড পার্টি। ছোট ছোট মেয়েরা পরীর মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। বড় ভাল লাগলো দেখে। গেটধরনীরা হাজার টাকার কমে গেট ছাড়বে না। শুধু টাকা দিলেই হবে না, তিনটি ধাঁধা আছে, ভেতরে ঢুকতে হলে সেগুলোও ভাঙতে হবে। একটি ধাঁধা হচ্ছে, কাটলে কোন জিনিস বড় হয়। বরযাত্রী যারা ছিলাম কারোর বুদ্ধি শুদ্ধি বোধ হয় সে রকম নয়। আমরা কেউই একটি ধাঁধারও উত্তর দিতে পারলাম না। বাচ্চা মেয়েগুলো খুব হাসাহাসি করতে লাগলো। হাসাহাসি করলে কি হবে, সবগুলো বিচ্ছু—গেট খুলবে না। শেষ পর্যন্ত মেয়ের বাবা এসে ধমক দিলেন, 'গেট খোল। সব সময় ফাজলামী।'

বিয়ে পড়ানো হয়ে গেল নিমিষের মধ্যেই। 'দেন মোহরান'—যা নিয়ে দু পক্ষই ঘন্টাদুয়েক দড়ি টানাটানি করেন, তাও দেখি আগেই ঠিক করা। শুধু কবুল বলে নাম সই। বিয়ে বলতে এইটুকুই।

খেতে গিয়েও দেখি এলাহী ব্যবস্থা। জনপ্রতি ফুল রোস্ট, কাবাব রেজালা। আমার পাশে রোগামত একটি লোক বসেছিলো। সে আমার পেটে খোঁচা মেরে ফিস ফিস করে বললো, 'ব্রিগেডিয়ার বখতিয়ার এসেছে দেখেছেন?'

'কোথায় ব্রিগেডিয়ার বখতিয়ার?'

'ঐ যে দেখছেন না সানগ্লাস পরা। খাস পাঞ্জাব রেজিমেন্ট। আর্মড কোরের লোক। বডি দেখেছেন?'

AMARBOI.COM

আমি দেখলাম লম্বা করে রোগামত একটি লোক। বেশ কিছু লোক ঘুর-ঘুর করছে তার সঙ্গে।

'কতবড় দালাল দেখেছেন? পাঞ্জাবীর সাথে পিতলা খাতির।'

খাওয়া দাওয়া শেষ হতেই রফিক আমাকে বউ দেখাতে নিয়ে গেল। মেয়েটি দেখে আমি স্তম্ভিত। যেন সত্যি সত্যি একটি জলপরী বসে আছে। এমন সুন্দর মেয়েও পৃথিবীতে আছে!

দুপুর বেলা হঠাৎ চারদিক অন্ধকার করে ঝড় এলো।

জামগাছ থেকে শন শন শব্দ উঠতে লাগলো, একতলার কলঘরের টিনের চাল উড়ে চলে গেল। ঝড় একটু কমতেই শুরু হল বর্ষণ। তুমুল বর্ষণ। দরজা জানালা সব বন্ধ, তবু ফাঁক দিয়ে পানি এসে ঘর ভাসিয়ে দিল। কাদের মহা উৎসাহে ছোটাছুটি করছে। একবার নিচে যাচ্ছে, আবার ওপরে উঠে আসছে। তার ব্যস্ততা সীমাহীন ব্যস্ততা। আমি চা করতে বলেছিলাম, সে তার ধার দিয়েও যাচ্ছে না। একবার এসে হাসি মুখে বললো, 'বিলু আফার ঘরের একটা জানালার কাম সাফ। উইড়া গেছে।'

উল্লসিত হওয়ার মত কোনো ঘটনা নয়। কিন্তু কাদেরের মনস্তত্ত্ব বোঝার সাধ্য আমার নেই। আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, 'হাসি তামাশার কি আছে এর মধ্যে?'

ঠিক এই সময় একতলা থেকে নেজাম সাহেব ভীত স্বরে ডাকতে লাগলেন,—'শফিক ভাই শফিক ভাই'। আমার উত্তর দেবার আগেই কাদের মিয়া বিদ্যুৎগতিতে নিচে নেমে গেল। সেখান থেকে সেও চেঁচাতে লাগলো, 'ও ছোড মিয়া, ও ছোড মিয়া।' আমি গিয়ে দেখি জলিল সাহেব। মাথার চুল কামানো। গায়ে একটি গেঞ্জি এবং ফুল প্যান্ট। আমাকে দেখে বললেন, 'ভাল আছেন শফিক ভাই?'

নেজাম সাহেব বললেন, 'হাতটার অবস্থা দেখেছেন?'

হাতের দিকে তাকিয়ে আমি শিউরে উঠলাম। তাঁর বাঁ হাতটি কুনুইয়ের নিচ থেকে শুকিয়ে গেছে। আমি বললাম, 'আপনার বৌ আর মেয়ে ভাল আছে। আপনার ভাই এসে তাদের নিয়ে গেছে চাঁদপুর।'

জলিল সাহেবের কোন ভাবান্তর হল না। থেমে থেমে বললেন, 'খিদে লাগছে, ভাত খাব।'

AMARBOI.COM

ভাত খেয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়লেন। সন্ধ্যাবেলা দেখা গেল তাঁর প্রচণ্ড জ্বর। চোখ রক্তবর্ণ। মনে হল কাউকে চিনতে পারছেন না।

নেজাম সাহেব বললেন, 'জলিল ভাই আমাকে চিনতে পারছেন? আমি নেজাম।'

জলিল সাহেব উত্তর দেন না।

'কি চিনতে পারছেন না?'

জলিল সাহেব বললেন, 'পানি দেন ভাইসাব, তিয়াস লাগে।'

কাদের দৌড়ে গিয়ে ডাক্তার আনলো। আর আমাদের সবাইকে স্তম্ভিত করে জলিল সাহেব রাত একটার সময় মারা গেলেন। মারা যাবার আগ মুহূর্তে খুব সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষের মত কথাবার্তা বললেন। বউ কোথায়? মেয়েটি কেমন আছে জিজ্ঞেস করলেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। নেজাম সাহেব বললেন, 'হাতটা এ রকম হল কেন?'

জলিল সাহেব তার উত্তর দিলেন না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি এতদিন কোথায় ছিলেন?'

'মিলিটারিরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল। গুলি খাবার কাছ থেকে।'

'কবে ছেড়েছে?'

'গত পরশু।'

'বলেন কি! এই দুই দিন আপনি কোথায় ছিলেন?'

জলিল সাহেব তার উত্তর দিলেন না। এর কিছুক্ষণ পরই তাঁর মৃত্যু হল। আমি চলে এলাম ওপরে। এসে দেখি মতিনউদ্দিন সাহেব ইজি চেয়ারে বসে হাউ মাউ করে কাঁদছেন।

ঝড় বৃষ্টি কেটে গিয়ে মধ্যরাতে আকাশ কাঁচের মত পরিষ্কার হয়ে গেল। প্রকাণ্ড একটি চাঁদ ঝকমক করতে লাগলো সেখানে। সেই অসহ্য জোৎস্নার দিকে তাকিয়ে থেকে শুনলাম অনেক দিন পর জলিল সাহেবের বউ কাঁদছে। সরু মেয়েলী গলায় গাঢ় বিষাদের কান্না—'কে কাঁদছে?' কাদের মিয়া বললো, 'বিলু আফা কানতাছে।'

বিলু নিলু দুই বোন সমস্ত রাত জলিল সাহেবের মাথার পাশে বসে রইল।

মৌলবী ইজাবুদ্দিন সাহেব এম. এ. (এল. এল. বি.) খবর পাঠিয়েছেন—আমি যেন অবশ্যি তাঁর সঙ্গে দেখা করি, বিশেষ প্রয়োজন।

AMARBOI.COM

দুবার গিয়ে তাঁকে পেলাম না। তিনি আজকাল ভীষণ ব্যস্ত। বাসায় টেলিফোন এসেছে। সন্ধ্যার পর দুজন আনসার তাঁর বাড়ি পাহারা দেয়। আগে তাঁর বাড়ির বারান্দায় কোনো আলো ছিল না। এখন তিন দিকে একশ পাওয়ারের তিনটি বাতি জ্বলে।

কোন মানুষকে দু বার গিয়ে না পাওয়া গেলে তৃতীয়বার যাওয়ার উৎসাহ থাকে না। তা ছাড়া আমি ভেবে দেখলাম, আমাকে তাঁর বিশেষ প্রয়োজন হওয়ার কোনোই কারণ নেই। আমি আর না যাওয়াই ঠিক করলাম। তৃতীয় দিন ইজাবুদ্দিন সাহেব আমাকে নেয়ার জন্যে গাড়ি পাঠালেন। গাড়িতে অসম্ভব রোগা এবং অসম্ভব লম্বা একটি লোক বসেছিল। সে কড়া গলায় বললো, 'আপনাকে ডাকা হয়েছে তবু আপনি আসেননি কেন ?

আমার সঙ্গে কেউ কড়া গলায় কথা বললে আমি সাধারণত কড়া গলায় জবাব দিই। কিন্তু দিন কাল ভালো না, কাজেই সহজ ভঙ্গিতে বললাম, 'আপনি কে ?'

'তা' দিয়ে আপনার দরকার কি ?'

'আপনি কি ইজাবুদ্দীন সাহেবের সঙ্গে কাজ করেন ? আপনাকে তো দেখিনি।'

'আপনি বেশি কথা বলেন। বেশি কথা বলা ঠিক না।'

'ঠিক না কেন বলুন তো ?'

লোকটি কঠিন মুখে চুপ করে রইল।

ইজাবুদ্দিন সাহেব কিন্তু এমন ভাব করলেন যেন আমি একজন মহা সম্মানিত ব্যক্তি। গাড়ি থামা মাত্র ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নরম স্বরে বললেন, 'আসতে কোন তকলিফ হয় নাই তো ?'

'না কোন তকলিফ হয়নি। ব্যাপারটা কি ?'

'আরে না ভাই কিছু না। কথা-বার্তা বলার জন্যে ডাকলাম। আসেন ভেতরে গিয়ে বসি।'

ভেতরে অনেক লোকজন বসে ছিল। এঁদের মধ্যে একজনের মাথায় একটি ঝলমলে ঝুটিওয়ালা টুপি। লোকজন এখনো এই জাতীয় টুপি পরে, আমার জানা ছিল না। গাড়ির সেই শুকনো লোকটিকে দেখলাম আলাদা একটা টেবিলে। টেবিলে ফাইলপত্রও আছে। ইজাবুদ্দিন সাহেব বললেন, 'আপনার এইখানে একজন লোক মারা গেছে শুনলাম। কিভাবে মারা গেল, কি সমাচার ?'

AMARBOI.COM

আমি বেশ স্পষ্ট স্বরেই বললাম, 'মিলিটারিরা পিটিয়ে মেরে ফেলেছে।'

'বলেন কি সাহেব!'

ইজাবুদ্দিন সাহেব এমন ভাব করলেন, যেন অকল্পনীয় একটি ঘটনা শুনলেন। সেই শুকনো লোকটি সরু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তুর্কি টুপি পরা ভদ্রলোক বিড়বিড় করে কি যেন বললেন। তিনি এক সময় গলার স্বর উঁচু করে বললেন, 'লোকটি কে?'

'আমার একজন ভাড়াটে। পরহেজগার লোক। সাত বছর বয়স থেকে নামাজ কাজা করেনি।'

ইজাবুদ্দিন সাহেব থেমে থেমে বললেন, 'বড়ই আফসোসের কথা। সিপাইদের হাতে দুএকটা এই রকম ঘটনা ঘটেছে। দশজন মন্দের সাথে একজন ভালও শাস্তি পায়। দুনিয়ার নিয়মই এই। আমি ব্রিগেডিয়ার সাহেবকে নিজে বলব ব্যাপারটা। ভবিষ্যতে এই রকম যেন না হয়।'

আমি চুপ করে রইলাম। তুর্কি টুপি পরা ভদ্রলোক বললেন, 'মৃত্যু স্বয়ং আল্লাহ্‌পাকের হাতে। আল্লাহ্‌পাক যদি ঐ লোকের মৃত্যু মিলিটারির হাতে লিখে থাকেন, তাহলে হবেই। আপনি আমি কিছুই করতে পারব না। কি বলেন ইজাবুদ্দিন সাহেব?'

ইজাবুদ্দিন সাহেব কোনো উত্তর দিলেন না। আমি বললাম—'আপনি কি এটার জন্যেই ডেকেছেন?'

'জ্বি না, আমি ডেকেছি অন্য ব্যাপারে। স্থানীয় কিছু গণ্য-মান্য লোকদের নিয়ে একটা শান্তি সভা হবে। যাতে মানুষের মন থেকে ভয়-ভীতি দূর হয়। সবারই এখন মিলেমিশে থাকা দরকার। আপনার বাবা ছিলেন এই অঞ্চলের একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক। পাকিস্তান হাসেলের জন্যে তিনি যে কি করেছেন তা তো আপনি জানেন না, জানি আমি। জিন্নাহ্‌ সাহেবের সাথে তাঁর চিঠিপত্রের যোগাযোগ ছিল। তাঁর ছেলে হিসাবে আপনার শান্তি সভাতে থাকা দরকার।

'আমি থাকবো।'

'তা তো থাকবেনই। না থাকলে কি আর আমি ডাকতাম আপনাকে? মানুষ চিনি তো। আপনার দুলাভাইয়ের সঙ্গে দেখা হল সেদিন। তিনি আবার ব্রিগেডিয়ার তোফাজ্জল সাহেবের বিশিষ্ট বন্ধু।

AMARBOI.COM

ইংল্যাণ্ডে উনার সঙ্গে ব্রিগেডিয়ার সাহেবের পরিচয়। জানি তো সব, হা হা হা।'

ইজাবুদ্দিন সাহেব আমাকে গাড়িতে করে ফেরত পাঠালেন। সেই শুকনো লোকটা এবারো যাচ্ছে আমার সঙ্গে। তার ভাবভঙ্গি এখন আর আগের মত নয়। খুব বিনীত অবস্থা। গাড়ি ছাড়া মাত্র বললো, 'কোনো রকম অসুবিধা হলে বলবেন আমাকে।'

'আপনাকে বলব কেন ?'

'না, আমি মানে খোঁজ খবর রাখি। অনেক রকম কানেকশন আছে, ইয়ে কি যেন বলে......'

লোকটি থতমত খেয়ে চুপ করে গেল।

বাসায় এসে দেখি বড় আপা চিঠি পাঠিয়েছে। তাতে লেখা—'আগামী কাল দুপুরে আমরা নীলগঞ্জে চলে যাচ্ছি। তুমি অবশ্যই তোমার জিনিসপত্র নিয়ে চলে আসবে। তোমার দুলাভাইয়ের ধারণা, অবস্থা খুব খারাপ।'

আমি অবস্থা খারাপের তেমন কোনো লক্ষণ দেখলাম না। সব কিছুই বেশ স্বাভাবিক। মুক্তিবাহিনী টাহিনী বলে কিছু নেই বলেই মনে হচ্ছে। বড় আপার ধারণা মুক্তিবাহিনীর সমস্ত ব্যাপারটাই আকাশ-বাণী কোলকাতার দেবদুলাল বাবুর কল্পনা। বড় আপাকে ঠিক দোষও দেয়া যায় না। কোলকাতার খবরগুলোর প্রায় বারআনাই মিথ্যা। তাদের খবর অনুসারে যেদিন মুক্তিবাহিনীর বোমায় মগ-বাজার বিদ্যুৎ ট্রান্সমিশন কেন্দ্র সম্পূর্ণ বিকল বলা হল, তার পরদিনই বড় আপার বাসায় খাবার সময় দেখি সব ঠিক ঠাক আছে। আরেক দিন বলা হল—মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ সমরের ফল হিসেবে ঢাকার রাজপথ আজ জনশূন্য। আমি দেখলাম দিব্যি লোকজন চলাচল করছে।

আমার জানামতে দুজন লোককেই পাওয়া গেল, যাদের স্বাধীন বাংলা বেতার এবং কোলকাতা বেতারের খবরের উপর পূর্ণ আস্থা। একজন আমাদের আজিজ সাহেব, অন্যজন কাদের মিয়া। কাদের মিয়া আবার যা শোনে তার তিন গুণ বলে। রাতে শোবার আগে সে ইদানীং নিচু গলায় বলছে, 'ছোড ভাই, মিলিটারির পাতলা পায়খানা শুরু হইছে।'

আমি এই জাতীয় আলোচনায় বিশেষ উৎসাহ দেখাই না, কিন্তু কাদেরের কোন উৎসাহের প্রয়োজন হয় না।

AMARBOI.COM

'বিবিসির খবর ছোড ভাই, চিটাগাং-এ পুরা ফাইট। ঢাকা শহরেও শুরু হইছে। খেইল জমতাছে ছোড ভাই।'

'কই আমিতো কোন খেইল দেখি না।'

'ছোড ভাই এইসব তো দেখনের জিনিস না। ভিতরের ব্যাপার। ইসকুরু টাইট হইতাছে ছোড ভাই।'

'টাইট দেয়া হলে তো ভালই।'

কাদেরের আগের ভাব এখন নেই। আগে সে বাড়ি ঘর ছেড়ে বড় আপার বাসায় গিয়ে ওঠার জন্যে ব্যস্ত ছিল, এখন সে ব্যস্ততা নেই। তবে তার কাজ অনেক বেড়েছে। প্রতিদিনই একবার মতিনউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে তার বৈঠক বসে। সেই বৈঠক রাত দশটা এগারোটা পর্যন্ত চলে। একদিন দেখি সে মতিনউদ্দিন সাহেবের প্যাকেট থেকে সিগারেট নিচ্ছে। মতিনউদ্দিন সাহেব লাইটার এগিয়ে দিলেন। সকালবেলা নীলু যখন খবরের কাগজ পড়ে তার বাবাকে শোনায়, কাদের মিয়া সেখানেও হাজির থাকে। এবং পড়া শেষ হলে গম্ভীর হয়ে বলে, 'একটাও সত্যি খবর নাই।' এ ব্যাপারে আজিজ সাহেবও তার সঙ্গে পুরোপুরি একমত।

মগবাজারে বড় আপার বাসায় গিয়ে দেখি তাদের যাওয়া বাতিল হয়ে গেছে। বড় আপা মহা খুশি। কাপড় চোপড় স্যুটকেস থেকে নামানো হচ্ছে। বেশ একটা খুশি খুশি ব্যস্ততা।

'তোমাদের যাওয়ার কি হল ?'

'তোর দুলাভাইকে জিজ্ঞেস কর, আমি কিছু জানি না।'

দুলাভাই ঠিক পরিষ্কার করে কিছু বলেন না। তাঁর হাবভাবে মনে হল অবস্থা যতটা খারাপ মনে করেছিলেন ততটা খারাপ না। একদিনে অবস্থা হঠাৎ করে কি ভাবে ভাল হয়ে গেল তা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

এক ফাঁকে বড় আপা বললেন, তাঁরা তাজমহল রোডের বিজলী মহল্লায় একটা চারতলা বাড়ি কিনবেন। পঁচানব্বই হাজার টাকা দিলেই পাওয়া যায়। যে অবাঙালীর বাড়ি, সে পাকিস্তান চলে যাবে, কাজেই জলের দরে সব কিছু বিক্রি করে দিচ্ছে। দেশের অবস্থা ভাল হলে ঐ লোককে জলের দরে সব কিছু বিক্রি করে চলে যেতে হচ্ছে কেন, তাও পরিষ্কার বোঝা গেল না।

দুলাভাই আমাকে গাড়ি করে পৌঁছে দিলেন। অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই বললেন, 'এখানকার একজন ব্রিগেডিয়ারের সঙ্গে আমার খুব জানাশোনা

AMARBOI.COM

আছে। তোফাজ্জল নাম। বেলুচ রেজিমেন্টের লোক। খুবই ভাল মানুষ।'

'আমি জানি। ইজাবুদ্দিন সাহেব বলেছেন।'

দুলাভাই হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আর কি বলেছে ইজাবুদ্দিন ?'

'নাহ্, আর কিছু বলে নি।'

দুলাভাই খুব ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'আমি এদের সঙ্গে মেলামেশা করি না। তোফাজ্জলকে বাসায় পর্যন্ত আসতে বলি না। আমাকে প্রায়ই টেলিফোন করে। কয়েকদিন আগে রাজশাহীর এক ঝুড়ি আম পাঠিয়েছে।'

আমি চুপ করে রইলাম। দুলাভাই ক্লান্ত স্বরে বললেন, 'এদের সাথে বেশি মাখামাখি করা ঠিক না। শীলার বন্ধু লুনাকে তো চেন ? ঐ যে খুব সুন্দর দেখতে ?'

'হ্যাঁ চিনেছি।'

'ওদের বাড়িতে খুব যাতায়াত ছিল মিলিটারিদের। লুনার বাবা প্রায়ই পার্টি ফার্টি দিতেন। এখন শুনলাম এক মেজর নাকি লুনাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে। ক্লাস নাইনে পড়ে মেয়ে, চিন্তা করে দেখ অবস্থাটা।'

'বিয়ে হচ্ছে ?'

দুলাভাই দীর্ঘ সময় চুপ থেকে বললেন, 'না হয়ে উপায় আছে ? তবে আমি লুনার বাবাকে বলেছি সবাইকে নিয়ে সরে পড়তে। লোকটা ঘাবড়ে গেছে।'

নীলুর সঙ্গে মতিনউদ্দিন সাহেবের বিয়ে সম্পর্কে যা শুনেছিলাম তা বোধ হয় ঠিক নয়। বিলুকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, সে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলেছে—'দূর! কি যে বলেন! আপনিও কি মতিন ভাইয়ের মত পাগলা নাকি ?' বিলুর কথা অবশ্যি ধর্তব্য নয়। সে কখন কি বলে তার ঠিক নেই। কখন সে রেগে আছে, আর কখন শরিফ মেজাজে আছে—তাও বোঝা মুশকিল। একদিন জিজ্ঞেস করলাম, 'বিলু, মতিন সাহেব শুনলাম আমেরিকা ফিরে যাবেন, সত্যি নাকি ?'

বিলু সঙ্গে সঙ্গে রেগে গেল। চোখ বড় বড় করে বললো, 'যেতে চাইলে যাক, আমরা কি তাকে ধরে রেখেছি।'

আমি বিব্রত হয়ে বললাম, 'রাগ করছ কেন বিলু ?'

'রাগ করলাম কোথায় ? রাগের কি দেখলেন ? আমি কি আপনাকে বকেছি না কিছু বলেছি ?'

বিলু মেয়েটিকে আমার বড়ই দুর্বোধ্য মনে হয়। পনেরো ষোল বছরের একটি মেয়ের মধ্যে এতটা দুর্বোধ্যতার কারণ আমি ঠিক বুঝতে পারি না।

একদিন দুপুরবেলা আমাকে এসে বললো, 'শফিক ভাই, 'নীপ' শব্দের অর্থ জানা আছে আপনার?'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'না তো? কি জন্যে?'

'জানবার জন্যে। 'এসো নীপ বনে এসো ছায়াবিথী তলে' এই গানটি শোনেননি আপনি?'

'শুনেছি।'

'ঐ জায়গায় তো 'নীপ' শব্দটি আছে—এর মানে কি? নীলু আপা জানতে চাচ্ছে।'

'জানি না আমি। চলন্তিকা দেখে বলতে হবে।'

'কখন বলবেন?'

'আমার কাছে চলন্তিকা নেই, খুঁজে দেখতে হবে। রফিকের হয়ত আছে। তার ছোট ভাই বইপত্রের পোকা।'

'বেশ, তাহলে আজকে সন্ধ্যার আগে বলবেন, খুব জরুরী।'

সন্ধ্যাবেলা নীপ শব্দের মানে জেনে ঘরে ফিরছি গেটের কাছে দেখা নীলুর সঙ্গে। আমি বেশ উৎসাহের সঙ্গে বললাম, 'নীপ শব্দের মানে হচ্ছে কদম্ব। নীপ বন হচ্ছে কদম্ব বন।' নীলু মনে হল খুবই অবাক হল। আমি বললাম, 'বিলু বলছিল তুমি এর মানে জানতে চাও?'

নীলু ইতস্তত করে বললো, 'বিলু প্রায়ই আসে আপনার কাছে, তাই না?'

'তা আসে।'

'শফিক ভাই ওকে আপনি প্রশ্রয় দেবেন না। বিলুর বয়স কম। এই বয়সে মেয়েরা অনেক মন-গড়া জিনিসকে সত্যি মনে করে।'

আমি অবাক হয়ে বেশ খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম নীলুর দিকে। নীলু হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টে বললো, 'জলিল সাহেবের স্ত্রীকে কি আপনি খবর পাঠিয়েছেন?'

'না। তার ভাইকে চিঠি দিয়েছি।'

'উত্তর এসেছে কোনো?'

'না।'

'এলে আমাকে জানাবেন।'

সকালে কাদেরকে সিগারেট আনতে পাঠিয়েছি, সে সিগারেট না নিয়ে ফিরে এলো। তার মুখ অত্যন্ত গম্ভীর।

AMARBOI.COM

'ছোড ভাই কাম সাফ! খেল খতম পয়সা হজম!!'

সে খবর এনেছে জেনারেল টিক্কা খানকে মেরে ফেলা হয়েছে। এত বড় খবরের পর সিগারেটের মত নগণ্য জিনিসের কথা তার আর মনে নেই। দু'দিন পর পর কাদের এই জাতীয় খবর নিয়ে আসে। একবার খবর আনলো বেলুচী এবং পাঞ্জাবী এই দুই দলের মধ্যে গণ্ডগোল লেগে ঢাকা কেন্টনমেন্টে দুদলই শেষ। একদম পরিষ্কার।

আরেকবার দরবেশ বাচ্চু ভাইয়ের দোকান থেকে পাকা খবর আনলো মেজর জিয়া চিটাগাং এবং কুমিল্লা দখল করে ঢাকার দিকে রওনা হয়েছে। দাউদকান্দিতে তুমুল 'ফাইট' হচ্ছে। রাত গভীর হলেই নাকি কামানের শব্দ শোনা যাবে।

বলাই বাহুল্য টিক্কা খানের মৃত্যুসংবাদটিও বাচ্চু ভাইয়ের দোকান থেকেই এসেছে। আমি প্রচণ্ড ধমক দিয়ে কাদেরকে দোকানে ফেরত পাঠালাম। সিগারেট ছাড়া আমি সকালের চা খেতে পারি না। কাদের ফিরলো না। ঠিক দু'ঘন্টা অপেক্ষা করে নিচে নেমে দেখি আজিজ সাহেবের ঘরে মিটিং বসেছে। নেজাম সাহেব এবং মতিনউদ্দিন সাহেব দু'জনেই মুখ লম্বা করে বসে আছেন।

আজিজ সাহেব পায়ের শব্দ শুনেই আমাকে ডাকালেন, 'শফিক, কি সর্বনাশ! আজকে বেরুবে না কোথায়ও। খবর শোন নি?'

'কি খবর?

'টিক্কা মারা গেছে।'

'কে খবর দিয়েছে? আমাদের কাদের মিয়া তো?'

'খবর দেওয়া দেওয়ির কিছু নেই শফিক। সবাই জানে। আমরা জানলাম সবার শেষে।'

আজিজ সাহেব 'আকাশবাণী' ধরে বসে আছেন। এরা খবর দিতে এত দেরি করছে কেন বুঝতে পারছি না। তারা শুধু বলেছে—'ঢাকা শহরে প্রচণ্ড গণ্ডগোলের খবর নির্ভরযোগ্য সূত্রে পাওয়া গেছে।' বিবিসি দিনের বেলা পরিষ্কার ধরা যায় না, রাত না হওয়া পর্যন্ত সঠিক কি ঘটেছে তা জানা যাবে না। নেজাম সাহেব বললেন, তিনি অফিসে যাওয়ার জন্যে বেরিয়েছিলেন, অবস্থা বেগতিক দেখে চলে এসেছেন। দোকান পাট যেগুলো খুলেছিল সেসব বন্ধ করে লোকজন বাড়ি চলে গেছে। রাস্তাঘাটে রিকশার সংখ্যাও নগণ্য। মীরপুর রোডে চেকপোস্ট বসেছে। রিক্সা গাড়ি সব কিছুই থামানো হচ্ছে। আজিজ সাহেব বললেন, 'কলিজা

AMARBOI.COM

শুকায়ে শুকনা কাঠ হয়ে গেছে সফিক। বাঙালী তো চিনে নাই। এখন চিনবে। ঘুঘু দেখেছে ফাঁদ দেখে নাই।'

আমাকে তারা কিছুতেই বের হতে দিল না। আজিজ সাহেব বললেন, 'আজকের দিনটা খুব সাবধানে থাকা দরকার। ওরা পাগলা কুত্তার মত হয়ে আছে তো, কি করে না করে কিছুই ঠিক নাই।'

দুপুরের আগেই কি করে এত বড় একটা ঘটনা ঘটলো তা জানা গেল। জেনারেল টিক্কাখান ফাইলপত্র সই করছিলেন। এমন সময় তাঁর ইউনিটের একজন বাঙালী অফিসার (সেই একমাত্র বাঙালী যে এখনো টিকে আছে এবং পাক আর্মীর কথা মত সমানে বাঙালী মারছে) জেনারেল টিক্কার ঘরে ঢুকলো। তাদের মধ্যে ইংরেজীতে নিম্নলিখিত কথা-বার্তা হল।

টিক্কা : কি ব্যাপার কর্ণেল মঈন? এত রাত্রে কোনো প্রয়োজন আছে?

মঈন : জি স্যার আছে।

টিক্কা : বেশ বলে ফেল। আমার হাতে সময় কম। আমি খুবই ব্যস্ত।

মঈন : আপনার সময় কম কথাটি স্যার সত্যি।

এক পর্যায়ে কর্ণেল মঈন (নামের ব্যাপারে খানিকটা সন্দেহ আছে, কেউ কেউ বলছে মেজর সাঈদ) রিভলবার বের করে পর পর তিনটি গুলি করলেন।

মতিনউদ্দিন সাহেবকে দেখে মনে হল তিনি কিছুটা দিশেহারা, যেন বুঝতে পারছেন না ঠিক কি হচ্ছে। আমাকে বারান্দায় ডেকে নিয়ে নিচু স্বরে বললেন, 'টিক্কা সাহেবকে অন্যায় ভাবে মারাটা ঠিক হল না।'

আমার বদ্ধমূল ধারণা মতিনউদ্দিন সাহেবের মথায় ছিট আছে। এখন তিনি নেজাম সাহেবের সঙ্গে ছায়ার মত ঘুরে বেড়ান। যেখানে তিনি আছেন সেখানেই মতিন সাহেব আছেন। কাদেরের কাছে শুনলাম নেজাম সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও নাকি ভূত দেখেছেন। সন্ধ্যাবেলা বারান্দায় বসেছিলেন, সড় সড় শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখেন জামগাছের ডালে কে যেন বসে আছে। কোনো দিকে কোনো বাতাস নেই, শুধু জামগাছের ডালটি নড়ছে। মতিন সাহেবকে দেখি সব সময় ঘরেই থাকেন। চাকরি বাকরি কিছুই করবেন না নাকি? জিজ্ঞেস করলেই হুঁ হাঁ করেন, পরিস্কার কিছু বলেন না।

টিক্কা খানের মৃত্যু প্রসঙ্গে আমার যা কিছু অবিশ্বাস ছিল, বিকেলের দিকে তা ধুয়ে-মুছে গেল। বড় আপার বাসায় যাবার জন্যে

AMARBOI.COM

বেরিয়েছি, দেখি সত্যি সত্যি খুব থমথমে অবস্থা। দোকানপাট বেশির ভাগই বন্ধ, লোকজন এখানে ওখানে জটলা পাকাচ্ছে। ই পি আর হেড কোয়ার্টারের গেটের সামনে বালির বস্তা ফেলে দুর্গের মত করা। বালির বস্তা আগেও ছিল, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে যুদ্ধের সাজসজ্জা। সায়েন্স ল্যাবরেটরির কাছে মেশিনগান বসানো দুটি কালো রঙের জীপ। সায়েন্স ল্যাবরেটরি থেকে রিকশা নিয়ে চলে গেলাম মগবাজারে। রিকশাওয়ালাটি বৃদ্ধ। টানতে পারে না। পাক মটরস পর্যন্ত যেতেই তাকে তিনবার থামতে হলো। যতক্ষণ থেমে থাকে ততক্ষণ সে আমাকে খুশি রাখবার জন্যেই হয়তো গল্পগুজব করে। তার কাছ থেকেই জানলাম—জেনারেল টিক্কা একা মারা যায়নি। তার বউ এবং ছেলেটাও মারা গেছে।

'গুষ্টি নিকাশ হইছে স্যার। নিব্বংশ হইছে।'

আমি বললাম, 'খবর কোথায় পেলেন চাচা মিয়া?'

সে গম্ভীর হয়ে বললো, 'এই সব খবর কি স্যার গোপন থাকে? মুক্তিবাহিনীর লোক শহরে ঢুকছে। লাড়াচাড়া শুরু হইছে।'

'কি লাড়াচাড়া?'

'যাত্রাবাড়িতে দুইটা ট্রাক উড়াইয়া দিছে। হেই রাস্তায় দুই দিন ধইরা লোক চলাচল বন্ধ।'

'যাত্রাবাড়ির দিকে গেছিলেন নাকি?'

'কি যে কন, ওদিকে কেউ যায়!'

আমাকে দেখে বড় আপা বললেন, 'তুই আবার এলি কি জন্যে? এই বৎসর আর জন্মদিন টিন কিছু করছি না।'

আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। দুলাভাই বললেন, 'তুমিও আবার জন্মদিন টিন মনে রাখ নাকি শফিক? আমার নিজেরও কিন্তু মনে নেই। হা হা হা। গিফট টিফট কিছু আছে সঙ্গে, না খালি হাতে এসেছো?'

তখন আমার মনে পড়লো আজ জুলাইয়ের ৬ তারিখ, শীলার জন্মদিন। বড় একটা উৎসবের তারিখ।

'তোর জন্যে সকালেই গাড়ি পাঠাতাম। তোর দুলাভাই বললো অবস্থা থমথমে, তাই পাঠাইনি। তুই আবার জন্মদিনের জন্যে চলে এলি? ঘর থেকে বের হওয়াই তো এখন ঠিক না।'

আমি ইতস্তত করে বললাম, জন্মদিন ভেবে আসিনি। জন্মদিন টিন আমার মনে থাকে না।'

AMARBOI.COM

আপা তার স্বভাবমত সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে গেলো। দুলাভাই ঘর ফাটিয়ে হাসতে লাগলেন।

'দিলে তো তোমার আপাকে রাগিয়ে। জন্মদিন ভেবে আসনি এটা বড় গলা করে বলার দরকার কি? তুমি দেখি ডিপ্লোমেসি কিছুই শিখলে না। হা হা হা।'

জন্মদিনের কোনো আয়োজন হয়নি কথাটা ঠিক নয়। কিছুক্ষণ পরই দেখলাম শীলার বান্ধবীরা আসতে শুরু করেছে। এরা আশপাশেই থাকে। এদেরকে বলা হয়েছে। লুনা মেয়েটি একটি গাঢ় নীল রঙের শাড়ি পরে এসেছে। তুলিতে আঁকা ছবির মত লাগছে মেয়েটিকে। আমি আপাকে বললাম, 'এই মেয়েটির যে এক মেজরের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার কথা ছিল, হয়েছে?'

আপা সরু গলায় বললো, 'তোকে কে বলেছে?'

'দুলাভাইয়ের কাছে শুনলাম।'

'তোর দুলাভাইকে নিয়ে মুশকিল। পেটে কথা থাকে না। শুধু লোক জানাজানি করা আর মানুষকে বিপদে ফেলা।'

আপা রাগে গজগজ করতে লাগলো। আমি জানলে কি রকম বিপদ হতে পারে তা বুঝতে পারলাম না। আপার কথাবার্তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। যখন যা মনে আসে বলে। সব মেয়েরাই এরকম নাকি? আপা ভ্রূ কুঁচকে বললো, 'জন্মদিন ভেবে আসিসনি তো কি ভেবে এসেছিস? তোর তো দেখাই পাওয়া যায় না।'

'টিক্কা খান মারা যাওয়ার পর দুলাভাইয়ের পরিকল্পনা কিছু বদলেছে কি-না জানবার জন্যে এলাম।'

'টিক্কা খান মারা গেছে তোকে বললো কে?'

'মারা যায়নি?'

'টিক্কা খান কি মাছি যে থাবা দিয়ে মেরে ফেলবে?'

আপা কোন এক বিচিত্র কারণে পাকিস্তানী মিলিটারি মারা পড়ছে এই জাতীয় খবর সহ্য করতে পারে না। আমি আপার রাগী মুখের দিকে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে বললাম, 'দুলা ভাইকে জিজ্ঞেস করলে সঠিক জানা যেত।'

'আমি যে বললাম সেটা বিশ্বাস হল না?'

রাত্রে আমাকে থেকে যেতে হল। দুলাভাই আমাকে গাড়ি দিয়ে পৌঁছে দিতে রাজি হলেন না, আবার একা একা ছাড়তেও চাইলেন না। বড় আপার বাসায় আমার রাত কাটাতে ভাল লাগে না। এখানে রাত

AMARBOI.COM

কাটানোর মানেই হচ্ছে সারা রাত বসার ঘরে বসে বড় আপা যে কি পরিমাণ অসুখী সেই গল্প শোনা। দুলাভাই ঠিক দশটা ত্রিশ মিনিটে 'তুমি তোমার দুঃখের কাহিনী এখন শুরু করতে পার' এই বলে দাঁত মাজতে যান এবং দশটা পঁয়ত্রিশে বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়েন। আপার দুঃখের কাহিনী অবিশ্যি সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় না। দুলাভাই ঘুমিয়ে পড়েছেন কি-না নেই সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়ার জন্যে ঘন্টা-খানিক অপেক্ষা করে আকবরের মাকে চা আনতে বলে।

তারপর গলার স্বর যথাসম্ভব নিচে নামিয়ে বলে, 'শফিক জীবনটা আমার নষ্ট হয়ে গেছে। তুইতো বিশ্বাস করবি না, তোর দুলাভাই একটা অমানুষ।'

'কি যে তুমি বল আপা!'

'কি বলি মানে? তুই কি ভেতরের কিছু জানিস? তুই তো দেখিস বাইরেরটা।'

'বাদ দাও আপা।'

'বাদ দেব কি? বাদ দেওয়ার কিছু কি আছে? তুই কি ভাবছিস আমি ছেড়ে দেব? নীপু যদি না ছাড়ে আমিও ছাড়ব না।'

নীপু আমার মেজো বোন। গত পনেরো বছর ধরে সে আমেরিকার সিয়াটলে থাকে। গত বৎসর খবর এসেছে সে সেপারেশন নিয়ে আলাদা থাকে। আমি আপাকে বললাম, 'নীপুর সঙ্গে তুলনা করছ কেন?'

'কেন তুলনা করব না? নীপু কি আমার চেয়ে বেশি জানে, না নীপুর বুদ্ধি আমার চেয়ে বেশি? সে যদি সেপারেশন নিতে পারে—আমিও পারি। তুই কি ভাবছিস আমি এম্নি ছেড়ে দেব? ওর বাপের নাম ভুলিয়ে দেব না?'

যেহেতু নীপু সেপারেশন নিয়েছে, কাজেই আপার ধারণা হয়েছে সেপারেশন নেয়ার মধ্যে বেশ খানিকটা বাহাদুরী আছে।

আজ রাতে বড় আপা তার দুঃখের কাহিনী শুরু করবার সুযোগ পেলো না। ঘড়িতে এগারোটা বাজলো, তবু দুলাভাই উঠবার নাম করলেন না। আপা বললো, 'ঘুমবে না?'

'নাহ্।'

'শরীর খারাপ?'

'নাহ্ শরীর ঠিক আছে।'

'শরীর ঠিক থাকলে ঘুমাতে যাচ্ছ না কেন? তোমার তো সব কিছু ঘড়ির কাঁটার মত চলে।'

AMARBOI.COM

'এই নিয়েও তুমি একটা ঝগড়া শুরু করতে চাও ?'

'আমি বুঝি সবকিছু নিয়ে ঝগড়া করি ?'

'তা কর। আমি যদি এখন একটা হাঁচি দিই এই নিয়েও তুমি একটা ঝগড়া শুরু করবে।'

'তুমি হাঁচি দিলেই ঝগড়া শুরু করবো ?'

'প্রথমে ঝগড়া তারপর কান্নাকাটি তারপর খাওয়া বন্ধ।'

বড় আপা মুখ কালো করে উঠে চলে গেল। দুলাভাই হো হো করে হেসে উঠলেন।

'কফি খাওয়া যাক। শফিক খাবে ?'

'না কফি ভাল লাগে না। চা হলে খেতে পারি।'

'আমি নিজে বানাচ্ছি, খেয়ে দেখো। খুব সাবধানে লিকার বের করব। সবাই পারে না। খেলেই বুঝবে।'

দুলাভাইয়ের কথা শেষ হবার আগেই দক্ষিণ দিকে প্রচণ্ড একটা আওয়াজ হলো। সমস্ত অঞ্চল অন্ধকার হয়ে পড়লো। দুলাভাই থেমে থেমে বললেন, 'খুব সম্ভব ট্রান্সমিশন স্টেশনটি শেষ করে দিয়েছে।'

শীলা ঘুম থেকে উঠে চিৎকার করতে লাগলো। ঘন্টা বাজিয়ে কয়েকটা দমকলের গাড়ি ছুটে গেলো। গুলির আওয়াজ হলো বেশ কয়েকবার। অত্যন্ত দ্রুত গতিতে কয়েকটি ভারী ট্রাক জাতীয় গাড়ি গেল।

আমরা সবাই শোবার ঘরে দরজা বন্ধ করে চুপচাপ বসে রইলাম। আমার জানা মতে এটিই ছিল ঢাকা শহরে মুক্তিবাহিনীর প্রথম সফল আক্রমণ।

AMARBOI.COM

দরবেশ বাচ্চু ভাইকে ধরে নিয়ে গেছে। বাচ্চু ভাই একা নয়, তার চায়ের দোকানে রাত নটার সময় যে কজন ছিল সবাইকে। আমাদের কাদের মিয়া তাদের একজন। এত রাত পর্যন্ত সে বাইরে থাকে না। রাত আটটায় বিবিসির খবর। এর আগেই সে আজিজ সাহেবের ঘরে উপস্থিত হয়। সেদিনই শুধু দেরি হল।

যে ছেলেটি খবর দিতে এলো, সে দরবেশ বাচ্চু ভাইয়ের দোকানের বয়। দশ এগারো বছর বয়স। তাকেই শুধু ওরা ছেড়ে দিয়েছে। তার

কাছে জানা গেল রাত নটার কিছু আগে দু তিনজন লোক এসেছিল দোকানে। লোকগুলো বাঙালী। এদের মধ্যে একজন বেঁটে মত—মাথার চুল কোঁকড়ানো। সে বললো, 'বাচ্চু ভাই এখানে কার নাম?'

বাচ্চু ভাই কাউন্টার থেকে উঠে এলেন।

'আমার নাম। কি দরকার?'

'একটু বাইরে আসেন।'

ওরা বাচ্চু ভাইকে বাইরে নিয়ে একটা গাড়িতে তুললো। তারপর এসে বাকি সবাইকে বললো, 'জিজ্ঞাসাবাদ করবার জন্যে থানায় নিয়ে যাচ্ছি। ভয়ের কিচ্ছু নাই।'

আমি ছেলেটিকে বললাম, 'দোকানে তালা দিয়ে এসেছিস?'

'হ স্যার। ক্যাশবাক্সের টেকাও আমার কাছে।'

'কত টাকা?'

'মোট তেত্রিশ টাকা বার আনা।'

'তুই আর এত রাত্রে যাবি কোথায়? থাক এখানে।'

'দরবেশ সাবের বাসাত একটা খবর দেওন দরকার।'

'সকালে দিবি, এখন আর যাবি কিভাবে? কার্ফু না?'

ছেলেটি মাথা চুলকোতে লাগলো। আমি বললাম, 'দরবেশ সাবের বাড়িতে আছে কে?'

'তার পরিবার আছে। আর একটা পুলা আছে—নান্টু মিয়া নাম। খালি কান্দে।'

'তুই খাওয়া দাওয়া করেছিস?'

'জ্বি না।'

'ভাত খা। এখন ঘর থেকে বার হওয়া ঠিক না।'

কাদের মিয়াকে ধরে নিয়ে গেছে, এই খবরে আমি বিশেষ বিচলিত বোধ করলাম না। সহজ স্বাভাবিক ভাবেই চা বানালাম। রাতের জন্যে কাদের কিছু রান্না করে গেছে কি না তা দেখলাম হাঁড়ি পাতিল উল্টে। ছেলেটার শোবার জায়গা দেখিয়ে দিয়ে তার সঙ্গে কিছু গল্প গুজবও করলাম।

'বাড়ি কোথায়?'

'বিরাম ছরি ময়মনসিং।'

'বাড়িতে আছে কে?'

'মা আছে, ভইন আছে; দুইটা ভাই আছে। চাইর জন খানেওয়ালা।'

'বোনের বিয়ে হয়েছে?'

AMARBOI.COM

'হইছিল, এখন পৃথ্যক।'

এক সময় বিলু এসে আমাকে নিচে ডেকে নিয়ে গেল। আজিজ সাহেবের জ্বর। তিনি কম্বল গায়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে আছেন। তাঁর সামনের চেয়ারে নেজাম সাহেব বসে আছেন। আমাকে দেখেই নেজাম সাহেব শুকনো গলায় বললেন, 'কাদের মিয়াকে শুনলাম শুট করেছে।'

'ধরে নিয়ে গেছে। শুট করেছে কিনা জানি না।'

'কি সর্বনাশের কথা ভাই!'

আজিজ সাহেব একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। থেমে থেমে বললেন, 'মনটা খুব খারাপ আজকে।'

আমি চুপ করে রইলাম। বিলু বললো, 'আপনার খাওয়া হয়েছে?'

'না।'

'আপনার জন্য ভাত বাড়ছি। আমি এখনো খাইনি। নীলু আপাও খায়নি।'

'না আমি খাব না। কাদের রেঁধে গিয়েছে।'

'তবু খেতে হবে।'

নীলু বললো, 'ইনি খেতে চাচ্ছেন না, তবু জোর করছ কেন?'

'না খেতেই হবে।'

আজিজ সাহেব বললেন, 'কাদেরের ব্যাপারে কি করবে?'

'করার তো তেমন কিছু নেই।'

'তা ঠিক।'

'সকালবেলা ইজাবুদ্দিন সাহেবের কাছে যাব।'

আর কোনো কথাবার্তা হল না। বিলু এসে বললো, 'আসুন ভাত দিয়েছি।'

আমি অস্বস্তির সঙ্গে উঠে দাঁড়ালাম। ভাত খেতে গিয়ে দেখি নীলু খেতে আসেনি। তার না-কি মাথা ধরেছে। বিলু বললো, 'মাথা ধরেছে না হাতি, আমার সঙ্গে রাগ। আপনাকে খেতে বলেছি তো, তাই তার রাগ উঠে গেছে। তার রাগ করবার কি?'

আমি চুপ করে রইলাম। বিলু বললো, 'সে অনেক কিছুই করে যা আমার ভাল লাগে না। কিন্তু আমি কি রাগ করি?'

'রাগ কর না?'

'মাঝে মাঝে করি কিন্তু কাউকে বুঝতে দিই না। আমার মুখ দেখে কেউ কিচ্ছু বুঝতে পারবে না। এই যে কাদের বেচারা মারা গেল......'

'কাদের মারা গেছে বলছ কেন?'

AMARBOI.COM

'মিলিটারি ধরলে কি আর কেউ ফেরে? কেউ ফেরে না।'

ওপরে এসে দেখি ছেলেটি তখনো ঘুমায়নি। বারান্দায় চুপচাপ বসে আছে।

'কি রে ঘুমাস নি?'

'দরবেশ সাবের লাগি পেট পুড়ে।'

'পেট পুড়বার কিছু নেই। দেখবি সকালে ছেড়ে দেবে। মিলিটারির হাতে তো ধরা পড়ে নি। মিলেটারির হাতে ধরা পড়লে একটা চিন্তার কারণ ছিল।'

ছেলেটা গম্ভীর হয়ে বললো, 'না স্যার, দরবেশ সাবেরে আইজ রাইতেই গুল্লি করব।'

'দূর ব্যাটা, বলেছে কে তোকে?'

'আমার মনে অইতাছে স্যার। যেডা আমার মনে অয় হেইডা অয়।'

বলে কি এই ছেলে! আমি সিগারেট ধরিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালাম তার দিকে।

'দরবেশ সাবরে খাওন দিছে, না দিছে না? শেষ খানাটা বালা হওয়া দরকার। কি কন স্যার।'

'কি বলছিস এইসব?'

'দরবেশ সাব আর জিন্দা নাই স্যার?'

আমি একটা কড়া ধমক লাগালাম। রাগী গলায় বললাম, 'দেখবি ভোরবেলা চলে এসেছে। দরবেশ মানুষ, তাকে খামোখা গুলি করবে কেন?'

AMARBOI.COM

ইজাবুদ্দিন সাহেব আগের মতই আমাকে খাতির যত্ন করলেন। প্রায় দশবার বললেন,—আমার সাধ্যমত খোঁজ খবর করব। সন্ধ্যার মধ্যে ইনশাল্লাহ্ খবর বের করব।'

'ছাড়া পাবে তো?'

'যদি বেঁচে থাকে তাহলে ইনশাল্লাহ্ ছাড়া পাবে।'

'বেঁচে না থাকার সম্ভাবনা আছে নাকি?'

'শফিক সাহেব সময় খারাপ। চারদিকে ঝামেলা, কারোর মাথাই ঠিক নেই। তা ইনশাল্লাহ্ জানব। চিন্তা করবেন না। ফি আমানুল্লাহ।'

'আমি সন্ধ্যার সময় এসে খোঁজ নেব।'

'কোনো দরকার নেই। কষ্ট করবেন কেন খামাখা?'

ইজাবুদ্দিন সাহেব আমাকে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এলেন। গলার স্বর খাদে নামিয়ে বললেন, 'চীনা সৈন্যরা চলে আসছে জানেন না-কি ?'

'চীনা সৈন্য !'

'জ্বি, হাজারে হাজারে আসছে। যে সব ফুটফাট শোনেন সব দেখবেন খতম।'

'চীনা সৈন্য আসছে, এই সব বললো কে আপনাকে ?'

'হা হা হা। খবরাখবর কিছু কিছু পাই। ব্রিগেডিয়ারের সঙ্গে খানা খেয়েছি গত সপ্তাহে। খুব হামদর্দি লোক।'

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, 'ইজাবুদ্দিন সাহেব।'

'জ্বি।'

'এই সব বিশ্বাস করবেন না। পাকিস্তানীদের অবস্থা খারাপ।'

'এইটা ভাইসাব আপনি কি বললেন ?'

'ঠিকই বললাম। আপনি নিজেও সাবধানে থাকবেন।'

'মাবুদে এলাহী, আমি সাবধানে থাকব কেন ? আমি কি করলাম ?'

ইজাবুদ্দিন সাহেব কাজের লোক। বিকেলবেলা খবর আনলেন কাদের মিয়া পিতা বিরাম মিয়া গ্রাম কুতুবপুর থানা কেন্দুয়া জীবিত আছে। দু-এক দিনের মধ্যে ছাড়া পাবে। তবে দরবেশ বাচ্চু ভাই নামের কেউ ওদের ক্যাম্পগুলিতে নেই। এই নামে কোন লোককে আটক করা হয়নি।

দু দিনের জায়গায় এক সপ্তাহ হয়ে গেল, কাদের ফিরলো না। আমি রোজই একবার যাই ইজাবুদ্দিন সাহেবের কাছে। ভদ্রলোকের ধৈর্য সীমাহীন, একটুও বিরক্ত হন না। রোজই বলেন, 'বলছি তো ছাড়া পাবে। সবুর করেন। আল্লাহ্ দুই কিসিমের লোক পছন্দ করে—এক যারা নেক কাজ করে, দুই যারা সবুর করে। সবুরের মত কিছু নাই।'

কাদেরের অনুপস্থিতিতে আমার খাওয়া দাওয়া হয় নিচতলায় নেজাম সাহেবদের ওখানে। ওদের একটি কাজের মেয়ে রান্না করে দিয়ে যেত। এখন আর আসছে না। এখন রান্না করছেন মতিনউদ্দিন সাহেব। চমৎকার রান্না। দৈনন্দিন খাবারের ব্যাপারটি যে এত সুখকর হতে পারে তা আমার ধারণার বাইরে ছিল। অবশ্যি নেজাম সাহেব প্রতিটি খাবারের কিছু না কিছু ত্রুটি বের করেন।

AMARBOI.COM

'গরুর গোস্তে কেউ টমেটো সস দেয়! করেছেন কি আপনি? খেতে ভাল হলেই তো হয় না। একটা নিয়ম নীতি আছে। গোসতের সঙ্গে আলু ছাড়া আর কিছু দেয়া যায় না।'

'কেন? দেয়া যায় না কেন?'

'আরে ভাই যায় না, যায় না। কেন তা জানি না। টেস্টের চেয়ে দরকার ফুড ভ্যালু। বুঝলেন?'

নেজাম সাহেবের আরেকটি দিক হচ্ছে নিতান্ত আজগুবী সব কুৎসা খুব বিশ্বাসযোগ্য ভঙ্গিতে বলা। এগুলো হয় সাধারণত ভাত খাবার সময়। সেদিন যেমন জলিল সাহেবের প্রসঙ্গ তুললেন—

'জলিল সাহেবের স্ত্রীর ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করেছেন?'

'কি ভাবভঙ্গি?'

'না তেমন কিছু না।'

'তেমন কিছু না হলে লক্ষ্য করব কিভাবে?'

'জলিল সাহেবের ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা যেন কেমন কেমন।'

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, 'কেমন কেমন মানে?'

নেজাম সাহেব প্রসঙ্গ পাল্টে বললেন, 'জলিল সাহেবের ভাই বিয়ে শাদী করেন নি জানেন তো?'

'না জানি না। তাতে কি?'

নেজাম সাহেব আর কথা বললেন না। একদিন চোখ ছোট করে বিলুর প্রসঙ্গ তুললেন—

'মেয়েটাকে দেখে কি মনে হয় আপনার শফিক ভাই?'

'কি মনে হবে? কিছুই মনে হয় না।'

'তাই বুঝি?'

AMARBOI.COM

নেজাম সাহেব মাথা হেলিয়ে হে হে করে হাসতে লাগলেন যা শুনে গা রি রি করে। আমার অনুপস্থিতিতে এই লোকটি আমাকে নিয়ে কি বলে কে জানে?

চাঁদপুর থেকে জলিল সাহেবের ভাইয়ের একটি চিঠি এসেছে। তিনি গোটা গোটা হরফে লিখেছেন—

> পরম শ্রদ্ধেয় বড় ভাই সাহেব,
>
> সালাম পর সমাচার এই যে আপনার পত্রখানি যথাসময়ে হস্তগত হইয়াছে। জলিল যে শেষ সময়ে আপনাদের মতো দরদী মানুষের সঙ্গে ছিলো ইহার জন্য আল্লাহর কাছে আমার হাজার শুকুর। সমগ্র জীবন আমি

আল্লাহ্পাকের নিয়ামত স্বীকার করিয়াছি। গাফুরুর রাহিমের কোনো কাজের জন্য মন বেজার করি নাই। কিন্তু আজকে আমার মনটায় বড় কষ্ট। আপনি লিখিয়াছেন জলিলের মাথার কাছে দাঁড়ায়ে বোন নীলু ও বোন বিলু কাঁদতে ছিলো। আল্লাহ্ তাদের বেহেস্ত নসিব করুক হায়াত দরাজ করুক। জলিলের পরম সৌভাগ্যে আপনাদের মতো মানুষের সহিত তাহার দেখা হইল। আপনি লিখিয়াছেন তাহার মৃত্যু সংবাদ যেন এখন আর তাহার স্ত্রী ও কন্যার নিকট না দেই। আপনার কথাটি রাখিতে না পারার জন্য আমি বড়ই শরমিন্দা। হাদিসে জন্ম ও মৃত্যু সংবাদ গোপন না করার নির্দেশ আছে। আল্লাহ্পাক যাহাকে দুঃখ দেন তাহাকে দুঃখ সহ্য করার ক্ষমতাও দেন। গাফুরুর রাহিমের কাছে আপনার জন্য দোয়া করি। আল্লাহ্পাক আপনার হায়াত দরাজ করুক, আমিন।

ইতি

আপনার স্নেহধন্য

আব্দুর রহমান

AMARBOI.COM

চিঠি পড়ে কেন জানি খুব মন খারাপ হয়ে গেল। আমি চিঠিটি হাতে নিয়ে আজিজ সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে গেলাম। ঘরে ঢুকেই অপ্রস্তুত হয়ে দেখি বিলু মাথা নিচু করে কাঁদছে। আজিজ সাহেব এবং নীলু গম্ভীর হয়ে বসে আছে। আমাকে ঢুকতে দেখেই নীলু বিলু উঠে চলে গেল। আজিজ সাহেব এই প্রথমবারের মত শব্দ শুনে আমাকে চিনতে পারলেন না। থেমে থেমে বললেন, 'কে, মতিনউদ্দিন?'

'জ্বি না আমি। আমি শফিক।'

'ও শফিক। বস। বস তুমি। মনটাতে খুব অশান্তি।'

আমি বেশ খানিকক্ষণ বসে রইলাম। আজিজ সাহেব কোনো কথা বললেন না। অন্যদিনের মত বিলুকে ডেকে চায়ের ফরমাশ করলেন না। আমি যখন চলে আসবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছি তখন তিনি ক্লান্ত স্বরে বললেন, 'আমি আমার মেয়ে দুটিকে নিয়ে গ্রামের বাড়িতে চলে যাব।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কখন ঠিক করলেন?'

'অনেক দিন ধরেই চিন্তা করছিলাম। এখন মনস্থির করেছি। নেজাম সাহেবকে বলেছি আমাদের নিয়ে যেতে।'

'কবে নাগাদ যাবেন ?'

'জানি না এখনো, নেজাম সাহেব অফিস থেকে ছুটি নেবেন, তারপর।'

আজিজ সাহেবরা শুক্রবার দুটোর সময় সত্যি সত্যি চলে গেলেন। যাবার আগে বিলু দেখা করতে এলো আমার সঙ্গে। খুব হাসি খুশি ঝলমলে মুখ। এসেই জিজ্ঞেস করলো, 'চট করে বলুন তো সব প্রাণীর লেজ হয়, আর মানুষের হয় না কেন ? চট করে বলুন।'

আমি চুপ করে রইলাম। বিলু হাসতে হাসতে বললো, 'কি পারলেন না তো ? না আপনার বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারেই নেই।'

আমি বললাম, 'তোমাদের সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে কে জানে ?'

বিলু গম্ভীর হয়ে বললো, 'আর দেখা টেখা হবে না। কিছু বলবার থাকলে বলে ফেলুন। কি, আছে কিছু বলবার ?'

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি, কিছু বলতে পারি না। নিচ থেকে নীলু তীক্ষ্ম স্বরে ডাকে, 'এত দেরি করছিস কেন, এই বিলু এই ?'

মতিনউদ্দিন সাহেব জিনিসপত্র নিয়ে উঠে আসেন দোতলায়। একা একা নিচতলায় থাকতে ভয় লাগে তাঁর। তার ওপর ক'দিন আগেই না-কি ভয়াবহ একটি স্বপ্ন দেখেছেন— একটি কালো রঙের জীপে করে তাঁকে যেন কারা নিয়ে যাচ্ছে। যারা নিয়ে যাচ্ছে তাদের মুখ দেখা যাচ্ছে না। তবে বোঝা যাচ্ছে লোকগুলো অসম্ভব বুড়ো। অনেকদূর গিয়ে জীপটি থামলো। তিনি জীপ থেকে নামলেন। কিন্তু বুড়ো লোকগুলো নামলো না। যে জায়গাটিতে তিনি নেমেছেন সেটি পাহাড়ি জায়গা। খুব বাতাস বইছে। তিনি ভয় পেয়ে বললেন, 'এই তোমরা আমাকে কোথায় নামালে ?'

বুড়ো লোকগুলো এই কথায় খুব মজা পেয়ে হো হো করে হাসতে লাগলো। তিনি দেখলেন জীপটি চলে যাচ্ছে। তিনি প্রাণপণে ডাকতে লাগলেন, 'এই এই।'

গত চারদিন ধরে মতিন সাহেব দোতলায় আমার সঙ্গে আছেন। এই চারদিন সারাক্ষণই তিনি আমার সঙ্গে ছায়ার মত লেগে আছেন।

AMARBOI.COM

আমি বাজারে যাচ্ছি—তিনি সঙ্গে যাচ্ছেন। আমি ইজাবুদ্দিন সাহেবের কাছে কাদেরের খোঁজে যাচ্ছি, তিনি আছেন। আজকেও বেরুবার জন্যে কাপড় পরছি, দেখি তিনিও কাপড় পরছেন। আমি থমথমে স্বরে বললাম, 'কোথায় যাচ্ছেন আপনি?'

'আপনার সঙ্গে যাচ্ছি।'

'আজ আমি একটা বিশেষ কাজে যাচ্ছি। আপনি আমার সঙ্গে যাচ্ছেন না।'

মতিনউদ্দিন সাহেব অত্যন্ত অবাক হলেন, 'সেকি, আমি একা একা থাকব কি ভাবে!'

'যে ভাবেই থাকেন থাকবেন।'

তাঁকে রেখেই আমি বের হয়ে এলাম। এই লোকটি দিনে দিনে অসহ্য হয়ে উঠছে। এখন মনে হচ্ছে সঙ্গে টাকা পয়সাও নেই। আমার কাছে সেদিন একটি মিনোলটা এস এল আর ক্যামেরা বিক্রি করতে চাইলেন। আমি বললাম, 'আপনার টাকা পয়সা নেই না-কি?'

'কিছু আছে। যা নিয়ে এসেছিলাম খরচ হয়ে যাচ্ছে।'

'কাজ টাজ কিছু দেখেন।'

'কি দেখব বলেন? ইউনিভার্সিটিতে কোন পোস্ট এডভ্যার্টাইজ করছে না। মাস্টারী ছাড়া আর কিছু তো করতেও পারব না আমি।'

'আত্মীয়-স্বজন কে কে আছে আপনার?

'আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই।'

'কেউ নেই মানে? একজন বড় ভাই তো আছেন জানি। গাড়ি করে আপনাকে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল যার।'

'ও রকিব ভাই? সে অনেক দূর সম্পর্কের আত্মীয়। তাছাড়া আমাকে সে পছন্দও করে না।'

'নীলুরাও তো শুনেছি আপনার আত্মীয়, ওদের সঙ্গে চলে গেলেন না কেন?'

মতিনউদ্দিন সাহেব ইতস্তত করে বললেন, 'ওরা আমাকে এখন আর পছন্দ করে না। বিলুর ধারণা আমার মাথা খারাপ। দেখেন তো অবস্থা। তবু আমি যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু নীলু খুব রাগ করলো।'

মতিনউদ্দিন সাহেবকে একা ঘরে রেখেই আমি চলে এলাম। সারাক্ষণ কাউকে গাদা বোটের মত টেনে বেড়ানোর কোনো অর্থ হয় না। বাইরে বেরিয়ে আবার আমার খারাপ লাগতে লাগলো। সঙ্গে নিয়ে এলেই হত। রাস্তার মোড় পর্যন্ত এসে থমকে দাঁড়ালাম,

ফিরে গিয়ে ডেকে নিয়ে আসব? ঠিক তখনি কে যেন ডাকলো, 'ও ছোড ভাই। ও ছোড ভাই।'

চমকে তাকিয়ে দেখি কাদের মিয়া। রিকশা করে আসছে। চোখ কোটরাগত, কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে আছে।

'এই কাদের এই।'

'রিকশা ভাড়া দেন ছোড ভাই।'

'কখন ছাড়া পেলি?'

'এক ঘন্টার মত হইব। বালা আছেন ছোড ভাই?' আজিজ সাব আর নেজাম সাব বালা?'

'তুই ভাল?'

'মতিনউদ্দিন সাবের শইলডা কেমন?

বলতে বলতে কাদের মিয়া হাউ মাউ করে কেঁদে উঠলো। সেই রিকশায় করেই কাদেরকে ঘরে নিয়ে এলাম।

'ছোড ভাই পেটে ভুখ লাগছে, চাইরডা ভাত খাওন দরকার।'

'তুই চুপচাপ বসে থাক। আমি ভাত বসাচ্ছি। শুয়ে থাকবি?'

'জ্বি না।'

'ঘরে ঘি আছে। গরম গরম ভাত খাবি ঘি দিয়ে। রাত্রে মতিন-উদ্দিন সাহেব রান্না করবে। খুব ভাল রাঁধে।'

কাদের বসে ঝিমুতে লাগলো। সে কোথায় ছিল, কেমন ছিল, আমি কিছুই জিজ্ঞেস করলাম না।

'ছোড ভাই নিচতলাটা দেখলাম খালি।'

'ওরা দেশের বাড়িতে চলে গেছে।'

'বালা করছে, খুব বালা কাম করছে।'

ভাত খেতে পারলো না কাদের। খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করে উঠে পড়লো।

'কিছুইতো মুখে দিলি না, এই কাদের।'

'শইলডা জুইত নাই ছোড ভাই।'

'শুয়ে থাক, আরাম করে শুয়ে থাক। ভয়ের কিছু নেই।'

সন্ধ্যার পর থেকে ঝড় বৃষ্টি শুরু হল। এবং যথারীতি কারেন্ট চলে গিয়ে চারদিক অন্ধকার হয়ে পড়লো। তাকিয়ে দেখি হারিকেন জ্বালিয়ে মতিনউদ্দিন সাহেব নেজাম সাহেবের ঘর থেকে বেরুচ্ছেন।

AMARBOI.COM

এতক্ষণ সেখানেই বসেছিলেন। আমার তাঁর কথা মনেই হয়নি। আমাকে দেখেই এক গাল হেসে বললেন, 'ঝড় বৃষ্টির রাতে মিলিটারি বের হবে না। আরাম করে ঘুমানো যাবে। ঠিক না শফিক সাহেব?'

এই বলেই কাদেরের দিকে তাঁর চোখ পড়লো। ভীত স্বরে বললেন, 'মরে গেছে না-কি?'

'না মরেনি।'

'এসেছে কখন?'

'বিকেলে।'

'আপনি আমাকে খবর দেননি কেন? কেন আমাকে খবর দেন নি?'

মতিন সাহেব বড়ই রেগে গেলেন। আমি অবাক হয়ে দেখলাম তাঁর চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

'আমাকে কেউ মানুষ বলে মনে করে না। যখন কাদেরকে ধরে নিয়ে গেছে তখনো কেউ আমাকে বলে নি। আমি জেনেছি এক দিন পরে। কেন আপনারা আমার সঙ্গে এরকম করেন? আমি কি করেছি?'

হৈ চৈ শুনে কাদের জেগে উঠলো। মতিনউদ্দিন সাহেব হঠাৎ অত্যন্ত নরম স্বরে বললেন, 'তোমার জন্যে আমি খুব চিন্তা করেছি কাদের। হযরত শাহ্ জালাল সাহেবের দরগাতে সিন্নি মানত করেছি।'

'আপনের শইলডা বালা?'

'আমার শরীর বেশি ভাল না কাদের। রাত্রে ঘুম হয় না। কিন্তু তোমার পায়ে কি হয়েছে? ভেঙে ফেলেছে না-কি?'

'না ভাঙ্গে নাই।'

'বললেই হয় ভাঙেনি। নিশ্চয়ই ভেঙেছে। পায়ে কোন সেন্স আছে? চিমটি দিলে বুঝতে পার?'

'জ্বি পারি।

মতিনউদ্দিন সাহেব খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'তুমি রাজাকারে ভর্তি হয়ে যাও কাদের মিয়া। তাহলে মিলিটারি তোমাকে কিছু বলবে না। ভয় ডর থাকবে না, আরাম করে ঘুমাতে পারবে। যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পারবে। নব্বই টাকা বেতন পাবে তার সঙ্গে খোরাকী। ভাল ব্যবস্থা। ভর্তি হয়ে যাও। কালকেই যাও।'

AMARBOI.COM

আমি অনেকক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম মতিন সাহেবকে। লোকটির বয়স হঠাৎ করে যেন অনেক বেড়ে গেছে। অনিদ্রার জন্যে চোখের নিচে গাঢ় হয়ে কালি পড়েছে। মোটা সোটা থাকায় আগে যেমন সুখী সুখী লাগতো এখন লাগে না। কেমন উদভ্রান্ত চোখের দৃষ্টি। সমস্ত চেহারাটাই কেমন যেন রুক্ষ।

মতিন সাহেব সেই রাত্রে আমাকে খুবই বিরক্ত করলেন। একটা চিঠি লিখছিলাম। তিনি পেছন থেকে বার বার সেই চিঠি পড়ার চেষ্টা করতে লাগলেন। আমি রাগী গলায় বললাম, 'কি করছেন এই সব ?'

'দেখছি মিলিটারির বিরুদ্ধে কিছু লিখেছেন কিনা। চিঠি এখন সেনসার হয়। আপনার লেখার জন্যে শেষে আমাকে ধরে নিয়ে যাবে।'

'আপনার ভয় নেই, মিলিটারির বিরুদ্ধে কিছু লিখছি না।'

'কি লিখছেন পড়ে শোনান।'

'আপনি ঘুমাতে চেষ্টা করেন মতিন সাহেব।'

'রাত্রে তো আমি ঘুমাই না। তার ওপর আজকে আবার ইলেকট্রি-সিটি নেই। মিলিটারির জন্যে খুব সুবিধা।'

'মতিন সাহেব।'

'জ্বি ?'

'আপনি দয়া করে আপনার ঘরে যান তো।'

'কেন, আমি থাকলে কি হয় ? আমি তো আর আপনাকে বিরক্ত করছি না। বসে আছি চুপচাপ।'

বহু কষ্টে রাগ থামালাম আমি। নেজাম সাহেব কবে যে ফিরবেন আর কবে যে এই যন্ত্রের হাত থেকে বাঁচবো কে জানে। মতিন সাহেব হঠাৎ উঠে জানালা বন্ধ করতে লাগলেন।

'জানালা খোলা থাকলে অনেক দূর থেকে আলো দেখা যায়। এতো রাত পর্যন্ত আলো জ্বালা খুব সন্দেহজনক।'

'গরমে সেদ্ধ হয়ে মরব মতিন সাহেব।'

'গরম কোথায়, হারিকেনটা নিবিয়ে দেন। দেখবেন শীত শীত লাগবে।'

AMARBOI.COM

গলা ব্যথার জন্যে অষুধ কিনতে গিয়েছি, দেখি অষুধের দোকানে রফিকের ছোট ভাই। এ্যাসপিরিন কিনছে। আমাকে দেখে তার মুখ

ফ্যাকাসে হয়ে গেল। আমি অত্যন্ত পরিচিত ভঙ্গিতে বললাম, 'এই যে কি ব্যাপার?'

সে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালো। যেন আমাকে ঠিক চিনতে পারছে না। আমি হাসি হাসি মুখে বললাম, 'তারপর সব খবর ভালো তো? হানিমুন কোথায় করলে?'

সে তারও উত্তর দিল না। এ্যাসপিরিনের দাম দিয়ে লম্বা মুখ করে বেরিয়ে গেল।

এই ছেলেটিকে আমি দুচোখে দেখতে পারি না। তবু রাস্তায় দেখা হলে কথা বলি। সেই সবজান্তার ভঙ্গিতে দু একটা জ্ঞানগর্ভ কথা বলেই গম্ভীর হয়ে থাকে। কিন্তু আজকে এ রকম করলো কেন? ছেলেটির সঙ্গে আমার মোটামুটি খাতির আছে। আমার নিজের ধারণা, আমি বোকা সেজে থাকি বলে ছেলেটা আমাকে খানিকটা পছন্দও করে।

আমি অষুধ কিনে বাড়ি না ফিরে চলে গেলাম রফিকের ওখানে। রফিক বাসায় ছিল না। তার ছোট ভাই বেরিয়ে এসে পাথরের মত মুখ করে বললো, 'আমাদের টেলিফোন নষ্ট।'

'টেলিফোন করতে আসিনি, রফিকের সঙ্গে কথা ছিল।'

'দাদাতো সন্ধ্যার আগে আসবে না।'

রফিক এসে পড়লো মিনিট পনেরোর মধ্যেই।'

'কোনো কাজে এসেছিস?'

'না, দেখা করতে এলাম। কাদের ছাড়া পেয়েছে জানিস নাকি?'

'জানবো না কেন, তুই তো টেলিফোন করলি। আছে কেমন এখন?'

'ভালোই আছে। তোদের খবর কি?'

রফিক মুখ কালো করে বললো, 'তুই জানিস না কিছু?'

'না। কি জানব?'

'সারা ঢাকার লোক জানে, আর তুই জানিস না? আয় আমার সাথে চায়ের দোকানটাতে গিয়ে বসি। সিগারেট আছে?'

চায়ের দোকানে রফিক খুব গম্ভীর হয়ে বসে রইল। আমি বললাম, 'বল কি হয়েছে?'

'আমার ছোট ভাই ফিরোজ, সে এখন আর তার বৌকে দেখতে পারে না। মেয়েটা থাকে বাপের বাড়ি। সে যায় না ওখানে। খুবই অশান্তি।'

AMARBOI.COM

'কারণটা কি ?'

'কোনই কারণ নেই। একটা গুজব উঠেছে বুঝলি—দু' একজন লোক বলাবলি করছে মেয়েটাকে নাকি একবার মিলিটারিরা উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। দু'রাত না-কি রেখেছিল।'

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

'গুজব ছাড়া আর কিছুই না। এই সিগারেটের আগুন হাতে নিয়ে বলছি। কিন্তু ফিরোজের ধারণা এটা গুজব না। ঐটা তো আসলে একটা গরু, চিলে কান নিয়ে গেছে শুনলে চিলের পিছে দৌড়ায়।'

রফিক আরেক কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে নিচু গলায় বললো, 'ফিরোজকে দোষ দিয়ে কি হবে বল। আমার মায়েরও সেই রকম ধারনা। মা ঐদিন বলছিলেন—কোন দোষ না থাকলে এই রকম একটা সুন্দরী মেয়েকে ফিরোজের কাছে বিয়ে দেয় কেন? ফিরোজের আছে কি ?'

রফিক আরেকটি সিগারেট ধরিয়ে আরেক কাপ চায়ের অর্ডার দিল। আমি বললাম, 'আর চা নিস না। দুপুরবেলা গাদাখানিক চা খাওয়া ঠিক না। রফিক বললো, 'কাউকে বলিস না, তোকে একটা কথা বলছি—আমি ঠিক করেছি মুক্তিবাহিনীতে চলে যাব। আমার জীবনের কোন দাম আছে না-কি? বেঁচে থাকলেই কি আর মরলেই কি। আমার আর সহ্য হচ্ছে না।'

'মুক্তিবাহিনীতে যাবি কিভাবে?'

প্রথম মেঘালয়ে যাব। সেখানে গেলেই ব্যবস্থা হবে। সোর্স পাওয়া গেছে।'

'কবে যাবি?'

'দুয়েক দিনের মধ্যে যাব।'

'কাউকে বলেছিস বাড়িতে?'

'বাবাকে বলেছি।'

'চাচা কি বলেন?'

'কি বলেন শুনে লাভ নেই। দে আরেকটা সিগারেট দে।'

উঠে আসবার সময় রফিক ইতস্তত করে বললো, 'একটা কথা শফিক, আমার ভাইয়ের ব্যাপারটা একটু গোপন রাখিস। বড় লজ্জার ব্যাপার হয়েছেরে ভাই। সে আবার গত সোমবার নয়টা ফেনোবারবিটল খেয়েছে। চিন্তা করে দেখ।'

'কে খেয়েছে?'

AMARBOI.COM

'ফিরোজ, আর কে। কি লজ্জা ভেবে দেখ। স্টমাক ওয়াস টোয়াস করাতে হয়েছে।'

ঘরে ফিরে দেখি বাচ্চু ভাই দরবেশের দোকানের সেই ছেলেটা (বাদশা মিয়া) এসে বসে আছে। কাদের বাচ্চু ভাই দরবেশের কোন খবর পেয়েছে কি-না তাই জানতে এসেছে। কাদের গম্ভীর হয়ে বলছে, 'বাইচা আছে এই খবর পাইছি।'

'কে কইছে?'

'ইজাবুদ্দিন সাব।'

'এইটা কেমুন কথা কাদের ভাই। ইজাবুদ্দিন সাব তো কইছে উল্টা কথা।'

'আমি কি তর সাথে মিছা কইছি?'

'না তুমি মিছা কইবা ক্যান?'

'দরবেশ সাবের পরিবাররে কইছে চিন্তার কোনো কারণ নাই।'

'দেখা করনের কোন উপায় আছে কাদের ভাই?'

'দেখা করনের চিন্তা বাদ দে বাদশা। বাইচা আছে। এইটাই বড় কথা। কয় জন বাচে ক দেখি?'

'তা ঠিক।'

বাদশা মিয়ার ছেলেটি খুব কাজের, সে একাই বাচ্চু ভাই দরবেশের দোকান চালু করে দিয়েছে। আগের মত বিক্রি নেই, তবু বাজার খরচ উঠে যায়। বাচ্চু ভাইয়ের পরিবারকে পথে বসতে হয়নি।

একদিন গেলাম তার ওখানে চা খেতে। লোকজন নেই, খালি দোকান সাজিয়ে বাদশা মিয়া বসে আছে।

'কিরে লোক জনতো কিছু নেই।'

'সকালের দিকে কিছু কিছু হয়।'

'চা তুই একাই বানাস না অন্য কেউ আছে?

'জি না আমি একলাই আছি, অন্য কেউ নাই।'

কিছুতেই তাকে চায়ের দাম দেয়া গেল না। চোখ কপালে তুলে বললো, 'আপনার কাছ থাইক্যা দাম নেই ক্যামনে! কন কি স্যার।

আমার প্রতি তার এই প্রগাঢ় ভক্তির কারণ কি, কে জানে? বাড়িতে ফিরে এসে দেখি আজিজ সাহেবের কাছ থেকে লম্বা একটি চিঠি এসেছে। চিঠিটি লিখে দিয়েছে নীলু। দুটি খবর জানা গেল সে চিঠিতে। আজিজ সাহেব তাঁর মেয়েদের জন্যে বিয়ে ঠিক করেছেন। বিলুর বিয়ে হচ্ছে যে ছেলেটির সঙ্গে সে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ফিফথ

AMARBOI.COM

ইয়ারে পড়ে। দেখতে ভাল। বংশও ভাল। ছেলের বাবা স্কুলের হেড মাস্টার। আজিজ সাহেব লিখেছেন—বর্তমান পরিস্থিতিতে মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেয়াই সবচে ভাল। সমগ্র চিঠিতে নীলুর বিয়ে কোথায় হচ্ছে, কার সঙ্গে হচ্ছে—কিছুই লেখা নেই। নেজাম সাহেবের কথাও নেই। সেটিও বেশ রহস্যময়।

চিঠির সঙ্গে বিলুর একটি চিরকুটও আছে। আমি অসংখ্যবার পড়লাম সেটি।

'সফিক ভাই,

মতিন ভাইয়ের কাছে একটি চিঠি দিয়েছিলাম আপনাকে দেবার জন্যে। লিখেছিলাম এক মাসের মধ্যে অবশ্যি যেন তার জবাব দেন। আপনি দেননি। এমন কেন আপনি ?

বিলু।

মতিন সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, 'বিলু কি যাবার আগে আপনাকে কোন চিঠি দিয়েছিল ?'

মতিন সাহেব অনেক ভেবে চিন্তে বললেন, 'হ্যাঁ আপনাকে দিতে বলেছিল। খুব না-কি জরুরী।'

'কোথায় সে চিঠি ?'

মতিন সাহেব চোখ কপালে তুলে বললেন, 'আমি কি করে বলব কোথায় ?

সেই চিঠিটি আর কোথাও পাওয়া গেল না।

AMARBOI.COM

মানুষ যে-কোনো অবস্থাতেই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে। ফাঁসির আসামীও শুনেছি এক সময় মৃত্যুভয়ে অভ্যস্ত হয়ে যায়। নিয়মিত খাওয়া-দাওয়া করে। তরকারিতে লবণ কম হলে মেটকে চৌদ্দপুরুষ তুলে গাল দেয়। সেই হিসেবে আমাদের দীর্ঘ ছ'মাসে মোটামুটি অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু তা হওয়া গেল না। তার মূল কারণ সম্ভবত অনিশ্চয়তা। রাস্তায় রিকশা নিয়ে বের হলে দুটি সম্ভাবনা—মিলিটারিরা রিকশা থামাতে পারে, না-ও থামাতে পারে। থামালে ধরে নিয়ে যেতে পারে, না-ও ধরতে পারে। ধরে নিয়ে গেলে আবার ফিরে আসতে পারে, আবার না-ও ফিরে আসতে পারে। এই ধরনের অনিশ্চয়তায় বেঁচে থাকা যায় না।

যদি নিশ্চিতভাবে জানা যেতো এর বেশি আর কিছু হবে না। স্বাধীনতা-টাধিনতার কথা চিন্তা করে লাভ নেই, তাহলে হয়তো সময় এতো দুঃসহ হতো না। কিন্তু একটি আশার ব্যাপার আছে। একদিন হয়তো আবার আগের মতো রাস্তায় ইচ্ছেমতো হাঁটা যাবে। রাত বারোটায় চায়ের দোকানে বসে সিঙ্গেল চায়ের অর্ডার দেয়া যাবে। স্বাধীনতা একেকজনের কাছে একেক রকম। এই মুহূর্তে আমার কাছে স্বাধীনতা মানে হচ্ছে রাত এগারোটায় রাস্তায় হাঁটতে-হাঁটতে গম্ভীর হয়ে পানের পিক ফেলা। মতিনউদ্দিন সাহেবের কাছে স্বাধীনতার মানে খুব সম্ভব রাতের বেলায় জানালা খোলা রেখে (এবং বাতি জ্বালিয়ে রেখে) ঘুমনোর অধিকার।

আজকাল আমি রাস্তায় দীর্ঘসময় হেঁটে বেড়াই। আগে কেউ আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করতো না। এখন মাঝে-মাঝে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে। বাসা কোথায়? কোথায় যাচ্ছি? মুসলমান, না হিন্দু (হিন্দু বলতে পারে না, বলে ইন্দু)। একবার শুধু-শুধু আধঘন্টা দাঁড় করিয়ে রাখলো। আমার ধারণা নিছক ভয় দেখিয়ে মজা করবার জন্যেই। আমার সঙ্গে আরেকটি ছেলে ছিলো। সে বাজার করে ফিরছে। বাজারের ব্যাগ থেকে ইলিশ মাছের লেজ বের হয়ে আছে। ছেলেটি কুল কুল করে ঘামতে শুরু করলো। নেহায়েৎ বাচ্চা ছেলে। হয়তো কাজের ছেলেটা আসেনি, মা জোর করে পাঠিয়েছে। আমি বললাম, 'ভয়ের কিছু নেই। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকো। এক্ষুনি ছেড়ে দেবে।'

যে সেপাইটি আমাদের দাঁড় করিয়ে রেখেছে, সে একবার এসে জিজ্ঞেস করলো, 'ক্যা ডর লাগতা?'

ছেলেটি কোনো কথা বলতে পারলো না। আমি বললাম, 'ইলিশ মাছ কতো দিয়ে কিনেছো?'

বেচারা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো। প্রচণ্ড ঘামছে সে। আমি বললাম, 'এক্ষুনি ছাড়বে, ভয়ের কিছু নেই।'

'যদি না ছাড়ে?'

'কি যে বল। ছাড়বেই। তোমার নাম কি?'

লম্বামত একটি মিলিটারি এগিয়ে এলো এই সময় এবং আমি কিছু বোঝবার আগেই প্রচণ্ড এক চড় মারলো ছেলেটির গালে। আমি হাত বাড়িয়ে ছেলেটিকে টেনে তুললাম। তার ব্যাগ ছিটকে পড়েছে দূরে। সেখান থেকে আলুগুলো বেরিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। মিলিটারিটি আমাদের হাত নেড়ে চলে যেতে বললো। ছেলেটির গা কাঁপছিলো,

AMARBOI.COM

ঠিকমত হাঁটতে পারছিল না। সে ফিস ফিস করে বললো, 'আমাকে একটু বাসায় পৌঁছে দেবেন?'

আমরা একটা রিকশা নিলাম। ছেলেটি রিকশায় উঠে ক্রমাগত চোখ মুছতে লাগলো। আমার খুব ইচ্ছে হল বলি—আজ তুমি যে লজ্জা পেয়েছ, সে শুধু তোমার একার লজ্জা নয়। আমাদের সবার লজ্জা। কিন্তু কিছুই বললাম না। এই সব বড় বড় কথার আসলে তেমন কোনো অর্থ নেই।

আমি তাকে বাসা পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম। ছেলেটির মা এমন ভাব করতে লাগলো যেন আমি তাকে মিলিটারির হাত থেকে ছাড়িয়ে এনেছি। আমার জন্যে হালুয়া এবং পরোটা তৈরি হলো। হালুয়া খাবার সময় ভদ্রমহিলা একটা তালপাখা নিয়ে বাতাস করতে লাগলো। আমি বললাম, 'রোজার সময় দেখবেন এরা বেশি ঝামেলা করবে না। আর কয়েকটা দিন।'

আমাদের কাদের মিয়াও খবর আনলো প্রথম রোজার দিন সব আটক লোককে ছেড়ে দেয়া হবে। ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবের সঙ্গে বৈঠকে বসবে। সব ঠিকঠাক। আমেরিকা নাকি শক্ত ধমক দিয়েছে ইয়াহিয়া খানকে। ইয়াহিয়া মিটমাটের জন্যে একটা পথ খুঁজছে।

'বুঝলেন ছোড ভাই, সাপ গিলার অবস্থা হইছে। না পারে গিলতে, না পারে রাখতে।'

কাদের পহেলা রমজানের জন্যে খুব উৎসাহ নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। তার উৎসাহের প্রধান কারণ দরবেশ বাচ্চু ভাই ছাড়া পাবে।

দরবেশ বাচ্চু ভাই ছাড়া পেলেন না। রমজানের সময় অবস্থা অনেক বেশি খারাপ হলো। আল বদর বাহিনী তৈরি হল। প্রথমবারের মতো অনুভব করলাম কিছু কিছু যুদ্ধ সত্যি সত্যি হচ্ছে। নয় তো এতোটা খারাপ অবস্থা হওয়ার কোনো কারণ নেই। ইজাবুদ্দিন সাহেবও অনেকখানি মিইয়ে গেলেন। বারান্দায় এখন আর তিনি একশ পাওয়ারের বাতি দুটি জ্বালান না। ছয় রোজার দিন রাতে তারাবীর নামাজ শেষে ফেরবার পথে তিনি মারা পড়লেন। হাসিমুখে খবর আনলো কাদের মিয়া। প্রচণ্ড ধমক লাগালাম কাদেরকে, 'এই লোকটার জন্যেই বেঁচে এসেছিস তুই কাদের। আর যেই হাসে হাসুক, তুই হাসিস না।'

কাদেরের হাসি বন্ধ হলো না। চোখ ছোট-ছোট করে বললো, 'খেইল শুরু হইছে ছোড ভাই। বিসমিল্লাহ্ দিয়া শুরু।'

মতিনউদ্দিন সাহেব শুধু বললেন, 'মানুষ মারাটা ঠিক না। মানুষ মারাটা কোনো হাসির জিনিস না কাদের মিয়া। ইজাবুদ্দিন সাহেব মানুষের অনেক উপকার করেছেন।'

AMARBOI.COM

দুলাভাই খবর পাঠিয়েছেন এক্ষুণি যেতে হবে। দুলাভাইয়ের গাড়ির এই ড্রাইভারটি নতুন রাখা হয়েছে। লোকটি বিহারী। মিলিটারির গাড়ি থামলেই সে গলা বের করে এক গাদা কথা হড় হড় করে বলে। ফলস্বরূপ গাড়ি থেকে নামতে হয় না।

দুলাভাইয়ের বাসায় গিয়ে দেখি জিনিসপত্র গোছগাছ হচ্ছে। আপার মুখে আষাঢ়ের ঘনঘটা। দুলাভাই বললেন, 'ইণ্ডিয়া যুদ্ধে নামবে, বুঝলে নাকি শফিক? শহর ছাড়ার সময় হয়ে গেছে।'

'কখন ছাড়ছেন শহর?'

'আন্দাজ কর দেখি?'

'আজকেই যাচ্ছেন নাকি?'

'ঠিক। এক ঘন্টার মধ্যে। গাড়িতে করে যাবো ময়মনসিংহ। ময়মনসিংহে খবর দেয়া আছে।'

'হঠাৎ করে যাচ্ছেন দুলাভাই। আজকেই ঠিক করলেন নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'আজকে ঠিক করার পেছনে কোনো কারণ আছে?'

'আছে। সিরিয়াস কারণ আছে।'

'বলেন শুনি।'

'তার আগে বলো তুমি একটা কাজ করতে পারবে কিনা?'

'কি কাজ?'

'লুনাকে তো চেন, শীলার বান্ধবী—এক মেজর বিয়ে করতে চায় তাকে।'

'চিনি।'

'সেই মেয়েটিকে তোমার ওখানে নিয়ে রাখবে। শুধু আজকের রাতটা। কাল ভোরে মেয়ের এক চাচা এসে মেয়েকে নিয়ে যাবে। খবর দেয়া হয়েছে, তাঁকে তোমার ঠিকানা দিয়ে দিয়েছি।'

'কিছুই বুঝতে পারছি না দুলাভাই। মেয়েটা কোথায়?'

'এখানেই আছে। শীলার ঘরে আছে।'

ব্যাপার মোটামুটি এই রকম, গত দশদিন ধরে লুনা এই বাড়িতে আছে। মেয়ের বাবা-মা মেজর ভদ্রলোককে বলেছেন, মেয়ে চিটাগাং তার নানার বাড়িতে আছে। ঈদের পর আসলে বিয়ের পাকা কথা-বার্তা হবে তখন। মেজর সাহেব কিছুই বলেননি। আজ সকালে কিছু লোকজন এসে মেয়ের বাবা-মাকে তুলে নিয়ে গেছে। দুলাভাইয়ের ধারণা তাঁকে ধরতে আসবে আজকালের মধ্যে। বড় আপা অত্যন্ত

AMARBOI.COM

বিরক্ত হয়ে বললো, 'মেয়েকে আমার এখানে রাখার কথা তো আমি বলি নি, তোর দুলাভাই গলা বাড়িয়ে গিয়ে বলেছে। এখন দেখ না ঝামেলা।'

'ঝামেলা তো সবারই আপা। তুমি ঝামেলায় পড়লে দেখবে সাহায্যের জন্যে লোক আসছে।'

'রাখ-রাখ। লম্বা লম্বা কথা ভালো লাগে না। লম্বা কথা অনেক শুনেছি।'

বড় আপার ঢাকা ছাড়ার ইচ্ছে মোটেই নেই। সে আমার সামনেই একবার দুলাভাইকে বোঝাতে চেষ্টা করল যে সবচে ভালো হয় এই বাসা ছেড়ে দিয়ে অন্য কোথায়ও ওঠা।

'শফিকের ওখানে উঠতে দোষ কি? ঘর তো খালি পড়ে আছে?'

দুলাভাই অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বললেন, 'ঢাকা শহরে এক ঘন্টার বেশি আমি থাকবো না। ওরা আমাকে খুঁজছে।'

'তুমি তো শেখ মুজিব। তোমাকে না হলে ওদের ঘুম হচ্ছে না।'

দুলাভাই শান্ত স্বরে ড্রাইভারকে বললেন গাড়ি বের করতে। আমাকে বললেন, 'লুনাকে সবকিছু বলা হয়েছে। খুব শক্ত মেয়ে। একটুও ঘাবড়ায় নি।'

আমি বললাম, 'যদি ওর চাচা না আসে?'

'আসবেই। আর যদি না আসে তাহলে তুমি বুদ্ধি খাটিয়ে যা করবার করবে। মেয়ের এক দূর সম্পর্কের খালা আছে ঢাকায়। লুনার কাছে ঠিকানা আছে।'

'ওর বাবা-মার খবর ওকে বলেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'কান্নাকাটি করছে না?'

'আমাদের সামনে না। মেয়ে বড় শক্ত, মচকাবার মেয়ে না। আমি খুবই ইমপ্রেসড।'

দুলাভাই খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'একটা টেলিফোন নাম্বার দিচ্ছি, সেই টেলিফোন নাম্বারে ফোন করে বলবে যে আমি চলে গেছি।'

'কাকে বলবো?'

'যে টেলিফোন রিসিভ করবে তাকেই বলবে। বলবে মেসেজ রাখতে।'

'এইটি কি আপনার ব্রিগেডিয়ার বন্ধুর নাম্বার?'

'হ্যাঁ, তোমার ওর কাছে যাওয়ার দরকার নেই।'

AMARBOI.COM

লুনাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরছি। রাস্তায় নেমেই প্রচণ্ড ভয় লাগলো। মনে হলো রাস্তাঘাটগুলো যেন বড় নির্জন। যেন আজকেই ভয়ংকর একটা কিছু ঘটবে। শাহবাগের পাশে প্রকাণ্ড একটা ট্রাক দাঁড়িয়ে ছিল। তার পাশ দিয়ে যাবার সময় আমার বুক কাঁপতে লাগলো। মনে হলো ওরা আজ অবশ্যি আমাদের গাড়ি থামাবে। ঠাণ্ডা স্বরে বলবে—'তোমার সঙ্গের ঐ মেয়েটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করবার জন্যে আমরা নিয়ে যাব।' আমি বলব, 'জনাব, ও একটি নিতান্ত বাচ্চা মেয়ে। ক্লাস নাইনে পড়ে।' ওরা দাঁত বের করে হাসবে। এবং হাসতে হাসতে বলবে, 'জিজ্ঞাসাবাদ করবার জন্যে বাচ্চা মেয়েরাই ভালো।'

আমি নিজেকে সাহস দেবার জন্যেই বললাম, 'লুনা, ভয়ের কিছু নেই। তুমি শান্তভাবে চুপচাপ বসে থাক।'

'চুপচাপই তো বসে আছি।'

'জানালা দিয়ে বারবার এদিক-ওদিক তাকাচ্ছ কেন? মাথাটা নিচু করে বস না।'

'আহ্, আপনি কেন এত ভয় পাচ্ছেন? মাথা নিচু করে বসব কেন শুধু শুধু?'

ড্রাইভার গাড়ি ছোটাচ্ছে ঝড়ের মতো। এত জোরে গাড়ি চালানোর দরকারটা কি? শুধু শুধু মানুষের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি করা। আমি বললাম, 'ড্রাইভার সাহেব একটু আস্তে চালান।'

ড্রাইভার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ফার্স্ট গিয়ারে নিয়ে এলো—যা আরো সন্দেহজনক। যেই দেখবে তারই মনে হবে বদ মতলব নিয়ে গাড়ির ভেতর কেউ বসে আছে। সম্ভবত একটি লুকোনো স্টেনগান আছে, সুবিধে মত টার্গেট পেলেই বের হয়ে আসবে।

বাড়ির সামনে এসেও আমার বুকের ধক-ধকানি কমে না। এত খাঁ-খাঁ করছে কেন চারদিক? আগে তো কখনো এরকম লাগেনি। আমি গলা উঁচিয়ে ডাকলাম, 'এই কাদের। কাদের।'

কাদেরের সাড়া পাওয়া গেল না। মতিনউদ্দিন সাহেব জানালা দিয়ে মাথা বের করে আবার কচ্ছপের মত মাথা টেনে নিলেন।

AMARBOI.COM

তারপরই ঝপাং করে জানালা বন্ধ করে ফেললেন। ভদ্রলোকের মাথা কি পুরোপুরিই খারাপ হয়ে গেছে?

'মতিন সাহেব, আপনি নিচে এসে স্যুটকেসটা নিয়ে যান দয়া করে।'

মতিন সাহেব নিচে নামলেন না। শব্দ শুনে বুঝলাম ভদ্রলোক অন্য জানালাগুলো বন্ধ করছেন। লুনা বললো, 'আমি নিতে পারবো।'

'তোমার নিতে হবে না। রাখ তুমি। মতিন সাহেব। ও মতিন সাহেব।'

কোনোই সাড়া নেই। লুনা বললো, 'ঐ লোকটিরই কি মাথা খারাপ?'

'কে বললো তোমাকে?'

'শীলা। শীলা বলেছে।'

শীলা দেখলাম অনেক কিছুই বলেছে। এই বাড়িতে যে একটা তক্ষক আছে তাও তারা জানা। দোতলায় উঠেই বললো, 'এ বাড়িতে নাকি কুমীরের মত বড় একটা তক্ষক আছে?'

'তা আছে।'

'কোথায় দেখান তো।'

এই মেয়ে যে অবস্থায় আছে, সেই অবস্থায় কেউ যে তক্ষকের খোঁজ করতে পারে তা আমার কল্পনা ছিল না। আমি গম্ভীর মুখে লুনাকে বসিয়ে রেখে মতিন সাহেবের খোঁজ করতে গেলাম। তিনি কাদেরের ঘরে। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ।

'দরজা খোলেন মতিন সাহেব।'

'ঐ মেয়েটা কে?'

'আমার ভাগ্নি। আপনি দরজা বন্ধ করে বসে আছেন কেন?

মতিন সাহেব দরজা খুলে ফিস ফিস করে বললেন, 'আপন ভাগ্নি?'

'তা দিয়ে দরকার কি আপনার?'

মতিন সাহেব দীর্ঘ সময় চুপচাপ থেকে বললেন, 'মেয়েটাকে আমি চিনি শফিক সাহেব। আপনাকে আমি আগে বলিনি, একদিন সন্ধ্যাবেলা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। ঘরের মধ্যে কেমন যেন একটা মিষ্টি গন্ধ। তাকিয়ে দেখি মাথার কাছে একটি মেয়ে বসে আছে। মেয়েটার নাকের কাছে একটা তিল। এইটি সেই মেয়ে। দেখেই চিনেছি।'

আমি ভদ্রলোকের কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এই লোক তো বদ্ধ উন্মাদ। মতিন সাহেব ফিস ফিস করে বললেন, 'আপনার বিশ্বাস হয় না?'

AMARBOI.COM

'না। অন্ধকারের মধ্যে আপনি একটা মেয়ের নাকের তিল দেখবেন কি করে?'

'তাও তো ঠিক।'

'মেয়েটার নাকে কোন তিল-টিল নেই, বিপদে পড়ে এসেছে। কাল সকালে চলে যাবে।'

'কি সর্বনাশ, রাত্রে থাকবে। আগে বলেননি কেন?'

'আগে বললে কি করতেন?'

'না মানে করার তো কিছু নেই।'

'যান নিচ থেকে স্যুটকেসটা নিয়ে আসুন। কাদের গেছে কোথায়?'

'জানি না। আমাকে কিছু বলে যায় নি।'

'কখন আসবে তাও বলেনি?'

'নাহ্।'

লুনা অল্পক্ষণের মধ্যেই বেশ সহজ হয়ে গেলো। কথাবার্তা বলতে শুরু করলো। ভাবখানা এরকম যেন এ জাতীয় ব্যাপার প্রতিদিন ঘটছে। অপরিচিত জায়গায় অপরিচিত পুরুষদের মধ্যে রাত কাটানোটা তেমন কিছু বড় ব্যাপার নয়। নিজের বাবা-মার কথা একবারই শুধু বললো। তক্ষকরা কি খায় সেই গল্প বলতে বলতে হঠাৎ বলে ফেললো, 'আপনার কি মনে হয় আব্বা আম্মা ছাড়া পেয়ে আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে? আমার ঠিকানা তো তারা জানে না।'

প্রশ্নটি এত আচম্‌কা এসেছে যে আমার জবাব দিতে দেরি হল। আমি থেমে থেমে বললাম, 'খুবই সম্ভব। তবে তারা নিশ্চয়ই তোমার চাচার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন, আর তোমার চাচা তো আমার ঠিকানা জানেন।'

'তা ঠিক। এটি আমার মনেই হয়নি।'

তার মুখ দেখে মনে হল বড় একটি সমস্যার খুব সহজ সমাধান পাওয়া গেছে। এ নিয়ে আর চিন্তার কিছু নেই। আমি বললাম, 'তুমি হাত মুখ ধুয়ে বিশ্রাম কর। কাদের এসে এই ঘর তোমার জন্যে ঠিকঠাক করবে। চা খাবে? ক্ষিধে লেগেছে? ঘরে অবশ্যি কিছু নেই। শুধু শুধু চা, এক কাপ খাও।'

'কে বানাবে চা, আপনি?'

'হ্যাঁ, কেন?'

'শীলা বলেছে আপনি কিছুই করতে পারেন না। চা পর্যন্ত বানাতে জানেন না। এই জন্যেই চাকরি-টাকরি কিছুই করেন না। শুধু ঘরে বসে থাকেন।'

AMARBOI.COM

'আর কি বলেছে ?'

'আর বলেছে আপনি কাক পোষেন। আপনি যে দিকেই যান, দশ বারোটা কাক কা কা করতে করতে আপনার পেছনে পেছনে যায়।'

লুনা খিল খিল করে হেসে উঠলো। বহুদিন আমার এই আগোছালো নোংরা ঘরে এমন মন খুলে কেউ হেসে ওঠেনি। আমার মনে হলো সব যেন আগের মত হয়ে গেছে। আর ভয়ে ভয়ে রাস্তায় বের হতে হবে না। রাতের বেলা জীপের শব্দ শুনে কাঠ হয়ে বিছানায় বসে থাকতে হবে না। লুনা বললো, 'আপনি আবার রাগ করলেন না-কি ?'

কাদের এসে নিমিষের মধ্যে ঘর-দোর গুছিয়ে ফেললো। চাল ডালের টিন দুটি কোথায় যেন সরিয়ে ফেললো। নতুন টেবিল ক্লথ বের হলো। বিছানার চাদর নিয়ে রমিজের দোকান থেকে ইস্ত্রী করিয়ে আনলো। বইয়ের শেল্‌ফ গুছিয়ে, মতিন সাহেবকে নিয়ে ধরাধরি করে বড় ট্রাঙ্কটা সরানো হলো। এতে না-কি হাঁটাচলার জায়গা বেশি হবে। এক ফাঁকে আমাকে এসে ফিস ফিস করে বলে গেল, 'মেয়েছেলে না থাকলে ঘরের কোন 'সুন্দর্য' নাই। এই কথাটা ছোড ভাই খুব খাঁটি। লাখ কথার এক কথা।'

লুনার থাকার ব্যবস্থা হলো আমার ঘরে। আমি গেলাম কাদেরের ঘরে। মতিন সাহেব বললেন তিনি বারান্দায় বসে থাকবেন। ঘরে একটি মহিলা আছে, সবাই ঘুমিয়ে পড়াটা ঠিক হবে না। তাঁর যখন এমনিতেই ঘুম হয় না কাজেই অসুবিধে কিছু নেই। আমি লুনাকে বেশ কয়েক বার বললাম, 'ভয়ের কিছু নেই, একটা রাত দেখতে দেখতে কেটে যাবে। আর যদি ভয় টয় লাগে ডাকবে। আমার খুব সজাগ ঘুম।'

'না আমার ভয় লাগছে না।'

কাদের বললো,'চিন্তার কিছু নাই আফা। কোনো বেচাল দেখলেই আমার কাছে খবর আসব। লোক আছে আমার। আফা আগের দিন আর নাই।'

কাদের যেন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হয়ে উঠেছে। বেচাল দেখলেই তার কাছে খবর চলে আসবে তা জানা ছিল না। সে কয়েক দিন আগে ঘোষণা করেছে—'এই ভাবে থাকা ঠিক না। কিছু করা বিশেষ প্রয়োজন।'

AMARBOI.COM

মতিন সাহেবের কাছে শুনলাম কাদের নাকি কার কার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে, তারা তাকে নিয়ে যাবে। কখন নেবে কি তা গোপন। হঠাৎ একদিন হয়ত চলে যেতে হবে। এই ব্যাপারে আমার সঙ্গে তার কোনো কথা হয়নি। সরাসরি আমার সঙ্গে কথা বলার বোধ হয় তার ইচ্ছেও নেই।

লুনা রাত দশটা বাজতেই ঘরের বাতি নিভিয়ে দিল। আমি শুতে গেলাম রাত বারটার দিকে। শোয়া মাত্রই আমার ঘুম আসে না। দীর্ঘ সময় জেগে থাকতে হয়। এপাশ-ওপাশ করতে হয়। দু তিনবার বাথরুমে গিয়ে ঘাড়ে পানি দিতে হয়। বিচিত্র কারণে আজ শোয়া মাত্রই ঘুম এলো। গাঢ় ঘুম। ঘুম ভাঙলো অনেক রাতে। দেখি অন্ধকারে উবু হয়ে বসে কাদের বিড়ি টানছে। আমাকে দেখে হাতের আড়ালে বিড়ি লুকিয়ে ফেলে নিচু গলায় বললো, 'মেয়েডা খুব কানতেছে ছোড ভাই। মনটার মইদ্যে বড় কষ্ট লাগতাছে।'

প্রথম কিছুক্ষণ কিছুই শুনতে পেলাম না। তারপর অস্পষ্ট ফোঁপানির আওয়াজ শুনলাম। মেয়েটি নিশ্চয়ই বালিশে মুখ গুঁজে কান্নার শব্দ ঢাকার চেষ্টা করছে। আমি উঠে দরজার কাছে যেতেই কান্না অনেক স্পষ্ট হলো। মাঝে মাঝে আবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলছে—'আম্মি আম্মি।' আমি কিছুই বললাম না। কিছু কিছু ব্যক্তিগত দুঃখ আছে যা স্পর্শ করার অধিকার কারোরই নেই। মতিন সাহেব অনেকটা দূরে ইজিচেয়ারে মূর্তির মত বসেছিলেন। আমাকে বেরিয়ে আসতে দেখে ভারী গলায় বললেন, 'মেয়েটা খুব কাঁদছে। কি করা যায় বলুন তো?'

'কিছুই করার নেই।'

'তা ঠিক, কিছুই করার নেই। বড় কষ্ট লাগছে। আমিও কাঁদছিলাম।'

বলতে বলতে মতিন সাহেব চোখ মুছলেন। দু'জন চুপচাপ বারান্দায় বসে রইলাম। এক সময় কাদেরও এসে যোগ দিল। শেষ রাতের দিকে বৃষ্টি পড়তে লাগলো। জাম গাছের পাতায় সড় সড় শব্দ উঠলো। লুনা ফোঁপাতে ফোঁপাতে ডাকলো, 'আম্মি আম্মি।' পরদিন লুনার চাচা লুনাকে নিতে এলেন না।

সন্ধ্যার পর মডার্ন ফার্মেসী থেকে টেলিফোন করতে চেষ্টা করলাম। অপারেটর বললো ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ টেলিফোন এক্সচেঞ্জ নষ্ট। কখন ঠিক হবে তা জানে না। আমি বাসায় ফিরে দেখি লুনা মুখ কালো

AMARBOI.COM

করে বসে আছে। আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই কোনো কাজে আটকা পড়েছেন। কাল নিশ্চয়ই আসবেন।'

লুনা কোনো কথা-টথা বললো না।

'কালকে আমি তোমার খালার বাসা খুঁজে বের করব। চা খেয়েই চলে যাব। তোমার কাছে ঠিকানা আছে না?'

'জ্বি আছে।'

'আমি খুব ভোরেই যাব। যদি এর মধ্যে তোমার চাচা চলে আসেন তাহলে তুমি তাঁর সঙ্গে চলে যাবে। অবশ্যই যাবে। আমার জন্যে অপেক্ষা করবে না।'

লুনা শান্ত স্বরে বললো, 'না। আমি আপনার জন্যে অপেক্ষা করব।'

'আমার ফিরতে কত দেরি হবে কে জানে। হয়তো আটকা পড়ে যাব রাস্তায়। তুমি অপেক্ষা করবে না। যত তাড়াতাড়ি পৌঁছোনো যায় ততই ভালো।'

রাত্রে ভাত খাওয়ার জন্যে ডাকতে গিয়ে দেখি চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে।

'আমি ভাত খাব না।'

'তোমার কি শরীর খারাপ লুনা?'

'জ্বি না।'

'জ্বর না তো? চোখ মুখ কেমন যেন ফোলা ফোলা লাগছে।'

'জ্বর-টর না। কিছু খেতে ইচ্ছে হচ্ছে না।'

'দুধ খাবে? ঘরে দুধ আছে।'

'জ্বি না। আমি কিছুই খাব না।'

আমি ফিরে আসছি, হঠাৎ লুনা খুব শান্ত স্বরে বললো, 'আমার মনে হয় কেউ আমাকে নিতে আসবে না।'

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই একটি টিকটিকি ডাকলো। লুনা বললো, 'দেখলেন তো টিকটিকি বলছে "ঠিক ঠিক"। তার মানে কেউ আসবে না।'

ঠিকানা নিয়ে যে বাড়িতে উপস্থিত হলাম সেটি তালাবন্ধ। গেটে 'টু লেট' ঝুলছে। বাড়িওয়ালা আশপাশেই ছিলেন, আমাকে দেখে হাসি মুখে এগিয়ে এলেন, 'বাড়ি ভাড়া করবেন? খুব সস্তায় পাবেন।

AMARBOI.COM

সারভেন্টের জন্য আলাদা বাথরুম আছে এখানে। গত বছর দেওয়াল ডিসটেম্পার করলাম।'

বাড়ি ভাড়ার জন্যে আসি নি। খোরশেদ আলি সাহেবের খোঁজ করছি শুনে ভদ্রলোক খুব হতাশ হলেন।

'এরা থাকে না এখানে—জুন মাসে বাড়ি ছেড়ে গেছে। অঞ্চলটা নাকি নিরাপদ না। বলেন দেখি কোন অঞ্চলটা নিরাপদ? আমি তো এখানেই আছি। আমার কিছু হয়েছে? বলেন দেখি?'

'খোরশেদ আলি সাহেবরা এখন থাকেন কোথায় জানেন?'

'ঠিকানা আছে। গিয়ে দেখবেন সেখানেও নেই। নিরাপদ জায়গা যারা খোঁজে তারা এক জায়গায় থাকে না। ঘোরাঘুরি করে।'

ভদ্রলোক ঠিকানা বের করতে এক ঘন্টা লাগালেন। শেষ পর্যন্ত ঠিকানা যেটা পাওয়া গেলো সেটায় বাড়ির নম্বর দেয়া নেই। লেখা আছে মসজিদের সামনের হলুদ রঙের দোতলা বাড়ি। বাড়িওয়ালা ভদ্রলোক গম্ভীর হয়ে বললেন, 'মসজিদের সামনেই বাড়ি তাই মনে করেছে খুব নিরাপদ। বুদ্ধি নেই, লোক তো গাছে হয় না মায়ের পেটেই হয়।'

বহু ঝামেলা করে মসজিদের সামনের হলুদ রঙের দোতলা বাড়ি খুঁজে বের করলাম। বাড়িওয়ালা ভদ্রলোকের কথাই ঠিক। খোরশেদ আলি সাহেব এখানেও নেই। কোথায় গেছেন তাও কেউ জানে না। বাসায় ফেরার পথে মনে হলো নুনার চাচা ভদ্রলোক হয়তো আমার ঠিকানাই হারিয়ে ফেলেছেন। মানুষের স্বভাবই হচ্ছে সবচে' জরুরী কাগজটা হারিয়ে ফেলা। ঠিকানা হারিয়ে ভদ্রলোক নিশ্চয়ই বড় আপার বাসায় খোঁজাখুঁজি করেছেন। অবশ্যি এ যুক্তি তেমন জোরালো নয়। বড় আপার বাসায় দারোয়ান শমসের মিয়া আমার ঠিকানা খুব ভালো করে জানে। তবে এটা অসম্ভব নয় যে শমসের মিয়াকে বিদায় দিয়ে নতুন লোক রাখা হয়েছে। খুব সম্ভব বিহারী কেউ। গাড়ির ড্রাইভার যেমন বিহারী রাখা হয়েছে সে রকম। এ যুক্তি যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য মনে হওয়ায় আমি ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ক্লান্ত-হয়ে বড় আপার বাসায় দুপুর দুটোর দিকে উপস্থিত হলাম। না, শমশের মিয়াই আছে। এবং কেউ এ-বাড়িতে আসেনি। আসবার মধ্যে পিয়ন এসেছে।

'খাওয়ার কিছু আছে শমসের মিয়া?'

'ঘর তো তালা দেওয়া ছোট ভাই। চাবি মেমসাবের কাছে।'

'তোমার কাছে কিছু নেই?'

AMARBOI.COM

'মুড়ি আছে।'

'দেও দেখি তেল মরিচ দিয়ে মেখে। চিঠিপত্র কি আছে দেখি।'

চিঠি এসেছে অণুর কাছ থেকে। বড় আপার কাছে লেখা দীর্ঘ চিঠি (অণু আমাকে কখনো চিঠি লেখে না, নববর্ষের সময় কার্ড পাঠায়)। বড় আপার কাছে লেখা চিঠি আমার পড়তে কোনো দোষ নেই, এই চিন্তা করে চিঠি খুলে ফেললাম। চিঠি পড়ে বড়ই কষ্ট লাগলো। এই যে এতোবড় একটা দুঃসময় যাচ্ছে আমাদের সেই সম্পর্কে শুধু একটি লাইন লেখা, 'দেশের খবর শুনে খুব চিন্তা লাগছে, সাবধানে থাকবি।' তার পরপরই তিন পৃষ্ঠা জুড়ে মন্টানা যাওয়ার পথে কি ঝামেলা হয়েছিলো সেটা লেখা। 'আই-ডাহো ছাড়ার পাঁচ ঘন্টা পর গাড়ির ট্রান্সমিশন গেলো বন্ধ হয়ে। হাইওয়েতে দুঘন্টা বসে থাকতে হলো। শেষ পর্যন্ত হাইওয়ে পেট্রল পুলিশ এসে রাত তিনটায় একটা অতি বাজে মোটেলে নিয়ে তুললো। পেটে প্রচণ্ড খিদে। ভেন্ডিং মেশিন আপেল আর মিল্ক চকোলেট ছাড়া কিছু নেই। বাধ্য হয়ে আপেল আর চকোলেট খেয়ে ঘুমতে যেতে হলো সবাইকে। আর ঘুম কি আসে? এয়ারকুলারটা দিয়ে ঘড় ঘড় শব্দ।'

শমসের মিয়া এক গামলা মুড়ি নিয়ে এলো। কাঁচামরিচ যে কটা ঘরে ছিলো সবই বোধহয় দিয়ে দিয়েছে। ঝালের চোটে চোখে পানি আসার জোগাড়। শমসের মিয়া গলা নিচু করে বললো, 'জায়গার জায়গায় নাকি যুদ্ধ শুরু হইছে, কথাডা সত্যি ছোট ভাই?'

'সত্যি।'

'দেশ স্বাধীন হইলে গরিব দুঃখীর কোনো চিন্তা থাকতো না, কি কন ছোট ভাই?'

'না থাকারই কথা।'

'খাওয়া খাদ্য থাকবো বেশুমার।'

'তা থাকবে।'

'খারাপের পরে বালা দিন আয়—এইটা বিধির বিধান।'

'খুবই খাঁটি কথা শমসের মিয়া।'

'চিন্তা করলে মনটার মইদ্যে শান্তি হয়।'

বাড়ি ফিরে শুনি লুনার চাচা আজকেও আসেননি। লুনার জ্বরও বেড়েছে। কাদের একজন ডাক্তার নিয়ে এসেছিলো। ওষুধপত্র দিয়েছে, আর বলেছে রক্ত পরীক্ষা করতে।

AMARBOI.COM

লুনা আমাকে দেখে বললো, 'কাউকে পান নি?'

'কাল ঠিক পাবো। সকালেই গুলিস্তান থেকে বাস নিয়ে চলে যাবো নারায়ণগঞ্জ।'

'আপনি যে সারাদিন ঘোরাঘুরি করেন, আপনার ভয় লাগে না?'

'নাহ্। আমার অচল পা দেখেই মিলিটারিরা মনে করে একে নিয়ে কোনো ঝামেলা হবে না।'

লুনা গম্ভীর হয়ে বললো, 'আপনি ভাবছেন আপনার কথা শুনে আমি হাসবো? আমাকে যতোটা ছোট আপনি ভাবছেন, তত ছোট আমি না। আমি অনেক কিছু বুঝি।'

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। লুনা শান্ত স্বরে বললো, 'এই যে আমার কাল রাত থেকে জ্বর, আপনি কি আমার গায়ে হাত দিয়ে দেখেছেন কতোটা জ্বর? আপনি কি মনে করেন আমি জানি না, কেন আপনি এ-রকম করছেন? আমি ঠিকই জানি।'

'কি জানো?

লুনা থেমে থেমে বললো, 'গায়ে হাত দিলেই আমি অন্য কিছু ভাববো, বলেন ভাবছেন না? আমি সব বুঝতে পারি। আমি যদি কালো, কুৎসিত একটা মেয়ে হতাম, আপনি ঠিকই আমার গায়ে হাত দিয়ে জ্বর দেখতেন। দেখেন টিকটিকি টিক টিক করছে, তার মানে সত্যি।'

আমি লুনার কপালে হাত দিয়ে দেখি বেশ জ্বর গায়ে। স্বাভাবিক সুরে বললাম, 'লুনা তুমি শুয়ে থাকো, আমি ভাত খেয়ে আসছি। আর তুমি যা বলেছো সেটা ঠিক। খুবই ঠিক।'

রান্নাঘরে ঢুকতেই মতিনউদ্দিন সাহেব বললেন, 'খতমে জালালীটা শুরু করা দরকার। লুনার চাচা আসছে না। এদিকে আবার জ্বর-জ্বারি। এক লাখ পঁচিশ হাজার বার 'দোয়া ইউনুস' পড়লেই সব ঠিক হয়ে যাবে। খুব শক্ত খতম এটা।'

ভাত খেতে বসে শুনলাম দূরে কোথায় যেন গোলাগুলি হচ্ছে। থেমে থেমে বন্দুকের আওয়াজ। মতিন সাহেব মাখা ভাত রেখে উঠে পড়লেন। তাকিয়ে দেখি তাঁর পা ঠক ঠক করে কাঁপছে। কাদের বললো, 'ভয়ের কিছু নাই। নিশ্চিন্ত মনে ভাত খান।'

'আমার খিদে নেই। বমি বমি লাগছে।'

খানিকক্ষণ পর ভারি ভারি দুটি ট্রাক গেলো। মতিন সাহেব ভীত স্বরে বললেন, 'সব বাতি টাতি নিভিয়ে ফেলা দরকার।'

AMARBOI.COM

তিনি দিশেহারার মত জানালা বন্ধ করতে ছুটলেন। কাদের বললো, 'লক্ষণ খারাপ ছোড ভাই।'

রাত দশটায় হঠাৎ বাদশা মিয়া এসে হাজির। সে খুব একটা খারাপ খবর নিয়ে এসেছে। বিহারীরা দল বেঁধে লুটপাট শুরু করেছে। মানুষও মারছে। শুরু হয়েছে তাজমহল রোড, নুরজাহান রোড অঞ্চল থেকে। খবর সত্যি হলে খুবই চিন্তার ব্যাপার।

কাদেরের মুখ শুকিয়ে গেলো। আমি বললাম, 'কোত্থেকে খবর পেয়েছিস?'

'ঠিক খবর স্যার। এক চুল মিথ্যা না।'

লুনার ঘরে গিয়ে দেখি সে জেগে আছে। আমাকে দেখেই বললো, 'ঐ ছেলেটি কি বলছে?

'না কিছু না।'

'বলুন আমাকে, কি বলছে?'

'বিহারীরা নাকি লুটপাট করা শুরু করেছে।'

'কোন্ জায়গায়?'

'শুরু হয়েছে মোহাম্মদপুরে।'

'মোহাম্মদপুর কতো দূর এখান থেকে?'

'দূর আছে।'

'আপনি ঠিক করে বলুন। কেন আমাকে লুকোচ্ছেন?'

'বেশি দূর না।'

বাদশা মিয়া থাকলো না। কার্ফু হবে দশটা থেকে। তার আগেই দরবেশ বাচ্চু ভাইয়ের ঘরে পৌঁছান দরকার। সেখানে পুরুষ মানুষ কেউ নেই। বাচ্চু ভাইয়ের ছেলের বয়স মাত্র চার বছর।

আমরা বাতি-টাতি নিভিয়ে সমস্ত রাত জেগে বসে রইলাম। মাঝ-রাতের দিকে সোবাহানবাগের দিক থেকে খুব হৈ-চৈ ও চিৎকার শোনা গেল। এর কিছুক্ষণ পর একনাগাড়ে দীর্ঘ সময় গুলির শব্দ হতে লাগলো। আমি দিশেহারা হয়ে গেলাম।

'কাদের, কি করা যায়?'

'আল্লাহ্‌র নাম নেন ছোড ভাই। আল্লাহ্ হাফেজ।'

লুনা কিছুতেই বিছানায় শুয়ে থাকতে রাজি হলো না। অন্ধকার বারান্দায় আমাদের সঙ্গে সারারাত বসে রইলো। ভোর রাতে মাইকে বলা হলো এই অঞ্চলে বিকেল তিনটা পর্যন্ত কার্ফু বলবৎ থাকবে।

AMARBOI.COM

দিনটি মেঘলা। দুপুর থেকে টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়তে লাগলো। আমি নিচতলায় আজিজ সাহেবের ঘরের সামনে চুপচাপ বসে রইলাম। আজিজ সাহেব বা নেজাম সাহেব—কারোর কোন খোঁজ খবর নেই। নেজাম সাহেবের নামে একটি রেজিস্ট্রি চিঠি অনেক দিন থেকে পড়ে আছে। লোকটি কোথায় আছে কে জানে।

'ছোড ভাই, আপনের চা।'

কাদের শুধু চা নয়, একটি পিরিচে দুটি বিসকিটও নিয়ে এসেছে।

'কি ব্যাপার, চা কেন?'

'ছোড ভাই, এই শেষ কাপ চা বানাইলাম।'

আমি অবাক হয়ে তাকালাম।

'আর দেখা হয় কি না হয়।'

'ব্যাপার কি?'

'আমি রফিক ভাইয়ের সাথে মেঘালয় যাইতেছি ছোড ভাই।'

'কবে?'

'আইজই যাওনের কথা। কার্ফু তুললেই রওনা দেওনের কথা।'

'আগে বলিসনি কেন?'

কাদের চুপ করে রইলো। এক সময় মৃদু স্বরে বললো, 'কার্ফু ভাঙলেই আমি লুনা আফার জন্যে ডাক্তারের বাবস্থা কইরা রফিক ভাইয়ের বাসায় যাইয়াম। এখন ডাক্তার পাইলে হয়।'

তাকিয়ে দেখি কাদের সার্টের হাতায় চোখ মুছছে।

বেলা সাড়ে তিনটায় কাদের সত্যি চলে গেল। মতিনউদ্দিন সাহেব কিছুই জানেন না বলে মনে হল। আমাকে বললেন, 'কাদেরের কাণ্ড দেখেছেন! তিন ঘন্টার জন্যে কার্ফু রিলাক্স করেছে—এর মধ্যেই তাকে বেরুতে হবে। কথা বললে তো শোনে না। শেষে একার জন্যে সবাই মারা পড়ব।'

মতিনউদ্দিন সাহেব গম্ভীর হয়ে চায়ে চুমুক দিতে লাগলেন। তাঁর দৃষ্টি কেমন যেন উদভ্রান্ত। আমি বললাম, 'আপনার শরীর কি ঠিক আছে?'

'জ্বি ঠিক আছে।'

'দেখছেন কেমন ঢালা বর্ষণ শুরু হয়েছে?'

'জ্বি দেখলাম।'

'লুনা কি ঘুমাচ্ছে?'

মতিন সাহেব হঠাৎ বললেন, 'মেয়েটার কাছে গিয়ে বসেন। ওর শরীর খুব খারাপ।

AMARBOI.COM

সহজ স্বাভাবিক ভালোমানুষের মতো কথাবার্তা।

লুনা জেগে ছিলো। জ্বরের আঁচে তার ফর্সা গাল লালচে হয়ে আছে। চোখ দুটিও ঈষৎ রক্তবর্ণ।

'খুব বেশি খারাপ লাগছে?'

'হ্যাঁ।'

'কাদের এক্ষুণি ডাক্তার পাঠাবে।'

'আপনি একটু বসবেন আমার কাছে?'

আমি তার মাথার কাছে গিয়ে বসলাম। লুনা ছোট একটি নিঃশ্বাস ফেললো। আমার দিকে তাকিয়ে থেমে থেমে বললো, 'একদিন সব আবার আগের মতো হবে, ঠিক না?'

'নিশ্চয়ই হবে। খুব বেশি দেরিও নেই।'

'সেই সময় আপনাকে আমাদের বাসায় কয়েকদিন এসে থাকতে হবে। মতিন সাহেবকে আর কাদেরকেও।'

'হ্যাঁ নিশ্চয়ই, ভালোই হবে।'

'তখন কিন্তু হেন তেন অজুহাত দিতে পারবেন না।'

'আচ্ছা ঠিক আছে।'

'আপনার থাকার ইচ্ছে নেই। হাসছেন মনে মনে।'

'আরে না।'

'আর যখন সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবে, তখন কিন্তু আমি প্রায়ই আপনার এখানে বেড়াতে আসবো।'

'তাতো আসবেই।'

'তখন আমার সঙ্গে অনেক কথা বলতে হবে। তখন যদি আপনি মনে করেন যে বাচ্চা মেয়ের সঙ্গে আমি কি কথা বলবো, তাহলে খুব রাগ করবো।'

'না রাগ করতে দেবো না।'

'আমি কিন্তু মোটেই বাচ্চা মেয়ে না। আমি অনেক কিছু জানি। ওকি আপনি হাসছেন কেন?'

'কই, হাসছি কোথায়?'

'মনে মনে হাসছেন। আমি ঠিক বুঝতে পারছি। যান আপনার সঙ্গে কথা বলবো না আমি।'

লুনা ঝিম মেরে গেল। দীর্ঘ সময় কোনো কথাবার্তা বললো না। আমি চুপচাপ কাছে বসে রইলাম। কাদের কি ডাক্তারকে বলতে ভুলে গিয়েছে। ভোলবার কথা তো নয়।

AMARBOI.COM

লুনা সমস্ত দিন কিছুই খায়নি। আমি এক গ্লাস দুধ এনে দিলাম, সে তা স্পর্শও করলো না। এক সময় গাঢ় রক্তবর্ণ চোখ মেলে বললো, 'কাদের এবং মতিন সাহেব এদের একটু ডেকে জিজ্ঞেস করুন তো। ওরা আমাদের বাসায় থাকবে কি না।'

'নিশ্চয়ই থাকবে।'

'তবু আপনি জিজ্ঞেস করুন।'

মতিন সাহেবকে ডেকে আনলাম। লুনা জড়িত স্বরে বললো, 'আপনি কি থাকবেন আমাদের বাসায় কিছু দিন? থাকতে হবে। না বললে শুনব না।'

মতিন সাহেব মুখ কালো করে বললেন, 'জ্বর মনে হয় খুব বেশী?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ অনেক বেশি। কাদের ডাক্তার পাঠাবে।'

'কখন পাঠাবে?'

'কার্ফু ভাঙার আগেই পাঠাবে।'

লুনা বললো,'কোনো ডাক্তার আসবে না। কেউ আসবে না আমার জন্যে।'

ডাক্তার সত্যি সত্যি এলো না। সন্ধ্যার আগে আগে বাদশা মিয়া এসে উপস্থিত। জানা গেল, কাদের দুজন ডাক্তারের কছে গিয়েছিলো। তাদের একজন বলেছেন পরদিন সকাল বেলায় আসবেন, অন্যজন বলেছেন হাসপাতালে নিয়ে যেতে।

সন্ধ্যা ছ'টা থেকে আবার কার্ফু। লুনা আচ্ছন্নের মত পড়ে আছে। মাঝে মাঝে বেশ সহজ ভাবে কথা বলে পরক্ষণেই নিজের মনে বিড় বিড় করে। একবার খুব স্বভাবিক ভাবে বললো, 'ঠিক করে বলুন তো আমার চেয়েও সুন্দরী কোনো মেয়ে দেখেছেন? আমাকে খুশি করবার জন্যে বললে হবে না। আমি ঠিক বুঝে ফেলবো।'

আমি চুপ করে রইলাম। লুনার মুখে আচ্ছন্ন ভাব।

'চুপ করে থাকলে হবে না, বলতে হবে।'

'তোমার চেয়ে কোন সুন্দরী মেয়ে আমি দেখিনি লুনা।'

'সত্যি!'

'হ্যাঁ।'

'আমার গা ছুঁয়ে বলুন।'

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লুনার অবস্থা খুব খারাপ হলো। মনে হলো লোকজন ঠিক চিনতে পারছে না। মতিন সাহেব ঘরে ঢুকতেই বললো, 'আপনি আমার আম্মিকে একটু ডেকে দেবেন?'

মতিন সাহেব অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

AMARBOI.COM

'ডেকে দিন না। বেশিক্ষণ কথা বলবো না, সত্যি বলছি।'

মতিন সাহেব গম্ভীর হয়ে বললেন, শফিক ভাই, আমি ডাক্তারের খোঁজে যাব। আপনি ওর কাছে বসে থাকুন। হাসপাতালে নিতে হবে।'

মতিন সাহেবের ভাবভঙ্গি অত্যন্ত স্বাভাবিক। সহজ সাধারণ মানুষের মত কাপড় পরলেন। বাদশা অবাক হয়ে বললো, 'কার্ফুর মইধ্যে যাইবেন ?'

'হ্যাঁ।'

আমি বললাম, 'সত্যি সত্যি বেরুচ্ছেন মতিন সাহেব ?'

'হ্যাঁ। কাদের মুক্তিবাহিনীতে গেছে শুনেছেন ?'

'শুনেছি।'

'বাদশা বললো—খুব নাকি কাঁদছিলো। কাঁদার তো কিছু নেই, কি বলেন ?'

মতিনউদ্দিন সাহেব জুতো পায়ে দিতে দিতে বললেন, 'দেখবেন একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে।'

আমি বসে রইলাম মেয়েটির পাশে। জানালা দিয়ে দেখছি শান্ত ভঙ্গিতে পা ফেলে মতিনউদ্দিন সাহেব এগুচ্ছেন। ল্যাম্পপোস্টের আলোয় তাঁর দীর্ঘ ছায়া পড়েছে।

একদিন এই দুঃস্বপ্ন নিশ্চয়ই কাটবে। এই অপূর্ব রূপবতী মেয়েটি গাঢ় নীল রঙের শাড়ি পরে হয়তো সত্যি সত্যি বেড়াতে আসবে এ বাড়িতে। বিলু নীলু ফিরে আসবে একতলায়। অকারণেই বিলু দোতলায় উঠে এসে চোখ ঘুরিয়ে বলবে 'আচ্ছা বলুন দেখি দুই এবং তিন যোগ করলে কখন সাত হয় ?' কনিষ্কও নিশ্চয়ই ফিরে এসে গর্বিত ভঙ্গিতে রেলিং-এ বসে ডাকবে 'কা কা"। কাদের মিয়া বিরক্ত ভঙ্গিতে বলবে—'কি অলক্ষণ, যা যা ভাগ।' গভীর রাত্রে মুষলধারে বর্ষণ হবে। সেই বর্ষণ অগ্রাহ্য করে পাড়ার বখাটে ছেলেরা সেকেণ্ড শো সিনেমা দেখে শিস দিতে দিতে বাড়ি ফিরবে। বৃষ্টির ছাঁটে আমার তোষক ভিজে যাবে, তবু আমি আলস্য করে উঠবো না।

আমি বসেই রইলাম। বসেই রইলাম। লুনা ফিসফিস করে তার মাকে একবার ডাকলো। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম মতিন সাহেব ঠিকই বলেছেন। মেয়েটির নাকের ডগায় ছোট একটি লাল রঙের তিল। বহু দূরে একসঙ্গে অনেকগুলো কুকুর ডাকতে লাগলো। আমার ঘরের প্রাচীন তক্ষকটি বুক সেলফের কাছে থেকে মাথা ঘুরিয়ে গম্ভীর ভঙ্গিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলো।

AMARBOI.COM

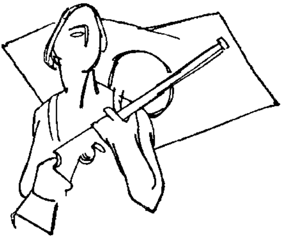

আগুনের পরশমণি

সারাটা সকাল উৎকন্ঠার ভেতর কাটল। উৎকন্ঠা এবং চাপা উদ্বেগ। মতিন সাহেব অস্থির হয়ে পড়লেন। গেটে সামান্য শব্দ হতেই কান খাড়া করে ফেলেন, সরু গলায় বলেন—বিন্তি দেখতো কেউ এসেছে কি না।

বিন্তি এ বাড়ির নতুন কাজের মেয়ে। তার কোনো ব্যাপারে কোনো উৎসাহ নেই, কিন্তু গেট খোলায় খুব আগ্রহ। সে বার বার যাচ্ছে এবং হাসি মুখে ফিরে আসছে। মজার সংবাদ দেবার ভঙ্গিতে বলছে—বাতাসে গেইট লড়ে। মানুষজন নাই।

দুপুরের পর মতিন সাহেবের উদ্বেগ আরো বাড়ল। তিনি তলপেটে একটা চাপ ব্যথা অনুভব করতে লাগলেন। এই উপসর্গটি তাঁর নতুন। কোনো কিছু নিয়ে চিন্তিত হলেই তলপেটে তীক্ষ্ম যন্ত্রণা হতে থাকে। ডাক্তার-টাক্তার দেখানো দরকার বোধ হয়। আলসার হলে কি এ রকম হয়? আলসার হয়ে গেল নাকি?

মতিন সাহেব পাঞ্জাবি গায়ে দিলেন। চুল আঁচড়ালেন। সুরমা অবাক হয়ে বললেন, 'কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

ঃ এই একটু রাস্তায়।

ঃ রাস্তায় কি?

ঃ কিছু না। একটু হাঁটব আর কি।

তিনি হাসতে চেষ্টা করলেন।

সুরমার দৃষ্টি তীক্ষ্ম হল। গত রাতে তাঁদের বড় রকমের একটা ঝগড়া হয়েছে। সাধারণত ঝগড়ার পর তিনি কিছুদিন স্বামীর সঙ্গে কোনো কথা বলেন না। আজ তার ব্যতিক্রম হল। তিনি কঠিন গলায়

AMARBOI.COM

বললেন, 'তুমি সকাল থেকে এ রকম করছ কেন ? কারোর কি আসার কথা ?'

মতিন সাহেব পাংশু মুখে বললেন—আরে না, কে আসবে ? এই দিনে কেউ আসে ?

মতিন সাহেব স্ত্রীর দৃষ্টি এড়াবার জন্যে নিচু হয়ে চটি খুঁজতে লাগলেন। সুরমা বললেন—

ঃ রাস্তায় হাঁটাহাঁটির কোনো দরকার নেই। ঘরে বসে থাক।

ঃ যাচ্ছি না কোথাও। এই গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকব।

ঃ গেটের বাইরে শুধু শুধু দাঁড়িয়ে থাকবে কেন ?

তিনি জবাব দিলেন না।

স্ত্রীর কথার অবাধ্য হবার ক্ষমতা তাঁর কোনো কালেই ছিল না। কিন্তু আজ অবাধ্য হলেন। হলুদ রঙের একটা পাঞ্জাবি গায়ে গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন। রাস্তা ফাঁকা। তিনি পর পর দুটি সিগারেট শেষ করলেন, এর মধ্যে মাত্র একটা রিকশা গেল। সে রিকশাও ফাঁকা। অথচ কিছুদিন আগেও দুপুরবেলায় রিকশার যন্ত্রণায় হাঁটা যেত না। মতিন সাহেব রাস্তার মোড় পর্যন্ত গেলেন। ইদ্রিস মিয়ার পানের দোকানের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। ইদ্রিস মিয়া শুকনো গলায় বলল, 'স্যার ভাল আছেন ?'

তিনি মাথা নাড়লেন। যার অর্থ হ্যাঁ। কিন্তু মুখের ভাবে তা মনে হলো না। তাঁর মুখ দেখে মনে হচ্ছে তিনি ভাল নেই।

ঃ বিক্রি বাটা কেমন ইদ্রিস ?

ঃ আর বিক্রি ! কিনব কে কেন ? কিনার মানুষ আছে ?

ঃ দেখি একটা পান দাও।

মতিন সাহেবের এখনো দুপুরের খাওয়া হয়নি। এক্ষুণি গিয়ে ভাত নিয়ে বসতে হবে। পান খাওয়ার কোনো মানে হয় না। কিন্তু একটা দোকানের সামনে শুধু শুধু দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। ব্যাপারটা সন্দেহ-জনক। এখন সময় খারাপ। আচার আচরণে কোনো রকম সন্দেহের ছাপ থাকা ঠিক না।

ঃ জর্দা দিমু ?

ঃ দাও।

ইদ্রিস নিষ্প্রাণ ভঙ্গিতে পান সাজাতে লাগল। তার মাথায় ঝুটি-বিহীন একটা লাল ফেজ টুপি। কোত্থেকে জোগাড় করেছে কে জানে। চিবুকের কাছে অল্প দাড়ি মতিন। সাহেব পান মুখে নিয়ে বললেন—

AMARBOI.COM

দাড়ি রাখছ নাকি ইদ্রিস? ইদ্রিস জবাব দিল না।

ঃ দাড়ি রেখে ভালই করেছ। যে দিকে বাতাস, সেই দিকেই পাল তুলতে হয়। পান কত?

ঃ দেন যা ইচ্ছা।

ইদ্রিসের গলার স্বরে স্পষ্ট বৈরাগ্য। যেন পানের দাম না দিলেও তার কিছু আসে যায় না। মতিন সাহেব একটা সিকি ফেলে খানিকটা এগিয়ে গেলেন। নিউ পল্টন লাইনের এই গলিটায় বেশ কয়েকটি দোকান। কিন্তু মডার্ন সেলুন এবং পাশের ঘরটি ছাড়া সবই বন্ধ। তিনি মডার্ন সেলুনে ঢুকে পড়লেন। রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করার চেয়ে সেলুনে চুল কাটা নিয়ে ব্যস্ত থাকা ভাল।

সেলুনটা এক সময় মস্তান ছেলেপুলেদের আড্ডাখানা ছিল। লম্বা চুলের চার পাঁচটা ছেলে সার্টের বুকের বোতাম খুলে বেঞ্চির উপর বসে থাকত। সেলুনের একটা এক ব্যান্ড ট্রানজিস্টার সারাক্ষণই বাজত। ট্রানজিস্টারের ব্যাটারীর খরচ দিতে গিয়েই সেলুন লাটে ওঠার কথা। কিন্তু তা ওঠে নি। রমরমা ব্যবসা করেছে। আজ অবশ্যি জনশূন্য! তবে ট্রানজিস্টার বাজছে। আগের মত ফুল ভ্যলুমে নয়। দেশাত্মবোধক গান। কথা ও সুর নজরুল হক। মতিন সাহেব বেশ মন দিয়েই গান শুনতে লাগলেন। তবে চোখ রাখলেন রাস্তার ওপর।

ঃ চুলটা একটু ছোট কর।

নাপিত ছেলেটি বিস্মিত হল। সে এঁর চুল গত বুধবারেই কেটেছে। আজ আরেক বুধবার। এক সপ্তাহে চুল বাড়ে দুই সুতা। তার জন্যে কেউ চুল কাটাতে আসে না।

ঃ স্যার চুল কাটবেন?

ঃ হুঁ। পিছনের দিকে একটু ছোট কর।

নাপিতের কাঁচি যন্ত্রের মত খট খট করতে লাগল। মতিন সাহেব বললেন—দেশের হালচাল কি?

ঃ ভালই।

চুল কাটাতে এলে এই ছোকরার কথার যন্ত্রণার অস্থির হতে হত। কথা শুনতে তাঁর খারাপ লাগে না। কিন্তু এই ছোকরা কথা বলার সময় থুথুর ছিটে এসে লাগে। আজ সে নিশ্চুপ। থুথু গায়ে লাগার কোনো আশঙ্কাই নেই।

দাম দেবার সময় তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'রাত দিন ট্রানজিস্টার চালাও কিভাবে? ব্যাটারীর তো মেলা দাম।' নাপিত ছোকরা জবাব দিল না।

AMARBOI.COM

গম্ভীর মুখে টাকা ফেরত দিয়ে বেঞ্চির ওপর পা তুলে বসে রইল। মতিন সাহেব বললেন, 'আজ কার্ফু ক'টা থেকে জান নাকি?'

ঃ জানি, ছয়টায়।

ঃ এক ঘণ্টা পিছিয়ে দিল, ব্যাপারটা কি?

ঃ ঝামেলা নাই, গণ্ডগোল নাই—কার্ফুও নাই।

ঃ তা তো ঠিকই। এখন হয়েছে ছ'টা, তারপর হবে সাতটা। তারপর আটটা, কি বল?

তিনি কোন উত্তর পেলেন না। ছেলেটা ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে আছে। আজকাল কেউ বাড়তি কথা বলতে চায় না। চেনা মানুষদের কাছেও না।

রোদ উঠেছে কড়া এবং ঝাঁঝালো। কিন্তু এই কড়া রোদেও তাঁর কেমন শীত শীত করতে লাগল। তিনি ইদ্রিস মিয়ার দোকানের সামনে দ্বিতীয়বার এসে দাঁড়ালেন। মনে করতে চেষ্টা করলেন ঘরে যথেষ্ট সিগারেট আছে কি না। পাঁচটার পর কোথাও কিছু পাওয়া যাবে না। গত সোমবারে সিগারেটের অভাবে খুব কষ্ট করেছেন। রাত ন'টার সময় বিন্তি এসে বলল, সিগারেটের প্যাকেট খুঁজ্যা পাই না। কি সর্বনাশ, বলে কি! তাঁর মাথায় রক্ত উঠে গেল। অমানিশি কাটবে কিভাবে? এটা ফ্ল্যাট বাড়ি না। ফ্ল্যাট বাড়ি হলে অন্যদের কাছে খোঁজ করা যেত। তবু তিনি রাত দশটার সময় পাঁচিলের কাছে দাঁড়িয়ে পাশের বাড়ির উকিল সাহেবকে করুন সুরে ডাকতে লাগলেন—ফরিদউদ্দিন সাহেব, ফরিদউদ্দিন সাহেব, সিগারেট আছে? সুরমা এসে তাঁকে টেনে ভেতরে নিয়ে গেলেন। রেগে আগুন হয়ে বললেন, 'মাথা কি খারাপ হয়ে গেছে? একটা রাত সিগারেট না ফুঁকলে কী হয়?'

AMARBOI.COM

মতিন সাহেব মানিব্যাগ খুললেন। ইদ্রিস মিয়া তার দোকানে আগর বাতি জ্বালিয়েছে। সব দোকানদারদের মধ্যে এই একটি নতুন অভ্যেস দেখা যাচ্ছে। আগরবাতি জ্বালানো। আগে কেউ কেউ সন্ধ্যাবেলা জ্বালাতো। এখন প্রায় সারাদিনই জ্বলে। আগরবাতির গন্ধ মৃত্যুর কথা মনে করিয়ে দেয়। মতিনউদ্দিন সাহেব অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন।

ঃ ইদ্রিস, দুই প্যাকেট ক্যাপস্টান দাও।

ইদ্রিস সিগাটের বের করল। দাম এক টাকা বেশি নিল। সিগারেটের দাম চড়েছে। ছেলে ছোকরারা এখন সারাদিন ঘরে বসে থাকে এবং সিপারেট ফোঁকে। এ ছাড়া কি আর করবে?

ঃ দুটা ম্যাচও দাও।

ইদ্রিস মিয়া ম্যাচ দিতে দিতে বলল, 'আফনে কাউরে খুজতেছেন?'

তিনি চমকে উঠলেন। বলে কি এই ব্যাটা! টের পেল কি ভাবে?

ঃ কারে খুজেন?

ঃ আরে না, কাকে খুঁজব? চুল কাটতে গিয়েছিলাম। চুল একটু বড় হলেই আমার অসহ্য লাগে।

তিনি বাড়ির দিকে রওনা হলেন। গোরস্তান ঘেঁসে রাস্তা গিয়েছে। সে জন্যেই কি গা ছম ছম করে? না অন্য কোনো কারণ আছে? একটা কটু গন্ধ আসছে। নিউ পল্টন লাইনের লোকজনদের ধারণা বর্ষাকালে এই গন্ধ পাওয়া যায়। লাশ পচে গন্ধ ছড়ায়। এখন বর্ষাকাল। গোরস্তানের পাশে বাড়ি ভাড়া নেয়াটা ভুল হয়েছে। বিরাট ভুল।

বিন্তি গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। মতিন সাহেবকে দেখে সে দাঁত বের করে হাসল। এই মেয়েটার হাসি-রোগ আছে। যখন তখন যার তার দিকে তাকিয়ে হাসবে। অভদ্রের চূড়ান্ত। কড়া ধমক দিতে হয়। তিনি ধমক দিতে গিয়েও দিলেন না। সোজা ঘরে ঢুকে খেতে বসলেন।

সুরমাও বসেছেন। কিন্তু তিনি কিছু খাচ্ছেন না। ঝগড়া-টগড়ার পর তিনি খাওয়া দাওয়া আলাদা করেন। মাঝে মাঝে করেনও না। মতিন সাহেব ভাত মাখাতে মাখাতে বললেন, আজ কার্ফু পাঁচটা থেকে। সুরমা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন, 'তাতে কি?'

ঃ না কিছু না। এমনি বললাম। কথার কথা।

ঃ আজ অফিসে গেলেন না কেন?

ঃ শরীরটা ভাল না।

ঃ একটা সত্যি কথা বল তো, কেউ কি আসবে?

তিনি বিষম খেলেন। পানি টানি খেয়ে ঠাণ্ডা হতে তাঁর সময় লাগল। সুরমা তাকিয়ে আছেন। তাঁর মুখ কঠিন। মতিন সাহেব ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেললেন। একসময় সুরমার এই মুখ খুব কোমল ছিল। কথায় কথায় রাগ করে কেঁদে ভাসাতো। একবার তাঁকে এক সপ্তাহের জন্যে রাজশাহী যেতে হবে। সুরমা গম্ভীর হয়ে আছে, কথা টথা বলছে না। রওনা হবার আগে আগে এমন কান্না! মতিন সাহেব বড় লজ্জার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন। বাড়ি ভর্তি লোকজন। এদের মধ্যে মেজো ভাবীও আছেন। মেজো ভাবীর মুখ খুব আলগা। তিনি নিচু গলায় বাজে ধরনের একটা রসিকতা করলেন। কি অস্বস্তি। পঁচিশ বছর আগেকার কথা। পঁচিশ বছর খুব কি দীর্ঘ সময়? এই সময়ের মধ্যে একটি কোমল মুখ চিরদিনের জন্যে কঠিন হয়ে যায়।

AMARBOI.COM

ঃ কি, কথা বলছ না কেন ?

ঃ কি বলব ?

ঃ কারোর কি আসার কথা ?

ঃ আরে না। কে আসবে ?

ঃ সত্যি করে বল।

মতিন সাহেব থেমে থেমে বললেন, ইয়ে—আমার এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়।

ঃ কে সে ?

ঃ তুমি চিনবে না।

ঃ তোমার আত্মীয় আর আমি চিনব না, কি বলছ এ সব ?

ঃ দেখা সাক্ষাৎ নেই তো, আমি নিজেই ভাল করে চিনি না।

ঃ তুমি নিজেও চেন না ?

সুরমার কপালে ভাঁজ পড়ল। মতিন সাহেব অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। তিনি মৃদু স্বরে বললেন—

ঃ দুই একদিন থাকবে, তারপর চলে যাবে। নাও আসতে পারে। ঠিক নেই কিছু। না আসারই সম্ভাবনা।

ঃ সে করে কি ?

ঃ জানি না।

ঃ জানি না মানে ?

ঃ বললাম তো আমি নিজেও চিনি না ভাল করে। যোগাযোগ নেই।

মতিন সাহেব উঠে পড়লেন। সাধারণত ছুটির দিনগুলোতে তিনি খাওয়া দাওয়ার পর গল্পের বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েন। আজ ছুটির দিন নয়, কিন্তু তিনি অফিসে যান নি। কাজেই দিনটিকে ছুটির দিন হিসেবেই ধরা যেতে পারে। তাঁর উচিত একটা বই নিয়ে বিছানায় চলে যাওয়া। তিনি তা করলেন না। বই হাতে বারান্দার ইজিচেয়ারে বসলেন। চোখ রাস্তার দিকে।

দিনের আলো কমে আসছে। আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছে। পর পর কয়েক দিন খটখটে রোদ গিয়েছে। এখন আবার কয়েক দিন ক্রমাগত বৃষ্টি হবার কথা। বাড়ির ভেতরে সুরমা বসেছে তার সেলাই মেশিন নিয়ে। বিশ্রী ঘটাং ঘটাং শব্দ হচ্ছে। মতিন সাহেবের ঘুম পেয়ে গেল। হাতে ধরে রাখা বইটির লেখাগুলো ঝাপসা হয়ে উঠছে। ঝাপসা এবং অস্পষ্ট। রোদ নেই একেবারেই। আকাশে মেঘের ঘনঘটা। বৃষ্টি হবে, জোর বৃষ্টি হবে। তিনি বই বন্ধ করে আকাশের দিকে তাকালেন।

AMARBOI.COM

বাদলা দিনে মনে পড়ে ছেলেবেলার গান। সুরমা ক্রমাগতই খট খট করে যাচ্ছে। কিসের তার এত সেলাই? আচ্ছা, ছেলেবেলায় সুরমা কেমন ছিল? প্রতিটি মানুষ এক্কেক বয়সে এক্কেক রকম। যৌবনে সুরমা কত মায়াবতী ছিল। বর্ষার রাতগুলো তাঁরা গল্প করে পার করে দিতেন। একবার খুব বর্ষা হল। খোলা জানালায় বৃষ্টির ছাঁট এসে বিছানা ভিজিয়ে একাকার করেছে, তবু তাঁরা জানালা বন্ধ করলেন না। ভেজা বিছানায় শুয়ে রইলেন। হাওয়া এসে বার বার মশারিকে নৌকার পালের মত ফুলিয়ে দিতে লাগল। কত গভীর আনন্দেই না কেটেছে তাঁদের যৌবন। মতিন সাহেব কালো আকাশের দিকে তাকিয়ে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লেন।

যখন ঘুম ভাঙল তখন চারদিক অন্ধকার। টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে। দমকা বাতাস দিচ্ছে। তিনি খোঁজ নিলেন---কেউ এসেছে কি না। কেউ আসে নি। কার্ফু শুরু হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। এখন আর আসার সময় নেই। কাল কি আসবে? বোধ হয় না। শুধু শুধুই অপেক্ষা করা হলো। তিনি শোবার ঘরে উঁকি দিলেন। সুরমা ঘুমচ্ছে। একটা সাদা চাদরে তার শরীর ঢাকা। তাকে কেমন অসহায় দেখাচ্ছে। মতিন সাহেব কোমল গলায় ডাকলেন, 'সুরমা সুরমা।' সুরমা পাশ ফিরলেন।

AMARBOI.COM

ঘড়িতে সাড়ে পাঁচটা বাজে। কার্ফু শুরু হতে এখনো আধ ঘণ্টা বাকি। কিন্তু এর মধ্যেই চারদিক জনশূন্য। লোকজন যার যার বাড়ি ফিরে গেছে। বাকি রাতটায় কেউ আর ঘর থেকে বেরুবে না। ইদ্রিস মিয়া তার দোকান বন্ধ করার জন্যে উঠে দাঁড়াল। রোজ শেষ মুহূর্তে কিছু বিক্রিবাটা হয়। আজ হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না কে জানে? অন্ধকার দেখে সবাই ভাবছে, বোধ হয় কার্ফুর সময় হয়েছে। সময় না হলেও কিছু যায় আসে না। আজকাল সবাই অন্ধকারকে ভয় পায়। ইদ্রিস মিয়া দোকানের তালা লাগাবার সময় লক্ষ্য করল গলির ভেতরে লম্বা একটি ছেলে ঢুকছে। তার হাতে কয়েকটা পত্রিকা। হাঁটার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে বাসার নম্বর পড়তে পড়তে আসছে। ইদ্রিস মিয়ার দোকানের সামনে এসে সে থমকে দাঁড়াল। ইদ্রিস মিয়া বলল, 'আপনে কি মতিন সাবের বাড়ি খুজেন?

ছেলেটি তাকাল বিস্মিত হয়ে। কিছু বলল না। ইদ্রিস বাড়ি দেখিয়ে দিল। নিচু গলায় বলল--

ঃ লোহার গেইট আছে। গেইটের কাছে একটা নাইরকল গাছ। তাড়াতাড়ি যান। ছয়টার সময় কার্ফু।

ইদ্রিস মিয়া হন হন করে হাঁটতে লাগল। একবারও পেছনে ফিরে তাকাল না। ছেলেটি তাকিয়ে রইল ইদ্রিস মিয়ার দিকে। লোকটি ছোটখাট। প্রায় দৌড়োচ্ছে। সে নিশ্চয়ই অনেকখানি দূরে থাকে। ছ'টার আগে তাকে পেঁীছতে হবে।

ছেলেটি এগিয়ে গেল। লোহার গেটের বাড়িটির সামনে দাঁড়াল। নারকেল গাছ দুটি ঝুঁকে আছে রাস্তার দিকে। প্রচুর নারকেল হয়েছে। ফলের ভারেই যেন গাছ হেলে আছে। দেখতে বড় ভাল লাগে। ছেলেটি গেটে টোকা দিয়ে ভারী গলায় ডাকল, 'মতিন সাহেব, মতিনউদ্দিন সাহেব।' বয়সের তুলনায় তার গলা ভারী। ছেলেটির নাম বদিউল আলম। তিন মাস পর সে এই প্রথম ঢুকেছে ঢাকা শহরে।

জুলাই মাসের ছ' তারিখ। বুধবার। উনিশ শ একাত্তুর সন। একটি ভয়াবহ বৎসর। পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীর কঠিন মুঠির ভেতর একটি অসহায় শহর। শহরের অসহায় মানুষ। চারদিকে সীমাহীন অন্ধকার। সীমাহীন ক্লান্তি। দীর্ঘ দিবস এবং দীর্ঘ রজনী।

বদিউল আলম গেট ধরে দাঁড়িয়ে আছে। সে এ শহরে ঢুকেছে সাত জনের একটি ছোট্ট দল নিয়ে। শহরে গেরিলা অপারেশন চালানোর দায়িত্ব তার। ছেলেটি রোগা। চশমায় ঢাকা বড় বড় চোখ। গায়ে হালকা নীল রঙের হাওয়াই সার্ট। সে একটি রুমাল বের করে কপাল মুছে দ্বিতীয়বার ডাকল, 'মতিন সাহেব, মতিন সাহেব।'

মতিন সাহেব দরজা খুলে বের হলেন। দীর্ঘ সময় অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন ছেলেটির দিকে। এ তো নিতান্তই বাচ্চা ছেলে। এরই কি আসার কথা?

ঃ আমার নাম বদিউল আলম।

ঃ এস বাবা, ভেতরে এস।

এই সামান্য কথা বলতে গিয়ে মতিন সাহেবের গলা ধরে গেল। চোখ ভিজে উঠল। এত আনন্দ হচ্ছে।।তিনি চাপা স্বরে বললেন, 'কেমন আছ তুমি?'

ঃ ভাল আছি।

ঃ সঙ্গে জিনিসপত্র কিছু নেই?

ঃ না।

ঃ বল কি।

AMARBOI.COM

সুরমা দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। পর্দা সরিয়ে তাকিয়ে আছেন। মতিন সাহেব বললেন, 'এস, ভেতরে এস। দাঁড়িয়ে আছ কেন ?'

ঃ গেটটা বন্ধ। গেট খুলুন।

ঃ ও আচ্ছা আচ্ছা।

মতিন সাহেব সঙ্কুচিত হয়ে পড়লেন। সাড়ে পাঁচটার দিকে গেটে তালা দিয়ে দেয়া হয়। চাবি থাকে সুরমার কাছে। সুরমা আঁচল থেকে চাবি বের করলেন।

ঃ গেটে তালা দিয়ে রাখি। আগে দিতাম না। এখন দেই। অবশ্যি চুরি ডাকাতির ভয়ে না। চুরি ডাকাতি কমে গেছে। চোর ডাকাতরা এখন কি ভাবে বেঁচে আছে কে জানে। বোধ হয় কষ্টে আছে।

বদিউল আলম বসবার ঘরে ঢুকল। মতিন সাহেবের মনে হল এই ছেলেটির কোনো দিকেই কোনো উৎসাহ নেই। সোফাতে বসে আছে, কিন্তু কোনো কিছু দেখছে না। বসার ভঙ্গির মধ্যেও গা ছেড়ে দেয়া ভাব আছে। মতিন সাহেব নিজের মনে কথা বলে যেতে লাগলেন---

ঃ কয়েকদিন ধরে আমরা স্বামী-স্ত্রী আছি এই বাড়িতে। আমাদের দুই মেয়ে আছে—রাত্রি আর অপালা। ওরা তার ফুপুর বাড়িতে। সোমবার আসবে। ওদের ফুপু মানে আমার বোনের কোনো ছেলেপুলে নেই। মাঝেমধ্যে রাত্রি আর অপালাকে নিয়ে যায়। ওরাও তাদেয় ফুপুর খুব ভক্ত। খুবই ভক্ত।

বদিউল আলম কিছু বলল না। তাকিয়ে রইল। মতিন সাহেব খানিকটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। গলা পরিষ্কার করে বললেন—অবস্থা কি বল শুনি।

ঃ কিসের অবস্থা ?

ঃ তোমরা যেখানে ছিলে সেখানকার অবস্থা।

ঃ ভালই।

ঃ আমরা তো কিছুই বুঝতে পারছি না। বাঘের পেটের ভেতর আছি। কাজেই বাঘটা কি করছে না করছে বোঝার উপায় নেই। বাঘ মারা না পড়া পর্যন্ত কিছুই বুঝব না। মারা পরার পরই পেট থেকে বের হব।

মতিন সাহেবের এটা একটা ভিন্ন ডায়ালগ। সুযোগ পেলেই এটা ব্যবহার করেন। শ্রোত্যরা তখন বেশ উৎসাহী হয়ে তাকায়। কয়েকজন বলেই ফেলে—ভাল বলেছেন। কিন্তু এবারে যে রকম কিছু হলো না। মতিন সাহেবের সন্দেহ হলো ছেলেটা হয়ত শুনছেই না।

AMARBOI.COM

ঃ তুমি হাত মুখ ধুয়ে এস। চায়ের ব্যবস্থা করছি।

ঃ চা খাব না। ভাতের ব্যবস্থা করুন, যদি অসুবিধে না হয়।

ঃ না না, অসুবিধে কিসের? কোন অসুবিধে নেই। খাবার-টাবার গরম করতে বলে দিই।

ঃ গরম করবার দরকার নেই। যেমন আছে দিন।

মতিন সাহেব অপ্রস্তুত হয়ে উঠে গেলেন। একজন ক্ষুধার্ত মানুষের সঙ্গে এতক্ষণ ধরে বক বক করছিলেন। খুব অন্যায়। খুবই অন্যায়।

আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে ছেলেটির প্রসঙ্গে সুরমা কোনো কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। যেন দেখবার পর তাঁর সব কৌতূহল মিটে গেছে। ভাত খাওয়াবার সময় নিজেই দু একটা কথা বললেন। যেমন একবার বললেন, 'তুমি মনে হচ্ছে ঝাল কম খাও?' ছেলেটি তার জবাবে অন্য এক রকম ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। দ্বিতীয়বারে বললেন, 'ছোট মাছ তুমি খেতে পারছ না দেখি। আস্তে আস্তে খাও, আমি একটা ডিম ভেজে নিয়ে আসি।'

ছেলেটি এই কথায় খাওয়া বন্ধ করে চুপচাপ বসে রইল। ভাজা ডিমের জন্যে প্রতীক্ষা। ব্যাপারটা মতিন সাহেবের বেশ মজার মনে হল। সাধারণত এই পরিস্থিতিতে সবাই বলে—না না লাগবে না। লাগবে না।

খাওয়া দাওয়া শেষ হতেই বদিউল আলম বলল, 'আমাকে শোবার জায়গা দেখিয়ে দিন।' মতিন সাহেব বললেন, 'এখুনি শোবে কি? বস, কথাবার্তা বলি। স্বাধীন বাংলা বেতার শুনবে না?'

ঃ জ্বি না। স্বাধীন বাংলা বেতার শোনবার আমার কোন আগ্রহ নেই।

ঃ বল কি তুমি! কখনো শোন না?

ঃ শুনেছি মাঝে মাঝে।

তিনি খুবই ক্ষুণ্ণ হলেন। ছেলেটি স্বাধীন বাংলা বেতার শোনে না, সে কারণে নয়। ক্ষুণ্ণ হলেন কারণ খাওয়া শেষ করেই সে একটা সিগারেট ধরিয়েছে। বলতে গেলে এ তাঁর ছেলের বয়েসী। একজন বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষের সামনে এ রকম ফট করে সিগারেট ধরানো ঠিক নয়। তা ছাড়া ছেলেটি দুবার কথার মধ্যে তাঁকে বলেছে মতিন সাহেব। এ কি কাণ্ড! চাচা বলবে। যদি বলতে খারাপই লাগে, কিছু বলবে না। কিন্তু মতিন সাহেব বলবে কেন? তিনি কি তার ইয়ার দোস্তদের কেউ? এ কেমন ব্যবহার!

ঘর ঠিকঠাক করলেন সুরমা। রাত্রি ও অপালার পাশের ছোট ঘরটায় ব্যবস্থা হল। বিন্তির ঘর। বিন্তি ঘুমবে বারান্দায়। এ ঘরটা

AMARBOI.COM

ভাঁড়ার ঘর হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পরিষ্কার করতে সময় লাগল। তবু পুরোপুরি পরিষ্কার হল না। চৌকির নিচে রসুন ও পেঁয়াজ। বস্তায় ভর্তি চাল ডাল। এ সব থেকে কেমন একটা টক টক গন্ধ ছড়াচ্ছে। সুরমা বললেন, 'তুমি এ ঘরে ঘুমতে পারবে তো? না পারলে বল, আমি বসার ঘরে ব্যবস্থা করে দিই। একটা ক্যাম্প খাট আছে, পেতে দেব?

ঃ লাগবে না।

ঃ বাথরুম কোথায় দেখে যাও।

বদিউল আলম বাথরুম দেখে এল।

ঃ কোনো কিছুর দরকার হলে আমাকে ডাকবে।

ঃ আমার কোনো কিছুর দরকার হবে না।

সুরমা চৌকির এক প্রান্তে বসলেন। বসার ভঙ্গিটি কঠিন। বদিউল আলম কৌতূহলী হয়ে তাঁকে দেখল।

ঃ আপনি কি আমাকে কিছু বলতে চান?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ বলুন।

ঃ তুমি কে আমি জানি না। কোত্থেকে এসেছ তাও জানি না। কিন্তু কি জন্যে এসেছ, তা আন্দাজ করতে পারি।

ঃ আন্দাজ করবার দরকার নেই। আমি বলছি কি জন্যে এসেছি। আপনাকে বলতে আমার কোনো অসুবিধে নেই।

ঃ তোমার কিছু বলার দরকার নেই। আমি তোমাকে কি বলছি সেটা মন দিয়ে শোন।

ঃ বলুন।

ঃ তুমি সকালে উঠে এখান থেকে চলে যাবে।

ছেলেটি কিছু বলল না। তাঁর দিকে তাকালও না।

ঃ দুটি মেয়ে নিয়ে আমি এখানে থাকি, কোনো রকম ঝামেলার মধ্যে আমি জড়াতে চাই না। রাত্রির বাবা আমাকে না জিজ্ঞেস করে এ সব করেছে। তুমি কি বুঝতে পারছ আমি কি বলতে চাচ্ছি?

ঃ পারছি।

ঃ তুমি কাল সকালে চলে যাবে।

ঃ কাল সকালে যাওয়া সম্ভব নয়। সব কিছু আগে থেকে ঠিকঠাক করা। মাঝখান থেকে হুট করে কিছু বদলানো যাবে না। আমি এক সপ্তাহ এখানে থাকব। আমার সঙ্গে যারা যোগাযোগ করবে তারা এই ঠিকানাই জানে।

AMARBOI.COM

সুরমা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। কি রকম উদ্ধত ভঙ্গিতে সে কথা বলছে। এ কি কাণ্ড।

ঃ তোমার জন্যে আমি আমার মেয়েগুলোকে নিয়ে বিপদে পড়ব? এ সব তুমি কি বলছ?

ঃ বিপদে পড়বেন কেন? বিপদে পড়বেন না। এই সপ্তাহের মধ্যে আমার কাজ শেষ হয়ে যাবে। এর পরের বার আমি এখানে উঠব না। আর আপনার মেয়েরা তাদের ফুপুর বাড়িতে থাকুক। এক সপ্তাহ পরে আসবে।

ঃ তুমি থাকবেই?

ঃ হ্যাঁ। অবশ্যি আপনি যদি ভয় দেখান আমাকে ধরিয়ে দেবেন সেটা অন্য কথা। তা দেবেন না সেটা বুঝতে পারছি।

সুরমা উঠে দাঁড়ালেন। যে ছেলেটিকে এতক্ষণ লাজুক এবং বিনীত মনে হচ্ছিল, এখন তাকে দুর্বিনীত অভদ্র একটি ছেলের মত লাগছে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, ছেলেটির এই রূপটিই তাঁর ভাল লাগল। কেন লাগল তিনি বুঝতে পারলেন না।

ঃ আলম।

ঃ বলুন।

ঃ ঢাকা শহরে কি তোমার বাবা-মা'রা থাকেন?

ঃ হ্যাঁ থাকেন।

ঃ কোথায় থাকেন?

ঃ শহরেই থাকেন।

ঃ বলতে কি তোমার অসুবিধে আছে?

ঃ হ্যাঁ আছে।

ঃ তুমি এক সপ্তাহ থাকবে?

ঃ হ্যাঁ।

সুরমা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ইলেকট্রিসিটি চলে গেল। ঘন অন্ধকারে নগরী ডুবে গেল। ঝুম বৃষ্টি নামল। সুরমা লক্ষ্য করলেন ছেলেটি বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। লাল আগুনের ফুলকি ওঠানামা করছে।

মতিন সাহেব শোবার ঘরে ট্রানজিস্টার কানে লাগিয়ে বসে আছেন। চরমপত্র শোনা হচ্ছে, এটি তাঁকে দেখে যে কেউ বলে দিতে পারবে। তিনি

AMARBOI.COM

তীব্র কণ্ঠে কিছুক্ষণ পর পরই বলছেন, 'মার লেংগী। মার লেংগী।' লেংগী শব্দটি তাঁর নিজের তৈরি করা। একমাত্র চরমপত্র শোনার সময়ই তিনি এটা বলে থাকেন।

সুরমা মোমবাতি নিয়ে ঘরে ঢুকতেই তিনি বললেন, 'কুমিল্লা সেক্টরে তো অবস্থা কেরসিন করে দিয়েছে। লেংগী মেরে দিয়েছে' বলেই খেয়াল হল এই জাতীয় কথাবার্তা সুরমা সহ্য করতে পারে না। তিনি আশঙ্কা করতে লাগলেন সুরমা কড়া কিছু বলবে। কিন্তু সে কিছু বলল না।

সুরমা যথেষ্ট সংযত আচরণ করছে বলে তাঁর ধারণা। এখনো ছেলেটিকে নিয়ে কোন হৈ চৈ করে নি। প্রথম ধাক্কাটা কেটে গেছে। কাজেই আশা করা যায় বাকিগুলোও কাটবে। অবশ্যি ছেলের আসল পরিচয় জানলে কি হবে বলা যাচ্ছে না। প্রয়োজন না হলে পরিচয় দেয়ারই বা দরকার কি? কোনো দরকার নেই।

স্বাধীন বাংলা থেকে দেশাত্মবোধক গান হচ্ছে। তিনি গানের তালে তালে পা ঠুকতে লাগলেন—ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা। তাঁর চোখ ভিজে উঠল। এইসব গান আগে কতবার শুনেছেন, কখনো এ রকম হয়নি। এখন যতবার শোনেন চোখ ভিজে ওঠে। বুক হু হু করে।

ঃ রেডিওটা কান থেকে নামাও।

মতিন সাহেব ট্রানজিস্টারটা বিছানার ওপর রাখলেন। নিজে থেকে কোনো প্রশ্ন করতে সাহসে কুলোচ্ছে না। সুরমা বললেন—

ঃ কাল তুমি তোমার বোনের বাসায় গিয়ে বলে আসবে, রাত্রি এবং অপালা যেন এক সপ্তাহ এখানে না আসে।

ঃ কেন?

ঃ তোমাকে বলতে বলছি, তুমি বলবে—ব্যাস। এই মাসটা ওরা সেখানেই থাকুক।

ঃ আচ্ছা বলব।

ঃ আরেকটা কথা।

ঃ বল।

ঃ ভবিষ্যতে কখনো আমাকে জিজ্ঞেস না করে কিছু করবে না।

ঃ আচ্ছা। এক কাপ চা খাওয়াবে?

এটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে সুরমাকে সামনে থেকে সরিয়ে দেয়া। সে বসে থাকা মানেই স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে বঞ্চিত হওয়া।

রাত দশটায় ভয়েস অব আমেরিকা থেকেও একটা ভাল খবর পাওয়া গেল। "পূর্ব রণাঙ্গনে বিদ্রোহী সৈন্য এবং পাকিস্তানী সৈনাবাহিনীর ভেতর খণ্ড যুদ্ধ হয়েছে বলে অসমর্থিত খবরে জানা গেছে। তবে পূর্ব পাকিস্তানের সমগ্র ছোট বড় শহর পাকিস্তানী বাহিনীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আছে। আমেরিকান দু'জন সিনেটার ঐ অঞ্চলের ব্যাপক প্রাণহানীর খবরে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। সংকট নিরসনের জন্যে আশু পদক্ষেপ নেয়া উচিত বলে তাঁরা মনে করেন।"

ভাল খবর হচ্ছে পূর্ব রণাঙ্গণে খণ্ড যুদ্ধ। আমেরিকানদের খবর। এরা তো আর না জেনেশুনে কিছু বলছে না। জেনেশুনেই বলছে। রাত্রি নেই, সে থাকলে এ সব খুঁটিনাটি বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে পারতেন। টেলিফোনটাও নষ্ট হয়ে আছে। ঠিক থাকলে ইশারা ইঙ্গিতে জিজ্ঞেস করা যেত সে ভয়েস অব আমেরিকা শুনেছে কিনা।

মতিন সাহেব রেডিও পিকিং ধরতে চেষ্টা করতে লাগলেন। পাশা-পাশি অনেকগুলো জায়গায় "চ্যাং চ্যাং চিন মিন" শব্দ হচ্ছে। এর কোনো একটি রেডিও পিকিংয়ের এক্সটারনাল সার্ভিস, কোনটি কে জানে। রাত এগারোটায় রেডিও অস্ট্রেলিয়া। মাঝে মাঝে রেডিও অস্ট্রেলিয়া খুব পরিষ্কার ধরা যায়। তারা ভাল ভাল খবর দেয়।

তিনি নব ঘোরাতে লাগলেন খুব সাবধানে। তাঁর মন বেশ খারাপ। বিবিসির খবর শুনতে পারেননি। খুব ডিসটারবেন্স ছিল। একটা ভাল ট্রানজিস্টার কেনা খুবই দরকার।

AMARBOI.COM

রাত সাড়ে দশটায় ইলেকট্রিসিটি এল। সুরমা লক্ষ্য করলেন, ছেলেটি বারান্দায় রাখা চেয়ারটায় বসে আছে। সারাটা সময় কি এখানেই বসে ছিল? না ঘুমিয়ে পড়েছে বসে থাকতে থাকতে? তিনি এগিয়ে গেলেন। না ঘুময়নি, জেগে আছে। চোখে চশমা নেই বলে অন্য রকম লাগছে।

ঃ আলম, তোমার কি ঘুম আসছে না?

ঃ জ্বি না।

ঃ গরম দুধ বানিয়ে দেব এক গ্লাস? গরম দুধ খেলে ঘুম আসে।

ঃ দিন।

সুরমা দুধের গ্লাস নিয়ে এসে দেখেন ছেলেটি ঘুমিয়ে পড়েছে। তাকে ডেকে তুলতে তাঁর মায়া লাগল। তিনি বারান্দার বাতি নিভিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন সেখানে।

আকাশ পরিষ্কার হয়ে আসছে। একটি দুটি করে তারা ফুটতে শুরু করেছে।

সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশে একটি অচেনা বাড়িতে দুদিন কেটে গেল। দুদিন এবং তিনটি দীর্ঘ রাত। আজ হচ্ছে তৃতীয় দিনের সকাল। আলম পা ঝুলিয়ে খাটে বসে আছে। কাজের মেয়েটি এক কাপ চা দিয়ে গেছে। সে চায়ে চুমুক দেয়নি। ইচ্ছে করছে না। অস্থির অস্থির লাগছে। পেঁয়াজ রসুনের গন্ধটা সহ্য হচ্ছে না। সূক্ষ্ম যন্ত্রণা হচ্ছে মাথায়। এই যন্ত্রণার উৎস নিশ্চয়ই পেঁয়াজ রসুনের গন্ধ নয়। সবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার জন্যেই এ রকম হচ্ছে। দম আটকে আসছে।

কথা ছিল সাদেক তার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। যেদিন সে ঢাকা এসে পৌঁছেছে তার পরদিনই যোগাযোগটা হবার কথা, কিন্তু এখনো সাদেকের কোন খোঁজ নেই। ধরা পড়ে গেল নাকি? দলের একজন ধরা পড়ার অর্থ হচ্ছে প্রায় সবারই ধরা পড়ে যাওয়া। এ কারণেই কেউ কারোর ঠিকানা জানে না। কাজের সময় সবাই একত্র হবে। তারপর আবার ছড়িয়ে পড়বে। ঝিকাতলায় একটি বাসায় কনট্যাক্ট পয়েন্ট। সেখানেও যাবার হুকুম নেই। নিতান্ত জরুরী না হলে কেউ সেখানে যাবে না।

সবার দায়িত্ব ভাগাভাগি করা আছে। মালমশলা জায়গা মত পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব রহমানের। সেগুলো নিশ্চয়ই পৌঁছে গেছে। রহমান অসাধ্য সাধন করতে পারে। রহমানকে যদি বলা হয়—রহমান তুমি যাও তো, সিংহের লেজটা দিয়ে কান চুলকে এস—সে তা পারবে। সিংহ সেটা বুঝতেও পারবে না। অথচ মজার ব্যাপার হচ্ছে রহমান অসম্ভব ভীতু ধরনের ছেলে। এ জাতীয় দলে ভীতু ছেলেপুলে রাখাটা ঠিক না। কিন্তু রহমানকে রাখতে হয়েছে।

আলম খাট থেকে নামল, অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে চায়ে চুমুক দিল। ঠাণ্ডা চা। সর পড়ে গিয়েছে। ঠাণ্ডার জন্যেই মিষ্টি বেশি লাগছে। বমি বমি ভাব এসে গেছে। সে আবার বিছানায় গিয়ে বসল। কিছু করবার নেই। এ বাড়ির ভদ্রমহিলা গতকাল বিশাল এক উপন্যাস দিয়ে গেছেন। অচিন্তকুমার সেনগুপ্তের 'প্রথম কদম ফুল'। প্রেমের উপন্যাস। প্রেম নিয়ে কেউ এতবড় একটা উপন্যাস ফাঁদতে পারে ভাবাই যায় না। কাকলী নামের একটি মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হচ্ছে একটি ছেলের। এ

AMARBOI.COM

রকমই গল্প। কোন সমস্যা নেই, কোন ঝামেলা নেই—সুখের গল্প পড়তে ভাল লাগছে না। তবু ছাপ্পান্ন পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়া হয়েছে আবার বইটি নিয়ে বসবে কি না, আলম মনস্থির করতে পারল না।

পাশের ঘর থেকে সেলাই মেশিনের খটাং খটাং শব্দ হচ্ছে। মেশিন চলছে তো চলছেই। রাতদিন এই মহিলা কি এত সেলাই করেন কে জানে। ক্লান্তি বলেও তো একটা জিনিস মানুষের আছে। খট খট খটাং খট খট খটাং চলছে তো চলছেই। গতকাল রাত এগারোটা পর্যন্ত এই কাণ্ড।

আলম হাত বাড়িয়ে 'প্রথম কদম ফুল' টেনে নিল। ছাপ্পান্ন পৃষ্ঠা খুঁজে বের করতে ইচ্ছে করছে না। যে কোনো একটা জায়গা থেকে পড়তে শুরু করলেই হয়। তার আগে একবার বাথরুমে যেতে পারলে ভাল হত। এটা একটা অস্বস্তিকর ব্যাপার। দুটি বাথরুম এ বাড়িতে, একটি অনেকটা দূরে—সার্ভেন্টস বাথরুম। অন্যটি এঁদের শোবার ঘরের পাশে। পুরোপুরি মেয়েলী ধরনের বাথরুম। ঝক ঝক তক তক করছে। ঢুকলেই এয়ার ফ্রেশনারের মিষ্টি গন্ধ পাওয়া যায়। বিশাল একটি আয়না। আয়নার নিচেই মেয়েলী সাজসজ্জার জিনিস। চমৎকার করে গোছানো। আয়নার ঠিক উল্টোদিকে একটি জলরঙ ছবি ফ্রেমে বাঁধানো। গামছা পরা দুটি বালিকা নদীতে নামছে। চমৎকার ছবি। আয়নার ভেতর দিয়ে এই ছবিটি দেখতে বড় ভাল লাগে। এ জাতীয় একটি বাথরুম বাইরের অজানা অচেনা একজন মানুষের জন্যে নয়।

আলম বই নামিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। আর ঠিক তখনই সেলাই মেশিনের শব্দ থেমে গেল। সে এই ব্যাপারটি আগেও লক্ষ্য করেছে। ঘর থেকে বেরুলেই ভদ্রমহিলা সেলাই থামিয়ে অপেক্ষা করেন। কি ভাবে কি ভাবে তিনি যেন টের পেয়ে যান। আলম বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই সুরমা বেরিয়ে এলেন। তাঁর চোখে বুড়োদের মত একটা চশমা। মাথায় ঘোমটা দেয়া। এটিও আলম লক্ষ্য করেছে—ভদ্রমহিলা মাথায় সব সময় কাপড় দিয়ে রাখেন। হেড মিসট্রেস হেড মিসট্রেস মনে হয় সে কারণেই।

সুরমা বললেন, 'তোমার কিছু লাগবে?'

ঃ না কিছু লাগবে না।

ঃ লাগলে বলবে। লজ্জা করবে না।

ঃ জ্বি আমি বলব।

ঃ আমাদের টেলিফোন ঠিক হয়েছে। তুমি যদি কাউকে ফোন করতে চাও বা তোমার বাসায় খবর দিতে চাও দিতে পার।

AMARBOI.COM

ঃ না, আমার কাউকে খবর দেবার দরকার নেই।

ঃ সারাক্ষণ ঐ ঘরটায় বসে থাক কেন? বসার ঘরে এসে বসতে পার। বারান্দায় যেতে পার।

আলম চুপ করে রইল। সুরমা বললেন, 'তুমি তো কোনো কাপড় জামা নিয়ে আসনি। রাত্রির বাবাকে বলেছি তোমার জন্যে সার্ট নিয়ে আসবে। ও তোমার জন্যে কিছু টাকাও রেখে গেছে। বাইরে টাইরে যদি যেতে চাও তাহলে রিকশা ভাড়া দেবে।'

ঃ আমার কাছে টাকা আছে।

ঃ তুমি কি কোথাও বেরুবে?

ঃ দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করব। দুপুরের মধ্যে যদি কেউ না আসে তাহলে বেরুব।

ঃ কারোর কি আসার কথা?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ তুমি যখন না থাক, তখন যদি সে আসে তাহলে কি তাকে কিছু বলতে হবে?

ঃ না, কিছু বলতে হবে না। সে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে।

সুরমা ভেতরে চলে গেলেন। আবার সেলাই মেশিনের খট খট শব্দ হতে থাকল। ভদ্রমহিলার মাথার ঠিক নেই বোধ হয়। কোন সুস্থ মানুষ দিনরাত একটা মেশিন দিয়ে খট খট করতে পারে না। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক। অবশ্যি এখন সময়টাই অস্বাভাবিক। সে জন্যেই বোধ হয় চমৎকার এই সকালটাকে মানাচ্ছে না। দুর্বাঘাসের ওপর সুন্দর রোদ। বাতাসে সবুজ ঘাস কাঁপছে, রোদও কাঁপছে। অস্বাভাবিক এই বন্দী শহরে এটাকে কিছুতেই মানানো যাচ্ছে না। আলম সিগারেট ধরাল। বিন্তি মেয়েটি নারকেল গাছের নিচে পা ছড়িয়ে বসে আছে। তার মুখ হাসি হাসি। এই মেয়েটি কি সব সময়ই হাসে? এত সুখী কেন সে?

দুপুর তিনটায় আকাশ মেঘলা হয়ে গেল। বাতাস হল আর্দ্র। দূরে কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে বোধহয়। আলম গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে বেশ খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল আকাশের দিকে। মেঘের গতি-প্রকৃতি বোঝার চেষ্টা হয়ত। কতক্ষণে বৃষ্টি নামবে আঁচ করা। বিন্তি বলল, 'কই যান?'

ঃ কাছেই।

ঃ পাঁচটার আগে আইবেন কিন্তুক। "কারপু" আছে।

AMARBOI.COM

ঃ আসব, পাঁচটার আগেই আসব।

পানওয়ালা ইদ্রিস মিয়াও দেখল ছেলেটি মাথা নিচু করে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে হেঁটে যাচ্ছে। সেও তাকিয়ে রইল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। রাস্তা-ঘাটে লোক চলাচল কম। অল্প যে ক'জনকে দেখা যায়, তাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে, দু'একটা কথা বলবার জন্যে মন চায়। ইদ্রিস মিয়া কোনো কথা বলল না। সে আজ চোখে সুরমা দিয়েছে, সে জন্যেই বোধ হয় চোখ কড় কড় করছে। কিংবা হয়ত চোখ উঠবে। চোখ ওঠা রোগ হয়েছে। চারদিকে সবার চোখ উঠছে।

আলম হাঁটতে হাঁটতে বলাকা সিনেমা হলের সামনে এসে দাঁড়াল। ঢাকা শহরে প্রচুর আর্মীর চলাচল বলে যে কথাটা সে শুনেছিল সেটা ঠিক নয়। আধঘন্টা দাঁড়িয়ে থেকে সে একটা মাত্র ট্রাক যেতে দেখেছে। সেই ট্রাকে ছাই-রঙা পোশাক পরা একদল মিলিশিয়া বসে আছে। সাধারণত ট্রাকে সবাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যায়। এরা বসে আছে কেন? ক্লান্ত?

চোখে পড়ার মত পরিবর্তন কি কি হয়েছে এ শহরে? আলম ঠিক বুঝতে পারল না। সে সম্ভবত আগে কখনো এ শহরকে ভালভাবে লক্ষ্য করেনি। প্রয়োজন মনে করেনি। এখন কেন জানি ইচ্ছে করছে আগের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে। চারদিক কেমন যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মনে হচ্ছে। পুরানো বইপত্রের হকাররা যে জায়গাটা দখল করে থাকত, সেটা খালি। একটি অন্ধ ভিখিরী টিনের মগ নিয়ে বসে আছে। একে ছাড়া অন্য কোন ভিখিরী চোখে পড়ল না। সব ভিখিরীকে কি এরা মেরে শেষ করে দিয়েছে? দিয়েছে হয়ত।

রিকশায় কিছু বোরকা পরা মহিলা দেখা গেল। মেয়েরা কি আজকাল বোরকা ছাড়া রাস্তায় নামছে না? কিছু কিছু রিকশায় ছোট ছোট পাকিস্তানী ফ্ল্যাগ। চাঁদ তারা আঁকা এই ফ্ল্যাগের বাজার এখন নিশ্চয়ই জমজমাট। যেখানে সেখানে এই ফ্লাগ উড়ছে। এর মধ্যে একটি প্রতিযোগিতার ভাবও আছে। কার পতাকাটি কত বড়। লাল রঙের তিনকোণা এক ধরনের পতাকাও দেখা যাচ্ছে। এর মধ্যে কি সব আরবী লেখা। লেখাগুলো তুলে ফেললেই এটা হয়ে যাবে মে দিবসের পতাকা।

আলম একটা রিকশা নিল। বুড়ো রিকশাওয়ালা। ভারী রিকশা টানতে কষ্ট হচ্ছে, তবু প্যাডেল করছে প্রাণপণে। সায়েন্স ল্যাবরেটরির মোড়ে একটা বরযাত্রীর দল দেখা গেল—নতুন বর বিয়ে করে ফিরছে। বিশাল একটা সাদা গাড়ি মালা দিয়ে সাজানো। ট্রাফিক

AMARBOI.COM

সিগন্যালে আটকা পড়ায় গাড়ি থেমে আছে। আশপাশের সবাই কৌতূহলী হয়ে দেখতে চেষ্টা করছে বর বউকে। আলমের মনে হল— দেশ যখন স্বাধীন হবে তখন কি এই ছেলেটি একটু লজ্জিত বোধ করবে না? যখন তার যুদ্ধে যাবার কথা, তখন সে গিয়েছে বিয়ে করতে। আজ রাতে সে কি সত্যি সত্যি কোন ভালবাসার কথা এই মেয়েটিকে বলতে পারবে?

সিগন্যাল পেয়ে বরের গাড়ি চলতে শুরু করেছে। বর একটা রুমালে মুখ ঢেকে রেখেছে। বিয়ে হয়ে যাবার পর সাধারণত বররা রুমালে মুখ ঢাকে না। এই ছেলেটি ঢাকছে কেন? সে কি নিজেকে লুকোতে চেষ্টা করছে? দুঃসময়ে বিয়ে করে ফেলায় সে কি খানিকটা লজ্জিত?

জুন মাসে ইয়াদনগরে নদী পার হবার সময় এ রকম একটা বরযাত্রীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। দশ বার জনের একটা দল। দু'টি নৌকায় বসে আছে। সবার চেহারাই কেমন অস্বাভাবিক। জবু থবু হয়ে বসে আছে। বর ছেলেটি শুঁটকো মত। তাকে লাগছে উদভ্রান্তের মত। এরা লগীতে নৌকা বেঁধে বসে আছে চুপচাপ। আলমদের দলে ছিল রহমান। সে সব সময়ই বেশি কথা বলে। বরযাত্রী দেখে হাসি মুখে বলল, কি, বিয়ে করতে যান? সাবধানে যাবেন। লঞ্চে করে মিলিটারি চলাচল করছে। ঘন ঘন পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলবেন। নওশাকে পাগড়ি পরিয়ে নৌকার গলুইয়ে বসিয়ে রাখলে কেউ কিছু বলবে না। বরযাত্রী দল থেকে কেউ একটি কথাও বলল না। একজন বুড়ো শুধু বিড় বিড় করতে লাগল। বর ছেলেটি কর্কশ গলায় তাকে ধমক দিল—চুপ করেন। অত্যন্ত রহস্যময় ব্যাপার!

AMARBOI.COM

কিছুক্ষণের মধ্যেই জানা গেল, এরা কনে নিয়ে ফিরছিল। বড় নদী ছেড়ে ছোট নদীতে ঢোকার সময় মিলিটারিদের একটা লঞ্চ এদের থামায়, কনে এবং কনের ছোটবোনকে উঠিয়ে নিয়ে চলে যায়। ছোট বোনটির বয়স এগারো।

আলম বলল, 'আপনারা কিছুই বললেন না?'

কেউ কোনো উত্তর দিল না। রহমান বলল, 'খামোখা এইখানে নৌকা থামিয়ে বসে আছেন কেন? বাড়ি চলে যান, তারপর আবার ছেলের বিয়ের ব্যবস্থা করেন। বাংলাদেশে কি মেয়ের অভাব আছে? অভাব নেই।'

লোকগুলো শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। যেন কারোর কোনো কথাই তাদের মাথায় ঢুকছে না।

আলম ঝিকাতলায় পৌঁছল বিকেল চারটায়। বৃষ্টি পড়ছে টিপ টিপ করে। আকাশ মেঘে মেঘে কালো। অন্ধকার হয়ে এসেছে। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে বাড়ি খুঁজতে হবে। খুঁজে পাওয়া যাবে কি না কে জানে। সময় অল্প। কার্ফুর আগেই ফিরতে হবে।

বাড়ি খুঁজে পাওয়া গেল সহজেই। ঝিকাতলা ট্যানারীর ঠিক সামনে ৩৩ নম্বর বাড়ি। দোতলা দালানের ওপরের তলায় থাকেন নজি-বুল ইসলাম আখন্দ। কনট্যাক্ট পয়েন্ট।

দোতলায় উঠে আলমের বিস্ময়ের সীমা রইল না। বিশাল এক তালা ঝুলছে বাড়িতে। দরজা জানালা সবই বন্ধ। তালার সাইজ দেখেই মনে হচ্ছে এ বাড়ির বাসিন্দারা দীর্ঘ দিনের জন্যে বাইরে গেছে এবং সম্ভবত আর ফিরবে না।

একতলায় অনেক ধাক্কাধাক্কি করবার পর দরজা একটুখানি খুলল। ভয়ে সাদা হয়ে যাওয়া একটি মেয়ে বলল, ‘কাকে চান?’

ঃ আখন্দ সাহেবকে। নজিবুল ইসলাম আখন্দ।

ঃ উনি দোতলায় থাকেন। এখন নাই।

ঃ কোথায় গেছেন?

ঃ দেশের বাড়িতে।

ঃ ছেলেমেয়ে সবাইকে নিয়ে গেছেন?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ কবে গেছেন?

ঃ তিন দিন আগে। উনার ছোট ভাই মারা গেছে দেশের বাড়িতে।

ঃ ও আচ্ছা।

মেয়েটি দরজা বন্ধ করে দিল। এ তো একটা সমস্যায় পড়া গেল। আলম শুকনো মুখে বের হয়ে এল। বাসায় ফিরল হেঁটে হেঁটে। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি। এর মধ্যে হাঁটতে ভালই লাগছে। তার সারাক্ষণই মনে হতে লাগল, বাসায় পৌঁছেই দেখবে সাদেক বিরক্ত মুখে অপেক্ষা করছে। পরদিনই কাজে নেমে পড়া যাবে। কাজকর্ম ছাড়া চুপচাপ বসে থাকাটা আর সহ্য হচ্ছে না।

AMARBOI.COM

বারান্দায় উদ্বিগ্ন মুখে মতিন সাহেব দাঁড়িয়ে ছিলেন। আলমকে দেখেই বললেন; 'কাউকে কিছু না বলে কোথায় গিয়েছিলে? আমি চিন্তায় অস্থির। একটু পরই কার্ফু শুরু হয়ে যাবে।'

আলম সহজ স্বরে বলল, 'আমার কাছে কেউ এসেছিল?'

ঃ না কেউ আসেনি। ভিজতে ভিজতে এলে কোত্থেকে? গিয়েছিলে কোথায়?

আলম কোনো জবাব না দিয়ে বসার ঘরে ঢুকে পড়ল। বসার ঘরের সাজসজ্জার কিছু পরিবর্তন হয়েছে। সোফা এক পাশে সরিয়ে একটা ক্যাম্পখাট পাতা হয়েছে। ক্যাম্পখাটে অচিন্তকুমারের প্রথম কদম ফুল। তার মানে শোবার জায়গার বদল হয়েছে। মতিন সাহেব ইতস্তত করে বললেন, 'আমার মেয়েরা চলে এসেছে। কাজেই তোমাকে বসার ঘরে নিয়ে এলাম। তোমার অসুবিধে হবে না তো?

ঃ না অসুবিধে কিসের?

ঃ আমার বড় মেয়ে একটু ইয়ে ধরনের মানে....

মতিন সাহেব কথা শেষ করলেন না, মাঝপথে থেমে গেলেন। আলম বলল, 'আমার কোনো অসুবিধে নেই। আপনি চিন্তা করবেন না।'

মতিন সাহেব নিচু গলায় বললেন, 'আলম আরেকটা কথা, ইয়ে মানে আমাদের আরেকটা বাথরুম যে আছে ওটাতে তুমি যাবে। ওটা আমি পরিষ্কার করেছি। মানে প্রবলেমটা তোমাকে বলি......প্রবলেমটা হল—'

ঃ আপনাকে প্রবলেম বলতে হবে না। আমার কোন অসুবিধে নেই।

আলম সিগারেট ধরিয়ে ক্যাম্পখাটে বসল। মতিন সাহেব হা হা করে উঠলেন, 'ভেজা কাপড়ে বিছানায় বসছ কেন? কাপড় জামা ছাড়। আমি তোমার জন্যে সার্ট আর লুঙ্গি কিনেছি।'

ঃ থ্যাংক্যু।

বার তের বছরের শান্ত চেহারার একটি মেয়ে উঁকি দিল। এর নামই বোধ হয় অপালা। মতিন সাহেব বললেন, 'তোর আপাকে ডেকে আন, পরিচয় করিয়ে দিই।'

মেয়েটি ভেতরে চলে গেল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এসে বলল, 'আপা আসবে না।'

মতিন সাহেব খুব লজ্জায় পড়ে গেলেন। আলম বলল, 'তোমার নাম অপালা?'

ঃ হ্যাঁ।

AMARBOI.COM

ঃ কেমন আছ অপালা ?

ঃ ভাল।

ঃ বস।

ঃ না আমি বসব না।

মেয়েটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। এ রকম বাচ্চা মেয়ের চোখ এত তীক্ষ্ণ কেন ? এদের চোখ হবে কোমল। আলম সিগারেট ধরাল। মেয়েটি এখনো তাকে মন দিয়ে লক্ষ্য করছে। কেন করছে কে জানে।

অপালা চোখ ফিরিয়ে নিল এবং শীতল গলায় বলল, 'আপনি প্রথম কদম ফুল বইটার একটা পাতা ছিঁড়ে ফেলেছেন। বই ছিঁড়লে আমি খুব রাগ করি।'

ঃ আর ছিঁড়ব না।

ঃ পাতাও মুড়বেন না। এটা আমার খুব প্রিয় বই।

আলম হেসে ফেলল।

AMARBOI.COM

রাত্রি সারাদিন খুব গম্ভীর ছিল। সন্ধ্যার পর আরো গম্ভীর হয়ে পড়ল। পৌনে আটটা থেকে আটটা পর্যন্ত বিবিসি বাংলা খবর দেয়। সে খবর শোনবার জন্যেও তার কোনো আগ্রহ দেখা গেল না। সবাইকে বলল তার মাথা ধরেছে।

সুরমা অপালাকে জিজ্ঞেস করলেন ওর কি হয়েছে ? অপালা গম্ভীর হয়ে বলল—ফুপুর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। সুরমা খুবই অবাক হলেন। রাত্রি কারো সঙ্গে ঝগড়া করার মেয়ে নয়। সে সব কিছুই নিজের মনে চেপে রাখে। সুরমা বললেন, 'কি নিয়ে ঝগড়া হলো ?'

ঃ জানি না কি নিয়ে। ফুপু ওকে আলাদা ডেকে নিল।

ঃ এতক্ষণ এই কথা বলিসনি কেন ?

ঃ মনে ছিল না।

ঃ মনে ছিল না মানে ?

ঃ আপা আমাকে কিছু বলতে মানা করেছে।

অপালা গল্পের বইয়ে মাথা ডুবিয়ে ফেলল। মা'র কোনো কথাই আসলে তার মাথায় ঢুকছে না। তার বিরক্তি লাগছে। কোনো একটা গল্পের বই শুরু করলে অন্য কিছু তার আর ভাল লাগে না। যে গল্পের

বইটি সে নিয়ে বসেছে তার নাম—'আলোর পিপাসা'। এই বইটি সে আগেও বেশ কয়েকবার পড়েছে। প্রতিটি লাইন তার মনে আছে, তবু পড়তে ভাল লাগছে।

অপালার বয়স তের। রোগা বলে তাকে বয়সের তুলনায় ছোট মনে হয়। এটা তার খুব খারাপ লাগে। তের বছর বয়সটা তার পছন্দ নয়। যুদ্ধ শুরু হবার আগে তাদের যে প্রাইভেট মাস্টার ছিল, তাকে একদিন সে বলেছে, 'স্যার, আমার বয়স পনেরো। বেশি বয়সে পড়ালেখা শুরু করেছি তো, এই জন্যে ক্লাস এইটে পড়ি। ছোট বেলায় খুব অসুখ বিসুখে ভুগতাম। পড়াশোনা শুরু করতে এই জন্যেই দেরি হয়ে গেল।'

অপালার এ জাতীয় কথাবার্তা জানাজানি হয়ে যাওয়ায় খুব ঝামেলা হয়েছিল। সুরমা শুধু বকাবকি করেই চুপ করে থাকেননি, চড় বসিয়ে দিয়েছিলেন। প্রাইভেট মাস্টারটিকে বদলে দিয়ে বুড়ো ধরনের একজন টিচার রাখলেন। এ জাতীয় ঝামেলা অপালা প্রায়ই তৈরি করে। কয়েকদিন আগেই একটা হলো। কি এক উপন্যাস পড়ে তার খুব ভাল লেগেছে। উপন্যাসের নায়িকার নাম 'মনিকা'। সে মনিকা নাম কেটে সমস্ত বইতে নিজের নাম বসিয়েছে। এ নিয়েও মা ঝামেলা করেছেন। তিনি সাধারণত বই-টই পড়েন না। অপালা কেন নায়িকার নামের জায়গায় নিজের নাম বসিয়েছে, এটা জানবার জন্যেই বইটি পড়লেন এবং রাগে তাঁর গা জ্বলে গেল। কারণ, উপন্যাসের নায়িকা মনিকা তিনটি ছেলেকে এক সঙ্গে ভালবাসে। ছেলেগুলো সুযোগ পেলেই তাকে জড়িয়ে ধরে। মনিকা কোনো বাধা দেয় না। এর মধ্যে একটি ছেলে বেশি রকম সাহসী। সে শুধু গায়ে হাত দিতে চায়। মনিকা তার এই স্বভাব সহ্যই করতে পারে না, তবু তাকেই সে সবচে বেশি ভালবাসে। ভয়াবহ ব্যাপার!

অপালাকে নিয়ে সুরমার দুঃশ্চিন্তার শেষ নেই। তাকে তিনি চোখে চোখে রাখতে চান। নিজে স্কুলে দিয়ে আসেন এবং নিয়ে আসেন। এখন স্কুল বন্ধ বলে এই ঝামেলাটা করতে হচ্ছে না। কিন্তু ওর কোনো টেলিফোন এলে তিনি আড়াল থেকে কথাবার্তা শুনতে চেষ্টা করেন।

রাত্রিকে নিয়ে এ রকম কোনো ঝামেলা হয়নি। রাত্রি যে বড় হয়েছে এটা সে কখনো কাউকে বুঝতেই দেয়নি। একবার শুধু খানিকটা অস্বাভাবিক আচরণ করেছিল। ইউনিভার্সিটিতে সেকেণ্ড ইয়ারে যখন পড়ে তখনকার ঘটনা। গরমের ছুটি চলছে। সে সময় সকাল দশটায় এক ছেলে এসে উপস্থিত—সে নাকি রাত্রির সঙ্গে পড়ে। সেলিম নাম।

AMARBOI.COM

সুরমা অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন রাত্রি কেমন অতিরিক্ত রকমের ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কথাবার্তা বলতে লাগল উঁচু গলায়। শব্দ করে হাসতে লাগল। এবং এক সময় মা'কে এসে বলল, 'মা, ওকে আজ দুপুরে খেতে বলি? হলে থাকে, হলের খাবার খুব খারাপ।' সুরমা ঠাণ্ডা গলায় বললেন—'অজানা অচেনা ছেলে দুপুরবেলায় এখানে খাবে কেন? ওকে যেতে বল।' রাত্রি ঘাড় বাঁকিয়ে বলল, 'অচেনা ছেলেতো নয় মা, আমার সঙ্গে পড়ে।'

সুরমা শক্ত গলায় বললেন, 'ক্লাশের ছেলেরা মেয়েদের সঙ্গে আড্ডা দেবার জন্যে দুপুরবেলায় বাসায় আসবে, এটা আমার পছন্দ নয়। ওকে যেতে বল।

ঃ এটা আমি কি করে বলব মা?

ঃ যেভাবে বলার সেভাবে বলবি।

রাত্রি চোখ মুখ লাল করে কথাটা বলতে গেল। এবং বলে এসে সমস্ত দিন কাঁদল। সুরমা কিছুই বললেন না। কারণ তিনি জানেন এই সাময়িক আবেগ কেটে যাবে। এখানে তাঁকে শক্ত হতেই হবে। ছেলেটিকে তিনি যদি খেতে বলতেন, সে বার বার ঘুরে ঘুরে এ বাড়িতে আসত। রাত্রির মত একটি মেয়ের সঙ্গে গল্প করার লোভ সামলানো কঠিন ব্যাপার। মেয়ে হয়েও সুরমা তা বুঝতে পারেন। বার বার আসা যাওয়া থেকে একটা ঘনিষ্ঠতা হবে। এই বয়সের কাঁচা আবেগের ফল কখনো শুভ হয় না।

সুরমা ভেবে পেলেন না, রাত্রি তার ফুপুর সঙ্গে কি নিয়ে ঝগড়া করবে? তার ফুপুকে সে খুবই পছন্দ করে। তাদের যে সম্পর্ক, সেখানে ঝগড়া হবার সুযোগ কোথায়? নাসিমাকে একটা টেলিফোন করা যেতে পারে, কিন্তু তার আগে রাত্রির সঙ্গে কথা বলা দরকার। কিন্তু রাত্রি কি কিছু বলবে? সুরমা অস্বস্তি নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

রাত্রি চুল আঁচড়াচ্ছিল। মা'কে দেখে অল্প হাসল। সুরমা মনে মনে ভাবলেন—এই মেয়েটি কি সত্যি আমার? এমন মায়াবতী একটা মেয়ের জন্ম দেবার মত ভাগ্য আমার কি করে হয়? সুরমা বললেন, 'আয় চুল বেঁধে দি।'

ঃ আস্তে করে বাঁধবে মা। তুমি এত শক্ত করে বাঁধ যে মাথা ব্যথা করে।

রাত্রি মাথা পেতে দিল। তিনি চিরুনী টানতে টানতে বললেন—'নাসিমার সঙ্গে তোর নাকি ঝগড়া হয়েছে?'

ঃ ঝগড়া হবে কেন?

AMARBOI.COM

ঃ অপালা বলছিল।

ঃ অপালা তো কত কিছুই বলে।

ঃ ঝগড়া হয়নি তাহলে ?

ঃ না। কি যে তুমি বল মা। আমি কি ঝগড়া করবার মেয়ে ?

সুরমা শান্ত গলায় বললেন—'তার মানে কি এই যে অন্য কোন মেয়ে হলে ঝগড়া করত ?'

রাত্রি হেসে ফেলল, কোন উত্তর দিল না। সুরমা বললেন, 'নাসিমা তোকে কি বলেছিল ?'

ঃ তেমন কিছু না।

সুরমা আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। কারণ তিনি জানেন জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। কোনো কবাব পাওয়া যাবে না। রাত্রি বসে আছে মাথা নিচু করে। মেয়েটি প্রতিদিনই কি সুন্দর হচ্ছে ? সুরমার সূক্ষ্ম একটা ব্যথা বোধ হলো। রাত্রি মৃদু স্বরে বলল, 'ঐ ছেলেটি কে মা ?'

ঃ কোন ছেলে ?

ঃ আমাদের বসার ঘরে যে ছেলেটি আছে।

ঃ তোর বাবার দূর সম্পর্কের আত্মীয় হয়। আমি ঠিক জানি না।

ঃ কথাটা তো মা তুমি মিথ্যা বললে। আমি শুনেছি সে বাবাকে মতিন সাহেব, মতিন সাহেব বলেছিল।

সুরমা ঝাঁঝালো স্বরে বললেন, 'আমি জানি না সে কে।'

ঃ এটাও তো মা ঠিক না। তুমি কিছু না জেনে-শুনে একটা ছেলেকে থাকতে দিতে না। তোমার স্বভাবের মধ্যে এটা নেই।

সুরমা কিছু বললেন না। রাত্রি বলল, 'আমি কারোর সঙ্গে মিথ্যা কথা বলি না। কেউ যখন আমার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলে আমার ভাল লাগে না।' সুরমা থেমে থেমে বললেন, 'ছেলেটি ঢাকায় গেরিলা অপা-রেশন চালানোর জন্যে এসেছে। তোর বাবা জুটিয়েছে। বুধবার পর্যন্ত থাকবে। এর বেশি আমি কিছু জানি না।'

রাত্রি কিছু বলল না। এটা একটা বড় ধরনের খবর। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত একটা ব্যাপার। কিন্তু রাত্রির কোন ভাবান্তর হল না। সে যে ভাবে বসেছিল, সে ভাবেই বসে রইল।

নাসিমাদের বাসার টেলিফোন লাইনে কোন একটা গণ্ডগোল আছে। টেলিফোন করলেই অন্য এক বাড়িতে চলে যায়। বুড়োমত এক ভদ্র-লোক বলেন, ডঃ খয়ের সাহেবের বাড়ি, কাকে চান ? আজ ভাগ্য ভাল।

AMARBOI.COM

টেলিফোনে নাসিমাকে পাওয়া গেল। সুরমা বললেন, 'রাত্রির সঙ্গে তোমার নাকি ঝগড়া হয়েছে? অপালা বলছিল।'

ঃ ঝগড়া হয়নি ভাবী। যা বলার 'আমিই বলেছি, ও শুধু শুনেছে।

ঃ কি নিয়ে কথা?

ঃ রাত্রির বিয়ের ব্যাপারে। ছেলের মা এসেছিলেন রাত্রির সঙ্গে কথা বলতে, রাত্রি পাথরের মত মুখ করে বসে রইল।

ঃ আমাকে তো এ সব কিছু বলনি।

ঃ বলার মত কিছু হয়নি।

ঃ আমার মেয়ের বিয়ে নিয়ে কথাবার্তা বলছ, আর আমি কিছু জানব না!

ঃ সময় হলেই জানবে। সময় হোক। ভাবী, রাত্রির জন্যে আমি যে ছেলে আনব সে ছেলে তোমরা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারবে না। রাত্রির ব্যাপারটা তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও। তোমার তো আরো একটি মেয়ে আছে। ওর বিয়ে তুমি দিও।

ঃ নাসিমা।

ঃ বল।

ঃ এ সময়ে মেয়ের বিয়ে-টিয়ে নিয়ে কথা হোক এটা আমি চাই না। মেয়ের আমি বিয়ে দেব সুসময়ে।

ঃ সুসময়ের দেরি আছে ভাবী। ছ' সাত সাত বৎসরের ধাক্কা। তা ছাড়া...

ঃ তা ছাড়া কি?

ঃ এ রকম সুন্দরী অবিবাহিতা একটি মেয়ে এ সময় কেউ ঘরে রাখছে না। গণ্ডায় গণ্ডায় বিয়ে হচ্ছে রোজ। এইট নাইনে পড়া মেয়ে-দেরও বাবা মা পার করে দিচ্ছে। আমাদের নিচের তলার রকিব সাহেব কি করেছেন শোন...

সুরমা থমথমে গলায় বললেন, 'রকিব সাহেবের কথা অন্য একদিন শুনব। আজ না। আমার মাথা ধরেছে।'

রাত এগারোটা প্রায় বাজে। মতিন সাহেব জেগে আছেন এখনো। রেডিও অস্ট্রেলিয়া শোনা হয় নি। রাত্রিও জেগে আছে। রেডিও অস্ট্রেলিয়া ধরে দেবার দায়িত্ব তার। ফাইন টিউনিং সে খুব ভাল পারে। দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে গভীর রাতে মতিন সাহেব মেয়ের সঙ্গে

AMARBOI.COM

মৃদু স্বরে কথা বলতে পছন্দ করেন। কথা একনাগাড়ে তিনিই বলেন। অবিশ্বাস্য আজগুবী সব গল্প। রাত্রি কোনোটিতেই প্রতিবাদ করে না। হাসি মুখে শুনে যায়।

আজ মতিন সাহেব এক পীর সাহেবের গল্প ফাঁদলেন। পীর সাহেবের বাড়ি যশোহর, তিনি এখন কিছুদিনের জন্যে আছেন ঢাকায়। টিক্কা খানের মিলিটারি অ্যাডজুটেন্ট নাকি তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল ক্যান্টনমেন্টে। টিক্কা খান খুব বিনীতভাবে পীর সাহেবকে বললেন দোয়া করতে। উত্তরে পীর সাহেব বললেন—তোমাদের সামনে মহাবিপদ। তোমাদের একজনও এই দেশ থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবে না। এক লাখ কবর উঠবে বাংলাদেশে।

রাত্রি বলল, 'তুমি এই গল্প শুনলে কোত্থেকে?' মতিন সাহেব বললেন, 'আমাদের ক্যাশিয়ার সাহেবের কাছে শুনলাম। উনি ঐ পীর সাহেবের মুরিদ। নিজেও খুব সুফী মানুষ। বানানো গল্প বলার লোক না।'

ঃ মিলিটারি কি আর পীর ফকিরের কাছে যাবে বাবা?

ঃ এম্নিতে কি আর যাচ্ছে? ঠেলায় পড়ে যাচ্ছে? ঠেলায় পড়লে বাঘেও ধান খায়। কি রকম লেংগী যে খাচ্ছে, তুই এখানে বসে কি বুঝবি। বুঝতে হলে ফ্রন্টে যেতে হবে। তবে দু'একটা দিন অপেক্ষা কর দেখ কি হয়।

ঃ কি হবে?

ঃ আজদহা নেমে গেছে ঢাকা শহরে। কাঁকড়া-বিছার দল। মিলিটারি কাঁচা খাওয়া শুরু করবে।

ঃ গেরিলারা ঢাকায় এসেছে নাকি বাবা?

ঃ আসবে না তো কি করবে? মা'র কোলে বসে থাকবে? ঢাকা ছেয়ে ফেলেছে। দু'একদিনের মধ্যে অপারেশন শুরু হবে। একবার অপারেশন শুরু হলে দেখবি সব ক'টা জেনারেলের আমাশা হয়ে গেছে। বদনা নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে সবাই।

রাত্রি হেসে ফেলল। বাবা এমন ছেলেমানুষী বিশ্বাস নিয়ে কথা বলেন যে বড় মায়া লাগে। মাঝে মাঝে রাত্রি ভাবতে চেষ্টা করে এ দেশে এমন কেউ কি আছে, যে এই দেশকে তার বাবার চেয়ে ভালবাসে?

ঃ বাবা।

ঃ কি?

ঃ শুয়ে পড় বাবা। ঘুমাও।

ঃ ঘুম ভাল হয় নারে মা। সব সময় একটা আতঙ্কের মধ্যে থাকি।

AMARBOI.COM

ঃ একদিন এই আতঙ্ক কেটে যাবে। আমরা সবাই নিশ্চিন্তে ঘুমব।

মতিন সাহেবের চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি গলার স্বর অনেকখানি নিচে নামিয়ে বললেন, 'আমাদের বাসায় যে ছেলেটা আছে সে কে বলতো মা? দেখি তোর কেমন বুদ্ধি?'

রাত্রি চুপ করে রইল। মতিন সাহেব ফিস ফিস করে বললেন, 'বলতে পারলি না? জানি পারবি না। ও হচ্ছে সাক্ষাত আজদহা, আবাবিল পক্ষী। ছারখার করে দেবে। কিছু বুঝতে পারলি?'

ঃ পারছি।

ঃ দেখে মনে হয়?

ঃ আমার সঙ্গে এখনো দেখা হয়নি।

ঃ কথা বলে দেখ, মনে হবে সাধারণ বাঙালী ঘরের ছেলে।

ঃ উনি তো বাঙালী ঘরের ছেলেই বাবা।

ঃ আরে না, ছেলেতে ছেলেতে ডিফারেন্স আছে না? এরা হচ্ছে সাক্ষাত আজদহা।

ঃ আজদহাটা কি?

মতিন সাহেব জবাব দিতে পারছেন না। আজদহা কি সে সম্পর্কে তাঁর ধারণা স্পষ্ট নয়। কথাটা তিনি অফিসে শুনেছেন। গেরিলা প্রসঙ্গে কে যেন বলেছিল—তাঁর খুব মনে ধরেছে।

রাত্রি বলল, বাবা, তুমি কি এঁর কথা কাউকে বলেছ?'

ঃ আরে না। কি সর্বনাশ, কাউকে বলা যায় নাকি!

ঃ তুমি তো একটা কথা রাখতে পার না বাবা। এই তো আমাকে বলে ফেললে।

তিনি চুপ করে গেলেন। রাত্রি বলল, 'ভাল করে মনে করে দেখ, কাউকে বলনি?'

ঃ না।

ঃ তোমাদের ক্যাশিয়ার সাহেব, তাঁকেও না?

ঃ না।

ঃ বাবা, ভাল করে ভেবে দেখ। জানাজানি হলে বিরাট বিপদ হবে।

ঃ আরে না, তুই পাগল হলি নাকি?

ঃ দুধ খাবে বাবা? শোবার আগে এক গ্লাস গরম দুধ খেয়ে শোও। ভাল ঘুম হবে।

AMARBOI.COM

ঃ দুধ না, চা খেতে ইচ্ছে করছে। তোর মা'কে না জাগিয়ে এক কাপ চা বানিয়ে দে।

রাত্রি উঠে দাঁড়াল।

আলম হকচকিয়ে গেল।

প্রায় মাঝরাতে এমন একটি রূপবতী মেয়ে অসঙ্কোচে তার সামনে চায়ের কাপ নামিয়ে রাখবে, এটা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই মেয়েটিই রাত্রি এটা বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু তার কাণ্ডকারখানা বোঝা যাচ্ছে না। রাত্রি মৃদু স্বরে বলল, 'বাবার জন্যে চা বানাতে হল। আপনি আছেন তাই আপনার জন্যেও বানালাম।' ঠিক কি বললে ভাল হয় আলম বুঝতে পারল না। মেয়েটি চলেও যাচ্ছে না। তাকে কি বসতে বলা উচিত? কিন্তু এটা তারই বাড়ি। তার বাড়িতে তাকে বসতে বলার মানে হয় না।

ঃ আমি এ বাড়ির বড় মেয়ে, আমার নাম রাত্রি।

ঃ আপনি কেমন আছেন?

'আপনি কেমন আছেন' বলে আলম আরো অস্বস্তিতে পড়ল। বোকার মত একটি প্রশ্ন করা হয়েছে। এবং মেয়েটি তা পরিষ্কার বুঝতে পারছে। কারণ সে এই প্রশ্নের কোন জবাব দেয়নি। আলমের মনে হল মেয়েটি যেন একটু হাসল।

রাত্রি বলল, 'আপনি কি আমার ওপর রাগ করেছিলেন?'

ঃ রাগ করব কেন?

ঃ বিকেলে বাবা আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছিল, তখন আসিনি—সে জন্যে।

ঃ আরে না। এ সব নিয়ে আমি ভাবিইনি।

ঃ আমার মন খারাপ ছিল তখন, তাই আসিনি। আমার ফুপুর ওপর রাগ করেছিলাম।

ঃ ও আচ্ছা।

ঃ আপনি বোধহয় চা-টা খাবেন না। দিন নিয়ে যাই।

ঃ না আমি খাব।

আলম চায়ে চুমুক দিল। রাত্রি বলল—কিছু বলবেন না?

ঃ কি বলব?

ঃ ভদ্রতা করে কিছু বলা। যেমন চাটা খুব ভাল হয়েছে—এই জাতীয়।

রাত্রি হাসছে। আলম ধাঁধায় পড়ে গেল। এই বয়েসী মেয়েদের সঙ্গে তার কথা বলে অভ্যেস নেই। খুবই অস্বস্তি লাগছে। সে বুঝতে

AMARBOI.COM

পারছে তার গাল এবং কান লাল হতে শুরু করেছে। ইচ্ছে করছে এ জায়গা থেকে কোনোমতে ছুটে পালিয়ে যেতে এবং একই সঙ্গে মনে হচ্ছে এই মেয়েটি এক্ষুণি যেন চলে না যায়। যেন সে থাকে আরো কিছুক্ষণ। আলমের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমল।

রাত্রি বলল, 'যাই। আপনি শুয়ে পড়ুন।'

আলম অনেক রাত পর্যন্ত চুপচাপ বসে রইল। অদ্ভুত এক ধরনের কষ্ট হতে লাগল তার। এই কষ্টের জন্ম কোথায় তা তার জানা নেই।

রাত বাড়ছে। চারদিক চুপচাপ। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আবারো হয়ত ঝড়-বৃষ্টি হবে। হোক, খুব হোক। সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে যাক।

আলম বাতি নিভিয়ে দিল। আজ রাতেও ঘুম আসবে না। জেগে কাটাতে হবে। ঢাকায় আসার পর থেকে এমন হচ্ছে। কেন হচ্ছে? আগে তো কখনো হয়নি। সে কি ভয় পাচ্ছে? ভালবাসা, ভয়, ঘৃণা, এসব জিনিসের জন্ম কোথায়?

তার পানির পিপাসা হলো। কিন্তু বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছে না।

AMARBOI.COM

শরীফ সাহেব অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। নিজের চোখকে তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না। আলম বলল, 'কথা বলছ না কেন মামা? কেমন আছ?'

ঃ ভাল আছি। তুই কোত্থেকে? বেঁচে আছিস এখনো।

ঃ আছি। বাসা অন্ধকার কেন? মামী কোথায়?

ঃ দেশের বাড়িতে। তুই এখন কোনো প্রশ্ন করবি না। কিছুক্ষণ সময় দে, নিজেকে সামলাই।

শরীফ সাহেব সোফায় বসে সত্যি সত্যি বড় বড় নিঃশ্বাস নিতে লাগলেন। আলম বলল, 'বাসার খবর বল, সবাই আছে কেমন?'

ঃ তুই বাসায় যাস নি?

ঃ না।

ঃ সরাসরি আমার এখানে এসেছিস?

ঃ তাও না। ঢাকাতেই আছি কয়েকদিন ধরে।

ঃ তোর কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।

: ঢাকায় আমি একটা কাজ নিয়ে এসেছি মামা।

: আই সি।

: এখন বল বাসার খবর।

: বাসার খবর তোকে কেন বলব? তোর কি কোনো আগ্রহ আছে, না কোনো দায়িত্বজ্ঞান আছে? বোন আর মা'কে ফেলে চলে গেলি দেশ উদ্ধারে। ওদের কথা ভাবলি না?

: তোমরা আছ, তোমরা ভাববে।

: প্রথম রেসপনসিবিলিটি হচ্ছে নিজের পরিবারের জন্যে। এই সাধারণ কথাটা তোরা কবে বুঝবি?

আলম হেসে ফেলল। শরীফ সাহেব রেগে গেলেন। মানুষটি ছোটখাট। ফাইন্যান্সের জয়েন্ট সেক্রেটারি। যতটা না বয়েস, তার চেয়েও বুড়ো দেখাচ্ছে। মাথার সমস্ত চুল পেকে গেছে। মুখের চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে। আলম বলল, 'মামা, বাসার খবর তো এখনো দিলে না। ওরা আছে কেমন?

: ভালই।

: মা'র শরীর কেমন?

: শরীর ঠিকই আছে। শরীর একটা আশ্চর্য জিনিস, এটা ঠিকই থাকে।

: তোমার তো তাও ঠিক নেই মামা, বুড়ো হয়ে গেছ।

: তা হয়েছি। একা থাকি। রাতে ঘুম-টুম হয় না।

: আমাদের বাড়িতে গিয়ে থাকলেই পার।

: পাগল হয়েছিস! ঐ বাড়ির উপর নজর রাখছে না? তুই যুদ্ধে গেছিস সবাই জানে। তোর মাকে থানায় নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে।

: আর কোনো ঝামেলা করেনি?

: করত। তোর বাবার জন্যে বেঁচে গেলি। ভাগ্যিস সে মরবার আগে তমঘায়ে খিদমতটা পেয়েছিল।

শরীফ সাহেব সার্ট গায়ে দিলেন। জুতো পরলেন।

: যাচ্ছ কোথায় মামা?

: অফিসে। আর কোথায় যাব? তুই কি ভেবেছিলি—যুদ্ধে যাচ্ছি?

: অফিস-টফিস করছ ঠিকমতই?

: করব না? তোর মত কয়েকজন চেংড়া ছোঁড়া দু' একটা গুলি-টুলি করবে, আর এতেই দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে? দিল্লী হনুজ দূর অস্ত।

AMARBOI.COM

তাছাড়া পলিটিক্যাল সলুশন হয়ে যাচ্ছে। খুব হাই লেভেলে কথাবার্তা হচ্ছে। আমেরিকা চাপ দিচ্ছে। আমেরিকার চাপ কি জিনিস, তোরা বুঝবি না। স্যাকরার ঠুক ঠাক কামারের এক ঘা।

আলম হাসতে লাগল। এই মামার সঙ্গে তার খুবই ভাব। একজন সৎ এবং সত্যিকার অর্থে ভালমানুষ। তাঁর একটি মাত্র দোষ—উল্টো তর্ক করা। আলমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি মুক্তিযুদ্ধকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু এই তিনিই আবার পাকিস্তানী ভাব আছে এমন কারোর সঙ্গে কথা বলবার সময় এমন যুক্তি দেবেন যাতে মনে হবে সপ্তাহখানেকের মধ্যে দেশ স্বাধীন হচ্ছে।

ঃ আলম।

ঃ জ্বি।

ঃ তোর মা'র সঙ্গে দেখা করবি না ?

ঃ না।

ঃ ভাল। লায়েক ছেলে তুই। যা ভাল মনে করিস তাই করবি। আমার এখানে থাকতে চাস ?

ঃ না।

ঃ তোর কি ধারণা, আমার এখানে উঠলেই তোকে আমি মিলিটারির হাতে ধরিয়ে দেব ?

ঃ তোমাদের কোনো ঝামেলায় ফেলতে চাই না।

ঃ এসেছিস কি জন্যে আমার কাছে ?

ঃ দেখতে এলাম।

ঃ যা দেখার ভাল করে দেখে নে। দশ মিনিট সময়। দশ মিনিটের মধ্যে বেরুব।

আলম উঠে দাঁড়াল। শরীফ সাহেব বললেন, 'তুই কোথায় আছিস ঠিকানাটা রেখে যা।'

ঃ ঠিকানা দেয়া যাবে না মামা। মা'কে বলবে আমি ভাল আছি। এবং ভবিষ্যতেও থাকব।

ঃ আমি বললে বিশ্বাস করবে না। তুই মরে গেছিস এটা বললে সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস করবে, কিন্তু বেঁচে আছিস বললে করবে না। তুই একটা কাজ কর, একটা কাগজে লেখ—আমি ভাল আছি। তারপর নাম সই করে দে। আজকের তারিখ দিবি।

AMARBOI.COM

আলম লিখল---ভাল আছি মা। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে লিখিল, 'শিগগীরই তোমাকে দেখতে আসব।' দ্বিতীয় লাইনটি লিখে তার একটু খারাপ লাগতে লাগল। 'শিগগীরই তোমাকে দেখতে আসব' এই লাইনটিতে কোথায় যেন একটু বিষাদের ভাব আছে। দেখতে আসা হবে না এই কথাটি যেন এর মধ্যে লুকনো।

শরীফ সাহেব গভীর গলায় বললেন, 'একটা লাইন লিখতে গিয়ে বুড়ো হয়ে যাচ্ছিস দেখি। তাড়াতাড়ি কর।'

আলম কাগজটা মামার হাতে ধরিয়ে নিউ পল্টনে চলে এলো। বসবার ঘরে সাদেক তার জন্যে অপেক্ষা করছে।

সাদেককে কেমন অচেনা লাগছে।

ফর্সা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একজন মানুষ। সে গোঁফ ফেলে দিয়েছে। লম্বা চুল ছিল। সেগুলো কেটেছে। জুতোজোড়াও চক চক করছে। আলম বলল, খোলশ পাল্টে ফেলেছিস মনে হচ্ছে। চেনা যাচ্ছে না।

ঃ ঢাকা শহরে ঢুকলাম এতদিন পর। সেজেগুজে ঢুকব না? তুই ছিলি কোথায়? দেড় ঘন্টা ধরে এক জায়গায় বসে আছি।

ঃ আজ আসবি বুঝব কি করে? আমি তো ভাবলাম প্রোগ্রাম ক্যানসেল। সব বাতিল।

ঃ ক্যানসেল হওয়ার মতই।

ঃ কি বললি?

ঃ রহমানের খোঁজ নেই। নো ট্রেস।

ঃ নো ট্রেস মানে?

ঃ নো ট্রেস মানে নো ট্রেস। সে আমার সঙ্গেই ঢাকায় ঢুকেছে। তারপর যেখানে যাবার কথা সেখানে যায় নি। কোথায় আছে তাও কেউ জানে না। এক গাদা এক্সপ্লোসিভ তার সাথে।

ঃ বলিস কি!

ঃ আমার আক্কেল গুড়ুম হয়ে গিয়েছিল। ডুব মারলাম। তিন দিন ডুব দিয়ে থাকার পর গেলাম ঝিকাতলা। কনট্যাক্ট পয়েন্ট। সেখানেও ভোঁ ভোঁ। কেউ নেই।

ঃ এখন ব্যাপারটা কোন পর্যায়ে আছে?

ঃ বলছি। তার আগে বাথরুমে যাওয়া দরকার। কিডনী ফেটে যাওয়ার মত অবস্থা। হেভী প্রেসার।

আলম ইতস্তত করে বলল, 'এখানে বাথরুমের একটু অসুবিধে আছে। বাইরে চলে যা, রাস্তার পাশে কোথাও বসে পড়।' সাদেক বেরিয়ে

AMARBOI.COM

গেল। এ বাড়িতে এসে সে খানিকটা ধাঁধায় পড়ে গেছে। দেড় ঘন্টা একা একাই বসে ছিল। এর মধ্যে ঘোমটা দেয়া এক মহিলা এসে বললেন, 'আলম বাইরে গেছে। এসে পড়বে। তুমি বস।' এ রকম শীতল কণ্ঠ সাদেক এর আগে শোনেনি। যেন একজন মরা মানুষ কথা বলছে।

প্রায় আধ ঘন্টা পর বাইশ তেইশ বছর বয়েসী চকলেট-রঙা শাড়ি পরা একটি মেয়ে এসে ঢুকল এবং সরু চোখে তাকিয়ে রইল। এ রকম রূপবতী মেয়েদের সাধারণত সিনেমা পত্রিকার কাভারে দেখা যায়। বাড়িতে তাদের দেখতে পাওয়ার কথা নয়। সাদেক ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'কিছু বলবেন আমাকে?' মেয়েটি তার মা'র মত শীতল গলায় বলল, 'আপনি কি দুপুরে এখানে খাবেন?'

কি অদ্ভুত কথা, অচেনা, অজানা একটা মানুষকে কেউ এ ভাবে বলে নাকি! সাদেক অবশ্যি নিজেকে চট করে সামলে নিয়ে বলল, 'জ্বি খাব। দুপুরে কি রান্না হচ্ছে?'

মেয়েটি এই কথার জবাব দেয়নি, ভেতরে চলে গেছে। তারপরই খটাং খটাং শব্দ। সেলাই মেশিন চলতে শুরু করেছে। মেয়েটি চায়ের কাপ নিয়ে এসেছে কিছুক্ষণ পর। কাপ নামিয়ে বলেছে—চিনি লাগবে কি না বলুন।

ঃ না লাগবে না।

ঃ চুমুক দিয়ে বলুন। চুমুক না দিয়েই কি ভাবে বললেন?

সাদেক চুমুক দিয়েছে। তার বাথরুমে যাওয়া দরকার ছিল। কিন্তু এ রকম রূপবতী একটা মেয়েকে নিশ্চয়ই বলা যায় না—আমি একটু ইয়েতে যাব। সাদেক বসে বসে তেতাল্লিশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত প্রথম কদম ফুল পড়ে ফেলল। বইটা থাকায় রক্ষা। নয়ত সময় কাটানো মুশকিল হত। ফেরার সময় বইটা সঙ্গে করে নিতে হবে। কোনো কাজ আধাআধি করে রাখা ঠিক না। মরে গেলে একটা আফসোস থাকবে।

সাদেক অল্প কথায় কিছু বলতে পারে না। কিংবা বলার চেষ্টাও করে না। রহমানের খোঁজ পাওয়া গেছে, সে ভালই আছে—এই খবরটা বের করতে আলমের এক ঘন্টা লাগল। তাও পুরোপুরি বের করা গেল না। কেন রহমান যেখানে ওঠার কথা ছিল সেখানে ওঠেনি সেটা জানা গেল না।

ঃ জিনিসপত্র সব এসেছে?

ঃ এসেছে কিছু কিছু।

ঃ কিছু কিছু মানে কি?

ঃ কিছু কিছু মানে হচ্ছে কিছু কিছু।

আলম বিরক্ত হয়ে বলল, 'যা বলার পরিষ্কার করে বল। অর্ধেক কথা পেটে রেখে দিচ্ছিস কেন ? কি কি জিনিসপত্র এসেছে ?'

ঃ যা যা দরকার সবই এসেছে। শুধু এল এম জি আসেনি।

ঃ আসেনি কেন ?

ঃ আমাকে বলছিস কেন ? আর এ রকম ধমক দিয়ে কথা বলছিস কেন ? জিনিসপত্র আনার দায়িত্ব আমার ছিল না। এক্সপ্লোসিভ আনার কথা ছিল, নিয়ে এসেছি।

ঃ কোথায় সেগুলো ?

ঃ জায়গা মতই আছে।

ঃ প্রোগ্রামটা কি ?

সাদেক সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, 'সেটা তুই ঠিক কর। তুই হচ্ছিস লিডার। তুই যা বলবি তাই।'

ঃ সবার সঙ্গে কথা বলা দরকার।

ঃ কারো সঙ্গে কথা বলার দরকার নেই। ফাইন্যাল প্রোগ্রামটা শুধু ওদের জানাব। সেই ভাবে কাজ হবে। প্রথম দানেই ছক্কা ফেলতে হবে।

ঃ ছক্কা ফেলতে হবে মানে ?

সাদেক বিরক্ত হয়ে বলল, 'তুই কি বাংলাও ভুলে গেছিস ? ছক্কা পাঞ্জাও তোর কাছে এক্সপ্লেইন করতে হবে ? প্রথম দানে ছক্কা মানে প্রথম অপারেশন হবে ক্লাস ওয়ান। ওয়ান হানড্রেড পারসেন্ট সাকসেস। বুঝতে পারছিস ?'

আলম চুপ করে রইল। সাদেক সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বলল, 'তুই কেমন অন্য রকম হয়ে গেছিস।'

ঃ কি রকম ?

ঃ কেমন যেন সুখী সুখী চেহারা হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে তুই এ বাড়ির জামাই।

সাদেক গলা ফাটিয়ে হাসতে লাগল। অস্বস্তিকর অবস্থা। আলম বিরক্ত মুখে বলল, 'এত হাসছিস কেন ? হাসির কি হয়েছে ?'

ঃ তুই কেমন পুতু পুতু হয়ে গেছিস, তাই দেখে হাসি আসছে। মোনালিসার প্রেমে পড়ে গেছিস নাকি ?

ঃ চুপ কর।

AMARBOI.COM

ঃ ভাবভঙ্গি তো সে রকমই। মজনু মজনু ভাব। অবশ্যি যে জিনিস দেখলাম, প্রেমে পড়াই উচিত।

সাদেককে আটকানো মুশকিল। যা মনে আসবে বলবে। আলম চিন্তায় পড়ে গেল। সে গম্ভীর গলায় বলল, 'আজে বাজে কথা বন্ধ কর, কাজের কথা বল। মোটামুটি একটা প্ল্যান দাঁড় করানো যাক। আমরা বেরুব কখন ?'

ঃ কার্ফুর আগে আগে বের হওয়াই ভাল। রাস্তাঘাটে লোক চলাচল সে সময়টায় বেশি থাকে। গাড়ি টাড়ি চলে। সময়টা ধর সাড়ে তিন থেকে চার।

কথাবার্তার এই পর্যায়ে বিন্তি এসে বলল, 'আপনেরে খাইতে ডাকে। আহেন।'

খাবার টেবিল বারান্দায়। খাবার দেয়া হয়েছে দু'জনকেই। এ বাড়ির কেউ বসেনি। সুরমা দাঁড়িয়ে রইলেন। মৃদু গলায় বললেন, 'নিজেরা নিয়ে খাও।' সাদেক সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'কোন অসুবিধে নেই খালাম্মা। আপনার থাকতে হবে না। খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে আমার কোনো লজ্জা নেই।'

ঃ লজ্জা না থাকাই ভাল।

ঃ আমার কোনো কিছুতেই লজ্জা নেই। আলমের সঙ্গে আমার বনে না এই জন্যেই। কয়েকটা শুকনো মরিচ ভেজে আনতে বলুন তো খালাম্মা। ঝাল কম হয়েছে।

সুরমা নিজেই গেলেন। সাদেক মাথা ঘুরিয়ে চারদিক দেখতে লাগল। মৃদু স্বরে বলল, 'বেশি পরিষ্কার। ভাগ্যিস এ বাড়িতে আমি উঠিনি। আমার এখানে ওঠার কথা ছিল। বাড়ির মালিক কি করেন ?'

ঃ জানি না কি করেন।

ঃ বলিস কি, ভদ্রলোক কি করেন জানিস না।

ঃ না।

ঃ মেয়েটার নাম কি ? না তাও জানিস না ?

ঃ ওর নাম রাত্রি।

ঃ রাত্রি ? বাহ্, চমৎকার তো ! জোছনা রাত্রি নিশ্চয়ই। হা হা হা।

ঃ আস্তে হাস।

সুরমা কাঁচের প্লেটে ভাজা শুকনো মরিচ নিয়ে ঢুকতেই সাদেক বলল, 'রাত্রি খাবে না ? হোস্টদের তরফ থেকে কারোর বসা উচিত।'

সুরমা শান্ত স্বরে বললেন, 'তোমরা খাও, ওরা পরে খাবে।'

AMARBOI.COM

ঃ পরে খাবে কেন? ডাকুন, গল্প করতে করতে খাই।

সুরমা অনেকক্ষণ সাদেকের দিকে তাকিয়ে থেকে সত্যি সত্যি রাত্রিকে ডাকলেন। এবং আশ্চর্য, রাত্রি একটি কথা না বলে খেতে বসল। সাদেক হাত টাত নেড়ে একটা হাসির গল্প শুরু করল। ছোটবেলায় সে মনে করে এক খাবলা চুন খেয়ে তার কি দশা হয়েছিল। দশ দিন মুখ বন্ধ করতে পারেনি। হাঁ করে থাকতে হত। সেই থেকে তার নাম হয়ে গেল ভেটকি মাছ। ভেটকি মাছ মুখ বন্ধ করে না, হাঁ করে থাকে। গল্প শুনে কেউ হাসল না। সাদেক একাই বারান্দা কাঁপিয়ে হাসতে লাগল।

ঃ ফাসক্লাস রান্না হয়েছে খালাম্মা। খাওয়ার পর আমি পান খাব। পান আছে ঘরে? না থাকলে বিন্তিকে পাঠিয়ে দিন, নিয়ে আসবে।

সুরমা বিন্তিকে পান আনতে পাঠালেন। সাদেক রাত্রির দিকে তাকিয়ে হাসি মুখে বলল, 'আপনি এত গম্ভীর হয়ে আছেন কেন?'

রাত্রি কিছু বলল না।

ঃ আপনি ইউনিভার্সিটিতে পড়েন নিশ্চয়ই। চেহারা দেখেই মনে হচ্ছে। ইউনিভার্সিটিতে পড়া মেয়েগুলো গম্ভীর হয় খুব।

ঃ আমি ইউনিভার্সিটিতেই পড়ি।

ঃ কোন সাবজেক্ট?

ঃ কেমিস্ট্রি।

ঃ সর্বনাশ! মেয়েরা এত কঠিন কঠিন সাবজেক্ট কেন পড়ে বুঝতে পারি না। মেয়েরা পড়বে বাংলা।

রাত্রি উঠে পড়ল। আলম একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করল। রাত্রি মেয়েটি বিরক্ত হয়নি। সাদেকের কথাবার্তার ধরনে যে কেউ বিরক্ত হত। হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই মেয়েটি হয়নি। হাত ধুয়ে এসে সে আবার চেয়ারে বসল। এবং চামচে করে ভাত তুলে দিল সাদেকের প্লেটে। তুলে দেয়ার ভঙ্গিটি সহজ ও স্বাভাবিক।

সাদেক দুপুর তিনটা পর্যন্ত থাকল। মৃদু গলায় প্ল্যান নিয়ে কথা বলল। প্রথম দিনের অপারেশনের জায়গাগুলো ঠিক করল। 'রেকি' করবার কি ব্যবস্থা করা যায় সে নিয়ে কথা বলল। অপারেশন চালাতে হবে অচেনা গাড়ি দিয়ে। সেই গাড়ির যোগাড় কি ভাবে করা যায় সেই নিয়েও কথা হল। আগামীকাল ভোরে আবার বসতে হবে। এ বাড়িতে নয়। পাক মটরস-এর কাছের একটি বাড়িতে। সেখানে রহমানও থাকবে। প্রোগ্রাম ফাইন্যাল করা হবে সেখানেই।

AMARBOI.COM

সাদেক যাবার আগে সুরমাকে পা ছুঁয়ে সালাম করল। সুরমা হকচকিয়ে গেলেন।

ঃ দোয়া করবেন খালাম্মা।

ঃ নিশ্চয়ই দোয়া করব।

ঃ রাত্রিকে ডাকুন। ওর কাছে বিদায় নিয়ে যাই।

রাত্রি এল। খুব সহজ এবং স্বাভাবিক ভঙ্গিতে সাদেক বলল, 'রাত্রি চলি। আবার দেখা হবে।' যেন এ বাড়ির সঙ্গে তার দীর্ঘ দিনের চেনা-জানা। রোজই আসছে যাচ্ছে। রাত্রি হেসে ফেলে বলল, 'হ্যাঁ নিশ্চয়ই দেখা হবে। ভাল থাকবেন।'

সাদেক ঘর থেকে বেরুবামাত্র রাত্রি বলল, 'আপনার বন্ধুর সঙ্গে আপনার কোনো মিল নেই। দু'জন সম্পূর্ণ দু'রকম। ও কি আপনার খুব ভাল বন্ধু?

ঃ হ্যাঁ ভাল বন্ধু। ও কিন্তু একটি অসম্ভব ভাল ছেলে।

ঃ তা জানি।

ঃ কি ভাবে জানেন?

ঃ কিছু কিছু জিনিস টের পাওয়া যায়। আপনার হয়ত ধারণা হয়েছে আমি ও'র ওপর বিরক্ত হয়েছি। এটা ঠিক না। আমি বিরক্ত হইনি।

অনেকদিন পর আলম দুপুরবেলা ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙল সন্ধ্যা মেলাবার পর। বিন্তি চায়ের পেয়ালা হাতে তাকে ডাকছে। বাইরে প্রবল বর্ষণ। ঘোর বর্ষা যাকে বলে। মতিন সাহেব বসে আছেন সোফায়। তাঁকে কেমন যেন চিন্তিত মনে হচ্ছে। আলম উঠে বসতেই তিনি বললেন, 'শরীর খারাপ করেছে নাকি?'

ঃ জ্বি না।

ঃ হাত মুখ ধুয়ে এস। একটা খারাপ খবর আছে।

ঃ কি সেটা?

ঃ আমেরিকানরা সেভেনথ্ ফ্লিট নিয়ে বঙ্গোপসাগরের দিকে রওনা হয়েছে।

আলম এই খবরে তেমন কোনো উৎসাহ দেখাল না। তার কাজ-কর্মের সঙ্গে আমেরিকার সেভেনথ্ ফ্লিটের কোনো সম্পর্ক নেই। মতিন সাহেব নিচু গলায় বললেন, 'এর চেয়েও একটা খারাপ সংবাদ আছে।'

ঃ বলুন শুনি।

ঃ ঢাকা শহরে চাইনীজ সোলজার দেখা গেছে।

AMARBOI.COM

ঃ আপনি নিজে দেখেছেন ?

ঃ না, আমি নিজে দেখিনি। কিন্তু দেখেছে অনেকেই। নাক চ্যাপটা বাঁটু সোলজার। দেখলেই চেনা যায়।

আলম বাসি মুখে চায়ে চুমুক দিতে লাগল। গুজবে ভর্তি হয়ে গেছে ঢাকা শহর। মানুষের মরাল ভেঙে পড়ছে। ঢাকা শহরের গেরিলাদের প্রথম কাজই হবে এই মরাল ঠিক করা। নতুন ধরনের গুজবের জন্ম দেয়া। যা শুনে এক‌েকজনের বুকের ছাতি ফুলে উঠবে। এরা রাতে আশা নিয়ে ঘুমতে যাবে। মতিন সাহেবের মত প্রাণহীন মুখ করে সোফায় বসে থাকবে না।

ঃ আলম !

ঃ বলুন।

ঃ শুনলাম তোমার এক বন্ধু নাকি এসেছিল ?

ঃ জ্বি।

ঃ কাজ তাহলে শুরু হচ্ছে ?

ঃ হচ্ছে।

ঃ অবস্থা কাহিল হয়ে যাবে ওদের, কি বল ?

ঃ তা হবে।

ঃ এক লাখ নতুন কবর হবে, কি বল ?

ঃ হওয়ার তো কথা।

ঃ যশোহরের এক পীর সাহেব কি বলেছেন শুনবে নাকি ?

ঃ বলুন।

ঃ খুবই কামেল আদমী। সুফী মানুষ।

মতিন সাহেব অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে যশোহরের পীর সাহেবের কথা বলতে লাগলেন। আলম কোনো কথা না বলে গল্প শুনে গেল। ডুবন্ত মানুষরাই খড়কুটো আঁকড়ে ধরে। ঢাকার মানুষ কি ডুবন্ত মানুষ ? তারা কেন এ রকম করবে ? আলম একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস চাপতে চেষ্টা করল।

রাত্রির ঘর অন্ধকার। সে বাতি নিভিয়ে চুপচাপ শুয়ে ছিল। অপালা এসে বলল, 'ফুপু টেলিফোন করেছে। তোমাকে ডাকে।' রাত্রি একবার ভাবল টেলিফোন ধরবে না। বলে পাঠাবে—শরীর ভাল না। জ্বর জ্বর লাগছে। কিন্তু তাতে লাভ হবে না। ফুপু বলবেন রিসিভার এ ঘরে নিয়ে আসতে। তার চেয়ে টেলিফোন ধরাই ভাল।

AMARBOI.COM

ঃ কেমন আছিস রাত্রি ?

ঃ ভাল।

ঃ তোদের ইউনিভার্সিটি নাকি খুলেছে ? ক্লাস টলাস হচ্ছে ?

ঃ হ্যাঁ হচ্ছে।

ঃ তুই যাচ্ছিস না ?

ঃ না।

ঃ পরীক্ষা নাকি ঠিকমত হবে শুনলাম।

ঃ হলে হবে।

ঃ তোর গলাটা এত ভারী ভারী লাগছে কেন ? জ্বর নাকি ?

ঃ না জ্বর না।

ঃ কাল গাড়ি পাঠাব। চলে আসবি আমার এখানে।

ঃ আচ্ছা।

ঃ আরেকটা কথা শোন, ঐ ভদ্রমহিলা আসবেন তোকে দেখতে। দেখলেই যে বিয়ে হবে এমন তো কোনো কথা নয়। তোর মত মেয়েকে কি কেউ জোর করে বিয়ে দিতে পারে ? তোর অনিচ্ছায় কিছু হবে না। বুঝতে পারছিস ?

ঃ পারছি।

ঃ কাজেই ভদ্রমহিলা এলে স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা বলবি।

ঃ ঠিক আছে বলব।

ঃ রাত্রি, আরেকটা কথা শোন—আমাদের ড্রাইভার বলল, সে দেখেছে কে একজন লোক তোমাদের বসার ঘরের ক্যাম্পখাটে শুয়ে আছে। কে সে ?

ঃ আব্বার এক বন্ধুর ছেলে।

ঃ এখানে সে কি করছে ?

ঃ কি একটা কাজে ঢাকায় এসেছে। থাকার জায়গা নেই। বুধবারে চলে যাবে।

নাসিমা বিরক্ত স্বরে বললেন—থাকার জায়গা নেই মানে ? হোটেল আছে কি জন্যে ? বাড়িতে সেয়ানা মেয়ে, এর মধ্যে ছেলে ছোকরা এনে ঢোকানোর মানেটা কি ? দেখি তোর বাবাকে টেলিফোনটা দে তো।

মতিন সাহেব টেলিফোনটা ধরতে রাজি হলেন না। কারণ তিনি বিবিসি শুনছেন। এই অবস্থায় তাঁকে হাতি দিয়ে টেনেও কোথাও নেয়া যাবে না। বিবিসি একটা বেশ মজার খবর দিল। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া আমেরিকান টিভি এনবিসিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলে-

AMARBOI.COM

ছেন—'আলোচনার দ্বার রুদ্ধ নয়।' এর মানে কি? কি আলোচনা? কার সঙ্গে আলোচনা? হাতি কি কাদায় পড়ে গেছে নাকি? এঁটেল মাটির কাদা? মতিন সাহেব অনেক দিন পর ঢাকা রেডিও খুললেন। মাঝে মধ্যে এদের কথাও শোনা দরকার। তেমন কোনো খবর নেই। দেশের সাবিক পরিস্থিতির উন্নয়নের কারণে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন শান্তি ও কল্যাণ কমিটির সভাপতি ফরিদ আহমেদ। মুসলিম লীগের সভাপতি হাশিমুদ্দিনের বিবৃতিও খুব ফলাও করে প্রচার করা হল—ছাত্রছাত্রীরা যেন দেশদ্রোহীদের দুরভিসন্ধিমূলক ও মিথ্যা প্রচারণায় বিভ্রান্ত না হয়। তারা যেন একটি মূল্যবান শিক্ষা বছর নষ্ট না করে। শান্তিপূর্ণভাবে মেট্রিক পরীক্ষা পরিচালনার জন্যে সরকার যা করণীয় সবই করবেন।

পনেরোই জুলাই থেকে মেট্রিক পরীক্ষা। ঐ দিন একটা শো ডাউন হবে বলে মতিন সাহেবের ধারণা। মুক্তিবাহিনীর আজদহারা নিশ্চয়ই পরীক্ষা বানচাল করবার কাজে নামবে। ঐ দিন একটা ওলট-পালট হয়ে যাবে—এটা চোখ বন্ধ করে বলে দেয়া যায়। মতিন সাহেব তাঁর রক্তের ভেতরে এক ধরনের উত্তেজনা অনুভব করলেন।

AMARBOI.COM

সুরমা রাতের খাবারের আয়োজন করছিলেন। তাঁর মুখ বিষণ্ণ। কোনো কারণে তিনি খুবই বিচলিত। কারণটি কি নিজেও স্পষ্ট জানেন না। মাঝে মাঝে তাঁর এ রকম হয়। রাত্রি এসে মা'র পাশে দাঁড়াল। সুরমা বললেন, 'কিছু বলবি?'

: হ্যাঁ। মা, ওকে ভেতরের ঘরে থাকতে দেয়া উচিত।

: আলমের কথা বলছিস?

: হ্যাঁ। বসার ঘরে থাকলেই সবার চোখে পড়বে। ফুপু টেলিফোনে জিজ্ঞেস করছিলেন। তাঁদের ড্রাইভার দেখে গেছে।

: এখন আবার ভেতরের ঘরে নিয়ে গেলে সেটা কি আরো বেশি করে চোখে পড়বে না?

রাত্রি কিছু বলতে পারল না। বেশির ভাগ সময়ই সুরমা চমৎকার যুক্তি দিয়ে কথা বলেন।

: রাত্রি।

: বল মা।

: ভেতরে নেয়ার আরেকটি সমস্যা কি জানিস? ছেলেটি অস্বস্তি বোধ করবে। একবার ভেতরে নেয়া হচ্ছে, একবার বাইরে। আবার ভেতরে। আমি কি ঠিক বলছি রাত্রি?

ঃ ঠিকই বলছ।

সুরমা অস্পষ্টভাবে হাসলেন। মৃদু স্বরে বললেন, 'তোর যখন ইচ্ছে, তাকে ভেতরেই নিয়ে আয়। বিন্তিকে বল ঘর পরিষ্কার করতে। অপালা কি করছে? তাকে তো কোনো কাজেই পাওয়া যায় না। মুখের সামনে গল্পের বই ধরে বসে আছে। ওকেও লাগিয়ে দে।'

রাত্রি কাউকে লাগালো না, নিজেই পরিষ্কার করতে লাগল। সুরমা এক সময় এসে উঁকি দিলেন। চমৎকার সাজানো হয়েছে। জানালায় পর্দা দেয়া হয়েছে। একটা ছোট্ট বুক শেলফ আনা হয়েছে। বুক শেলফ ভর্তি বই। অপালার পড়ার টেবিলটিও আনা হয়েছে ঘরে। টেবিলে চমৎকার টেবিল ক্লথ। পিরিচ দিয়ে ঢাকা পানির জগ এবং গ্লাস। সুরমা বিস্মিত হয়ে বললেন, 'ব্যাপার কি রাত্রি!'

রাত্রি লজ্জা পেয়ে গেল। তার গাল ঈষৎ লাল হল। এই ক্ষুদ্র পরিবর্তনও সুরমার চোখ এড়িয়ে গেল না। তিনি হালকা স্বরে বললেন—ছেলেটা হঠাৎ এই পরিবর্তন দেখে কি ভাবতে বলত?

ঃ কিছুই ভাববেন না। উনি অন্য ব্যাপারে ডুবে আছেন। কিছুই তাঁর চোখে পড়বে না। উনি আছেন একটা ঘোরের মধ্যে।

ঃ তুই যা করেছিস, চোখে না পড়ে উপায় আছে?

আলমের কিছু চোখে পড়েছে বলে মনে হল না। সে সহজভাবেই ভেতরের ঘরে চলে এল। প্রথম কদম ফুলের পাতা ওল্টাতে লাগল। রাত্রি দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। সে হাসি মুখে বলল—বইটা কেমন লাগছে?

ঃ ভাল।

ঃ ছেলেটার ওপর আপনার রাগ লাগছে না?

ঃ কোন ছেলেটার ওপর?

ঃ কাকলীর হাজবেণ্ড।

ঃ না, রাগ লাগবে কেন?

ঃ আপনার কি আর কিছু লাগবে?

ঃ না কিছু লাগবে না।

ঃ ড্রয়ারে মোমবাতি আছে, যদি বাতি নিভে যায় মোমবাতি জ্বালাবেন।

ঃ ঠিক আছে জ্বালাব।

রাত দশটায় মতিন সাহেব আলমকে ডাকতে এলেন ভয়েস অব আমেরিকা শোনবার জন্যে। আলম বলল তার মাথা ধরেছে, সে শুয়ে

AMARBOI.COM

থাকবে। মতিন সাহেব তবুও খানিকক্ষণ ঝোলাঝুলি করলেন। একা একা তাঁর কিছু শুনতে ইচ্ছে করে না। আজ রাত্রিও নেই। দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়েছে।

মতিন সাহেব শোবার ঘরে ঢুকলেন। সুরমা জেগে আছে এখনো। আলনায় কাপড় রাখছে। মতিন সাহেব ভয়ে ভয়ে বললেন, 'সুরমা ভয়েস অব আমেরিকা শুনবে?' সুরমা শীতল গলায় বললেন, 'না'।

ঃ আজ কিছু ইন্টারেস্টিং ডেভলপমেন্ট শোনা যাবে বলে আমার ধারণা।

সুরমা জবাব দিলেন না।

আলমের ঘুম ভাঙলো খুব ভোরে। আঁধার তখনো কাটেনি। চারদিকে ভোর হবার আগের অদ্ভুত নীরবতা। কিছুক্ষণের ভেতরই সূর্য ওঠার মত বিরাট একটা ঘটনা ঘটবে। প্রকৃতি যেন তার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে। আলম নিঃশব্দে বিছানা থেকে নামল, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চারদিক থেকে আজানের শব্দ হতে লাগল। ঢাকা শহরে এত মসজিদ আছে! আলম হকচকিয়ে গেল। ভোরবেলার অদ্ভুত অন্ধকারে চারদিক থেকে ভেসে আসা আজানের শব্দে অন্যরকম কিছু আছে। কেমন যেন ভয় ভয় লাগে। আলমের প্রায় সারা জীবন এই শহরেই কেটেছে, কিন্তু সকালবেলার এই ছবির সঙ্গে তার দেখা হয়নি। সব মানুষই বোধ হয় অনেক কিছু না জেনে বড় হয়।

সুরমা বারান্দায় বসে অজু করছিলেন। আলমকে বেরুতে দেখে বেশ অবাক হলেন। মাথায় ঘোমটা তুলে দিয়ে পরিষ্কার গলায় বললেন, 'রাতে ঘুম হয় নি?' তাঁর গলায় খানিকটা উদ্বেগ ছিল। আলমকে তা স্পর্শ করল। সে হাসিমুখে বলল, 'ভাল ঘুম হয়েছে। খুব ভাল। আপনি কি রোজ এ সময়ে জাগেন?'

ঃ হ্যাঁ। নামাজ পড়ি। নামাজ শেষ করে আবার ঘুমিয়ে পড়ি। তারপর সাতটা সাড়ে সাতটার দিকে রাত্রি ডেকে তোলে।

সুরমা হাসতে লাগলেন। যেন খুব একটা হাসির কথা বলেছেন। ভোরবেলার বাতাসে কিছু একটা বোধ হয় থাকে। মানুষকে তরল করে ফেলে। আলম বলল, 'আজ আমাদের একটা বিশেষ দিন।'

ঃ বুঝতে পারছি। তোমার কি ভয় লাগছে?

AMARBOI.COM

: ভয় না। অন্য রকম লাগছে। আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারব না। মেট্রিক পরীক্ষায় প্রথম ঘন্টা পড়বার সময় যে রকম লাগে সে রকম।

: কিন্তু এ ধরনের কাজ তো তুমি এর আগেও করেছ।

: তা করেছি। অবশ্যি এখানকার অবস্থাটা অন্য রকম।

: তুমি কি আল্লাহ্ বিশ্বাস কর? তোমার বয়েসী যুবকেরা খানিকটা নাস্তিক ধরনের হয়, সেই জন্যে বলছি।

আলম কিছু বলল না। সুরমা তাঁর প্রশ্নের জবাবের জন্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন। জবাব পেলেন না। তিনি হালকা গলায় বললেন, 'নামাজ শেষ করে এসে আমি একটা দোয়া পড়ে তোমার মাথায় ফুঁ দিতে চাই। তোমার কোনো আপত্তি আছে?'

: না আপত্তি থাকবে কেন?

: ঠিক আছে, আমি নামাজ শেষ করে আসছি। রাত্রিকে ডেকে দিচ্ছি, সে তোমাকে চা বানিয়ে দেবে।

: ডাকতে হবে না। আমার এত ঘন ঘন চা খাবার অভ্যেস নেই।

সুরমা রাত্রিকে ডেকে তুললেন। সাধারণত ফজরের নামাজ তিনি চট করে সেরে ফেলেন, কিন্তু আজ অনেক সময় নিলেন। কোথায় যেন পড়েছিলেন নামাজের শেষে পার্থিব কিছু চাইতে নেই, তাতে নামাজ নষ্ট হয়। কিন্তু আজ তিনি পার্থিব জিনিসই চাইলেন। অসংখ্যবার বললেন, 'এই ছেলেটিকে নিরাপদে রাখ। ভাল রাখ। সে যেন সন্ধ্যাবেলা আবার ঘরে ফিরে আসে। হারিয়ে না যায়।'

বলতে বলতে এক সময় তাঁর চোখে পানি এসে গেল। একবার পানি এসে গেলে খুব মুশকিল। তখন যাবতীয় দুঃখের কথা মনে পড়ে যায়। কিছুতেই আর কান্না থামানো যায় না। সুরমার তাঁর বাবার কথা মনে পড়ল। ক্যানসার হয়ে যিনি অমানুষিক যন্ত্রণা ভোগ করে মারা গেছেন। মৃত্যুর ঠিক আগে আগে পানি খেতে চেয়েছিলেন। চামচে করে পানি খাওয়াতে হয়। কি আশ্চর্য, একটা চামচ সেই সময় খুঁজে পাওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত হাতে আঁজলা করে পানি নিয়ে গেলেন সুরমা। সেই পানি মুখ পর্যন্ত নিতে নিতে আঙুল গলে নিচে পড়ে গেল। অতি কষ্টের মধ্যেও এই দৃশ্য দেখে তাঁর বাবা হেসে ফেললেন। তাঁর পানি খাওয়া হল না। কত অদ্ভুত মানুষের জীবন!

রাত্রি ঘরে ঢুকে দেখল, তার মা জায়নামাজে এলোমেলো হয়ে শুয়ে আছেন। কান্নার জন্যেই শরীর বার বার কেঁপে উঠছে। সে নিঃশব্দে

AMARBOI.COM

বের হয়ে গেল। আলমকে চা দিয়ে আসা হয়েছে। আবার সেখানে যাওয়াটা ভাল দেখায় না। কিন্তু যেতে ইচ্ছে করছে। মাঝে মাঝে অর্থ-হীন গল্পগুজব করতে ইচ্ছে করে। রাত্রি আলমের ঘরে উঁকি দিল।

ঃ আবার এলাম আপনার ঘরে।

ঃ আসুন।

ঃ চিনি হয়েছে কিনা জানতে এসেছি।

ঃ হয়েছে। থ্যাংকস।

রাত্রি খাটে গিয়ে বসল। আলমের কেমন লজ্জা করতে লাগল। রাত্রির গায়ে আলখাল্লা জাতীয় লম্বা পোশাকে, সাধারণ নাইটির মত বাহারী কোনো জিনিস নয়। এই পোশাকে তাকে অন্যরকম লাগছে। সে পা দোলাতে দোলাতে বলল, 'আপনি আজ এত ভোরে উঠেছেন কেন?'

ঃ জানি না কেন। ঘুম ভেঙে গেল।

ঃ টেনশান থাকলে ঘুম ভেঙে যায়।

ঃ তা যায়।

ঃ আমার উল্টোটা হয়, টেনশানের সময় শুধু ঘুম পায়।

ঃ একেকজন মানুষ একেক রকম।

ঃ তা ঠিক। আমরা সবাই আলাদা।

আলম সিগারেট ধরাল। ওর সিগারেটের কোন তৃষ্ণা হয় নি। অস্বস্তি কাটানোর জন্যে ধরানো। তার অস্বস্তির ব্যাপারটা কি মেয়েটি টের পাচ্ছে? পাচ্ছে নিশ্চয়ই। এ সব সূক্ষ্ম ব্যাপারগুলো মেয়েরা সহজেই টের পায়। আলম বলল, 'আপনি খুব ভোরে ওঠেন?'

ঃ হ্যাঁ উঠি। অন্ধকার থাকতে আমার ঘুম ভাঙে। খুব খারাপ লাগে তখন।

ঃ খারাপ লাগে কেন?

ঃ সবাই ঘুমচ্ছে, আর আমি জেগে আছি এই জন্যে। যখন ছোট ছিলাম তখন গেট খুলে বাইরে যেতাম। একা একা হাঁটতাম। ছোটবেলায় আমি খুব সাহসী ছিলাম।

ঃ এখন সাহসী না?

ঃ না। ছোটবেলায় আমি একটি কুৎসিত ঘটনা দেখি, তারপর আমার সব সাহস চলে যায়। আমি এখন একটি ভীরু ধরনের মেয়ে।

রাত্রি তাকিয়ে আছে মেঝের দিকে। পা দোলাচ্ছে না। কাঠিন্য চলে এসেছে তার চোখে-মুখে। আলম অবাক হয়ে এই সূক্ষ্ম কিন্তু তীক্ষ্ণ পরিবর্তনটি লক্ষ্য করল। রাত্রি বলল, 'আমি কি দেখেছিলাম তা তো

AMARBOI.COM

জিজ্ঞেস করলেন না।'

ঃ জিজ্ঞেস করলে আপনি বলবেন না, তাই জিজ্ঞেস করিনি।

ঃ ঠিকই করেছেন। আমি বলতাম না, কাউকেই বলিনি। মাকেও বলিনি। যাই কেমন ?

রাত্রি উঠে দাঁড়াল। এবং দ্রুত ঘর ছেড়ে চলে গেল।

রাত্রির ফুপু নাসিমার বয়স চল্লিশের ওপরে। কিন্তু তাঁকে দেখে সেটা বোঝার কোনো উপায় নেই। এখনো তাঁকে পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের তরুণীর মত লাগে। ভিড়ের মধ্যে লোকজন তাঁর গায়ে হাত দিতে চেষ্টা করে। একবার এ রকম একটি ছোকরাকে তিনি হাতে নাতে ধরে ফেললেন এবং হাসিমুখে বললেন, 'তোমার বয়স কত খোকা ?' ছেলেটি এ জাতীয় দৃশ্যের জন্যে প্রস্তুত ছিল না। সে ঘেমে নেয়ে উঠল। নাসিমা ধারাল গলায় বললেন—আমার বড় মেয়ে ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। বুঝতে পারছ ?

'তাঁর বড় মেয়ে ইউনিভার্সিটিতে পড়ে'—এটা ঠিক না। নাসিমার কোন ছেলেপুলে নেই। বড় মেয়ে বলতে তিনি বুঝিয়েছেন রাত্রিকে। বাইরের কেউ যদি জিজ্ঞেস করে—আপনার ছেলেমেয়ে ক'টি ? তিনি সহজভাবেই বলেন, আমার কোনো ছেলে নেই দু'টি মেয়ে—রাত্রি এবং অপালা। এটা তিনি যে শুধু বলেন তাই না, মনেপ্রাণে বিশ্বাসও করেন। তাঁর বাড়িতে এদের দু'জনের জন্যে দুটি ঘর আছে। সেই ঘর দুটি ওদের ইচ্ছেমত সাজানো। সপ্তাহে খুব কম হলেও তিনদিন এই ঘর-দুটিতে দু'বোনকে থাকতে হয়। নয়ত নাসিমা অস্থির হয়ে যান। তাঁর কিছু বিচিত্র অসুখ দেখা দেয়। হিস্টিরিয়ার সঙ্গে যার কিছু কিছু মিল আছে।

নাসিমার স্বামী ইয়াদ সাহেব লোকটি রসকষহীন। চেহারা চাল-চলন সবই নির্বোধের মত, কিন্তু তিনি নির্বোধ নন। কোনো নির্বোধ লোক একা একা একটি ইনজিনীয়ারিং ফার্ম শুরু করে বার বছরের মাথায় কোটিপতি হতে পারে না। ইয়াদ সাহেব হয়েছেন। যদিও এই বিত্ত তাঁর জীবন যাপন পদ্ধতির ওপর কোনো রকম ছাপ ফেলেনি। তিনি এখনো গায়ে তেল মেখে গোসল করেন, এবং স্ত্রীকে ভয় করেন। অসম্ভব রকম বিত্তবান লোকজন স্ত্রীদের ঠিক পরোয়া করে না।

ভোর আটটায় নাসিমা ইয়াদ সাহেবকে ডেকে তুললেন। তাঁর ডাকার ভঙ্গিতে এমন কিছু ছিল যে ইয়াদ সাহেবের বুক ধড়ফড় করতে

AMARBOI.COM

লাগল। তিনি ভয় পাওয়া গলায় বললেন—কি হয়েছে ?

ঃ তোমার গাড়ি পাঠালাম রাত্রিদের আনবার জন্যে।

ঃ ও আচ্ছা।

ইয়াদ সাহেব আবার ঘুমবার আয়োজন করলেন।

ঃ তুমি কিন্তু আজ অফিসে-টফিসে যাবে না।

ঃ কেন ?

ঃ আজ রাত্রিকে দেখতে আসবে। তোমার থাকা দরকার।

ঃ আমি থেকে কি করব ?

ঃ কিছু করবে না। থাকবে আর কি। এ সব কাজে ব্যাকগ্রাউণ্ডে একজন পুরুষ মানুষ থাকা দরকার।

ঃ দরকার হলে থাকব। এখন একটু ঘুমাই, কি বল ?

ঃ আচ্ছা ঘুমাও।

ইয়াদ সাহেব চোখ বন্ধ করে পাশ ফিরলেন। ছুটে যাওয়া ঘুম ফিরে এলো না। কিছুদিন থেকেই তাঁর দিন কাটছে উদ্বেগ ও দুঃশ্চিন্তার। মোহাম্মদপুরের তাঁদের মূল বাড়িটি বিহারীদের দখলে। দেশ স্বাধীন না হলে এ বাড়ি ফিরে পাওয়া যাবে না। অসম্ভব। দেশ চট করে স্বাধীন হয়ে যাবে, এ রকম কোন লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। চট করে পৃথিবীর কোন দেশই স্বাধীন হয়নি। ইংরেজ তাড়াতে কত দিন লেগেছে ? এখানেও তাই হবে। বছরের পর বছর লাগবে। তারপর এক সময় বাঙালীরা উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে। এই একটা অদ্ভুত জাতি। নিমিষের মধ্যে উৎসাহে পাগল হয়ে ওঠে, আবার সেই উৎসাহ নিভেও যায়।

AMARBOI.COM

ইয়াদ সাহেব উঠে বসলেন। কাজের ছেলেটিকে বেড-টির কথা বলে চুরুট ধরালেন। তাঁর বমি বমি ভাব হল। তিনি বিছানা থেকে নেমে হেঁটে হেঁটে বারান্দায় গেলেন। বারান্দার সামনে ঘুপসি মত গলি। মোহাম্মদপুরের বিশাল বাড়ি ছেড়ে তাঁকে থাকতে হচ্ছে ভাড়া বাড়িতে, যার সামনে ঘুপসি গলি। তিনি বেঁচে থাকতে থাকতে কি দেশ স্বাধীন হবে ? ফিরে পাওয়া যাবে নিজের বাড়ি ? ইয়াদ সাহেব খানিকটা লজ্জিত বোধ করলেন। তিনি দেশের স্বাধীনতা চাইছেন ব্যক্তিগত স্বার্থে। এটা ঠিক হচ্ছে না।

চায়ের পেয়ালা নিয়ে তিনি বাসি মুখে নিজের স্টাডি রুমে ঢুকলেন। তাঁর অফিসের যাবতীয় কাগজপত্র এই ছোট্ট ঘরটিতে আছে। এখনে তিনি দীর্ঘ সময় কাটান। নিজের তৈরি ব্লু প্রিন্টগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে তাঁর ভাল লাগে। কিন্তু আজ কিছুই ভাল লাগছে না। আলস্য

অনুভব করছেন। ব্যবসা বাণিজ্য এখন কিছুই নেই। সব রকম কনস্ট্রাকসনের কাজ বন্ধ হয়ে আছে। সরকারের কাছে মোটা অঙ্কের টাকা পাওনা। সেটা পাওয়া যাচ্ছে না। যাবেও না সম্ভবত। সব জলে যাবে। তাঁর মতে বাঙালীদের এই যুদ্ধে সবচে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কনসট্রাকসন ফার্মগুলো। এদের কোমর ভেঙে গেছে। এই কোমর আর ঠিক হবে না। দেশ স্বাধীন হলেও না। তিনি একটি নিঃশ্বাস ফেললেন। কলিং বেল বাজছে। মেয়ে দুটি এসেছে নিশ্চয়ই। এদের তাঁর ভাল লাগে না। কিন্তু তবু তিনি হাসি মুখে দরজা খুলে বের হলেন। এবং অমায়িক ভঙ্গিতে বললেন—রাত্রি মা, কেমন আছ?

ঃ ভাল আছি ফুপা।

ঃ অপালা মা, মুখটা এমন কাল কেন?

অপালা জবাব দিল না। সে তার ফুপাকে পছন্দ করে না। একেবারেই না। ইয়াদ সাহেব বললেন, 'কি গো মা, কথা বলছ না কেন?'

ঃ কথা বলতে ভাল লাগছে না, তাই বলছি না।

ইয়াদ সাহেব চুপ করে গেলেন।

AMARBOI.COM

আলম দোকানটির সামনে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে লাগল। এটিই কি সেই দোকান? নাম অবশ্যি সে রকমই—মডার্ন নিওন সাইনস। এখানেই সবার জড় হবার কথা। কিন্তু দোকনটি সদর রাস্তার ওপরে। তাছাড়া ভেতরে যে লোকটি বসে আছে, তার চেহারা কেমন বিহারী বিহারী। কার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতে বলতে হেসে গড়িয়ে পড়ছে। কোন বাঙালী ছেলে এই সময়ে এমনভাবে হাসবে না। এটা হাসির সময় না। আলম দোকানে ঢুকে পড়ল।

চেক হাওয়াই সার্ট পরা ছেলেটির ঠোঁটের ওপর সুঁচালো গোঁফ। গলায় সোনার চেইন বের হয়ে আছে। রোগা টিঙটিঙে, কিন্তু কথা বলার ভঙ্গি কেমন উদ্ধত। ছেলেটি টেলিফোন নামিয়ে রাগী গলায় বলল, 'কাকে চান?'

ঃ এটা কি মডার্ন নিওন সাইন?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ আমি আশফাক সাহেবকে খুঁজছি।

ঃ আমিই আশফাক। আপনার কি দরকার?

ঃ আমার নাম আলম।

ছেলেটির তীক্ষ্ম দৃষ্টি আরো তীক্ষ্ম হল, কিন্তু কথা বলল নরম গলায়—

আপনি ভেতরে ঢুকে যান। সিঁড়ি আছে। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় চলে যান।

ঃ আর কেউ এসেছে ?

ঃ রহমান ভাই এসেছেন। যান আপনি ভেতরে চলে যান।

ভেতরটা অন্ধকার। অসংখ্য নিওন টিউব চারদিকে ছড়ানো। একজন বুড়োমত লোক এই অন্ধকারে বসেই কি সব নকশা করছে। সে একবার চোখ তুলে আলমকে দেখল। তার কোন রকম ভাবান্তর হলো না। চোখ নামিয়ে নিজের মত কাজ করতে লাগল।

দোতলায় দুটি ঘর। একটিতে প্রকাণ্ড একটি তালা ঝুলছে। অন্যটি খোলা, রঙিন পর্দা ঝুলছে। রেলিং-এ মেয়েদের কিছু কাপড়। ঘরের ভেতর থেকে ক্যাসেটে গানের শব্দ আসছে—হাওয়ামে উড়তা যায়ে মেরা লাল দুপাট্টা মলমল। আলম ধাঁধায় পড়ে গেল। সে মৃদু স্বরে ডাকল, 'রহমান, রহমান।'

রহমান বেরিয়ে এলো। তার গায়ে একটা ভারী জ্যাকেট। মুখ শুকনো। এম্নিতেই সে ছোটখাটো মানুষ। এখন তাকে আরো ছোট দেখাচ্ছে। রহমান হাসতে চেষ্টা করল।

ঃ আসুন আলম ভাই!

ঃ তোমার এই অবস্থা কেন ? কি হয়েছে ?

ঃ শরীর খারাপ। জ্বর, সর্দি, কাশি—বুড়োদের অসুখ বিসুখ।

ঃ জ্বর কি বেশি ?

ঃ একশ দুই। অসুবিধে হবে না। চারটা এ্যাসপিরিন খেয়েছি। জ্বর নেমে যাবে। সকালে একশ তিন ছিল। ভেতরে আসুন আলম ভাই।

ঃ ভেতরে কে কে আছে ?

ঃ কেউ এখনো এসে পৌঁছেনি। আমি ফার্স্ট, আপনি সেকেণ্ড। এসে পড়বে।

আলম ঘরে ঢুকল। ছোট্ট ঘর। আসবাবপত্রে ঠাসা। বেমানান একটা কারুকার্য করা বিশাল খাট। খাটের সঙ্গে লাগোয়া একটা স্টীলের আলমারি। তার এক হাত দূরে ড্রেসার। জানালার কাছে খাটের মতই বিশাল টেবিল। এত ছোট্ট একটা ঘরে এতগুলো আসবাবের জায়গা হল কিভাবে কে জানে।

আলম নিচু গলায় বলল, 'জিনিসপত্র সব কি এখানেই ?'

ঃ সব না, কিছু আছে। বাকিগুলো সাদেকের কাছে। যাত্রাবাড়িতে।

ঃ আশফাক ছেলেটি কেমন ?

AMARBOI.COM

ঃ ওয়ান হানড্রেড পারসেন্ট গোল্ড। আপনার কাছে বিহারী বিহারী লাগছিল, তাই না? চুল ছোট করে কাটায় এ রকম লাগছে। গলায় আবার চেইন টেইন আছে। উর্দু বলে ফ্লুয়েন্ট।

ঃ বাড়ি কোথায়?

ঃ খুলনার সাতক্ষিরায়।

ঃ ফ্লুয়েন্ট উর্দু শিখল কার কাছে?

ঃ সিনেমা দেখে দেখে নাকি শিখেছে। নাচে নাগিন বাজে বীণ নামের একটা ছবি নাকি সে ন'বার দেখেছে। আলম ভাই, পা তুলে বসেন।

আলম ঠিক স্বস্তি বোধ করছিল না। সে থেমে থেমে বলল, 'জায়গাটা কেমন যেন সেফ মনে হচ্ছে না।'

ঃ প্রথম কিছুক্ষণ এ রকম মনে হয়। আমারো মনে হচ্ছিল। আশফাকের সঙ্গে কথাবার্তা বললে বুঝবেন, এটা অত্যন্ত সেফ জায়গা।

ঃ ছেলেটা একটু বেশি স্মার্ট। বেশি স্মার্ট ছেলেপুলে কেয়ারলেস হয়। আর জায়গাটা খুব এক্সপোজড। মেইন রোডের পাশে।

রহমান শান্ত স্বরে বলল, 'মেইন রোডের পাশে বলেই সন্দেহটা কম। আইসোলেটেড জায়গাগুলোই বেশি সন্দেহজনক।

ঃ আমার কেন জানি ভাল লাগছে না।

ঃ আপনার আসলে আশফাকের ওপর কনফিডেন্স আসছে না। ও যাচ্ছে আমাদের সাথে।

ঃ ও যাচ্ছে মানে?

ঃ গাড়ি চালাবে। ওর একটা পিক আপ আছে। সাদেককে তো আপনিই বলেছেন দুটি গাড়ি থাকবে। পেছনেরটা কভার দেবে। অবশ্যি আপনি নিতে না চাইলে ওকে বাদ দেবেন।

নিচে বসে থাকা বুড়ো লোকটি চা আর ডালপুরী নিয়ে এল। রহমান শুয়ে পড়ল চোখ বন্ধ করে। তার বেশ ঘাম হচ্ছে। জ্বর ছেড়ে দিচ্ছে বোধ হয়। সে ক্ষীণ স্বরে বলল, 'চা খান আলম ভাই।'

আলম চা বা ডালপুরীতে কোন রকম আগ্রহ দেখাল না। ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিক দেখতে লাগল। নায়িকাদের ছবি কেটে কেটে দেয়ালে লাগানো। এর মধ্যে বেশির ভাগ ছবিই অত্যন্ত আপত্তিকর। আলম বলল, 'মেয়েমানুষ কেউ কি থাকে এখানে?'

ঃ জ্বি না।

ঃ রেলিং-এ মেয়েদের কিছু জামাকাপড় দেখলাম।

AMARBOI.COM

ঃ আমি লক্ষ্য করিনি। আপনার মনের মধ্যে কিছু একটা ঢুকে গেছে আলম ভাই।

আলম জবাব দিল না। গুনগুন করতে করতে আশফাক এসে ঢুকল। ফুর্তিবাজের গলায় বলল—চা ডালপুরী কেউ খাচ্ছে না, ব্যাপারটা কি। ডালপুরী ফ্রেশ। আলম ভাই, খেয়ে দেখেন একটা। আপনার সঙ্গে পরিচয় করবার জন্যে এলাম।

ঃ বসুন।

ঃ ড্রাইভার হিসেবে আমাকে দলে নেন। দেখেন কি খেল দেখাই। আমার একটা পংখীরাজ আছে। দেখলে মনে হবে ঘন্টায় দশমাইলও যাবে না, কিন্তু আমি আশি মাইল তুলে আপনাকে দেখাব।

আলম শীতল গলায় বলল, 'আশফাক সাহেব কিছু মনে করবেন না। এ জায়গাটা আমার সেফ মনে হচ্ছে না।'

আশফাক হকচকিয়ে গেল। বিস্মিত গলায় বলল—সেফ মনে হচ্ছে না কেন?

ঃ জানি না কেন। ইনট্যুশন বলতে পারেন।

ঃ ঢাকা শহরে যে কয়টা সেফ বাড়ি আছে, তার মধ্যে এটা একটা। আশপাশের সবাই আমাকে কড়া পাকিস্তানী বলে জানে। মাবুদ খাঁ বলে এক ইনফেনট্রির মেজরের সঙ্গে আমার খুব খাতির। সে সপ্তাহে অন্তত একদিন আমার ঘরে আসে আড্ডা দেবার জন্যে।

আলম কিছু না বলে সিগারেট ধরাল। আশফাক বলল, 'এখনো কি আপনার এ বাড়ি আনসেফ মনে হচ্ছে?'

ঃ হ্যাঁ হচ্ছে।

ঃ তাহলে সবাই আসুক, তারপর আমরা অন্য কোথাও চলে যাব।

সবাই চুপ করে গেল। আশফাককে দেখে মনে হচ্ছে সে আহত হয়েছে। হাতের সিগারেট ফেলে দিয়ে সে সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় সিগারেট ধরাল। নিষ্প্রাণ গলায় বলল—রহমান ভাই, আপনার জ্বর কি কমেছে?

ঃ বুঝতে পারছি না। ঘরে থার্মোমিটার আছে?

ঃ আছে।

থার্মোমিটার দিয়ে দেখা গেল জ্বর একশর অল্প কিছু ওপরে, কিন্তু রহমানের বেশ খারাপ লাগছে। বমির বেগ হচ্ছে। বমি করতে পারলে হয়ত একটু আরাম হবে। সে বিছানা থেকে নেমে বাথরুমের দিকে এগুল। বাথরুমের দরজা খুলেই হড় হড় করে বমি করল। নাড়ি-ভুঁড়ি

AMARBOI.COM

উল্টে আসছে বলে মনে হচ্ছে। পৃথিবী দুলছে। রহমান ক্লান্ত স্বরে বলল, 'মাথাটা ধুইয়ে দিন তো আশফাক সাহেব। অবস্থা কাহিল।'

আলম চিন্তিত মুখে বলল, 'তোমার শরীর তো বেশ খারাপ। কিন্তু তোমাকে ছাড়া আমার চলবেও না। ডেটটা কি পিছিয়ে দেব?'

ঃ আরে না। আজই সেই দিন। আমাকে নিয়ে চিন্তা করবেন না। বমি করবার পর ভালই লাগছে। ঘন্টাখানিক শুয়ে থাকলেই ঠিক হয়ে যাবে।

রহমান চাদর গায়ে বিছানায় এসে শোয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়ল। নিচে কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। সাদেকের উঁচু গলায় ফুর্তির ছোঁয়া। যেন তারা সাবাই মিলে পিকনিকে যাবার মত কোনো ব্যাপার নিয়ে আলাপ করবে। রঙ-তামাশা করবে।

মতিন সাহেব আজ অফিসে যাননি। যাবার জন্যে তৈরি হয়েছিলেন। জামা জুতো পরেছিলেন। দশবার ইয়া মুকাদ্দিমু বলে ঘর থেকেও বেরিয়েছিলেন। পিলখানার তিন নম্বর গেটের কাছে এসে একটি অস্বাভাবিক দৃশ্য দেখে পাথর হয়ে গেলেন। খোলা ট্রাকে করে দুটি অল্পবয়েসী ছেলেকে নিয়ে যাচ্ছে। ছেলে দুটির হাত পেছন দিকে বাঁধা। ভাবশূন্য মুখ। একজনের চোখে আঘাত লেগেছে। চোখ এবং মুখের এক অংশ বীভৎস ভাবে ফুলে উঠেছে। কালো পোশাক পরা এক-দল মিলিশিয়া ওদের ঘিরে আছে। তাদের একজনের হাতে একটি রুমাল। সে রুমাল দিয়ে খেলার ছলে ছেলে দুটির মাথায় ঝাপটা দিচ্ছে, বাকিরা সবাই হেসে উঠছে। ট্রাক চলছিল। কাজেই দৃশ্যটির স্থায়ীত্ব খুব বেশি হলে দেড় মিনিট। এই দেড় মিনিট মতিন সাহেবের কাছে অনন্তকাল বলে মনে হলো। সমস্ত ব্যাপারটাতে প্রচণ্ড হৃদয়হীন কিছু আছে। মতিন সাহেবের পা কাঁপতে লাগল। মাথা ঝিম ঝিম করতে লাগল। ব্যাপারটা যে শুধু তাঁর ক্ষেত্রেই ঘটল তা নয়। তাঁর আশেপাশে যারা ছিল সবাই যেন কেমন হয়ে গেল। মতিন সাহেবের মনে হল ছেলে দুটিকে ওরা যদি মারতে মারতে নিয়ে যেত তাহলে তাঁর এমন লাগত না। রুমাল দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে তামাশা করছে বলেই এমন লাগছে। তিনি বাসায় ফিরে চললেন।

AMARBOI.COM

পানওয়ালা ইদ্রিস বলল, 'অফিসে যান না?'

ঃ না। শরীরটা ভাল না। দেখি একটা পান দাও।

পান খাওয়ার তাঁর দরকার ছিল না। এ সময়ে সবাই অদরকারী জিনিসগুলো করে। অপ্রয়োজনীয় কথা বলে। ভয় কাটানোর জন্যেই করে। ভয় তবু কাটে না। যত দিন যায় ততই তা বাড়তে থাকে।

ঃ দুটো ছেলেকে ধরে নিয়ে গেল। দেখলে ইদ্রিস মিয়া ?

ঃ জ্বি দেখলাম। নেন পান নেন।

মতিন সাহেব পান মুখে দিয়ে নিচু গলায় বললেন—এই অবস্থা বেশি দিন থাকবে না। আজদহা নেমে গেছে।

বলেই তিনি হকচকিয়ে গেলেন। একজন পানওয়ালার সঙ্গে এসব কি বলছেন ? ইদ্রিস মিয়া হয়ত তাঁর কথা পরিষ্কার শোনে নি। কিংবা শুনলেও অর্থ বুঝতে পারে নি। সে একটি আগরবাতি জ্বালাল। আগেরটি শেষ হয়ে গেছে।

সুরমা একবার জিজ্ঞেসও করলেন না—অফিসে যাও নি কেন ? তিনি নিজের মনে কাজ করে যেতে লাগলেন। সাবান পানি দিয়ে ঘরের মেঝে নিজের হাতে মুছলেন। কার্পেট শুকোতে দিলেন। বাথরুমে ঢুকলেন প্রচুর কাপড় নিয়ে। আজ অনেকদিন পর কড়া রোদ উঠেছে। রোদটা ব্যবহার করা উচিত।

মতিন সাহেব কি করবেন ভেবে পেলেন না। কিছুক্ষণ বারান্দায় বসে রইলেন, তারপরই তাঁর মনে হল অফিসে না গিয়ে তিনি বারান্দায় বসে আছেন এটা লোকজনের চোখে পড়বে। তিনি ভেতরের ঘরে গেলেন। ঝকঝকে মেঝে মাড়িয়ে যেতে খারাপ লাগে। সুরমা কিছু বলছেন না, কিন্তু তাকিয়ে আছেন কড়া চোখে। মতিন সাহেব বাগানে গেলেন। বাগান মানে বারান্দার কাছ ঘেঁসে এক চিলতে উঠোন। দীর্ঘ দিন ধরে তিনি এখানে শাকসব্জি ফলাবার চেষ্টা করছেন। ফলাতে পারেন নি। মরা মরা ধরনের কিছু গাছপালা হয়ে কিছুদিন পর আপনাআপনি শুকিয়ে যায়। সার-টার সব দিয়েও একই অবস্থা। নিজেই একবার মাটি নিয়ে জয়দেবপুর গিয়েছিলেন সয়েল টেস্টিং-এর জন্যে। তারা এক সপ্তাহ পর যেতে বলল। তিনি গেলেন এক সপ্তাহ পর। তিনি ঘন্টা বসে থাকার পর কামিজ পরা অত্যন্ত স্মার্ট একটি মেয়ে এসে বলল—আপনার স্যাম্পলতো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আপনি কি কষ্ট করে আরেকবার খানিকটা স্যাম্পল দিয়ে যেতে পারবেন? দু'এক দিনের মধ্যে নিয়ে আসুন। তিনি নিয়ে যান নি।

AMARBOI.COM

কয়েকদিনের ক্রমাগত বৃষ্টির জন্যে বাগান কাদা হয়েছে। জুতো শুদ্ধ পা অনেকখানি কাদায় ডেবে গেল। তিনি অবশ্যি তা লক্ষ্য করলেন না, কারণ তাঁর চোখ গিয়েছে কাঁকরুল গাছের দিকে। কাঁকরুল গাছ যে লাগানো হয়েছে তা তাঁর মনে ছিল না। আজ হঠাৎ দেখলেন একটা সতেজ গাছ। চড়া সবুজ রঙের পাতা চক চক করছে। তার চেয়েও বড় কথা পাতার ফাঁকে বড় বড় কাঁকরুল ঝুলছে। কেউ লক্ষ্যই করেনি। একটি আবার পেকে হলুদ বর্ণ হয়েছে। মতিন সাহেব চেঁচিয়ে উঠলেন—রাত্রি রাত্রি। রাত্রি বাসায় নেই। ভোরবেলায় তাঁর চোখের সামনে গাড়ি এসে নিয়ে গিয়েছে, তা তাঁর মনে রইল না। উত্তে-জিত স্বরে তিনি দ্বিতীয়বার ডাকলেন—রাত্রি, রাত্রি।

সুরমা ঘর মোছা বন্ধ করে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখ বিষণ্ণ। খানিকটা উদ্বেগ মিশে আছে সেখানে। তিনি বললেন, 'কি হয়েছে?'

ঃ সুরমা, কাঁকরুল দেখে যাও। গাছ ভর্তি হয়ে আছে। কেউ এটা লক্ষ্যও করে নি। কি কাণ্ড!

সুরমা সত্যি সত্যি নেমে এলেন। তাঁর যা স্বভাব তাতে নেমে আসার কথা নয়। নোংরা কাদা থিক থিক বাগানে পা দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

ঃ সুরমা দেখ দেখ পুঁই গাছটার দিকে দেখ। কেন এসব এতদিন কেউ দেখল না?

মতিন সাহেব গভীর মমতায় গাছের পাতায় হাত বোলাতে লাগলেন।

শুধু পুঁই গাছ নয়। রান্নাঘরের পাশের খানিকটা জায়গায় ডাঁটা লাগিয়েছিলেন। লাল লাল পুরুষ্টু ডাঁটা সেখানে। নিষ্ফলা মাটিতে হঠাৎ করে প্রাণ সঞ্চার হল নাকি? আনন্দে মতিন সাহেবের দম বন্ধ হয়ে যাবার মত হলো। রাত্রিকে খবর দিতে হবে। ওরা এলে এক সঙ্গে সব্জি তোলা হবে। তাছাড়া বাগান পরিষ্কার করতে হবে। বড় বড় ঘাস জন্মেছে। এদের টেনে তুলতে হবে। মাটি কোপাতে হবে। ডাঁটা ক্ষেতে পানি জমেছে, নালা কেটে পানি সরাতে হবে। অনেক কাজ। অফিসে না গিয়ে ভাল হয়েছে। রাত্রিকে খবর দেয়া দরকার। মতিন সাহেব কাদামাখা জুতো নিয়েই শোবার ঘরে ঢুকে পড়লেন। রাত্রিকে টেলিফোন করলেন। সুরমা দেখলেন তাঁর ধোয়া-মোছা মেঝের কি হাল হলো। কিন্তু তিনি কিছু বললেন না।

AMARBOI.COM

রাত্রিকে টেলিফোনে পাওয়া গেল না। নাসিমা বলল, 'ওর সঙ্গে এখন কথা বলা যাবে না। তুমি ঘণ্টাখানিক পরে রিং করবে।'

মতিন সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, এখন সে কি করছে?

ঃ একজন ভদ্রমহিলা তাকে দেখতে এসেছেন। সে কথা বলছে তাঁর সঙ্গে।

ঃ কেন দেখতে এসেছে রাত্রিকে?

ঃ কেন তুমি জান না? তোমাকে তো বলা হয়েছে।

ঃ নাসিমা ব্যাপারটা কি খুলে বল তো।

ঃ এখন বক বক করতে পারব না। রান্নাবান্না করছি। উনি খাবেন এখানে।

ঃ কে এখানে খাবেন?

ঃ দাদা, পরে তোমাকে সব গুছিয়ে বলব। এখন রেখে দিই। তুমি বরং অপালার সঙ্গে কথা বল। ওকে ডেকে দিচ্ছি।

মতিন সাহেব রিসিভার কানে নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। অপালা আসছেই না। কোনো একটা গল্পের বই পড়ছে নিশ্চয়ই। গল্পের বই থেকে তাকে উঠিয়ে আনা যাবে না। তিনি যখন টেলিফোন রেখে দেবেন বলে মন ঠিক করে ফেলেছেন তখন অপালার চিকন গলা শোনা গেল।

ঃ হ্যালো বাবা।

ঃ হুঁ।

ঃ কি বলবে তাড়াতাড়ি বল।

মতিন সাহেব উৎকণ্ঠিত স্বরে বললেন, 'তোদের এখানে কি হচ্ছে?'

ঃ আপার বিয়ে হচ্ছে।

ঃ কি বললি!

ঃ আপার বিয়ে হচ্ছে। বিবাহ। শুভ বিবাহ।

ঃ কি বলছিস এসব, কিছু বুঝতে পারছি না।

অপালা বিরক্ত স্বরে বলল, 'বাবা, আমি এখন রেখে দিচ্ছি।' সে সত্যি সত্যি টেলিফোন রেখে দিল।

রাত্রি পা ঝুলিয়ে খাটে বসে আছে। তার সামনে বসে আছেন মিসেস রাবেয়া করিম। রাত্রির ধারণা ছিল একজন বুড়োমত মহিলা আসবেন। তাঁর পরনে থাকবে সাদা শাড়ি। তিনি আড়চোখে রাত্রিকে কয়েকবার দেখে ভাসা ভাসা ধরনের কিছু প্রশ্ন করবেন—বাড়ি কোথায়?

AMARBOI.COM

ক'ভাই বোন? কি পড়? কিন্তু তার সামনে যিনি বসে আছেন তিনি সম্পূর্ণ অন্য রকম মহিলা। রেডক্রস লাগানো কালো একটি মরিস মাইনর গাড়ি নিজে চালিয়ে নিয়ে এসেছেন। মহিলাদের গাড়ি চালানো এমন কিছু অদ্ভুত ব্যাপার নয়। অনেকেই চালাচ্ছে। নাসিমাও চালায়, কিন্তু এই সময়ে একজন একা একা গাড়ি করে যাওয়া আসা করে না।

ভদ্রমহিলা বেশ লম্বা। মাথার চুল কাঁচাপাকা। মুখটি কঠিন হলেও চোখ দুটি হাসি হাসি। অসম্ভব আত্মবিশ্বাসী একজন মহিলা। রাত্রিকে দেখে প্রথম যে কথাটি বললেন তা হচ্ছে, 'তোমার ইন্টারভ্যু নিতে এলাম মা।' রাত্রি হকচকিয়ে গেল।

ঃ প্রথমে নিজের পরিচয় দিয়ে নিই। আমি একজন ডাক্তার, মেডিকেল কলেজে গাইনির এসোসিয়েট প্রফেসর। আমার নাম রাবেয়া। তোমার ভাল নামটি কি?

ঃ ফারজানা।

ঃ তুমি বস এবং বল এত সুন্দর তুমি কি ভাবে হলে? এটা আমার প্রথম প্রশ্ন। খুব কঠিন প্রশ্ন।

ভদ্রমহিলা হাসতে লাগলেন। রাত্রি কি বলবে ভেবে পেল না।

ঃ হঠাৎ করে কেউ সুন্দর হয় না। এর পেছনে জেনেটিক কারণ থাকে। মনের সৌন্দর্য একজন নিজে নিজে ডেভেলপ করতে পারে কিন্তু দেহের সৌন্দর্য উত্তরাধিকার সূত্রে পেতে হয়। বল, তোমার মা এবং বাবা এদের দু'জনের মধ্যে কে সুন্দর?

ঃ মা।

ঃ শোন রাত্রি, তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে। তা কিছুই মিন করে না। তোমার পছন্দ অপছন্দ আছে। এবং আমার মনে হচ্ছে তুমি খুব খুঁতখুঁতে ধরনের মেয়ে। আমি কি ঠিক বলেছি?

ঃ ঠিকই বলেছেন।

ভদ্রমহিলা চা খেলেন। অপালার সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করলেন এবং এক পর্যায়ে একটি হাসির গল্প বললেন। হাসির গল্পটি একটি ব্যাঙ নিয়ে। পরপর কয়েকদিন বৃষ্টি হওয়ায় ব্যাঙটির সর্দি হয়ে গেছে। ব্যাঙ সমাজে ছি ছি পড়ে গেছে। বেশ লম্বা গল্প। অপালা মুগ্ধ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর পর হাসিতে ভেঙে পড়তে লাগল।

ভদ্রমহিলা এসেই বলেছিলেন আধঘন্টা থাকবেন। কিন্তু তিনি পুরোপুরি তিন ঘন্টা থাকলেন। দুপুরের খাবার খেলেন। খাবার শেষ করে রাত্রিকে বারান্দায় ডেকে নিয়ে গেলেন। অস্বাভাবিক নরম গলায়

AMARBOI.COM

বললেন, 'মা, তোমাকে কি আমি আমার ছেলে সম্পর্কে দু'একটি কথা বলতে পারি ?'

রাত্রি লজ্জিত স্বরে বলল, 'বলুন।'

ঃ তার সবচে দুর্বল দিকটির কথা আগে বলি। ওর থিংকিং প্রসেসটা একটু স্লো বলে আমার মনে হয়। যখন কেউ কোনো হাসির কথা বলে তখন সে প্রায়ই বুঝতে পারে না। বোকা মানুষদের মত বলে—ঠিক বুঝতে পারলাম না।

রাত্রি অবাক হয়ে ভদ্রমহিলার দিকে তাকিয়ে রইল। তিনি এই কথাটি বলবেন, তা বোধ হয় সে ভাবে নি।

ঃ এখন বলি ওর সবচে সবল দিকটির কথা। পুরোনো দিনের গল্প উপন্যাসে এক ধরনের নায়ক আছে যারা জীবনে কোনো পরীক্ষাতে সেকেণ্ড হয় না। ও সে রকম একটি ছেলে। মা, আমি খুব খুশি হব তুমি যদি খানিকক্ষণ ওর সঙ্গে কথা বল। আমার ধারণা কিছুক্ষণ কথা বললেই তোমার ওকে পছন্দ হবে। অবশ্যি ও কথা বলবে কি না জানি না। যা লাজুক ছেলে।

ছেলেটিকে না দেখেই রাত্রির কেমন যেন পছন্দ হল। কথা বলতে ইচ্ছে হল। তার একটু লজ্জা লজ্জাও লাগছে। ভদ্রমহিলা বললেন, 'মা তুমি কি ওর সঙ্গে কথা বলবে?'

ঃ হ্যাঁ বলব।

ঃ থ্যাংকয়্যু। যাই কেমন?

যাই বলার পরও তিনি আরো কিছুক্ষণ থাকলেন। নাসিমার সঙ্গে গল্প করলেন। অপালাকে আরো একটি হাসির গল্প বললেন। সেই গল্পটি তেমন জমল না। অপালা গম্ভীর হয়ে রইল।

ওরা মডার্ন নিওন সাইন থেকে বেরুল দুপুর দুটোয়। রহমানকে রেখে যেতে হলো কারণ তার উঠে দাঁড়াবার সামর্থ্য নেই। আলম চেয়েছিল রহমানকে তার আগের জায়গায় রেখে আসতে। দলের সবাই আপত্তি করল। নাড়াচাড়া করার কোনো দরকার নেই। এখানে বিশ্রাম করুক। আশফাক বলল, 'জহুর মিয়া আছে—সে দেখাশোনা করবে। দরকার হলে চেনা একজন ডাক্তার আছে, তাকে নিয়ে আসবে।'

আলম গম্ভীর হয়ে রইল। রহমানকে বাদ দিয়ে আজকের অপারেশন শুরু করতে তার মন চাইছে না। এবং কেন যেন জায়গাটাকে তার নিরাপদ মনে হচ্ছে না। সারাক্ষণই মনে হচ্ছে কিছু একটা হবে।

AMARBOI.COM

এ রকম মনে হবার তেমন কোনো কারণ নেই। এই শহরে মিলিটারিরা নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করছে। এরা এখানে শঙ্কিত নয়। আলাদাভাবে কোন বাড়ি-ঘরের দিকে নজর দেবে না। নজর দেবার কথাও নয়।

সাদেক বলল, 'আলম তুই এত গম্ভীর কেন? ভয় পাচ্ছিস নাকি?

আলম বলল, 'বেরিয়ে পড়া যাক।'

তারা উঠে দাঁড়াল। আশফাককে নিয়ে ছ'জনের একটি দল। আলম বলল, 'রহমান চললাম।' রহমান উত্তর দিল না। তাকিয়ে রইল। তার জ্বর নিশ্চয়ই বেড়েছে। চোখ ঘোলাটে। জ্বরের জন্যে মুখ লাল হয়ে আছে।

তারা রাস্তায় বেরুতেই একটি মিলিশিয়াদের ট্রাক চলে গেল। মিলিশিয়ারা ভাবলেশহীন মুখে তাকিয়ে আছে। মনে হয় অল্প কিছুদিন হলো এ দেশে এসেছে। নতুন পরিবেশে নতুন ধরনের জীবনযাত্রায় এখনো অভ্যস্ত হয়ে ওঠে নি।

সাদেক বলল, 'রওনা হবার আগে পান খেলে কেমন হয়? কেউ পান খাবে?'

জবাব পাওয়া গেল না। সাদেক লম্বা লম্বা পা ফেলে পান কিনতে গেল। নুরু বলল, 'সাদেক ভাইয়ের খুব ফুর্তি লাগছে মনে হয়। হাসতে হাসতে কেমন গল্প জমিয়েছেন দেখেন।'

সাদেক সত্যি সত্যি হাত পা নেড়ে কি সব বলছে। সিগারেট কিনে শিস দিতে দিতে আসছে। এই ফুর্তির ভাবটা কতটুকু আন্তরিক? বোঝার উপায় নেই। ফুর্তির ব্যাপারটা কারো কারো চরিত্রের মধ্যেই থাকে। হয়ত সাদেকেরও আছে।

আলম আকাশের দিকে তাকাল। নির্মেঘ আকাশ। ঘন নীল বর্ণ। বর্ষাকালের আকাশ এত নীল হয় না। আজ এত নীল কেন?

ভদ্রলোকের পরনে হাফ হাওয়াই সার্ট। বয়স খুব বেশি হলে পঁয়ত্রিশ হবে। কালো ফ্রেমের ভারী চশমার জন্যে বয়স কিছু বেশি মনে হচ্ছে। বেশ লম্বা, হাঁটছেন মাথা নিচু করে। তাঁর ডান হাতে একটি প্যাকেট। বাঁ হাত ধরে একটি মেয়ে হাঁটছে—তার বয়স পাঁচ ছ' বছর। ভারী

AMARBOI.COM

মিষ্টি চেহারা। তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। ছোট মেয়েটি ক্রমাগত কথা বলছে। ভদ্রলোক তার কোনো কথার জবাব দিচ্ছেন না। ভদ্রলোকের কম কথা বলার স্বভাবের সঙ্গে মেয়েটি পরিচিত। তাদের গাড়িটি বেশ খানিকটা দূরে পার্ক করা। তারা ছোট ছোট পা ফেলে গাড়ির দিকে যাচ্ছে।

জায়গাটা বায়তুল মুকাররম। সময় তিনটা পাঁচ।

ভদ্রলোকের গাড়িটি নতুন। সাদা রঙের টয়োটা করোলা। ফোর ডোর। রাস্তার বাঁয়ে দৈনিক পাকিস্তানের দিকে মুখ ফিরিয়ে প্যারালাল পার্ক করা। গাড়িটির কাছে পৌঁছতে হলে রাস্তা পার হতে হয়।

তিনি সাবধানে রাস্তা পার হলেন। লক্ষ্য করলেন তাঁর সঙ্গে দুটি ছেলেও রাস্তা পার হলো। এরা বারবার তাকাচ্ছে তাঁর দিকে। ভদ্রলোক একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। এই ছেলে দুটি অনেকক্ষণ ধরেই আছে তাঁর সঙ্গে, ব্যাপার কি? তিনি গাড়ির হাতলে হাত রাখামাত্র চশমা পরা লম্বা ছেলেটি এগিয়ে এল।

ঃ আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

ঃ আমার সঙ্গে কি কথা? আমি আপনাকে চিনি না।

ভদ্রলোক গাড়ির দরজা খুললেন। ছেলেটি শীতল কণ্ঠে বলল, 'গাড়িতে উঠবেন না। আপনার গাড়িটি দরকার। চিৎকার চেঁচামেচি কিছু করবেন না। যেভাবে দাঁড়িয়ে আছেন, সেভাবে দাঁড়িয়ে থাকুন।'

ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে রইলেন। ছোট মেয়েটি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। লম্বা ছেলেটি বলল, 'আমরা মুক্তিযোদ্ধার একটি গেরিলা ইউনিট, কিছুক্ষণের ভেতর ঢাকা শহরে অপারেশন চালাব। আপনার গাড়িটা দরকার। চাবি দিয়ে দিন।'

ভদ্রলোক চাবি তুলে দিলেন।

ঃ গাড়িতে কোনো সমস্যা নেই তো? ভাল চলে?

ঃ নতুন গাড়ি, খুবই ভাল চলে। তেল নেই। আপনাদের তেল নিতে হবে।

ঃ নিয়ে নেব।

ঃ তেল কেনবার টাকা আছে তো? টাকা না থাকলে আমার কাছ থেকে নিতে পারেন।

ঃ টাকা আছে।

ভদ্রলোক হাসছেন। তিনি তাঁর মেয়ের হাতে মৃদু চাপ দিয়ে মেয়েকে আশ্বস্ত করলেন। নরম স্বরে বললেন, 'মা, এঁদের স্লামালিকুম দাও।'

AMARBOI.COM

মেয়েটি চুপ করে রইল। তার চোখে স্পষ্ট ভয়। সে অল্প অল্প কাঁপছে।

ঃ আপনি এখন থেকে ঠিক দু'ঘন্টা পর থানায় ডায়রি করাবেন যে আপনার গাড়িটি চুরি হয়েছে। এর আগে কিছুই করবেন না।

ভদ্রলোক মাথা ঝাঁকালেন এবং হাত বাড়িয়ে দিলেন। ভদ্রলোকের হাত মেয়েদের হাতের মত কোমল।

ঃ আমার নাম ফারুক চৌধুরী। আমি একজন ডাক্তার। এ তৃণা, আমার বড় মেয়ে। আজ ওর জন্মদিন। আমরা কেক কিনতে এসেছিলাম।

লম্বা ছেলেটি বলল, 'আমার নাম আলম, বদিউল আলম। শুভ জন্মদিন তৃণা।'

আলম গাড়িতে উঠে দরজা লাগিয়ে দিল। গাড়ি চালাবে গৌরাঙ্গ। আলম বসেছে গৌরাঙ্গের পাশে। পেছনের সীটে সাদেক এবং নুরু।

আশফাকের গাড়িতে থাকবে শুধু নাজমুল। বেশি মানুষের সেখানে থাকার দরকার নেই। এটি হচ্ছে কভার দেবার গাড়ি। একটি সেলফ লোডিং রাইফেল হাতে নাজমুল একাই যথেষ্ট। সে মহা ওস্তাদ ছেলে। উৎসাহ একটু বেশি। তবে সেই বাড়তি উৎসাহের জন্যে এখন পর্যন্ত কাউকে বিপদে পড়তে হয়নি। আজও বিপদে পড়তে হবে না।

দুটি গাড়ি মগবাজার এলাকার দিকে চলল। আশফাকের গাড়িটিতে অস্ত্রশস্ত্র আছে। তার কিছু কিছু সামনের টয়োটায় তুলতে হবে।

রহমান ও সাদেকের হাতে থাকবে স্টেইনগান। ক্লোজ রেঞ্জ উইপন। ঠিকমত ব্যবহার করতে পারলে এটি একটি চমৎকার অস্ত্র। গেরিলাদের জন্যে আদর্শ। ছোট এবং হালকা। নুরুর দায়িত্বে এক বাক্স গ্রেনেড। নুরু হচ্ছে গ্রেনেড যাদুকর। নিশানা, ছোঁড়বার কায়দা, টাইমিং কোথাও কোন খুঁত নেই। অথচ এই ছেলে মহা বিপদ ঘটাতে যাচ্ছিল।

ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সার্জেন্ট মেজর, ময়না মিয়া গ্রেনেড ছোঁড়বার ট্রেনিং দিচ্ছেন। পরিষ্কার করে সব বুঝিয়ে দিলেন—

'পিনটা খোলবার পর হাতে সময় হচ্ছে সাত সেকেণ্ড। খেয়াল রাখবেন সাত সেকেণ্ড। মনে হচ্ছে খুব কম সময়। আসলে অনেক বেশি সময়। সাত সেকেণ্ডে অনেক কিছু করা যায়। ব্রাদারস, খেয়াল রাখবেন সাত সেকেণ্ড অনেক সময়। পিন খুলে নেবার পর যদি শুধু চিন্তা করতে থাকেন এই বুঝি ফাটল, এই বুঝি ফাটল তাহলে মুশকিল।

AMARBOI.COM

মনের ভয়ে তাড়াহুড়ো করবেন। নিশানা ঠিক হবে না। খেয়াল রাখবেন সাত সেকেণ্ড অনেক সময়। অনেক সময়।'

নুরুকে গ্রেনেড দিয়ে পাঠানো হল। ছোঁড়বার ট্রেনিং হবে। নুরু ঠিকমতই গ্রেনেডের পিন দাঁত দিয়ে খুলল। তারপর সে আর ছুঁড়ে মারছে না। হাতে নিয়ে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। ময়না মিয়া চেঁচাল "ছুঁড়ে মারেন, ছুঁড়ে মারেন। দাঁড়িয়ে আছেন কেন?" নুরু কাঁপা গলায় বলল, 'আমার হাত শক্ত হয়ে গেছে, ছুঁড়তে পারছি না।' নুরুর মুখ রক্তশূন্য।

বিদ্যুতের গতিতে ছুটে গেলেন ময়না মিয়া। গ্রেনেড কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে মারবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হল। ময়না মিয়া নুরুকে নিয়ে মাটিতে শোবারও সময় পেলেন না। সৌভাগ্যক্রমে কারো কিছু হলো না। ময়না মিয়া ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'নুরু ভাই আরেকটা গ্রেনেড ছোঁড়েন। এখন আমি আছি আপনার কাছে।' নুরু বলল, 'আমি পারব না।' ময়না মিয়া প্রচণ্ড একটা চড় কষালেন। তারপর বললেন, 'যা বলছি করেন।'

নুরু গ্রেনেড ছুঁড়ল। সার্জেন্ট মেজর ময়না মিয়া বললেন, 'নুরু ভাই হবেন গ্রেনেড মারায় এক নম্বর।'

ময়না মিয়ার কথা সত্যি হয়েছে। ময়না মিয়া তা দেখে যেতে পারেন নি। মান্দার অপারেশনে মারা গেছেন।

আলম ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলল। ময়না মিয়ার কথা মনে হলেই মন দ্রবীভূত হয়ে যায়, বুক হু হু করে। দেশ স্বাধীন হবার আগেই কি দেশের বীর পুত্রদের সবাই শেষ হয়ে যাবে?

ঃ আলম।

ঃ বল।

ঃ গাড়ি কোথাও রাখতে হবে, আমার পেচ্ছাব করতে হবে। কিডনী প্রেসার দিচ্ছে। একটা নর্দমার কাছে গাড়িটা থামা তো গৌরাঙ্গ।

গৌরাঙ্গ গাড়ি থামাল।

গাড়ি এগুচ্ছে খুব ধীরে। যেন কোনো রকম তাড়া নেই। গৌরাঙ্গ পেছনের পিক আপটির দিকে লক্ষ্য রাখতে চেষ্টা করছে। ব্যাক মিররটা ভাল না। বাঁকা হয়ে আছে। পেছনে কে আসছে দেখার জন্যে ঘাড় বাঁকা করতে হয়। আলমের মনে হল গৌরাঙ্গ বেশ নার্ভাস।

AMARBOI.COM

গৌরাঙ্গ।

ঃ বলেন।

ঃ পেছনের দিকে লক্ষ্য রাখার তোমার কোনো দরকার নেই, তুমি চালিয়ে যাও।

ঃ জি আচ্ছা।

ঃ এত আস্তে না। আরেকটু স্পীডে চালাও। রিকশা তোমাকে ওভারটেক করছে।

গৌরাঙ্গ মুহূর্তে স্পীড বাড়িয়ে দিল। তার এতটা নার্ভাস হবার কারণ কি? আলম পরিবেশ হালকা করার জন্যে বলল 'সেন্ট মেখেছ নাকি গৌরাঙ্গ? গন্ধ আসছে। কড়া গন্ধ।'

গৌরাঙ্গ লজ্জিত স্বরে বলল, 'সেন্ট না। আফটার শেভ দিয়েছি।'

ঃ দাড়ি গোঁফ গজাচ্ছে না, আফটার শেভ কেন?

সবাই হেসে উঠল। গৌরাঙ্গও হাসল। পরিবেশ হালকা করার একটা সচেতন প্রচেষ্টা। সবার ভাবভঙ্গি এ রকম যে বেড়াতে যাচ্ছে। আলগা একটা ফুর্তির ভাব। কিন্তু বাতাসে উত্তেজনা। রক্তে কিছু একটা নাচছে। প্রচুর পরিমাণে এড্রোনিন চলে এসেছে পিটুইটারী গ্লান্ড থেকে। সবার নিঃশ্বাস ভারী। চোখের মণি তীক্ষ্ম। গৌরাঙ্গের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। সে সিগারেট ধরাল। স্টিয়ারিং হুইলে হাত রেখে সিগারেট ধরানোর কৌশলটি চমৎকার। আলম তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। তামাকের গন্ধ ভাল লাগছে না। গা গোলাচ্ছে। আলম একবার ভাবল বলে—সিগারেট ফেলে দাও গৌরাঙ্গ। বলা হলো না।

সাদেক পেছনের সীটে গা এলিয়ে দিয়েছে। তার চোখ বন্ধ। সে বলল, 'আমি একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছি। সময় হলে জাগিয়ে দিও।' রসিকতার একটা চেষ্টা। স্থূল ধরনের চেষ্টা। কিন্তু কাজ দিয়েছে। নুরু এবং গৌরাঙ্গ দাঁত বের করে হাসছে। সাদেক এই হাসিতে আরো উৎসাহিত হল। নাক ডাকার মত শব্দ করতে লাগল।

গাড়ি নিউ মার্কেটের সামনে দিয়ে সোজা ঢুকল মীরপুর রোডে। লালমাটিয়ার কাছাকাছি এসে ডানদিকে টার্ন নিয়ে চলে যাবে ফার্মগেট। সেখানে থেকে হোটেল ইন্টারকন। কাগজে কলমে কত সহজ। বাস্তব অন্য জিনিস। বাস্তবে অদ্ভুত অদ্ভুত সব সমস্যা হয়। মিশাখালিতে যে রকম হল। খবর পাওয়া গেল দশজন রাজাকার নিয়ে তিনজন মিলিটারির একটা দল সুলেমান মিয়ার ঘরে এসে বসে আছে, ডাব খাচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যে সাদেক দলবল নিয়ে রওনা হয়ে গেল। দু' তিনটা গুলি

AMARBOI.COM

ছুঁড়লেই রাজাকাররা তাদের পাকিস্তানী বন্ধুদের ফেলে পালিয়ে যাবে। অতীতে সব সময়ই এ রকম হয়েছে, কিন্তু সেবার হয়নি। সুলেমান মিয়ার ঘরে যারা বসেছিল তারা সবাই পাঞ্জাব রেজিমেন্টের একটি কমাণ্ডো ইউনিট। গ্রামে ঢুকেছে গানবোট নিয়ে। সাদেক মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছে। যাদের নিয়ে গিয়েছিল তাদের সবাইকে প্রায় রেখে আসতে হয়েছিল। ভয়াবহ অবস্থা।

নাজমুল বলল, আপনার ভয় লাগছে নাকি আশফাক সাহেব?

আশফাক ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'আমার এত ভয় নেই।'

ঃ এ্যাকশন কখনো দেখেন নি, এইজন্যে ভয় নেই। একবার দেখলে বুকের রক্ত পানি হয়ে যায়। খুব খারাপ জিনিস।

আশফাক ব্রেকে পা দিল। সামনে একটা ঝামেলা হয়েছে। এ্যাক-সিডেন্ট হয়েছে বোধ হয়। একটা ঠেলাগাড়ি উল্টে পড়ে আছে। তার পাশে হেডলাইট ভাঙা একটা সবুজ রঙের জীপ। প্রচুর লোকজন এদের ঘিরে আছে। আশফাক ভিড় কমবার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। ভিড় কমছে না। একজন ট্রাফিক পুলিশ মেয়েদের মত মিনমিনে গলায় কি সব বলছে, কেউ তার কথা শুনছে না। নাজমুল বিরক্ত স্বরে বলল—ঝামেলা হয়ে গেল দেখি।

আশফাক নির্বিকার। যেন কিছুই হয়নি। সে জানালা দিয়ে মাথা বের করে ব্যাপারটা দেখবার চেষ্টা করছে। মনে হচ্ছে সে এই ঝামেলা-টায় বেশ মজা পাচ্ছে। কত অদ্ভুত মানুষ থাকে।

ভিড় চট করে কেটে যেতে শুরু করেছে। কারণ হচ্ছে ইপিআর এক নম্বর গেট থেকে একটি সাদা রঙের জীপ বাঁশি বাজাতে বাজাতে আসছে।

গৌরাঙ্গ একসিলেটরে পা দিল। নূরু বলল, 'যাত্রা শুভ না আলম ভাই। যাত্রা খারাপ।'

এ ধরনের কথাবার্তা খুবই আপত্তিজনক। মনের ওপর বাড়তি চাপ পড়ে। এই মুহূর্তে আর কোনো বাড়তি চাপের প্রয়োজন নেই। আলম ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'শুভ কাজের জন্যে যে যাত্রা তা সব সময়ই শুভ।' গৌরাঙ্গ স্পীড বাড়িয়ে দিয়েছে। হু হু করে হাওয়া আসছে জানালা দিয়ে। লালমাটিয়ার কাছাকাছি আসতেই আবার ব্রেকে পা দিতে হলো।

AMARBOI.COM

গৌরাঙ্গ শুকনো গলায় বলল, 'আলম ভাই, কি করব বলেন। ছুটে বেড়িয়ে যাব ?'

ঃ না, গাড়ি থামাও।

ঃ ভাল করে ভেবে বলেন।

ঃ গাড়ি থামাও। সবাই তৈরি থাক।

গাড়ি রাস্তার পাশে এসে থামল। আশফাকও তার পিক আপ থামিয়েছে।

তাদের সামনে দুটি গাড়ি থেমে আছে। একটি ত্রিপল ঢাকা ট্রাক, অন্যটি ভোক্সওয়াগন। মুখ কালো করে কয়েকজন লোক গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে আছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে এরা ভয়ে অস্থির।

যারা গাড়ি থামাচ্ছে তারা মিলিটারি পুলিশ। একেকটা গাড়ি আসছে—হুইসেল দিয়ে হাত ইশারা করছে। গাড়ি থামা মাত্র এগিয়ে যাচ্ছে—কাগজপত্র নিয়ে আসছে।

সংখ্যায় তারা চার জন। ভাল ব্যাপার হচ্ছে, এই চারজনই দাঁড়িয়ে আছে কাছাকাছি। ছড়িয়ে ছিটিয়ে নেই। ওদের একজনের সঙ্গে রিভালবার ছাড়া অন্য কিছু নেই। বাকি তিনজনের সঙ্গে আছে চাই-নীজ রাইফেল।

AMARBOI.COM

আলম বলল, 'সাদেক তুই একা আমার সঙ্গে নামবি। অন্য কেউ না।'

ঃ গৌরাঙ্গ।

ঃ বলুন।

ঃ সিগারেটটা এখন ফেলে দাও।

গৌরাঙ্গ সিগারেট ফেলে দিল। আলম জানালা দিয়ে মুখ বের করে হাত ইশারা করে ওদের ডাকল। মিলিটারি পুলিশের দলটি ক্রুদ্ধ ও অবাক হয়ে দৃশ্যটি দেখল। হাত ইশারা করে ওদের ডাকার স্পর্ধা এখনো কারোর আছে তা তাদের কল্পনাতেও নেই। একজন এগিয়ে আসছে, অন্য তিনজন দাঁড়িয়ে আছে।

আলম নামল খুব সহজ ও স্বাভাবিক ভঙ্গিতে। তার পেছনে নামল সাদেক। সাদেকের মুখ ভর্তি হাসি।

ওরা বুঝতে পারল না, এই ছেলে দুটি ভয়াবহ অস্ত্র নিয়ে নেমেছে। এদের স্নায়ু ইস্পাতের মত।

প্রচণ্ড শব্দ হলো গুলির। একটি গুলি নয়। এক ঝাঁক গুলি। ফাঁকা জায়গায় এত শব্দ হবার কথা নয়, কিন্তু হলো। চারজনই গড়িয়ে পড়েছে। এখনো রক্ত বেরুতে শুরু করেনি। ওদের মুখে আতঙ্ক ও বিস্ময়।

নাজমুল নেমে পড়েছে। তার হাতে এস এল আর। আলম বলল, গাড়িতে ওঠ নাজমুল। নেমেছ কেন?'

দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলো একটা ঘোরের মধ্যে আছে, কি হয়ে গেল তারা এখনো বুঝতে পারছে না। সাদেক বলল, 'আপনারা দাঁড়িয়ে থাকবেন না, তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে যান।' লোকগুলোর একজন শব্দ করে কাঁদছে। কি জন্যে কাঁদছে কে জানে। এখানে তার কাঁদবার কি হলো?

এখানকার ঘটনা প্রচার হতে সময় লাগবে। তারা ফার্মগেটে পৌঁছে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই। অবশ্যি গুলির শব্দ ওরা হয়ত পেয়েছে। এতে তেমন কোনো অসুবিধে হবার কথা নয়। এই শহরে গেরিলারা এসেছে এটা ওদের কল্পনাতেও নেই।

গাড়ি চলা শুরু করতেই সাদেক বলল, 'আমার বাথরুম পেয়ে গেছে। কেউ কোনো উত্তর দিল না। সাদেক আবার বলল, 'ডায়াবেটিস হয়ে গেল নাকি?' এই কথারও কোনো জবাব পাওয়া গেল না।

গৌরাঙ্গ আবার একটি সিগারেট ধরিয়েছে। তার ফর্সা আঙুল অল্প অল্প কাঁপছে। আলম বলল, 'ভয় লাগছে গৌরাঙ্গ?'

গৌরাঙ্গ সত্যি কথা বলল।

ঃ হ্যাঁ লাগছে। বেশ ভয় লাগছে।

আলম তাকাল পেছনে। সাদেক চোখ বন্ধ করে পড়ে আছে। স্টেইন-গানটি তার কোলে। কেমন খেলনার মত লাগছে। নুরু বসে আছে শক্ত মুখে। আলমের দিকে চোখ পড়তেই সে বলল, 'কিছু বলবেন আলম ভাই?'

ঃ না, কিছু বলব না।

ঃ সিগারেট ধরাবেন একটা?

ঃ না।

ঠিক এই মুহূর্তে কিছুই বলার নেই। কিছুই করার নেই। এটা হচ্ছে প্রতীক্ষার সময়। আলম লক্ষ্য করল বারবার তার মুখে থু থু জমা হচ্ছে। কেন এ রকম হচ্ছে? তার কি ভয় লাগছে? তার সঙ্গে আছে চমৎকার একটি দল। এরা প্রথম শ্রেণীর কমাণ্ডো ট্রেনিং পাওয়া দল। এদের সঙ্গে নিয়ে যে কোনো পরিস্থিতি সামলে দেয়া যায়। কোনো রকম ভয় তার থাকা উচিত নয়। কিন্তু আছে। ভালই আছে। নয়ত বার বার মুখে থুথু জমতো না। সেই আদিম ভয়, যা যুক্তি মানে না। মনের কোনো এক গহীন অন্ধকার থেকে বেড়ালের মত নিঃশব্দে বের হয়ে আসে এবং দেখতে দেখতে ফুলে ফেঁপে বিশাল হয়ে ওঠে।

AMARBOI.COM

গাড়ির বেগ কমে আসছে। গৌরাঙ্গের চোখ-মুখ শক্ত। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। আলম ডাকল, 'সাদেক সাদেক।' সাদেক ভারী গলায় বলল, 'আমি আছি।' গৌরাঙ্গ বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলছে। আলমের কেমন বমি বমি ভাব হচ্ছে। তার জানতে ইচ্ছে করছে অন্যদেরও তার মত হচ্ছে কি না। কিন্তু জানার সময় নেই। গাড়ি থেমে আছে। মিলিটারিদের তাঁবু দশ পনেরো গজ দূরে।

দরজা খুলে তিনজনই লাফিয়ে নামল। নাজমুল তখনো নামেনি।

পাঞ্জাব রেজিমেন্টের কুড়ি জনের একটি ইউনিট ছিল ফার্মগেটে। তাদের দলপতি সুবাদার মেজর মাবুদ খাঁ। এই দলটিকে এখানে রাখার উদ্দেশ্য মাবুদ খাঁর কাছে পরিষ্কার নয়। এদের ওপর তেমন কোনো ডিউটি নেই। মাঝে মাঝে রোড ব্লক করে যে চেকিং হয়, তা করে এম পিরা। ওদের সঙ্গে ইদানীং যোগ দিয়েছে মিলিশিয়ারা।

তাঁবুর ভেতরটা বেশ গরম কিন্তু তা সত্ত্বেও বেশির ভাগ সৈন্যই ঘুমচ্ছিল বা ঘুমের ভঙ্গিতে শুয়েছিল—যদিও এটা ঘুমবার সময় নয়। কিছুক্ষণের ভেতরই বৈকালিক চা আসবে। চা আসতে আজ দেরি হচ্ছে। কেন দেরি হচ্ছে কে জানে।

মাবুদ খাঁ তাঁবুর বাইরে চেয়ারে বসে ছিল। শুধু শুধু বসে থাকা যায় না। কিন্তু তাকিয়ে থাকা ছাড়া তার কোনো কাজ নেই। তাঁবুর ভেতর হৈ চৈ হচ্ছে। তাস খেলা হচ্ছে সম্ভবত। এই খেলাটি তার অপছন্দ। সে মুখ বিকৃত করল এবং ঠিক তখনই সে লক্ষ্য করল তিনটি ছেলে দৌড়ে আসছে। দীর্ঘদিনের সামরিক ট্রেনিং তার পেছনে। তার বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হলো না যে ছেলে তিনটি কেন ছুটে আসছে। সে মুগ্ধ হলো এদের অর্বাচীন সাহসে। কিছু একটা বলল চিৎকার করে। সেটা শোনা গেল না। কারণ আকাশ কাঁপিয়ে একটা বিস্ফোরণ হয়েছে।

চিৎকার, হৈ, চৈ, আতঙ্কগ্রস্ত মানুষদের ছোটাছুটি। সব কিছু ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে গুলির শব্দ। ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি এসে পড়ছে।

নূরু শান্ত। সে দুটি গ্রেনেড পরপর ছুঁড়েছে। এখন তার করবার কিছু নেই। সে দাঁড়িয়ে আছে মূর্তির মত। চোখের সামনে যা ঘটছে তা ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। আলম ভাই দ্বিতীয় ম্যাগাজিনটি ফিট করছেন। কিন্তু তার প্রয়োজন নেই। এখন উচিত দ্রুত পালিয়ে যাওয়া। যে

AMARBOI.COM

বিকট বিস্ফোরণ হয়েছে, অর্ধেক শহর নিশ্চয়ই কেঁপে উঠেছে। এয়ারপোর্ট থেকে টহলদারী জীপ নিশ্চয়ই বেরিয়ে পড়েছে।

গৌরাঙ্গ ক্রমাগত হর্ণ দিচ্ছে। তার মুখ রক্তশূন্য।

নূরু চেঁচিয়ে বলল, 'আলম ভাই গাড়িতে ওঠেন।'

একটি সরকারী বাস যাত্রী নিয়ে হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়েছে। ড্রাইভার বাস থামিয়ে হতভম্ব হয়ে তার সীটে বসে আছে। বাসটি এমনভাবে সে রেখেছে যে গৌরাঙ্গ তার গাড়ি বের করতে পারছে না। সাদেক এগিয়ে গেল, তার হাতে স্টেইনগান। বাস ড্রাইভারকে আশ্চর্য রকম নরম গলায় বলল, 'ড্রাইভার সাহেব গাড়িটা সরিয়ে নিন। আমাদের আরো কাজ আছে।'

হতভম্ব ড্রাইভার মুহূর্তে তার গাড়ি নিয়ে গেল থার্ড গিয়ারে।

ঘন্টার শব্দ আসছে। দমকল নাকি?

ওরা গাড়িতে উঠে বসল। গৌরাঙ্গ গাড়িটিকে প্রায় উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আলম বলল, 'আস্তে যাও। আস্তে। কোনো ভয় নেই।'

গাড়ি যাচ্ছে ইন্টারকনের দিকে। এই প্রোগ্রামটিতে কোনো ঝামেলা নেই। কেউ গাড়ি থেকে নামবে না। ছুটে যেতে যেতে কয়েকটি গ্রেনেড ছোঁড়া হবে। হোটেলের বিদেশী সাংবাদিকরা জানবে ঢাকার অবস্থা স্বাভাবিক নয়। আলমের মনে হলো বড় রকমের ঝামেলা হয়ত ইন্টারকনের সামনেই অপেক্ষা করছে। যেখানে কোনো ঝামেলা হবে না মনে করা হয় সেখানেই ঝামেলা দেখা দেয়। আলম বলল—

: স্পীড কমাও গৌরাঙ্গ। করছ কি তুমি! মারবে নাকি?

গৌরাঙ্গ স্পীড কমাল। সাদেক বলল, 'প্রচণ্ড বাথরুম পেয়ে গেছে, কি করা যায় বল তো আলম?'

আলম জবাব দিল না। ইন্টারকন এসে পড়েছে। আলমের নিঃশ্বাস ভারী হয়ে এল। আবার মুখে থুথু জমেছে। গা গোলাচ্ছে।

ছ'টায় কার্ফু শুরু হবে।

রাত্রি সাড়ে পাঁচটায় উদ্বিগ্ন হয়ে ফোন করল। ফোন ধরলেন সুরমা। তিনি বুঝতে পারছেন রাত্রির গলা কাঁপছে। অনেক চেষ্টা করেও সে তার উদ্বেগ চেপে রাখতে পারছে না।

AMARBOI.COM

তিনি নরম গলায় বললেন, কি হয়েছে রাত্রি?'

ঃ কিছু হয়নি মা। তুমি কি খবর শুনেছ?

ঃ না। কি খবর?

ঃ টেলিফোনে বলা যাবে না। দারুণ সব কাণ্ড হয়েছে মীরপুর রোডে। ফার্মগেটে। কিচ্ছু জান না?

ঃ না। জানি না।

ঃ আমরা বাড়ি আসবার জন্যে গাড়ি বের করেছিলাম। ওরা আসতে দেয়নি। রোড ব্লক করেছে। মা শোন—

ঃ শুনছি।

ঃ উনি কি এসেছেন?

ঃ না।

ঃ বল কি মা!

সুরমা চুপ করে রইলেন। রাত্রি টেলিফোন ধরে রেখেছে। যেন সে আরো কিছু শুনতে চায়। সুরমা বললেন, 'তোর বাবার সঙ্গে কথা বলবি?'

ঃ না। মা শোন, উনি এলেই তুমি টেলিফোন করবে।

সুরমা জবাব দিলেন না।

ঃ মা।

ঃ বল শুনছি।

ঃ উনি এলেই টেলিফোন করবে। আমার খুব খারাপ লাগছে মা। আমার কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে।

সুরমার মনে হল উনি কান্নার শব্দ শুনলেন। তাঁর হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল। কেন রাত্রি কাঁদছে? এই বয়েসী একটি মেয়ে যদি কোনো পুরুষের কথা ভেবে কাঁদে তার ফল শুভ হয় না।

বিয়ের আগে তিনি নিজেও একটি ছেলের জন্যে কাঁদতেন। তার ফল শুভ হয়নি। যদিও সেই ছেলেটির কথা তিনি একবারও ভাবেন না। তবু কোথাও যেন একটা শূন্যতা অনুভব করেন। ছেলেটি তাঁর হৃদয়ের একটি অংশ খালি করে গেছে। সেখানে কোন স্মৃতি নেই। স্বপ্ন নেই। প্রগাঢ় শূন্যতা।

সুরমা টেলিফোন নামিয়ে বসার ঘরে ঢোকবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আলম এল। তার চোখ লাল। দৃষ্টি এলোমেলো। সে সুরমার দিকে তাকিয়ে অল্প হাসল। সুরমা বললেন, 'তুমি ভাল আছ তো?'

ঃ জ্বি।

AMARBOI.COM

ঃ সবাই ভাল আছে ?

ঃ হ্যাঁ। আপনি কি আমাকে একটু গরম পানি করে দিতে পারবেন ? গরম পানি দিয়ে গোসল করব।

আলম, ক্লান্ত পায়ে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। থমকে দাঁড়াল বারান্দায়। মতিন সাহেব বাগানে কাজ করছেন। আগাছা পরিষ্কার করে বাগানটিকে এত সুন্দর করে ফেলেছেন—শুধু তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

সুরমা গরম পানি বাথরুমে দিয়ে আলমকে খবর দিতে গেলেন। আলম হাত-পা ছড়িয়ে গভীর ঘুমে অচেতন। কাপড় ছাড়েনি। পা থেকে জুতো পর্যন্ত খোলেনি।

ঘুমের মধ্যেই আলম একটি অস্ফুট শব্দ করছে। প্রচণ্ড জ্বর হলে মানুষ এমন করে। ওর কি জ্বর ? ঘরে ঢোকবার সময় দেখেছেন চোখ টকটকে লাল। সুরমা আলমের কপালে হাত রাখতেই আলম উঠে বসল।

ঃ তোমার পানি গরম হয়েছে।

ঃ থ্যাংকয়্যু।

ঃ কিন্তু তোমার গা তো পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে।

ঃ আমার এ রকম হয়। একটা শাওয়ার নিয়ে শুয়ে থাকলে জ্বর নেমে যাবে।

আলম তোয়ালে টেনে নিয়ে মাতালের ভঙ্গিতে বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেল।

রাত্রি সন্ধ্যা সাতটায় আবার টেলিফোন করল। কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'মা উনি আসেননি। তাই না?'

ঃ এসেছে।

ঃ এসেছেন, তাহলে আমাকে টেলিফোন করনি কেন ? আমি তখন থেকে টেলিফোনের সামনে বসে আছি।

রাত্রি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। সুরমা টেলিফোনে সেই কান্না শুনলেন। তাঁর নিজেরো চোখ ভিজে উঠতে শুরু করল। তিনি নিজেও কিশোরী বয়সে এভাবে কেঁদেছেন। কেউ তার কান্না শোনেনি। তিনি টেলিফোন নামিয়ে রেখে আলমের ঘরে এলেন। আলম খাটে পা ঝুলিয়ে বসে আছে। তার মুখে সিগারেট। সে সুরমাকে দেখে সিগারেট নামাল না। সুরমা তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তার দিকে।

আলম বলল, 'আপনি কি কিছু বলবেন ?'

AMARBOI.COM

সুরমা থেমে থেমে বললেন, 'তুমি বলেছিলে এ বাড়িতে সাত দিন থাকবে। আজ সাতদিন শেষ হয়েছে।'

ঃ আমি আগামী কাল চলে যাব। আগামী কাল সন্ধ্যায়।

ঃ তোমাকে কি এক কাপ চা বানিয়ে দেব?

ঃ দিন। আপনার কাছে এ্যাসপিরিন আছে?

ঃ আছে। দিচ্ছি।

বলেও সুরমা গেলেন না। দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন। আলম বলল, 'আপনি কি আরো কিছু বলবেন?'

ঃ না।

মতিন সাহেবের নাক ফুলে উঠছে বার বার। হাত মুঠি বন্ধ হচ্ছে। কারণ বিবিসি ঢাকায় গেরিলা অপারেশনের খবর ফলাও করে বলেছে। এত তাড়াতাড়ি খবর পৌঁছল কি ভাবে? সাহেবদের কর্মদক্ষতার ওপর তাঁর আস্থা সব সময়ই ছিল, এখন সেটা বহুগুণে বেড়ে গেছে।

সুরমাকে ঢুকতে দেখেই তিনি বললেন, 'বৃটিশদের মত একটা জাত আর হবে না।'

সুরমা তাঁর কথা বুঝতে পারলেন না। হঠাৎ বৃটিশ প্রসঙ্গ এল কেন কে জানে।

ঃ সুরমা আজদহারা ছারখার করে দিয়েছে। অর্ধেক ঢাকা শহর বার্ণ করে দিয়েছে। একেবারে ছাতু। হ্যাভক।

সুরমা কিছুই বললেন না। মতিন সাহেব ট্রানজিস্টার নিয়ে শোবার ঘরে চলে গেলেন। রাত্রিকে টেলিফোন করে জানতে হবে, সে বিবিসি শুনেছে কি না।

টেলিফোন ধরল অপালা। সে হাই তুলে বলল, 'বাবা আপাকে টেলিফোন দেয়া যাবে না। তার কি জানি হয়েছে, দরজা বন্ধ করে কাঁদছে।'

মতিন সাহেব অবাক হয়ে বললেন, 'এ রকম খুশির দিনে কাঁদছে কেন?'

রাত্রি ভোরবেলাতেই চলে এসেছে

সুরমা রান্নাঘরে ছিলেন। সে চলে গেল রান্নাঘরে। সুরমা মেয়েকে দেখে বিস্মিত হলেন। এ কি চেহারা হয়েছে মেয়ের! মুখ

AMARBOI.COM

শুকিয়ে কেমন অন্য রকম দেখাচ্ছে। চোখ লাল।

ঃ তোর কি হয়েছে ?

ঃ কিছু হয়নি।

ঃ ঠিক করে বল কি হয়েছে ?

ঃ রাতে ঘুম হয়নি মা। সারারাত জেগে ছিলাম।

সুরমা আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। রুটি বেলতে লাগলেন। বিন্তি রুটি সেঁকছে এবং নিজের মনেই হাসছে। রাত্রি হালকা গলায় বলল, ‘আজ কি নাশ্‌তা মা ?’

সুরমা কঠিন গলায় বললেন—দেখতেই পাচ্ছিস কি। জিজ্ঞেস করছিস কেন ?

রাত্রি মৃদু স্বরে বলল, ‘আমার ওপর কেন তুমি রেগে যাচ্ছ মা ? আমি কি কখনো তোমাকে রাগানোর জন্যে কিছু করেছি ?’

সুরমা উত্তর দিলেন না। রাত্রি আবার বলল, ‘চুপ করে থাকবে না। বল তুমি, কখনো কি আমি তোমাকে রাগাবার মত কোনো কারণ ঘটিয়েছি ?’

সুরমা দেখলেন রাত্রির চোখে জল টলমল করছে। যেন এক্ষুণি সে কেঁদে ফেলবে। তাঁর নিজেরো কান্না পেয়ে গেল। তিনি মনে মনে বললেন, কেউ যেন আমার এই মেয়েটির মনে কণ্ট না দেয়। বড় ভাল মেয়ে। বড় ভাল।

ঃ রাত্রি।

ঃ কি মা ?

ঃ আলমের ঘুম ভেঙেছে কিনা দেখে আয়।

AMARBOI.COM

বলেই সুরমা পাংশুবর্ণ হয়ে গেলেন। কেন রাত্রিকে এই কথা বললেন ? তিনি ভালই জানেন আলম জেগে আছে। কিছুক্ষণ আগেই তিনি তাকে চা দিয়ে এসেছেন। রাত্রিকে এই কথা বলার উদ্দেশ্য কি এই যে তিনি তাকে খুশি করতে চেয়েছেন ? কি ভয়ানক কথা ! রাত্রি কি তার এই উদ্দেশ্য ধরতে পেরেছে ? নিশ্চয়ই পেরেছে। সে বোকা মেয়ে নয়। নিজেকে সামলানোর জন্যে তিনি থেমে থেমে বললেন—

ঃ আজ চলে যাবে, একটু যত্ন-টত্ন করা দরকার।

ঃ আজ চলে যাবেন নাকি ?

ঃ হ্যাঁ। এক সপ্তাহ থাকার জন্যে এসেছিল। এক সপ্তাহ তো হয়ে গেল।

ঃ তিনি কি বলেছেন আজ চলে যাবেন ?

ঃ হ্যাঁ বলেছে।

রাত্রি হালকা পায়ে ঘর ছেড়ে গেল। তার গায়ে একটা ধবধবে সাদা সিল্কের শাড়ি। শাড়িতে বেগুনি ফুল। কি চমৎকার লাগছে রাত্রিকে! তাঁর মনে হল শুধুমাত্র মেয়েরাই মেয়েদের সৌন্দর্য বুঝতে পারে, পুরুষরা না। ওদের নজর থাকে শরীরের দিকে। সৌন্দর্য দেখবার সময় কোথায় ওদের?

আলম পা ঝুলিয়ে খাটে বসে আছে। তার কোলের ওপর একটি বই। সে পা দোলাচ্ছে। রাত্রিকে ঢুকতে দেখে সে অল্প হাসল।

ঃ কখন এসেছেন?

ঃ এই তো কিছুক্ষণ আগে। কি বই পড়ছেন এত মন দিয়ে?

আলম বইটি উঁচু করে দেখাল 'দত্তা'। রাত্রি হাসিমুখে বলল, 'অপালা এই বইটা মুখস্থ বলতে পারে। পাঁচ ছ'দিন পরপর এই বইটা সে একবার পড়ে ফেলে।'

আলম বলল, 'আপনি কি অসুস্থ? কেমন যেন অন্য রকম লাগছে।'

ঃ না, অসুস্থ না। আমি বেশ ভাল। দেখতে এসেছি আপনি কেমন আছেন। কাল সন্ধ্যাবেলা খুব ভয় পেয়েছিলাম। কেন জানি মনে হচ্ছিল কিছু একটা হয়েছে আপনার। কি যে কষ্ট হচ্ছিল, আপনি কোনোদিন কল্পনাও করতে পারবেন না।

আলমের অস্বস্তি লাগছে। এ সব কি বলছে এই মেয়ে! কিন্তু এত সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলছে। আলম কথা ঘোরাবার জন্যে বলল, 'কাল কি হয়েছে শুনতে চান?'

ঃ না শুনতে চাই না। যুদ্ধ-টুদ্ধ আমার ভাল লাগে না।

ঃ কারোরই ভাল লাগে না।

রাত্রি খাটে আলমের মত পা ঝুলিয়ে বসল। মিষ্টি একটা গন্ধ বাতাসে ভাসছে। সৌরভ কি মানুষের মনে বিষাদ জাগিয়ে তোলে? তোলে বোধ হয়। আলমের কেমন জানি মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

রাত্রি বলল, 'আপনি নাকি আজ চলে যাচ্ছেন?'

ঃ হ্যাঁ।

ঃ কখন যাবেন?

ঃ বিকেলে।

ঃ আপনি কি ঢাকাতেই থাকবেন, না চলে যাবেন অন্য কোথাও?

AMARBOI.COM

ঃ ঢাকাতেই থাকব।

ঃ আর আসবেন না আমাদের এখানে ?

ঃ আসব না কেন, আসব।

ঃ আমার মনে হচ্ছে আপনি আর আসবেন না।

ঃ এ রকম মনে হচ্ছে কেন ?

ঃ কেউ কথা রাখে না।

রাত্রি হঠাৎ উঠে চলে গেল। কারণ তার চোখ জলে ভরে আসছে। এই জল একান্তই নিজের, লুকিয়ে রাখার জিনিস। সে চলে গেল তার নিজের ঘরে।

অপালা সেখানে বসে আছে। তার হাতে একটা গল্পের বই। সে বই নামিয়ে বলল, 'কাঁদছ কেন আপা ?'

ঃ মাথা ধরেছে।

অপালা চোখ নামিয়ে নিল বইয়ে। সে নিজেও কাঁদছে, কারণ এই মুহূর্তে সে খুবই দুঃখের একটা ব্যাপার পড়ছে। নায়িকা সিঁড়ি থেকে পিছলে পড়েছে এবং চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। সে আর্তস্বরে চিৎকার করছে—অরুণ! অরুণ! অরুণ সে ডাক শুনেও নির্বিকার ভঙ্গিতে নেমে যাচ্ছে।

AMARBOI.COM

সুরমা নাশতা টেবিলে দিয়ে আলমকে ডাকতে এলেন। আলম জুতো পরছে।

ঃ কোথাও বেরুচ্ছো ?

ঃ জ্বি।

ঃ কখন ফিরবে ?

ঃ বিকেলে এসে বিদেয় নিয়ে যাব।

সুরমা একবার ভাবলেন বলেন, মাঝে মাঝে এসো। কিন্তু বলতে পারলেন না। যে-সব কথা আমরা বলতে চাই তার বেশির ভাগই বলতে পারি না।

ঃ নাশ্‌তা খেয়ে এস বাবা।

ঃ আসছি।

মতিন সাহেব ঢাকা রেডিও খুলে বসেছিলেন। বাচ্চাদের একটি অনুষ্ঠান হচ্ছে। কিচির মিচির করছে একদল বাচ্চা।

ঃ আপা, আমি একটা ছড়া বলব। আমার নাম রুমানা—ময়না ময়না কোনো কথা কয়না....

ঃ বাহ্ বাহ্ বেশ হয়েছে। এবার তুমি এস। পরিষ্কার করে নাম বল।

ঃ আপা, আমার নাম সুমন। আমি একটা গান গাইব। রচনা বিদ্রোহী কবি নজরুল—কাবেরী নদীজলে কেগো বালিকা....

ঃ চমৎকার হয়েছে। এবার তুমি এস।

মতিন সাহেব বিড় বিড় করে বললেন—এদের ধরে চাবকানো উচিত। এ সময়ে গান গাচ্ছে, ছড়া বলছে। কতবড় স্পর্ধা!

সুরমা এসে বললেন, 'নাশ্‌তা দেয়া হয়েছে। খেতে এস।'

মতিন সাহেব শিশুর মত রেগে গেলেন।

ঃ যাও আমি খাব না কিছু। যত ইডিয়টের দল গান গাইছে ছড়া বলছে। চড় দিয়ে দাঁত ফেলে দিতে হয়।

শরীফ সাহেব আলমাক দেখে মোটেই অবাক হলেন না। তাঁর ভঙ্গি দেখে মনে হলো তিনি যেন মনে মনে তার জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন।

ঃ মামা, কি খবর তোমার?

ঃ ভাল। তুই এখনো বেঁচে আছিস?

ঃ আছি।

ঃ কাল রাতে স্বপ্ন দেখলাম গুলি খেয়েছিস। তখনি বুঝলাম তুই ভালই আছিস। আমার স্বপ্ন সব সময় উল্টো হয়।

শরীফ সাহেব কোমরের লুঙ্গি আঁট করতে করতে উঠে দাঁড়ালেন। ন'টা বাজে। অফিসে যাবার জন্যে তৈরি হতে হয়। কিন্তু কেন জানি অফিসে যেতে ইচ্ছে করছে না। লুঙ্গি বদলে প্যান্ট পরতে হবে ভাবতেই খারাপ লাগছে।

ঃ চা খাবি?

ঃ না।

ঃ কফি, কফি খাবি? একটা ইনসটেন্ট কফি কিনেছি। চা বানানোর মহা হাঙ্গাম। কাজের ছেলেটা আমার একটা স্যুটকেস নিয়ে পালিয়ে গেছে।

বলতে বলতে তাঁর হাসি পেয়ে গেল। কারণ স্যুটকেসটিতে কিছু পুরোনো ম্যাগাজিন ছাড়া কিছু ছিল না। ছাত্রজীবনে কিছু গল্প-কবিতা

AMARBOI.COM

লিখতেন। তার কয়েকটি ছাপাও হয়েছিল। স্যুটকেস বোঝাই সেইসব ম্যাগাজিনে।

ঃ হাসছ কেন?

ঃ ব্যাটা খুব 'ঠক' খেয়েছে। স্যুটকেস খুলে হাউ-মাউ করে কাঁদবে।

আলমের মনে হল, তার মামার হাসির ভঙ্গিটি কেমন যেন অস্বাভাবিক। সুস্থ মানুষের হাসি নয়। অসুস্থ মানুষের হাসি।

ঃ আলম!

ঃ বল।

ঃ তোর চিঠি তোর মা'কে পেঁৗছে দিয়েছি।

ঃ মা ভাল আছেন?

ঃ জানি না।

ঃ জান না মানে?

ঃ দেশের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছি।

ঃ ভাল করেছ।

ঃ ভাবছি নিজেও চলে যাব। রাতে ঘুম হয় না।

ঃ যাও, চলে যাও।

ঃ কিন্তু ওরা খুঁজে বের করে ফেলবে। ফখরুদ্দিন সাহেব পালিয়ে গিয়েছিলেন। মানিকগঞ্জে তাঁর শ্বশুর বাড়ি থেকে তাঁকে ধরে নিয়ে এসেছে। এখন বোধ হয় মেরেই ফেলছে। খাবি তুই কফি?

ঃ দাও।

ঃ ফার্মগেটের অপারেশনে তুই ছিলি?

ঃ হুঁ!

ঃ ভালই দেখিয়েছিস।

আলম হাসল। হাসিমুখে বলল, 'তোমার সামনে সিগারেট খেলে তুমি রাগ করবে?'

ঃ খেতে ইচ্ছে হলে খা। লায়েক হয়ে গেছিস, এখন তো খাবিই।

কফি ভাল হলো না। অতিরিক্ত কড়া হয়ে গেল। হালকা করার জন্যে দুধ এবং গরম পানি মেশানোর পর তার স্বাদ হল আরো কুৎসিত। শরীফ সাহেব মুখ বিকৃত করে বললেন, 'পেচ্ছাবের মত লাগছে। ফেলে দে। আবার বানাব।'

ঃ আর বানাতে হবে না। মামা একটা কথা শোন।

ঃ বল, শুনছি।

AMARBOI.COM

ঃ আমি যদি তোমার এখানে থাকি কয়েকদিন, তোমার অসুবিধা হবে?

ঃ না। আগে যেখানে ছিলি সেখানে কি অবস্থা? জানাজানি হয়ে গেছে?

ঃ তা না। ভদ্রমহিলা একটু ভয় পাচ্ছেন। তাছাড়া আমি বলেছিলাম এক সপ্তাহ থাকব। এক সপ্তাহ হয়ে গেছে।

ঃ কখন আসবি?

ঃ বিকেলে। আমাকে একটা চাবি দাও।

শরীফ সাহেব চাবি বের করে দিলেন। এবং দ্রুত কাপড় পরতে শুরু করলেন। আলম এখানে থাকলে অফিস মিস করা উচিত হবে না।

ঃ আলম।

ঃ বল মামা।

ঃ একটা সাকসেসফুল অপারেশনের পর ওভার কনফিডেন্ট হবার একটা সম্ভাবনা থাকে। খুব সাবধান। এরা এখন পাগলা কুত্তার মত। দারুণ সতর্ক। পাগলা কুত্তারা খুব সতর্ক হয়, জানিস তো?

ঃ আমরাও সতর্ক।

ঃ স্বপ্ন দেখে মনটা একটু ইয়ে হয়ে গেল। যদিও জানি আমার স্বপ্ন সব সময় উল্টো হয়। প্রমোশন পাওয়ার একটা স্বপ্ন দেখলাম একবার, হয়ে গেল ডিমোশন। অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি বানিয়ে বেইজ্জত করল।

শরীফ সাহেব আবার হাসতে শুরু করলেন। অন্য রকম হাসি, অসুস্থ মানুষের হাসি।

ঃ বুঝলি আলম, এই যুদ্ধ দীর্ঘদিন চলবে। মে বি ফর ইয়ারস। চায়না কেমন চুপ মেরে আছে দেখছিস না? অন্য দেশগুলো চুপ করে আছে আমি মাইণ্ড করছি না, কিন্তু চায়না পাকিস্তান সমর্থন করবে কেন? হোয়াই? মানুষের জন্যে মমতা নেই চায়নার, এটা ভাবতেই মনটা খারাপ হয়ে যায়। হোয়াই চায়না? হোয়াই?

ঃ অফিসে যাবে না মামা?

ঃ না ইচ্ছে করছে না। শুয়ে থাকব। সিক রিপোর্ট করব। আসলেই সিক সিক লাগছে। দেখ তো কপালে হাত দিয়ে জ্বর আছে কি না?

ঃ জ্বর নেই।

AMARBOI.COM

ঃ না থাকলেও হবে। জ্বর হবে, সর্দি হবে, কাশি হবে। ডায়রিয়া হবে।

শরীফ সাহেব শব্দ করে হাসতে লাগলেন। গা দুলিয়ে হাসি।

ঝিকাতলার একটি বাসায় সবাই একত্র হয়েছে। রহমানও আছে। সে এখন মোটামুটি সুস্থ। জ্বর নেমে গেছে। দাড়ি গোঁফ কামানোয় তাকে বালক বালক লাগছে। পরবর্তী অপারেশন নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে। নতুন মানুষের ভেতর মিনহাজউদ্দিনকে দেখা যাচ্ছে। তার কাছ থেকেই জানা গেল, আরো কিছু ছোট ছোট গ্রুপ শহরে ঢুকেছে। এরা পাওয়ার স্টেশন নষ্ট করতে চেষ্টা করবে। ট্রান্সফরমার উড়িয়ে দেয়ার কাজটা বাইরে থেকে বোমা মেরে করা যাবে না। সাহায্য আসতে হবে ভেতর থেকে। প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ লাগিয়ে বিস্ফোরণ ঘটাতে হবে।

সাহায্য করতে সবাই আগ্রহী, কিন্তু সবাইকে দিয়ে এ কাজ হবে না। ঠিক লোকটিকে বেছে নিতে হবে। সাহসী এবং বুদ্ধিমান একজন মানুষ। মুশকিল হচ্ছে এই দুটি জিনিস খুব কম সময়ই একত্রে পাওয়া যায়। সাধারণত সাহসী লোকদের বুদ্ধি কম থাকে। মিনহাজ সাহেব বললেন, 'আলম সাহেব আপনারা যা করছেন এটা হচ্ছে হিরোইজম। ঠিক এই মুহূর্তে আমাদের বীরত্বের দরকার নেই। আমরা এখন চাই ওদের বিরক্ত করতে। বোমা ফাটিয়ে, গ্রেনেড ফাটিয়ে নার্ভাস করে ফেলতে। বুঝতে পারছেন?'

ঃ পারছি।

ঃ কথাগুলো কিন্তু আমার না। কমাণ্ড কাউন্সিলের।

ঃ তাও জানি।

ঃ এমন সব জায়গায় যান যেখানে মিলিটারি নেই। সরাসরি সংঘর্ষের সম্ভাবনা নেই। যেমন ধরুন, পেট্রল পাম্প। পেট্রল পাম্প উড়িয়ে দিন। দর্শনীয় ব্যাপার হবে।

আলম হাই তুলল। মিনহাজ সাহেব একজন বিরক্তিকর মানুষ। কথা বলে মাথার পোকা নড়িয়ে দেয়। একই কথা একশবার বলে।

ঃ আলম সাহেব।

ঃ বলুন শুনছি।

ঃ আজ আপনাদের কি প্রোগ্রাম?

AMARBOI.COM

ঃ আছে কিছু।

ঃ বলুন শুনি।

ঃ বলার মত কিছু নয়।

মিনহাজ সাহেব মুখ কালো করে ফেললেন। এত অল্পতেই মানুষ এমন আহত হয় কেন আলম ভেবে পেল না। মিনহাজ সাহেবের অন্য দল। তাদের সঙ্গে এ দলের কাজকর্মের আলোচনার কি তেমন কোনো দরকার আছে? কোনো দরকার নেই।

আশফাক তার পিক আপ নিয়ে উপস্থিত হল দুটোর সময়। তার সঙ্গে সাদেক।

আশফাক দাঁত বের করে বলল, 'নিজের গাড়িই আনলাম। নিজের জিনিস ছাড়া কনফিডেন্স পাওয়া যায় না।

আলম বিরক্ত হয়ে বলল, 'একই গাড়ি নিয়ে দ্বিতীয়বার বের হতে চাই না।'

সাদেক নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, 'ঢাকা শহরে এ রকম পিক আপ পাঁচ হাজার আছে। তুই ভ্যাজর ভ্যাজর করিস না, উঠে আয়। রোজ একটা করে নতুন গাড়ি পাব কোথায়? ছোট কাজ, চট করে সেরে চলে আসব। সবার যাওয়ার দরকার নেই।

গাড়িতে উঠল তিন জন। ড্রাইভারের পাশে আলম। পেছনের সীটে নূরু এবং সাদেক। তারা চলে গেল মগবাজারের একটা পেট্রল পাম্পে। জায়গাটা খারাপ না। ওয়ারলেস স্টেশনের কাছে। ঠিকমত বিস্ফোরণ ঘটাতে পারলে পাকিস্তানীদের বড় ধরনের একটা চমক দেয়া যাবে।

সবাই বসে রইল পিক আপে। লম্বা লম্বা পা ফেলে নেমে গেল সাদেক। যেতে যেতে শিস দিচ্ছে।

কাঁচের ঘরের ভেতর যে গোলগাল লোকটি বসেছিল, তাকে হাসি-মুখে বলল—

ঃ মন দিয়ে শোনেন কি বলছি। আমরা আপনার এই পেট্রল পাম্পটা উড়িয়ে দেব। আপনি লোকজন নিয়ে সরে পড়ুন। কুইক।

লোকটি চোখের পাতা পর্যন্ত ফেলতে ভুলে গেল। তাকিয়ে রইল মাছের মত। সাদেক বলল, 'আমার কথা বুঝতে পারছেন তো?'

ঃ জ্বি পারছি।

AMARBOI.COM

ঃ তাহলে দেরি করছেন কেন ?

ঃ আপনারা মুক্তিবাহিনী ?

ঃ হ্যাঁ।

লোকটি হাঁসের মত ফ্যাসফ্যাসে গলায় ডাকতে লাগল—হিসামুদ্দিন, হিসামুদ্দিন। ও হিসামুদ্দিন।

বিস্ফোরণ হল ভয়াবহ। বিশাল আগুন দাউ দাউ করে আকাশ স্পর্শ করল। বিকট শব্দ হতে থাকল। কুণ্ডুলী পাকিয়ে উঠছে কালো ধোঁয়া। অসংখ্য লোকজন ছোটাছুটি করছে। চিৎকার। হৈচৈ। হিস হিস শব্দ হচ্ছে। ভয়াবহ ব্যাপার !

আশফাকের পিক আপ ছুটে চলছে। নূরু ফিস ফিস করে বলল, 'পেট্রল পাম্পে গ্রেনেড না ছোঁড়াই ভাল। এই অবস্থা হবে কে জানত।'

ঘন্টা বাজিয়ে চারদিক থেকে ফায়ার ব্রিগেড আসছে। বিস্ফোরণে যারা ভয় পায়নি, তারা এবার ভয় পাবে। ফায়ার ব্রিগেডের ঘন্টা অতি সাহসী মানুষের মনেও আতঙ্ক ধরিয়ে দেয়।

আলম হঠাৎ লক্ষ্য করল পেছন থেকে দৈত্যাকৃতি একটি ট্রাক ছুটে আসছে। অনুসন্ধানী ট্রাক। বিস্ফোরণের রহস্যের সন্ধান করছে নিশ্চয়ই। ট্রাকের মাথায় দুটি মেশিনগান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন গানার। এরা কি তাদের পিক আপ থামাবে এবং বলবে—তোমরা কারা? কোথায় যাচ্ছ? বের হয়ে এস। হাত মাথার ওপর তোল।

আলমের মাথা ঝিম ঝিম করছে। পেটের ভেতর কি জানি পাক খাচ্ছে। এই ট্রাক ওদের থামাবে। নিশ্চয়ই থামাবে। বোঝা যায়। কিছু কিছু জিনিস টের পাওয়া যায়। বিশেষ বিশেষ সময়ে সিক্সথ সেন্স কাজ করে। আলম ফিস ফিস করে বলল, 'আশফাক সাইড দাও। মাথা ঠাণ্ডা রাখ সবাই।'

আশফাক গাড়ি প্রায় ফুটপাতের ওপর তুলে ফেলল। ট্রাক থামল না। গানার দু'জন পলকের জন্যে তাকাল তাদের দিকে। ওদের চোখ কাঁচের মত ঠাণ্ডা।

সাদেক কপালের ঘাম মুছে বলল, 'একটা বড় ফাঁড়া কেটে গেছে। আমার কেন জানি মনে হচ্ছিল, এরা আমাদের জন্যেই এসেছে। আলম, তোর কি এ রকম মনে হয়েছে ?'

AMARBOI.COM

আলম জবাব দিল না। সাদেক বলল, 'কেন জানি দারুণ একটা ভয় লেগে গেল। আমার কখনো এ রকম হয় না। মরার ভয় আমার নেই।'

আশফাক সিগারেট ধরিয়েছে। সে বেশ সহজ স্বাভাবিক। সিগারেটে টান দিয়ে একসিলেটরে চাপ দিয়ে হালকা গলায় বলল—চলেন ঘরে ফিরে যাই।

নিউ ইস্কাটনের কাছে এসে তাদের বিস্ময়ের সীমা রইল না। সেই ট্রাকটি দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে আছে তাদের দিকে মুখ করে। গানার দু'জন মেশিনগান তাক করে আছে। কিছু সৈন্য নেমে এসেছে রাস্তায়। তাদের একজন মাঝরাস্তায় চলে এসেছে। বাঁশি বাজাচ্ছে এবং গাড়ি থামাতে বলছে। এর মানে কি?

আলম ফিস ফিস করে বলল—আশফাক, কেটে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা কর। নুরু, দেখ কিছু করতে পার কি না।

ওরা বন্দুক তাক করছে। বুঝে ফেলেছে এ গাড়ি থামবে না। সাদেক স্টেনগানের মুখ গাড়ির জানালায় রাখল। নুরু দুটি গ্রেনেডের পিন খুলে হাতে নিয়ে বসে আছে। সাত সেকেণ্ড সময় আছে। সাত সেকেণ্ড অনেক সময়। কিছুক্ষণ হাতে নিয়ে বসে থাকা যায়।

আশফাকের গাড়ি লাফিয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে উড়ে চলে যাবে। নুরু দুটি গ্রেনেডই ছুঁড়েছে। বিস্ফোরণের শব্দ পাওয়ার আগেই ওদের ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি এসে পড়ল। আলম নিজের স্টেইনগানের উপর ঝুঁকে পড়ে ফিস ফিস করে বলল—মাথা ঠাণ্ডা রাখ। মাথা ঠাণ্ডা।

AMARBOI.COM

শরীফ সাহেব বাড়ি ফেরবার জন্যে তৈরি হচ্ছিলেন, তখন খবরটা পেলেন। মিলিটারিদের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষ হয়েছে গেরিলাদের। গেরিলাদের কিছুই হয়নি, কিন্তু মিলিটারিদের একটা ট্রাক উড়ে গেছে। এ জাতীয় খবর কখনো পুরোপুরি সত্যি হয় না। উইসফুল থিংকিংয়ের একটা ব্যাপার আছে। বাস্তবে নিশ্চয়ই অন্যরকম কিছু হয়েছে। গেরিলাদের গায়ে আঁচড়ও পড়বে না, তা কি হয়।

শরীফ সাহেব খুব আশা করতে লাগলেন যেন সংঘর্ষের খবরটা সত্যি না হয়। সত্যি না হবারই কথা। দিনে দুপুরে ওরা কি আর মিলিটারিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে? অবশ্যি পড়তেও পারে। রোমান্টিসিজম! ওদের যা বয়স তাতে রোমান্টিসিজমই প্রাধান্য পাবে। এ জাতীয় অপারেশনে আসা উচিত মধ্যবয়স্কদের। যারা সাবধানী।

তিনি বাড়ি ফিরে কাপড় না ছেড়েই বারান্দার ইজিচেয়ারে বসে রইলেন। আলমের জন্যে অপেক্ষা। সে আসছে না। দেরি করছে কেন? খোঁজ নেবারও কোনো উপায় নেই। সে কোথায় থাকে তাঁর জানা নেই। সাবধানতা। যেখানে ওদের সাবধানী হওয়া উচিত সেখানে না হয়ে অন্য জায়গায়। কোনো মানে হয়?

দুপুর তিনটায় নিয়ামত সাহেব টেলিফোন করলেন।

ঃ খবর শুনেছেন? ভেরী অথেনটিক।

ঃ কি খবর?

ঃ গেরিলাদের একটা পিক আপ ধরা পড়েছে। দু'জনের ডেড বডি পাওয়া গেছে।

ঃ কে বলেছে আপনাকে? যত উড়ো খবর। এইসব খবরে কান দেবেন না। এবং টেলিফোনে এসব ডিসকাসও করবেন না।

শরীফ সাহেব টেলিফোন নামিয়ে আবার বারান্দায় এসে বসলেন।

মতিন সাহেব অবাক হয়ে দেখলেন একটা বেবীটেক্সি এসে তাঁর বাড়ির সামনে থেমেছে। বেবীটেক্সির ড্রাইভার এবং একটি অচেনা লোক আলমকে ধরাধরি করে নামাচ্ছে। তিনি অস্ফুট স্বরে বললেন, 'কি হয়েছে?' অপরিচিত লম্বা ছেলেটি বলল, 'গুলি লেগেছে। আপনারা রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা করুন। আমি ডাক্তার নিয়ে আসব। আমার নাম আশফাক। এভাবে দাঁড়িয়ে থাকবেন না, এসে ধরুন।'

তারা বসার ঘরে ঢুকল। আলমের জ্ঞান আছে। সে হাত দিয়ে বাঁ কাঁধ চেপে ধরে আছে। ফোঁটা ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে সেখান থেকে।

রাত্রি এসে দাঁড়িয়ে দরজার পাশে। তার মুখ রক্তশূন্য। সে একটি কথাও বলছে না। মতিন সাহেব ভাঙা গলায় বললেন, 'মা একে ধর।' রাত্রি নড়ল না। যেভাবে দাঁড়িয়ে ছিল সেভাবেই দাঁড়িয়ে রইল।

ভেতর থেকে সেলাই মেশিনের শব্দ হচ্ছে। আশফাক শান্ত স্বরে বলল, 'আলম ভাই, আপনি কোনো রকম চিন্তা করবেন না। কারফিউয়ের আগেই আমি ডাক্তারের ব্যবস্থা করব। যে ভাবেই হোক।'

বেবীটেক্সির বুড়ো ড্রাইভারটির মুখ ভাবলেশহীন। যেন এ জাতীয় ঘটনা সে জীবনে বহু দেখেছে।

আশফাক তার ঘরে পৌঁছল পাঁচটায়। এখান থেকে সে যাবে ঝিকাতলা। ওদের খবর দিয়ে ডাক্তারের ব্যবস্থা করতে হবে। কার্ফু শুরু হবে সাড়ে ছ'টায়। হাতে অনেকখানি সময়।

AMARBOI.COM

সে গেঞ্জি বদলে একটা সার্ট পরল। অভ্যাস বসে চুল আঁচড়াল, নিচে নামল। গালে ক্রীম দিল। মুখের চামড়া টানছে। এসব শীত-কালে হয়। চামড়া শুকিয়ে যায়। কিন্তু তার এখন হচ্ছে কেন। বড্ড ক্লান্ত লাগছে। নিচে নামতে গিয়ে পা কাঁপছে। কেন এ রকম হচ্ছে? সে এখনো বেঁচে আছে। বিরাট ঘটনা। আনন্দে চিৎকার করা উচিত। কিন্তু আনন্দ হচ্ছে না। কেমন যেন ঘুম পাচ্ছে।

তার জন্যে কালো রঙের জীপ নিয়ে আর্মি ইন্টেলিজেন্সের লোকজন অপেক্ষা করছে।

ঃ আশফাক তোমার নাম?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ চল আমাদের সঙ্গে। তোমার জন্যে গত এক ঘন্টা ধরে অপেক্ষা করছি।

AMARBOI.COM

রাত্রি পাথরের মূর্তির মত একা একা বসার ঘরে বসে আছে। দুপুর থেকেই আকাশ মেঘে মেঘে কালো হয়েছিল। এখন বৃষ্টি নামল। প্রবল বর্ষণ। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ঘন ঘন বাজ পড়ছে।

রস্তোয় লোক চলাচল একেবারেই নেই। দু' একটা রিকশা বা বেবী-টেক্সির শব্দ শোনামাত্র রাত্রি বের হয়ে আসছে। বোধ হয় ডাক্তার নিয়ে কেউ এসেছে। না কেউ না। কার্ফুর সময় দ্রুত এগিয়ে আসছে। কিছুক্ষণ পর হয়ত আর একটিও রিকশা বা বেবীটেক্সির শব্দ কানে আসবে না। দ্রুতগামী জীপ কিংবা ভারী ট্রাকের শব্দ কানে আসবে। রাত্রি ঘড়ি দেখে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। সামনের পুকুরে এই অবেলায় একজন লোক গোসল করছে। কোথাও কেউ নেই। এমন ঘোর বর্ষণ-এর ভেতর নিজের মনে লোকটা সাঁতার কাটছে। দেখে মনে হচ্ছে এই লোকটির মনে কত আনন্দ।

জামগাছওয়ালা বাড়ির উকিল সাহেব বাজার নিয়ে ফিরছিলেন। তাঁর এক হাতে ছাতা, তবু তিনি পুরোপুরি ভিজে গেছেন। তিনি ঘাড় ঘুরিয়ে রাত্রিকে দেখলেন, অবাক হয়ে বললেন—একা একা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছ কেন মা? ভেতরে যাও। কখনো বারান্দায় থাকবে না। যাও যাও ভেতরে যাও। দরজা বন্ধ করে দাও।

রাত্রি বলল, 'কার্ফু' 'কি শুরু হয়েছে চাচা?'

ঃ না. এখনো ঘন্টাখানিক আছে। যাও মা ভেতরে যাও।

উকিল সাহেব লম্বা লম্বা পা ফেলে এগুলেন। তাঁর এক মেয়ে, যূথী রাত্রির সঙ্গে পড়ত। মেট্রিক পাশ করবার পরই তার বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের এক বছরের মাথায় বাচ্চা হতে গিয়ে যূথী মারা গেল। বিয়ে না হলে মেয়েটা বেঁচে থাকত। মেয়েদের জীবন বড় কষ্টের।

লোকটা পুকুরে এখনো সাঁতার কাটছে। চিৎ হয়ে কাত হয়ে নানান রকম ভঙ্গি করছে। পাগল নাকি?

ভেতর থেকে সুরমা ডাকলেন—রাত্রি।

রাত্রি জবাব দিল না। সুরমা বারান্দায় এসে তাঁর মেয়ের মতই অবাক হয়ে সাঁতার কাটা লোকটিকে দেখতে লাগলেন। রাত্রি মৃদু স্বরে বলল, 'কেউ তো এখনো এল না মা।'

সুরমা শান্ত গলায় বললেন, 'এসে পড়বে। এখনি এসে পড়বে। তুই ভেতরে আয়। আলমের কাছে গিয়ে বস।'

রাত্রি বসার ঘরে এসে সোফায় বসল। ভেতরে গেল না। ভেতরে যেতে তার ইচ্ছে করছে না।

AMARBOI.COM

মতিন সাহেব একটা পরিষ্কার পুরোনো শাড়ি ভাঁজ করে আলমের কাঁধে দিয়েছেন। তিনি দু'হাতে সেই শাড়ি চেপে ধরে আছেন। একটু পর পর ফিস ফিস করে বলছেন—তোমার কোনো ভয় নাই। এক্ষুণি ডাক্তার চলে আসবে। তাছাড়া রক্ত বন্ধ হওয়াটাই বড় কথা। রক্ত বন্ধ হয়েছে।

মতিন সাহেবের কথা সত্যি নয়। কাঁধের শাড়ি ভিজে উঠছে। রক্ত জমাট বাঁধছে না। আলম নিঃশ্বাস নিচ্ছে হাঁ করে। মাঝে মাঝে খুব অস্পষ্ট ভাবে আহ্ উহ্ করছে। কিন্তু জ্ঞান আছে পরিষ্কার। কেউ কিছু বললে জবাব দিচ্ছে। সে একটু পর পর পানি খেতে চাইছে। চামচে করে মুখে পানি দিয়ে দিচ্ছে বিন্তি। এই প্রথম বিন্তির মুখে কোনো হাসি দেখা যাচ্ছে না। সে পানির গ্লাস এবং চামচ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দরজার পাশে। তার সঙ্গে গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অপালা। সে দারুণ ভয় পেয়েছে। একটু পর পর কেঁপে কেঁপে উঠছে। এক সময় আলম গোঙাতে শুরু করল। অপালা চমকে উঠল, তারপরই কেঁদে উঠে ছুটে বের হয়ে গেল।

রাত্রি এসে দাঁড়িয়েছে দরজার ওপাশে। তার মুখ ভাবলেশহীন। সে তাকিয়ে আছে মেঝের দিকে।

আলম কাৎরাতে কাৎরাতে বলল, 'ব্যথাটা সহ্য করতে পারছি না। একেবারেই সহ্য করতে পারছি না।'

মতিন সাহেব তাকিয়ে আছেন। তিনি বিড় বিড় করে বললেন, 'ডাক্তার এসে পড়বে। একটু ধৈর্য ধর। একটু। রাত্রি, তুই দাঁড়িয়ে আছিস কেন? কিছু একটা কর।'

ঃ কি করব বল?

মতিন সাহেব কিছু বলতে পারলেন না।

বৃষ্টির বেগ বাড়ছে। খোলা জানালা দিয়ে প্রচুর হাওয়া আসছে। বৃষ্টি-ভেজা হাওয়া।

ঃ জানালা বন্ধ করে দে।

রাত্রি জানালা বন্ধ করবার জন্যে এগিয়ে যেতেই আলম বলল—বন্ধ করবেন না। প্লীজ বন্ধ করবেন না। সে পাশ ফিরতে চেষ্টা করতেই তীব্র ব্যথায় সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে গেল। মা'কে ডাকতে ইচ্ছে করছে। ব্যথার সময় মা মা বলে চিৎকার করলেই ব্যথা কমে যায়। এটা কি সত্যি, না এটা সুন্দর একটা কল্পনা?

খোলা জানালার পাশে রাত্রি দাঁড়িয়ে আছে। হাওয়ায় তার চুল উড়ছে। আহ্ কি সুন্দর দেখাচ্ছে মেয়েটাকে। বেঁচে থাকার মত আনন্দ আর কিছুই নেই। কত অপূর্ব সব দৃশ্য চারিদিকে। মন দিয়ে আমরা কখনো তা দেখি না। যখন সময় শেষ হয়ে যায়, তখনি শুধু হাহাকারে হৃদয় পূর্ণ হয়। রাত্রি কি যেন বলছে। কি বলছে সে? আলম তার ইন্দ্রিয়গুলো সজাগ করতে চেষ্টা করল।

ঃ আপনি বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছেন। জানালা বন্ধ করে দি?

ঃ না না, খোলা থাকুক। প্লীজ।

এই জানালা বন্ধ করা নিয়ে কত কাণ্ড হত বাড়িতে। শীতের সময়ও জানালা খোলা না রেখে সে ঘুমতে পারত না। মা গভীর রাতে চুপিচুপি এসে জানালা বন্ধ করে দিতেন। এই নিয়ে তাঁর কত ঝগড়া।

ঃ নিউমোনিয়া হয়ে মরে থাকবি একদিন।

ঃ জানালা বন্ধ থাকলে নিউমোনিয়া ছাড়াই মরে যাব মা। অক্সিজেনের অভাবে মরে যাব।

ঃ অন্য কারোর তো অক্সিজেনের অভাব হচ্ছে না।

ঃ আমার হয়। আমি খুব স্পেশাল মানুষ তো, তাই।

AMARBOI.COM

সেই খোলা জানালা দিয়ে চোর এল এক রাতে। আলমের টেবিলের ওপর থেকে মানিব্যাগ, ঘড়ি এবং একটা ক্যামেরা নিয়ে পাইপ বেয়ে নেমে গেল। সকালবেলা দেখা গেল—চোর তার স্পঞ্জের স্যাণ্ডেল বাগানে ফেলে গেছে। আলম সেই স্যাণ্ডেল জোড়া নিয়ে এল। হাসি মুখে মাকে বলল—শোধ বোধ হয়ে গেল মা। চোর নিয়েছে আমার জিনিস আমি নিলাম চোরের। এখন থেকে এই স্যাণ্ডেল আমি ব্যবহার করব।

এই নিয়ে মা বড় ঝামেলা করতে লাগলেন। চিৎকার চেঁচামেচি। চোরের স্যাণ্ডেল ঘরে থাকবে কেন? এইসব কি কাণ্ড! আলম হেসে হেসে বলত—বড় সফট স্যাণ্ডেল মা। পরতে খুব আরাম।

স্যাণ্ডেল জোড়া কি আছে এখনো? মানুষের মন এত অদ্ভুত কেন? এত জিনিস থাকতে আজ মনে পড়ছে চোরের স্যাণ্ডেল জোড়ার কথা?

মতিন সাহেব ঘড়ি দেখলেন। কারফিউয়ের সময় দ্রুত শেষ হয়ে আসছে। ছেলেটি কি ডাক্তার নিয়ে আসবে না? তাঁর নিজেরই কি যাওয়া উচিত? আশেপাশে ডাক্তার কে আছেন? একজন লেডি ডাক্তার এই পাড়াতেই থাকেন। তাঁর বাড়ি তিনি চেনেন না। কিন্তু খুঁজে বের করা যাবে। সেটা কি ঠিক হবে? গুলি খেয়ে একটি ছেলে পড়ে আছে। এটা জানাজানি করবার বিষয় নয়। কিন্তু ছেলেটার যদি কিছু হয়? বৃষ্টি বাদলার জন্যে অসময়ে চারদিক অন্ধকার হয়ে গেছে। ইলেকট্রিসিটি নেই। এ অঞ্চলে অল্প হাওয়া দিলেই ইলেকট্রিসিটি চলে যায়। মতিন সাহেব বললেন, 'একটা হারিকেন নিয়ে আয়তো মা।'

রাত্রি ঘর থেকে বেরুবামাত্র আলম দু'বার ফিস ফিস করে তার মা'কে ডাকল—আম্মি, আম্মি। শিশুদের ডাক। যেন একটি ন'দশ বছরের শিশু অন্ধকারে ভয় পেয়ে তার মা'কে ডাকছে। রাত্রি নিঃশব্দে এগুচ্ছে রান্নাঘরের দিকে। শোবার ঘর থেকে অপালা ডাকল—আপা, একটু শুনে যাও।

অপালা বিছানায় চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে আছে। অসম্ভব ভয় লাগছে তার। সে চাদরের নিচে বার বার কেঁপে কেঁপে উঠছে। রাত্রি ঘরে ঢোকামাত্র সে উঠে বসল।

ঃ কি হয়েছে অপালা?

ঃ খুব ভয় লাগছে।

ঃ মা'র কাছে গিয়ে বসে থাক।

ঃ না।

AMARBOI.COM

অপালা আবার চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল। রাত্রি এসে হাত রাখল তার মাথায়। গা গরম। জ্বর এসেছে।

অপালা ফিস ফিস করে বলল, 'আপা উনি কি মারা গেছেন?'

ঃ না। মারা যাবেন কেন? ভাল আছেন।

ঃ তাহলে কোনো কথাবার্তা শুনছি না কেন?

রাত্রি কোনো জবাব দিল না। অপালা কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'তুমি একটু আমার পাশে বসে থাক আপা।' রাত্রি বসল। ঠিক তখনি শুনতে পেল আলম আবার তার মা'কে ডাকছে। আম্মি। আম্মি।

রাত্রি উঠে দাঁড়াল।

সুরমা হারিকেন জ্বালিয়ে রান্নাঘরেই বসে আছেন। রাত্রি ছায়ার মত রান্নাঘরে এসে ঢুকল। কাঁপা গলায় বলল—

ঃ মা, তুমি ওঁর হাত ধরে একটু বসে থাক। উনি বার বার তাঁর মা'কে ডাকছেন।

সুরমা নড়লেন না। হারিকেনের দিকে তাকিয়ে বসেই রইলেন। রাত্রি বলল, 'মা এখন আমরা কি করব?'

সুরমা ফিস ফিস করে বললেন, 'কিছু বুঝতে পারছি না।'

হাওয়ার ঝাপটায় হারিকেনের আলো কাঁপছে। বিচিত্র সব নকশা তৈরি হচ্ছে দেয়ালে। প্রচণ্ড শব্দে কাছেই কোথাও যেন বাজ পড়ল। মতিন সাহেব ও ঘর থেকে চেঁচাচ্ছেন—আলো দিয়ে যাচ্ছে না কেন? হয়েছে কি সবার? ভয় পেয়ে অপালা তার ঘরে কাঁদতে শুরু করেছে। কি ভয়ংকর একটি রাত। কি ভয়ংকর!

গত দেড় ঘন্টা যাবত আশফাক একটা চেয়ারে জড়সড় হয়ে বসে আছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে তার কোনো বোধশক্তি নেই। চারপাশে কোথায় কি ঘটছে সে সম্পর্কেও কোনো আগ্রহ নেই। তার সামনে একজন মিলিটারি অফিসার বসে আছে। অফিসারটির গায়ে কোনো ইউনিফর্ম নেই। লম্বা কোর্তার মত একটা পোশাক। ইউনিফর্ম না থাকায় তার র‍্যাংক বোঝা যাচ্ছে না। বয়স দেখে মনে হয় মেজর কিংবা ল্যাফটেনেন্ট কর্ণেল। জুলপির কাছে কিছু চুল পাকা।

চেহারা রাজপুত্রের মত। কথা বলে নিচু গলায়। খুব কফি খাওয়ার অভ্যাস। আশফাক লক্ষ্য করেছে, এই এক ঘন্টায় সে ছয় কাপের মত কফি খেয়েছে। কফি খাওয়ার ধরনটিও বিচিত্র। কয়েক চুমুক দিয়ে রেখে দিচ্ছে এবং নতুন আরেক কাপ দিতে বলছে। এখন পর্যন্ত

AMARBOI.COM

আশফাকের সঙ্গে তার কথা হয়নি। আশফাক বসে আছে। অফিসারটি কফিকে চুমুক দিচ্ছে এবং নিজের মনে কি সব লেখালেখি করছে। মনে হচ্ছে আশফাক সম্পর্কে তার কোনো উৎসাহ নেই।

ঘরটি খুবই ছোট। তবে মেঝেতে কার্পেট আছে। দরজায় ফুল তোলা পর্দা। অফিস ঘরের জন্যে পর্দাগুলো মানাচ্ছে না। কার্পেটের রঙের সঙ্গেও মিল খাচ্ছে না। কার্পেট লাল রঙের, পর্দা দুটি নীল। আশফাক বসে বসে পর্দায় কতগুলো ফুল আছে তা গোনার চেষ্টা করছে। তার প্রচণ্ড সিগারেটের তৃষ্ণা হচ্ছে। সিগারেট আছে সঙ্গে, তবে ধরাবার সাহস হচ্ছে না।

মিলিটারি অফিসারটির কাজ মনে হয় শেষ হয়েছে। সে ফাইল-পত্র একপাশে সরিয়ে রেখে আশফাকের দিকে তাকিয়ে চমৎকার ইংরেজীতে বলল, 'কফি খাবে? ঝড় বৃষ্টিতে কফি ভালই লাগবে।'

আশফাক কোন উত্তর দিল না।

ঃ আশফাক তোমার নাম?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ তোমার গাড়িতে যে দুটি ডেড বডি পাওয়া গেছে ওদের নাম কি?

আশফাক নাম বলল। অফিসারটির মনে হলো নামের প্রতি কোনো আগ্রহ নেই। সে হাই তুলে বেয়ারাকে গলায় দু'কাপ কফি দিতে বলল। কফি চলে এল সঙ্গে সঙ্গেই।

ঃ খাও, কফি খাও। আমার নাম রাকিব। মেজর রাকিব। আমি কফিতে দুধ চিনি খাই না। তোমারটাতেও দুধ চিনি নেই। লাগলে বলবে। তুমি সিগারেট খাও?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ তাহলে সিগারেট ধরাও। স্মোকাররা সিগারেট ছাড়া কফি খেতে পারে না।

আশফাক কফিতে চুমুক দিল। চমৎকার কফি। সিগারেট ধরাল। ভাল লাগছে সিগারেট টানতে। মেজর রাকিব তাকিয়ে আছে এক-দৃষ্টিতে। তার চোখ দুটি হাসি হাসি।

ঃ আশফাক।

ঃ বলুন।

ঃ আমরা দু'জনে পনেরো মিনিটের মধ্যে এখান থেকে বেরুব। ঝড়টা কমার জন্যে অপেক্ষা করছি। তুমি আমার সঙ্গে থাকবে এবং

AMARBOI.COM

সহকর্মীরা যেসব জায়গায় থাকে সে সব আমাকে দেখিয়ে দেবে। আমরা আজ রাতের মধ্যেই সবাইকে ধরে ফেলব।

আশফাক তাকিয়ে রইল।

ঃ তোমার সাহায্য আমি মনে রাখব, এইটুকু শুধু তোমাকে বলছি।

আশফাক নিচু গলায় বলল, 'ওরা কোথায় থাকে আমি জানি না।'

মেজর রাকিব এমন ভাব করল যে সে এই কথাটি শুনতে পায়নি। হাসি হাসি মুখে বলল—কেউ কথা না বলতে চাইলে আমাদের বেশ কিছু পদ্ধতি আছে। কিছু কিছু পদ্ধতি বেশ মজার। একটা তোমাকে বলি। এক বুড়োকে আমরা ধরলাম গত সপ্তাহে। আমার ধারণা হল সে কিছু খবরাখবর জানে। ভাব দেখে মনে হলো কিছু বলবে না। আমি তখন ওর মেয়েটিকে ধরে আনলাম এবং বললাম—মুখ না খুললে আমার একজন জোয়ান তোমার সামনে মেয়েটিকে রেপ করবে। পাঁচ মিনিট সময়, এর মধ্যে ঠিক কর বলবে কি বলবে না। বুড়ো এক মিনিটের মাথায় বলতে শুরু করল।

আশফাক বলল, 'স্যার আমি এদের কারোরই ঠিকানা জানি না।'

ঃ এটা কি বিশ্বাসযোগ্য?

ঃ এরা আমার কাছে এসেছে, আমি ওদের গাড়ি করে নিয়ে গিয়েছি। আমি নিজেও মুক্তিযোদ্ধা না।

ঃ ওরা তোমাকে জোর করে নিয়ে গেছে, তাই না? গানপয়েন্টে না গেলে তোমাকে ওরা গুলি করে মেরে ফেলত?

ঃ জ্বি।

ঃ নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে তুমি এই কাজটি করেছ।

ঃ জ্বি স্যার।

ঃ তা তো করবেই। গানপয়েন্টে কেউ কিছু বললে না শুনে উপায় নেই। শুনতেই হয়।

মেজর রাকিব আরেক কাপ কফির কথা বলল। কপি নিয়ে যে লোকটি ঢুকল তাকে বলল, 'তুমি একে নিয়ে যাও। ওর দুটি আঙুল ভেঙে আবার আমার কাছে নিয়ে এস। বেশি ব্যথা দিও না।'

রাকিব হাসি মুখে তাকাল আশফাকের দিকে এবং নরম গলায় বলল—তুমি ওর সঙ্গে যাও। এবং শুনে রাখ এখন বাজে নটা কুড়ি, তুমি নটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে প্রচুর কথা বলবে। সবার বাড়ি দেখিয়ে দেবে। ধরিয়ে দেবে। আমি এই নিয়ে তোমার সঙ্গে দশ হাজার টাকা বাজি রাখতে পারি।

AMARBOI.COM

যে লোকটি আশফাকের ডান হাত নিজের মুঠোয় ধরে রেখেছে তার মুখ গোলাকার। এ রকম গোল মানুষের মুখ হয়! যেন কম্পাস দিয়ে মুখটি আঁকা। তার হাতটিও মেয়েদের হাতের মত তুলতুলে নরম। লোকটি পেনসিলের মত সাইজের একটি কাঠি আশফাকের দু' আঙুলের ফাঁকে রাখল। আশফাকের মনে হচ্ছে এটা একটা স্বপ্নদৃশ্য। বাস্তবে এ রকম কিছু ঘটছে না। গোলাকার মুখের এই লোকটি তার হাত নিয়ে খেলা করছে। আশফাক নিজেই বুঝতে পারল না যে সে পশুর মত আঁ আঁ করে চিৎকার করে উঠেছে। কেউ কি টেনে তার হাতটি ছিঁড়ে ফেলেছে? কি করছে এরা, কি করছে? তীব্র তীক্ষ্ম যন্ত্রণা। দ্বিতীয়বারের মত চিৎকার করেই সে জ্ঞান হারাল।

মেজর রাকিব তাকিয়ে আছে তার দিকে। কি সুন্দর চেহারা এই লোকটির, নাদিমের সঙ্গে মিল আছে। নাকটা লম্বা।

ঃ আশফাক তোমার জ্ঞান ফিরেছে মনে হচ্ছে। ভালই হয়েছে। গাড়ি এসে গেছে। চল, যাওয়া যাক। নাকি যাবার আগে আরেক কাপ কফি খাবে?

আশফাক তাকিয়ে আছে। লোকটি নাদিমের মত লম্বা নয়। একটু খাটো। বড়জোর পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি।

ঃ আশফাক তুমি ওদের ঠিকানা জান নিশ্চয়ই। জান না?

ঃ কয়েকজনের জানি। সবার জানি না।

ঃ ওতেই হবে। ব্যাপারটা হচ্ছে মাকড়শার জালের মত। একটা সুতার সন্ধান পাওয়া গেলে গোটা জালটা খুঁজে পাওয়া যায়। আশফাক।

ঃ বলুন।

ঃ চল রওনা হওয়া যাক।

ঃ আমি আপনাকে কিছুই বলব না।

ঃ কিছুই বলবে না?

ঃ না।

ঃ মাত্র দু'টি আঙুল তোমার ভাঙা হয়েছে। তোমার হাতে আরো আটটি আঙুল আছে।

ঃ আমি কিছুই বলব না।

ঃ তোমার মাথা গরম হয়ে গেছে। অনেক সময় ব্যথার পরিমাণ বেশি হলে মাথা গরম হয়ে যায়। তুমি মাথা ঠাণ্ডা কর। কফি খাও,

AMARBOI.COM

সিগারেট খাও। তারপর আমরা কথা বলব। নাকি সলিড কিছু খাবে? গোশ্‌ত পারাটা?

আশফাক কিছু বলল না। সে তাকিয়ে আছে তার বাঁ হাতের দিকে। মুহূর্তের মধ্যে কেমন ফুলে উঠেছে। এটি কি সত্যি তার হাত?

আশফাক গোশ্‌ত পারাটা খুব আগ্রহ করে খেল। তার এতটা খিদে পেয়েছিল সে নিজেও বুঝতে পারেনি। ঝাল দিয়ে রান্না করা গোশ্‌ত। চমৎকার লাগছে। পশ্চিমারা এতটা ঝাল খায় তার জানা ছিল না।

ঃ আশফাক।

ঃ জ্বি।

ঃ আরো লাগবে?

ঃ জ্বি না।

ঃ কফি চলবে?

ঃ একটা পান খাব।

ঃ পান পাওয়া যাবে না। দোকানপাট বন্ধ। এখন কার্ফু চলছে। সিগারেট আছে তো? না থাকলে বল।

ঃ জ্বি আছে।

ঃ চল তাহলে রওনা দেওয়া যাক।

ঃ কোথায়?

ঃ তুমি তোমার বন্ধুদের দেখিয়ে দেবে। বাড়ি চিনিয়ে দেবে।

আশফাক অনেক কষ্টে এক হাতে দেয়াশলাই জ্বালিয়ে সিগারেট ধরাল। অনেকখানি সময় নিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল। বেশ লাগছে সিগারেট।

ঃ মেজর সাহেব।

ঃ বল।

ঃ আমি কিছুই বলব না।

ঃ কিছুই বলবে না?

ঃ জ্বি না। আপনি তো আমাকে মেরেই ফেলবেন। মারেন। কষ্ট দেবেন না। কষ্ট দেয়া ঠিক না।

ঃ মরতে ভয় পাও না?

ঃ জ্বি পাই। কিন্তু কি করব বলেন? উপায় কি?

ঃ উপায় আছে। ধরিয়ে দাও ওদের। আমি তোমাকে ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা করব। আমি ব্যক্তিগতভাবে এই গ্যারান্টি তোমাকে দিচ্ছি।

ঃ মেজর সাহেব, এটা সম্ভব না।

ঃ সম্ভব না?

AMARBOI.COM

ঃ জ্বি না। আমি তো মানুষের বাচ্চা। কুকুর বেড়ালের বাচ্চাতো না।

ঃ তুমি মানুষের বাচ্চা ?

ঃ জ্বি। আমাকে কষ্ট দেবেন না মেজর সাহেব। মেরে ফেলতে বলেন। কষ্ট সহ্য করতে পারি না।

মেজর রাকিব দীর্ঘ সময় তাকিয়ে রইল। এই ছেলেটির যাবতীয় যন্ত্রণার অবসান করবার জন্যে তার ইচ্ছা করছে। কিন্তু তা সম্ভব নয়। খবর বের করতেই হবে। এটা একটা মাকড়শার জাল। একটা সুতা পাওয়া গেছে। জালটিও পাওয়া যাবে। পেতেই হবে। মানুষ আসলে একটি দুর্বল প্রাণী। মেজর রাকিব আশফাকের আরো দুটি আঙুল ভেঙে ফেলার হুকুম দিয়ে নিজের ঘরে এসে বসল।

বাইরে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে।

রাত এগারোটায় টেলিফোন। নাসিমা ভয়ে ভয়ে টেলিফোন ধরলেন।

ঃ কে ?

ঃ ফুপু আমি।

ঃ কি ব্যাপার রাত্রি ? গলা এরকম শোনাচ্ছে কেন, কি হয়েছে ?

ঃ কিছু হয়নি। ফুপু, তোমার কাছে যে একজন ভদ্রমহিলা এসেছিলেন, মেডিকেল কলেজের এ্যাসোসিয়েট প্রফেসর মিসেস রাবেয়া করিম, ওনার টেলিফোন নাম্বারটা দাও।

ঃ কেন ?

ঃ খুব দরকার ফুপু। তুমি দাও।

ঃ কি হয়েছে বল ?

ঃ বলছি। নাম্বারটা দাও আগে। তোমার পায়ে পড়ি ফুপু।

নাসিমা অবাক হয়ে শুনলেন, রাত্রি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তিনি নাম্বার এনে দিলেন।

সেই নাম্বারে বার বার টেলিফোন করেও কাউকে পাওয়া গেল না। রিং হচ্ছে, কেউ ধরছে না।

মতিন সাহেব ঠিক একই ভঙ্গিতে কাঁধ চেপে ধরে আছেন। তাঁর ধারণা রক্ত বন্ধ হয়েছে। তিনি মনে মনে সারাক্ষণ সূরা এখলাস পড়ছেন।

আলম এখন আর পানি খেতে চাচ্ছে না। খানিকটা আচ্ছন্নের মত হয়ে পড়েছে। সুরমা, এক কাপ গরম দুধ খাওয়াতে চেষ্টা করলেন। এটা সে খেতে পারল বলে মনে হল।

AMARBOI.COM

তার জ্ঞান আছে। ডাকলে সাড়া দেয়। চোখ মেলে তাকায়। সেই চোখ টকটকে লাল।

মতিন সাহেব বললেন—মাথায় জলপট্টি দেয়া দরকার। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। সুরমা, ভেজা তোয়ালে নিয়ে এসো।

ভেজা তোয়ালে দিয়ে কপাল স্পর্শ করতেই আলম কেঁপে উঠল। সুরমা মৃদু স্বরে বললেন, 'বাবা এখন রাত দুটো বাজে। ভোর হতে বেশি বাকি নেই। ভোর হলেই যে ভাবেই হোক তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করব। তুমি শক্ত থাক।'

আশফাক তাকিয়ে আছে শূন্য দৃষ্টিতে। মেজর রাকিবের মুখ এমন গোলকার লাগছে কেন? তার মুখ তো এমন ছিল না। গোল মুখ ছিল ঐ লোকটির, যে আঙুল ভাঙে। ভাঙার সময় কেমন টুক করে শব্দ হয়।

ঃ আশফাক।

ঃ জ্বি।

ঃ চিনতে পারছ আমাকে?

ঃ জ্বি। আপনি মেজর রকিব।

ঃ তুমি কি এখন বলবে?

ঃ জ্বি না। মেজর সাহেব, আপনি আমাকে মেরে ফেলেন, কষ্ট দেবেন না।

মেজর রাকিব তাকিয়ে রইল। এই ছেলেটি কোনো কথা বলবে না, এ বিষয়ে সে এখন নিঃসন্দেহ। তার প্রচণ্ড রাগ হওয়া উচিত। কিন্তু কেন জানি হতে পারছে না। সে ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'তুমি কি কিছু খেতে চাও? কফি কিংবা সিগারেট? খেতে চাইলে খেতে পার। চাও কিছু?'

ঃ জ্বি না। ধন্যবাদ মেজর সাহেব। বহুত শুকরিয়া।

ঃ আশফাক।

ঃ জ্বি।

ঃ তুমি কি বিবাহিত?

ঃ জ্বি স্যার?

ঃ ছেলেমেয়ে আছে?

ঃ জ্বি না।

ঃ নতুন বিয়ে?

ঃ জ্বি।

ঃ স্ত্রীকে ভালবাস?

AMARBOI.COM

আশফাক জবাব দিল না। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। মেজর রাকিব সহজ ভঙ্গিতে বলল, 'জবাব দাও। ভালবাস?'

: জ্বি স্যার।

: তাহলে তো ওর জন্যেই তোমার বেঁচে থাকা উচিত। উচিত নয় কি?

: জ্বি উচিত।

: তাহলে বোকামী করছ কেন? তোমার কি ধারণা কয়েকটি ছেলে ধরা পড়লে যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যাবে? তা তো না। নতুন নতুন ছেলে আসবে। এবং কে জানে এক সময় যুদ্ধে তোমরা জিতেও যেতে পার। পার না?

: জ্বি স্যার পারি।

: নিজের জীবনের চেয়ে মূল্যবান আর কিছুই নেই। এটা একটা সহজ সত্য। তুমি নেই—তার মানে তোমার কাছি পৃথিবীর কোনো অস্তিত্ব নেই—দেশ তো অনেক দূরের কথা। আমি কি ঠিক বলছি?

: জ্বি স্যার ঠিক।

: বেশ, এখন তুমি কথা বল। চল আমার সঙ্গে। শুধুমাত্র একজনকে ধরিয়ে দাও। আমি কথা দিচ্ছি, ভোরবেলায় তোমাকে ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা করব।

আশফাক অনেকক্ষণ মেজর রাকিবের দিকে তাকিয়ে রইল। ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল। তাকাল তার ফুলে ওঠা হাতের দিকে। আহ্ কি অসম্ভব যন্ত্রণা! যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে ইচ্ছে করে। খুবই ইচ্ছে করে।

: চল আশফাক, চল। দেরি হয়ে যাচ্ছে।

: স্যার, আমি কিছু বলব না।

: বলবে না?

: জ্বি না।

দু'জন দীর্ঘসময় দু'জনের দিকে তাকিয়ে রইল। মেজর রাকিব বেল টিপে কাকে যেন ডাকল। শীতল গলায় আশফাককে মেরে ফেলবার নির্দেশ দিল। আশফাক বিড় বিড় করে বলল, 'স্যার যাই। স্লামালিকুম।'

আলম কোনো সাড়াশব্দ করছে না। তার পা আগুনের মত গরম। কিছুক্ষণ আগেও ছটফট করছিল। এখন সে ছটফটানি নেই। একবার শুধু বলল, 'পানি খাব। পানি দিন।'

মতিন সাহেব চামচে করে পানি দিলেন। সেই পানি সে খেল না। মুখ ফিরিয়ে নিল।

: পানি চেয়েছিলে তুমি। একটু হাঁ কর।

AMARBOI.COM

ঃ না।

ঃ ব্যথা কি খুব বেশি ?

ঃ না বেশি না।

মতিন সাহেব চিন্তিত বোধ করলেন। হঠাৎ করে ব্যথা কমে যাবে কেন ? এর মানে কি ?

ঃ আলম, আলম।

ঃ জ্বি।

ঃ ভোর হতে খুব দেরি নেই। তোমার আত্মীয়স্বজন কাকে খবর দেব বল তো।

আলম জবাব দিল না। মতিন সাহেব এই প্রশ্নটি দ্বিতীয়বার করলেন। আলম বলল, 'কাউকে বলতে হবে না।'

ঃ কেন বলতে হবে না ? নিশ্চয়ই বলতে হবে।

ঃ কেন বিরক্ত করছেন ?

মতিন সাহেব চুপ করে গেলেন।

আলম বিড় বিড় করে বলল, 'আমার মাথার নিচে আরেকটা বালিশ দিন।'

তার কাছে মনে হচ্ছে তার মাথাটা ক্রমেই নিচে নেমে যাচ্ছে। টেনে কেউ তাকে নিয়ে যাচ্ছে অতলান্তিক জলে। কিছুতেই ভাসিয়ে রাখা যাচ্ছে না। ঘর-বাড়ি অচেনা হয়ে যাচ্ছে। সে কি মারা যাচ্ছে ? মরবার আগে সমস্ত অতীত স্মৃতি নাকি ঝলসে ওঠে। কই সেরকম তো কিছু হচ্ছে না। চোখের সামনে কিছুই ভাসছে না। কোনো স্মৃতি নেই। চেষ্টা করেও কিছু মনে করা যাচ্ছে না। যতবার সে কিছু মনে করবার চেষ্টা করছে, ততবারই সাদেকের মুখ ভেসে উঠছে। নূরুর মুখের ছবি আসছে না। অথচ গাড়ি থেকে বের হবার সময় সে এই দু'জনের দিকেই তাকিয়ে ছিল। তার চেয়েও আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে নুরুকে সে অনেক বেশি পছন্দ করে। অনেক বেশি। কি ঠাণ্ডা একটা ছেলে! বয়স কত হবে ? কুড়ি একুশ ? তার চেয়েও কম হতে পারে। কোনো দিন জিজ্ঞেস করা হয়নি। জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল।

ঃ মতিন সাহেব।

ঃ কি বাবা ?

ঃ আমাদের সঙ্গে দুটি ছেলে ছিল। ওরা মারা গেছে।

ঃ বাবা, তুমি চুপ করে থাক। কথা বলবে না। কোনো কথা বলবে না।

ঃ পানি খাব।

AMARBOI.COM

বিন্তি এক চামচ পানি দিল মুখে। রাত্রি এসে দাঁড়িয়েছে দরজার পাশে। সেখান থেকেই সে বলল, 'আপনার কি এখন একটু ভাল লাগছে? রাত সাড়ে তিনটা, সকাল হতে বেশি বাকি নেই।'

আলমের মাথা আবার কেমন ভারী হয়ে যাচ্ছে। সে কি আবার তলিয়ে যেতে শুরু করেছে? কিন্তু সে তলিয়ে যেতে চায় না। জেগে থাকতে হবে। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে।

পাশা ভাইও এরকম গুলি খেয়েছিল। গুলি লেগেছিল পেটে। ভয়াবহ অবস্থা, কিন্তু পাশা ভাই ছিলেন ইস্পাতের মত। মৃত্যুর আগের মুহূর্তেও বললেন—আমাকে মেরে ফেলা এত সহজ না। সামান্য একটা সিসার গুলি আমাকে মেরে ফেলবে। পাগল হয়েছিস তোরা? বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচাগ্র মেদিনী।' কথায় কথায় কবিতা বলতেন। ছড়া বলতেন। দেশের সেরা সন্তানদের আমরা হারাচ্ছি। এরা দেশের শ্রেষ্ঠতম ফসল। এই দেশ বীরপ্রসবিনী।

রাত্রির পাশে তার মা এসে দাঁড়িয়েছেন। কি করুণ লাগছে ভদ্রমহিলার মুখ। আলম একবার ভাবল বলবে, 'আপনাদের অনেক ঝামেলায় ফেললাম।' কিন্তু বলা গেল না। বললে নাটকীয় শোনাবে। বাড়তি নাটকের এখন কোনো দরকার নেই। আলম বলল, 'ক'টা বাজে?'

ঃ তিনটা পঁয়ত্রিশ।

মাত্র পাঁচ মিনিট গিয়েছে? সময় কি থেমে গেছে? কে একজন ছিল না, যে সময়কে থামিয়ে দিয়েছিল? কি নাম যেন? মহাবীর থর? না অন্য কেউ? সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। আবার সাদেকের মুখটা ভাসছে। মৃত মানুষদের কথা এখন আমি ভাবতে চাই না। কিছুতেই না। আমি ভাবতে চাই জীবিত মানুষদের কথা। মা'র কথা ভাবতে চাই। বোনের কথা ভাবতে চাই, এবং এই মেয়েটির কথাও ভাবতে চাই। রাত্রি! কি অদ্ভুত নাম!

আলম পাশ ফিরতে চেষ্টা করল। সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ল তীব্র তীক্ষ্ণ ব্যথা। আবার সে ডুবে যেতে শুরু করেছে। সে বিড় বিড় করে বলল, 'মতিন সাহেব, মাথাটা একটু উঁচু করে দিন!'

রাত্রি একা একা বারান্দায় বসে আছে। সে তাকিয়ে আছে নারকেল গাছের দিকে। সেখানে বেশ কিছু জোনাকি ঝিকমিক করছে। শহরেও জোনাকি আছে তার জানা ছিল না। ভাল লাগছে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকতে।

AMARBOI.COM

পাশের বাড়ির দোতলা ফ্ল্যাটে একটি ছোট বাচ্চা কাঁদছে। তার মা তাকে শান্ত করার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না।

আকাশ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। একটি দুটি করে তারা ফুটতে শুরু করেছে। রাত্রি লক্ষ্য করল আকাশের তারার সঙ্গে জোনাকিদের চমৎকার মিল আছে।

বাচ্চাটা কান্না থামিয়েছে। হয়ত দুধ বানিয়ে দিয়েছে তার মা। নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমচ্ছে। আহ্ শিশুরা কত সুখী!

সুরমা বারান্দায় এসে তাকালেন মেয়ের দিকে। তাঁর বুকে ধ্বক করে একটা ধাক্কা লাগল।

ঃ রাত্রি।

ঃ কি মা ?

ঃ একা একা বসে আছিস কেন ?

রাত্রি জবাব দিল না। তাকিয়ে রইল জোনাকির দিকে। সুরমা ক্লান্ত স্বরে বললেন, 'ভোর হতে দেরি নেই।'

রাত্রি ঠিক আগের মতই বসে রইল। সুরমা বললেন, 'তুই চিন্তা করিস না। আমার মনে হয় ও সুস্থ হয়ে উঠবে। তোর মনে হয় না?'

ঃ আমার কিছু মনে-টনে হয় না।

বলতে গিয়ে রাত্রির গলা ধরে গেল। ইচ্ছা করল চেঁচিয়ে কেঁদে উঠতে।

সুরমা বসলেন মেয়ের পাশে। একটি হাত রাখলেন তার পিঠে। অস্বাভাবিক কোমল স্বরে বললেন, 'দেশ স্বাধীন হয়ে যাবার পর আমি আলমের মা'র কাছে গিয়ে বলব—চরম দুঃসময়ে আমরা আপনার ছেলের কাছে ছিলাম। তার ওপর আমাদের দাবি আছে। এই ছেলেটিকে আপনি আমায় দিয়ে দিন।'

দু'জনে অনেকক্ষণ কোন কথা বলল না। রাত্রির চোখ দিয়ে ক্রমাগত জল পড়তে লাগল। সুরমা মেয়েকে কাছে টানলেন। চুমু খেলেন তার ভেজা গালে।

রাত্রি ফিস ফিস করে বলল, 'জোনাকিগুলোকে আর দেখা যাচ্ছে না কেন মা?

জোনাকি দেখা যাচ্ছে না, কারণ ভোর হচ্ছে। আকাশ ফর্সা হতে শুরু করছে। গাছে গাছে পাখ পাখালী ডানা ঝাপটাচ্ছে। জোনাকিদের এখন আর প্রয়োজন নেই।

সূর্যের দিন

এ বাড়ির নিয়ম হচ্ছে যাদের বয়স বারোর নিচে তাদের বিকেল পাঁচটার আগে ঘরে ফিরতে হবে। যাদের বয়স আঠারোর নিচে তাদের ফিরতে হবে ছ'টার মধ্যে।

খোকনের বয়স তেরো বছর তিন মাস। কাজেই তার বাইরে থাকার মেয়াদ ছ'টা। কিন্তু এখন বাজছে সাড়ে সাতটা। বাড়ির কাছাকাছি এসে খোকনের বুক শুকিয়ে তৃষ্ণা পেয়ে গেল। আজ বড়-চাচার সামনে পড়ে গেলে ভূমিকম্প হয়ে যাবে।

অবশ্যি চমৎকার একটি গল্প তৈরি করা আছে। খোকন ভেবে রেখেছে সে মুখ কালো করে বলবে—'সাজ্জাদের সঙ্গে স্কুলে খেলছিলাম, হঠাৎ দেখলাম বিরাট একটা মিছিল আসছে। সবাই খুব শ্লোগান দিচ্ছে—'জাগো বাঙালী জাগো' আমরা দূর থেকে দেখছি। এমন সময় গণ্ডগোল লেগে গেলো। পুলিশের গাড়ির ওপর সবাই ইট-পাটকেল মারতে লাগলো। চারদিকে হৈ চৈ ছোটাছুটি। আমি সাজ্জাদকে সঙ্গে নিয়ে ছুটতে লাগলাম। পেছনে পটাপট শব্দ হচ্ছে, বোধ হয় গুলি হচ্ছে। আমরা আর পেছন ফিরে তাকাইনি, ছুটছিতো ছুটছিই। ফিরতে দেরি হলো এইজন্যে।'

খুব বিশ্বাসযোগ্য গল্প। আজকাল রোজই মিছিল হচ্ছে। আর রোজই গণ্ডগোল হচ্ছে। মিছিলের ঝামেলায় পড়ে যাওয়ার কথা সবাই বিশ্বাস করবে।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে বড়চাচাকে ঠিক সাধারণ মানুষের পর্যায়ে ফেলা যায় না। তাঁর সম্ভবত তিন নম্বর চোখ বলে কিছু আছে, যা দিয়ে তিনি অনেক দূর পর্যন্ত দেখে ফেলেন। কথা বলতে শুরু করেন

AMARBOI.COM

অত্যন্ত নিরীহ ভঙ্গিতে। ভাবখানা এ রকম যেন, কিছুই জানেন না। সেবারের ঘটনাটাই ধরা যাক। ফজলুর পাল্লায় পড়ে ফার্স্ট শো সিনেমা (গোলিয়াথ এণ্ড দা ড্রাগন, খুবই মারাত্মক ছবি) দেখে বাড়িতে পা দেয়া মাত্র বড়চাচার সামনে পড়ে গেল। বড়চাচা হাসি মুখে বললেন, 'এই যে খোকন, এই মাত্র ফিরলে বুঝি?'

: জ্বি চাচা।

: একটু মনে হয় দেরি হয়ে গেছে।

: অঙ্ক করছিলাম।

: তাই নাকি?

: জ্বি। ফজলুর এক মামা এসেছেন। খুব ভাল অঙ্ক জানেন। উনি দেখিয়ে দিচ্ছিলেন।

: পাটিগণিত?

: জ্বি পাটিগণিত। পাটিগণিতই উনি ভাল জানেন। তৈলাক্ত বাঁশের অঙ্কটা আজ খুব ভাল বুঝেছি।

বড়চাচা দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, 'একটা মুশকিল হয়ে গেলো খোকন। তোমার দেরি দেখে ফজলুদের বাসায় লোক পাঠানো হয়েছিল। সে কিন্তু তোমাদের দেখতে পায়নি।'

খোকন মহাবিপদেও মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারে। এবারও পারলো। হাসিমুখে বললো, 'আমরা তো ফজলুর বাসায় অঙ্ক করছিলাম না। ওদের বাসায় খুব গণ্ডগোল হয় তো, তাই আমরা জহিরদের বাসায় গেলাম।'

: এটা ভালই করেছ। পড়াশোনা করবার জন্য নিরিবিলি দরকার। ফজলুর মামা যে তোমাদের জন্যে এতটা কষ্ট স্বীকার করেছেন সে জন্যে তুমি তাঁকে আমার হয়ে ধন্যবাদ দিও।

: জ্বি চাচা দেব।

: আর তুমি তাঁকে আগামীকাল আমাদের বাসায় চা খেতে বলবে। তুমি নিজে তাঁকে নিয়ে আসবে, কেমন?

খোকন ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। বড়চাচা চশমার কাঁচ পরিস্কার করতে করতে বললেন—খোকন কি সিনেমা দেখলে?

এই হচ্ছেন বড়চাচা। এ রকম একজন মানুষের ভয়ে যদি কারো বুক কাঁপে তাহলে বোধ হয় তাকে ভীরু বা কাপুরুষ বলা ঠিক হবে না। খোকন এই ঠাণ্ডার মধ্যেও ঘামতে লাগলো।

AMARBOI.COM

তবে একতলার সবচে বাঁ দিকের ঘরটিতে আলো জ্বলছে। এটা একটা সুলক্ষণ। এর মানে হচ্ছে বড়চাচার কাছে মক্কেল এসেছে। তিনি মামলার নথিপত্র নিয়ে ব্যস্ত। খোকন এত রাত পর্যন্ত বাইরে এটা বোধ হয় এখনো ধরতে পারেন নি। যা হবার হবে, খোকন খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে পড়লো।

কিন্তু আশ্চর্য, কিছুই হলো না। সবাই যেন কেমন খুশি খুশি। উৎসব উৎসব একটা ভাব। ছোটরা চিৎকার চেঁচামেচি করছে, কেউ তাদের বকছে না। বড়চাচী পান বানাতে বানাতে কি গল্প বলে হেসে গড়িয়ে পড়ছেন। ঈদের আগের রাতে যে রকম একটা আনন্দ ভাব থাকে, চারিদিকের অবস্থা সে রকম। কিছু ঘটেছে, কিন্তু এখুনি কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করা ঠিক হবে না। খোকন এমন ভঙ্গিতে ঘুরে বেড়াতে লাগলো যেন সে সরাক্ষণ বাড়িতেই ছিল। অনজু আর বিলু সাপলুডু খেলছিলো। ওদের পাশে কিছুক্ষণ দাঁড়ালো। বিলুটা মহা-চোর। তার পড়েছে চার কিন্তু সে পাঁচ চেলে তরতর করে মই বেয়ে উঠে গেলো। পরের বার উঠলো পাঁচ, একেবারে সাপের মুখে। সে আবার চাললো চার। অনজুটা এমন বোকা, কিছুই বুঝতে পারছে না। খোকন বললো—এইসব কি হচ্ছে বিলু?

ঃ কিছুই হচ্ছে না। তুমি মেয়েদের খেলায় কথা বলতে এসেছ কেন? কোথায় ছিলে সারা সন্ধ্যা?

ঃ ঘরেই ছিলাম। যাবো আবার কোথায়?

খোকন সেখানে আর দাঁড়াল না। চলে এলো দোতলায়। বাবার ঘরে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলো—'প্যাথলজি' শব্দের মানে কি। যাতে বাবা বুঝতে পারেন সে পড়াশোনা নিয়েই আছে।

বাবাকে কিছু জিজ্ঞেস করা মুশকিল। তিনি অল্প কথায় কোনো জবাব দিতে পারেন না। প্যাথলজি শব্দের মানে বলতে তিনি পনেরো মিনিট সময় নিলেন। চিকিৎসা শাস্ত্রের কথা বললেন, ভেষজ বিজ্ঞানের ইতিহাস বললেন, শারীরবিদ্যায় প্রাচীন গ্রীকদের অবদানের কথা বললেন। খোকন চোখ বড় বড় করে শুনলো। তার ভঙ্গিটা এরকম, যেন সে খুব মজা পাচ্ছে। বাবা বক্তৃতা শেষ করে বললেন—যা যা বললাম সব খাতায় লিখে রাখবে।

ঃ জ্বি রাখব।

ঃ লিখবার আগে ছোটদের এনসাইক্লোপিডিয়াটাও দেখে নেবে। আমি হয়ত অনেক পয়েন্টস মিস করেছি।

AMARBOI.COM

ঃ আমি দেখে তারপর লিখব।

ঃ গুড্। আর শোন, সন্ধ্যাবেলা তোমার মা তোমার খোঁজ করছিলেন। সারা বিকেল তুমি তার কাছে যাওনি। চারদিকে ঝামেলা টামেলা হচ্ছে, সে খুব চিন্তিত থাকে। যাও দেখা করে এস।

মা থাকেন দোতলায় সবচে শেষ ঘরটায়। দীর্ঘদিন ধরে তিনি বিছানায় শুয়ে আছেন। হার্টের খুব খারাপ ধরনের একটা অসুখ, যাতে একটুও নড়াচড়া করা যায় না। রাতের বেলা একজন এ্যাংলো নার্স মিস গ্রিফিন এসে মা'র সঙ্গে থাকে। সে ছেলেদের মত সিগারেট খায়। বাচ্চারা কেউ শব্দ করে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠলেই প্রচণ্ড ধমক দেয়।

মিস গ্রিফিন মা'র ঘরের সামনের বারান্দায় বসে সিগারেট টানছিলো। খোকনকে দেখেই ভ্রূ কুঁচকে বললো—কি চাও তুমি?

ঃ মা'র কাছে যাব।

ঃ এখন না। এখন ঘুমাচ্ছে। সকালে আসবে। গো এওয়ে।

খোকন নিচে নেমে এসে দেখলো টেবিলে ভাত দেয়া হয়েছে। ফার্স্ট ব্যাচ খেতে বসবে। ফার্স্ট ব্যাচ হচ্ছে বাচ্চাদের, যাদের বয়স পনেরোর নিচে তাদের। এদের সঙ্গে বসে খেতে খোকনের লজ্জা লাগে। কিন্তু কিছু করার নেই, বড়চাচার নিয়ম। কবির ভাই গত নভেম্বরে পনোরোতে পড়েছেন কাজেই তিনি এখন গম্ভীর মুখে সেকেণ্ড ব্যাচ বড়দের সঙ্গে খেতে বসেন। ফার্স্ট ব্যাচ খেতে বসলেই এক ফাঁকে এসে বলেন, 'আহ্ বড্ড গণ্ডগোল হচ্ছে। খাওয়ার সময় এত কথা কিসের?' খোকনের গা জ্বলে যায়। কিন্তু সহ্য করা ছাড়া উপায় কি?

AMARBOI.COM

খেতে বসেই খোকন জানতে পারলো কি জন্যে আজ বাড়িতে এমন খুশি খুশি ভাব। ছোটচাচারা আমেরিকা থেকে ঢাকা চলে আসছেন। বিদেশ আর ভাল লাগছে না। আনন্দে খোকন বিষম খেয়ে ফেললো। ছোটচাচা এখন থেকে এ বাড়িতেই থাকবেন, এরচে আনন্দের খবর আর কিছু হতে পারে নাকি?

ছোটচাচা ফুর্তি ছাড়া এক মিনিটও থাকতে পারেন না। সব সময় তাঁর মাথায় মজার মজার সব ফন্দি আসে। খোকন যখন ক্লাস থ্রীতে পড়ে তখন তিনি একবার ঠিক করলেন ঢাকা শহরের ভিক্ষুকদের গড় আয় কি তা নিয়ে একটা সমীক্ষা চালাবেন। সমীক্ষার বিষয় হচ্ছে একজন ভিক্ষুক দৈনিক কত আয় করে। তারপর একদিন সত্যি সত্যি নকল দাড়ি গোঁফ লাগিয়ে ময়লা একটা লুঙ্গি পরে খালি গায়ে ভিক্ষা করতে বেরুলেন। দুপুর তিনটার মধ্যে আড়াই সের চাল, এক টাকা

পঁয়ত্রিশ পয়সা এবং একটা ছেঁড়া হলুদ রঙের সোয়েটার পেয়ে গেলেন। গম্ভীর হয়ে বললেন, 'পেশা হিসেবে ভিক্ষাবৃত্তি খুব খারাপ না।' যে লোক এমন একটা কাণ্ড করে তাকে ভাল না বেসে পারা যায় ?

খোকন খাওয়া শেষ করে যখন হাত মুখ ধুচ্ছে তখন বড়চাচা বেরুলেন তাঁর ঘর থেকে। খোকনের সামনে দাঁড়িয়ে শান্ত স্বরে বললেন—সাতটা বাজার দশ মিনিট আগে আমি তোমাকে এ বাড়িতে দেখিনি, কোথায় ছিলে ? খোকন বলতে চেষ্টা করলো—বাথরুমে ছিলো। বলতে পারলো না। কথা গলা পর্যন্ত এসে আলজিভে ধাক্কা খেয়ে থেমে গেলো। বড়চাচা দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন—চারদিকে হাঙ্গামা হুজ্জুত হচ্ছে, এর মধ্যে তুমি বাইরে। স্বাধীনতা বেশি পেয়ে যাচ্ছো। যাই হোক, তুমি কোথায় ছিলে কি করছিলে তা শুদ্ধ বাংলায় লিখে আজ রাত দশটার মধ্যে আমার কাছে জমা দেবে।

ঃ জ্বি আচ্ছা।

ঃ কাল সারাদিন ঘর থেকে বেরুবে না। সারাদিন থাকবে দোতলায়। নিচে নামবে না।

ঃ জ্বি আচ্ছা।

ঃ মিছিল টিছিলে গিয়েছিলে নাকি ?

ঃ জ্বি না।

ঃ আচ্ছা ঠিক আছে। যাও।

খোকন দোতলায় তার নিজের ঘরে এসে মুখ কালো করে বসে রইলো। কি জন্যে আজ ফিরতে দেরি হয়েছে তা লেখাটা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারলো না। বিষয়টা গোপনীয়। কিন্তু বড়চাচার কাছে গোপন করা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে ? নির্ঘাৎ ধরে ফেলবেন।

খোকন একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সত্যি কথাই লিখতে শুরু করলো। লেখা হলো সাধু ভাষায়---

'আজ (২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭১) আমরা একটি গোপন দল করিয়াছি। দলটির নাম "ভয়াল-ছয়"। দলের সদস্য সংখ্যা ছয়। সদস্যরা কিছুদিনের মধ্যেই পায়ে হাঁটিয়া পৃথিবী ঘুরিতে বাহির হইবে। আমাদের প্রথম গন্তব্য আফ্রিকার গহীন অরণ্য। কঙ্গো নদীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল।'

প্রায় দশটা বাজে।

ভয়াল-ছয় বাহিনীর দু'জন সদস্যকে দেখা গেল খোকনদের বাড়ির সামনে হাঁটাহাঁটি করছে। দু'জনই বেশ চিন্তিত। একজনের নাম

AMARBOI.COM

শাহজাহান। সে বেশ বেঁটে। তার বন্ধুদের ধারণা, যতই দিন যাচ্ছে ততই সে বেঁটে হচ্ছে। ক্লাস সিক্সে পড়ার সময় সে নাকি এতটা বেঁটে ছিল না। ক্লাসের ছেলেরা তাকে শাহ্জাহান ডাকে না, ডাকে—বল্টু। বেঁটে ছেলেদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা সাধারণত খুব লম্বা হয়। কিন্তু শাহ্-জাহানের ক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রম আছে। তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু সাজ্জাদও সাইজে শাহ্‌জাহানের মতই। সাজ্জাদ পড়াশোনা ও মারামারি দুটোতেই সমান দক্ষ বলে তার অন্য কোনো নাম নেই। ক্লাস সেভেনে পড়বার সময় টুনু তাকে দুয়েকবার 'মুরগি' ডাকার চেষ্টা করেছে। সাজ্জাদ টিফিন টাইমে টুনুর নাকে গদাম করে একটা ঘুষি মেরে বলেছিলো, 'আর মুরগি ডাকবি?' টুনু দুহাতে নাক চেপে বললো, 'নাঁ'।

ঃ বল কোনো দিন ডাকব না।

ঃ কোনো দিন ডাঁকব না।

টুনু মুরগি নাম দ্বিতীয় বার উচ্চারণ করেনি, কিন্তু তাকেই সবাই চীনা-মুরগি ডাকতে শুরু করলো। চীনা-মুরগিও উয়াল-ছয় বাহিনীর একজন সদস্য। তারও খোকনদের বাসায় আসবার কথা ছিল। আসতে পারেনি, কারণ তার ছোট ভাই আজ সকালেই সাইকেলের নিচে পড়ে হাত ছিলে ফেলে। টুনুকে তার ভাইয়ের সঙ্গে হাসপাতালে যেতে হয়েছে। সাড়ে ন'টার মধ্যে টুনুর চলে আসার কথা। কিন্তু আসছে না। এদিকে খোকনও বেরুচ্ছে না বাড়ি থেকে। সাজ্জাদ বললো, 'কি করবি বল্টু? গেট দিয়ে ঢুকবি খোকনদের বাড়ি?'

ঃ নাহ্।

ঃ নাহ্ কেন? খেয়েতো ফেলবে না? দারোয়ানকে গিয়ে বলব—আমরা খোকনের বন্ধু।

ঃ তুই গিয়ে বল।

সাজ্জাদ সাহস করে গেট পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েও ফিরে এলো। খোকনদের বাড়ির দারোয়ানটির চাউনি খুব আন্তরিক মনে হলো না তার কাছে। তার ওপর একটি কুকুর আছে। গেটের কাছে যাওয়া মাত্রই সে এমন একটি ডাক ছাড়লো যাকে কুকুরের ডাক বলে মনে হয় না। বল্টু বললো, 'কিরে ভীতুর ডিম, গেলি না ভেতরে?'

ঃ বড়লোকের বাড়িতে ঢুকতে ইচ্ছে করে না।

বল্টু কিছু বললো না। কারণ এটি তারও মনের কথা। যে বাড়ির ছেলেদের পাঁচ জোড়া জুতো থাকে সে বাড়িতে ঢুকতে ভাল লাগে না।

AMARBOI.COM

সাজ্জাদ বললো, 'ঢিল মারলে কেমন হয়? খোকনের ঘরের জানালায় চল ঢিল মারি।'

ঃ কোনটা ওর জানালা?

সাজ্জাদ চুপ করে গেল। খোকনের ঘর কোনটি তা তার জানা নেই। একদিন মাত্র সে এসোছিলো এ বাড়িতে, তাও ভেতরে ঢোকেনি। বল্টু বললো, 'চল দারোয়ানকে গিয়ে বলি ভেতরে খবর দিতে। খোকনকে গিয়ে বলবে, দু'জন বন্ধু এসেছে, খুব জরুরী দরকার।'

ঃ যদি না যায়?

ঃ যাবে না মানে, একশবার যাবে ।

ঃ তাহলে তুই গিয়ে বল।

ঃ আমি একা বলব কেন? আমার কি দায় পড়লো?

দু'জনের কাউকেই যেতে হলো না। দেখা গেলো দারোয়ান নিজেই আসছে। গেটের ভেতরে তাকে যে রকম ভয়ংকর মনে হচ্ছিল, এখন আর সেরকম মনে হচ্ছে না।

ঃ আপনাদের ডাকে।

ঃ কে ডাকে?

ঃ বড় সাহেব। আসেন আমার সাথে।

বল্টু এবং সাজ্জাদ মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো। বড় সাহেব মানে খোকনের বড়চাচা। তিনি তাদের ডাকবেন কেন শুধু শুধু? এই সময় টুনুকে আসতে দেখা গেল। সে বোধ হয় কিছু একটা আঁচ করেছে। সাজ্জাদ দেখলো—টুনু দাঁড়িয়ে পড়েছে। পর মুহূর্তেই টুনুকে লম্বা লম্বা পা ফেলে পাশের গলিতে ঢুকে পড়তে দেখা গেলো। এরকম ভীতুর ডিমকে ভয়াল-ছয়ে ঢোকানো খুব ভুল হয়েছে।

বড়চাচা ইজিচেয়ারে শুয়ে ছিলেন। ওদের দেখে উঠে বসলেন।

ঃ খোকনের সঙ্গে মনে হয় তোমাদের খুব জরুরী প্রয়োজন। অনেকক্ষণ ধরেই দেখছি ঘুরঘুর করছ।

ওরা জবাব দিল না। বড়চাচা বললেন, 'তোমরা দু'জনেই কি 'ভয়াল-ছয়'-এ আছো?' সাজ্জাদ ও বল্টু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো। এর মানে কি? ভয়াল-ছয়ের কথাতো তাঁর জানার কথা নয়।

AMARBOI.COM

বড়চাচা শান্ত স্বরে বললেন, 'তোমরা কি খোকনের বন্ধু?' উত্তর দিল সাজ্জাদ—

ঃ জ্বি।

ঃ আফ্রিকার গহীন অরণ্যে যাচ্ছ কবে?

প্রশ্নটা করা হল বল্টুকে। বল্টুর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমলো।

ঃ খুব শিগগীরই রওনা হচ্ছ নাকি?

ঃ জ্বি।

ঃ পায়ে হেঁটেই যাবে?

ঃ জ্বি।

ঃ প্রথমেই একেবারে আফ্রিকার গহীন অরণ্যে? এই দেশটা একবার দেখে নিলে হত না?

বল্টু বললো, 'এই দেশ আমরা পরে দেখব।'

ঃ আমার মনে হয় প্রথমে নিজের দেশটাই দেখা উচিত। আমি হলে তাই করতাম। বস, তোমরা ঐ চেয়ারে বস।

ওরা বসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্লেটে করে সন্দেশ চলে এলো। বড়চাচা বললেন, 'খোকনের সঙ্গে তো আজ দেখা হবে না। ও আজ সারা দিন ঘর থেকে বেরুতে পারবে না।' সাজ্জাদ ও বল্টু দু'জনের কেউই কোনো কথা বললো না। বড়চাচা বললেন, 'জিজ্ঞেস করো কেন খোকন আসবে না?' কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলো না। বড়চাচা বললেন, 'ও কাল রাত ন'টার পর বাড়ি ফিরেছে, সেজন্যে শাস্তি। বুঝতে পারছ?'

ঃ জ্বি পারছি।

ঃ তোমরা ছাড়া আর কে কে যাচ্ছে? সব মিলে ছ'জন না?

ঃ জ্বি না পাঁচজন। টগর আজ সকালে বলেছে সে যাবে না।

ঃ যাবে না কেন?

ঃ ওর নাকি ভয় লাগছে।

ঃ তাহলে তোমরা এখন ভয়াল-পাঁচ?

ঃ জ্বি।

ঃ আমার তো মনে হয় আরো কমবে। শেষ মুহূর্তে অনেকেই পিছিয়ে পড়বে। শেষ মুহূর্তে অনেকের সাহস থাকে না। খাও সন্দেশ খাও।

সাজ্জাদ সন্দেশ খেতে খেতে চারদিকে তাকালো। সিনেমায় বড়লোকদের বাড়ি যে রকম সাজানো থাকে সে রকম সাজানো। লাল টুকটুক কার্পেট। ময়লা জুতো পরে কেউ নিশ্চয়ই এ কার্পেটে পা দেয় না।

AMARBOI.COM

কার্পেট থেকেই লালাভ একটি আভা ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। ঘরের দেয়াল ঘেঁষে উঁচু উঁচু চেয়ার। চেয়ারের গদিগুলোও লাল রঙের। মাঝখানের মস্ত টেবিলটি কি পাথরে তৈরি? খোকনকে জিজ্ঞেস করতে হবে।

ঃ সন্দেশ খাচ্ছো না কেন? যে ক'টি খেতে পার খাও।

গব গব করে পাঁচ ছ'টা সন্দেশ শেষ করে দেয়াটা অভদ্রতা হবে ভেবেই বল্টু ইতস্তত করছিল। বড়চাচা বললেন, 'খেতে ইচ্ছে হলে খাবে। না খাওয়ার মধ্যে কোনো ভদ্রতা নেই।'

সাজ্জাদ এক সঙ্গে দুটো সন্দেশ মুখে পুড়ে দিল। মিষ্টির ভেতরও যে এমন সুন্দর গন্ধ থাকতে পারে তা তার জানা ছিল না। এ মিষ্টিগুলো কি বাড়িতেই তৈরি হয়? সাজ্জাদের হঠাৎ করে বড়লোক হবার ইচ্ছে হলো। খোকনদের মত বড়লোক। বড়চাচা বললেন, 'আচ্ছা তাহলে তোমরা যাও। খোদা হাফেজ।'

বল্টুর ইচ্ছে হলো এগিয়ে গিয়ে পা ছুঁয়ে সালাম করে ফেলে। মুরব্বীদের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হলে যে রকম করা হয়। কিন্তু সাহসে কুলালো না। যখন বেরিয়ে যাচ্ছে তখন বড়চাচা আবার ডাকলেন— 'তোমাদের একটা কথা জিজ্ঞেস করা হয়নি, তোমরা কি মিছিলে যাও? অর্থাৎ আমি জানতে চাচ্ছি [illegible]ন-ছয়ের সদস্যারা মিছিলে যায়?' সাজ্জাদ ইতস্তত করে বললো, ওরা যায় না, আমি যাই।

ঃ কেন যাও?

সাজ্জাদ জবাব দিতে পারল না।

ঃ এইসব মিছিল টিছিল কেন হচ্ছে জান?

ঃ জানি।

ঃ কেন?

সাজ্জাদ জবাব দিতে পারলো না। বড়চাচা গম্ভীর মুখে বললেন, 'না না তুমি জান না। মিছিল টিছিল করা এখন আমাদের স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে। কথায় কথায় মিছিল। সভা, শোভাযাত্রা। এইসব কি? রাতদিন রাস্তায় চেঁচামেচি করলে মানুষ কাজ করবে কখন?'

সাজ্জাদ কিছু বললো না। বড়চাচা হঠাৎ করে কেন রেগে যাচ্ছেন সে বুঝতে পারছে না।

ঃ আওয়ামী লীগ ইলেকশনে জিতেছে, ভাল কথা। কিন্তু এমন করছে যেন তারা যা বলবে তাই। আরে বাবা পাকিস্তানের কথাওতো শুনতে হবে। হবে কিনা বল?

AMARBOI.COM

সাজ্জাদ না বুঝেই মাথা নাড়লো।

ঃ শেখ সাহেবের যে পরিকল্পনা তাতে তো দেশটাই ছারখার হবে। পাকিস্তান আনার জন্যে আমরা কম কষ্ট করেছি? এখন পাকিস্তানের কথা বলে না, সবাই শুধু বাঙালী বাঙালী করে। বাঙালী ছাড়াও তো লোক আছে। পাঞ্জাবী আছে, সিন্ধী আছে, এরা মানুষ না? সবাইকে নিয়ে মিলেমিশে থাকা যায় না?

ঃ জ্বি যায়।

বড়চাচা গলা উঁচিয়ে বললেন—মিছিলে-টিছিলে কখনো যাবে না। এখন পড়াশোনার সময়, পড়াশোনা করবে। ব্যাস। কথায় কথায় মিছিল, এইসব কি? যাও বাড়ি যাও।

AMARBOI.COM

ছুটির দিনে খোকন সাধারণত খুব ভোরে ওঠে। বই নিয়ে পড়তে হবে না, এই আনন্দেই ঘুম ভেঙে যায় সকাল সকাল। এখন সবদিনই ছুটি। অনেক দিন ধরে স্কুল হচ্ছে না। তবু এ বাড়ির নিয়মে ছুটি মাত্র একদিন—শুক্রবার। সেদিন ঘুম থেকে ওঠার জন্যে কেউ ডাকাডাকি করবে না। কেউ যদি সারাদিন ঘুমতে চায় তাহলে তাও পারবে। ছোটরা বাড়ির ভেতর চিৎকার চেঁচামেচি করলেও তাদের কোনো প্রশ্ন করা হবে না। টিভির সামনে রাত এগারোটা পর্যন্ত বসে থাকলেও কেউ বলবে না—যাও ঘুমুতে যাও। সেদিন হচ্ছে স্বাধীনতার দিন।

আজ শুক্রবার। খোকন জেগে উঠেছে খুব ভোরে। তার ইচ্ছে হলো কিছুক্ষণ চেঁচিয়ে কাঁদতে। এরকম সুন্দর একটি ঝকঝক দিনে তাকে ঘরে বসে থাকতে হবে? তাছাড়া আজ দুপুরে স্কুলের বারান্দায় ভয়াল-ছয়ের একটি গোপন জরুরী মিটিং বসবে। সে মিটিং-এ সবাই থাকবে, শুধু সে থাকবে না! সবাই হয়তো ভাববে সে আর ভয়াল ছয়ে নেই। তাকে বাদ দিয়েই আজ নিশ্চয়ই সব ঠিকঠাক হবে। খোকন হাত মুখ ধুয়ে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। রতনের মা এসে একবার জিজ্ঞেস করলো—নাশতা ঘরে দিয়ে যাবে কি না। খোকন বললো সে আজ নাশতা খাবে না, তার খিদে নেই। রতনের মা দ্বিতীয়বার কিছু বললো না। শুক্রবারে খাওয়া নিয়ে পীড়াপীড়ি

করা নিষিদ্ধ। কেউ খেতে না চাইলে খাবে না। রতনের মা দু'মিনিট পরেই আবার এসে হাজির।

ঃ দাদাভাই আপনের ডাকে।

ঃ কে ডাকে?

ঃ আপনার আম্মা।

খোকনের মা'র শরীর মনে হয় আজ অন্য দিনের চেয়েও খারাপ। মাথার নিচে তিন-চারটা বালিশ দিয়ে তাঁকে শোয়ানো হয়েছে। মুখ রক্তশূন্য। ঘরের বড় বড় জানালায় ভারী পর্দা ঝুলছে। চারিদিক অন্ধকার। খোকন ঘরে ঢুকতেই তিনি নিচু গলায় বললেন, 'কাল বিকেলে তোকে খুঁজছিলাম, কোথায় ছিলি?' মায়ের সামনে খোকন মিথ্যা বলতে পারে না। সে মৃদুস্বরে বললো—বাইরে ছিলাম।

ঃ মিছিলে টিছিলে যাসনি তো?

ঃ না।

ঃ ঝামেলার মধ্যে যাবি না, কেমন?

ঃ আচ্ছা।

ঃ বোস্ এখানে। দাঁড়িয়ে আছিস কেন? তুই তো আমার ঘরে আসাই বন্ধ করে দিয়েছিস।

খোকন বসলো। খোকনের মা বললেন—একটা কমলা খাবি?

ঃ না।

ঃ না কেন, খা একটা।

তিনি একটি কমলা বের করে দিলেন।

ঃ আমার কাছে দে, আমি ছিলে দিচ্ছি।

ঃ আমি ছিলতে পারব।

ঃ দে আমার কাছে।

খোকনের মা কমলা ছিলতে লাগলেন। কিন্তু দেখে মনে হলো এইটুকু কাজ করতেই তাঁর খুব কষ্ট হচ্ছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে শুরু করেছে। তিনি টেনে টেনে বললেন—মিস গ্রিফিন বলছিলো গণ্ডগোল নাকি প্রায় মিটমাটের দিকে। ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে নাকি শেখ মুজিবের মিটমাট হয়ে গেছে। এখন নাকি শেখ মুজিব প্রধানমন্ত্রী হবে।

খোকন কিছু বললো না।

AMARBOI.COM

: মিটমাট হয়ে গেলেই হয়। মনে একটা শক্তি পাওয়া যায়। তাই না খোকন ?

: হ্যাঁ।

: কিন্তু তোর বাবা বলছিল এত সহজে নাকি কিছু হবে না। পাকিস্তানীরা নাকি চায় না শেখ মুজিব প্রধানমন্ত্রী হয়। আমি এখন কার কথা বিশ্বাস করি ?

খোকন উঠে দাঁড়ালো।

: মা এখন যাই।

: বোস না আরেকটু, বোস।

: পরে আসব।

: আচ্ছা আসিস। মিছিল টিছিলে যাস না কিন্তু লক্ষ্মী বাবা।

: বললাম তো আমি যাই না।

: ঐসব বাচ্চা ছেলেদের জন্যে না।

খোকন নিজের ঘরে এসে মুণ্ডহীন লাশ পড়তে বসলো। মঞ্জুর কাছ থেকে বহু সাধ্য সাধনা করে আনা হয়েছে। কিন্তু পড়তে ভাল লাগছে না। খোকন বই বন্ধ করে জানালার পাশে বসে রইলো। জানালা থেকে দেখা যাচ্ছে টুনুকে। তার জন্যেই ঘুর ঘুর করছে বোধ হয়। যারা সাধারণ গরিব ঘরের ছেলে তাদের মত সুখী বোধ হয় আর কেউ নেই। কেউ তাদের আটকে রাখে না। যেখানে ইচ্ছে সেখানে যেতে পারে। এই যে সাজ্জাদ, মিছিল দেখলেই ঢুকে পড়ে। কেউ তাকে কিছু বলে না। একদিন একা একা গিয়ে বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা শুনে এলো।

AMARBOI.COM

খোকন জানালা বন্ধ করে দিল। বাইরে তাকিয়ে থাকতেও খারাপ লাগছে। দোতলার সিঁড়িতে অনজু আর বিলু গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে। খোকন কড়া গলায় ধমক দিল, 'গোলমাল করিস না।' ওরা গোলমাল করতেই লাগলো। করবে জানা কথা। আজ ছুটির দিন। ওরা কোনো কথা শুনবে না। খোকন ভাবলো ছাদে গিয়ে বসে থাকবে। চুপচাপ।

ছাদে যাবার পথে বাবার সঙ্গে দেখা। বাবা থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তোমার কি অসুখ করেছে ?'

: জি না।

: কাল অনেক রাত পর্যন্ত তোমার ঘরে বাতি জ্বলছিলো, কি করছিলে ?

: কিছু করছিলাম না।

ঃ জেগে ছিলে নাকি ?

ঃ জ্বি।

ঃ জেগে ছিলে অথচ কিছুই করছিলে না।

বাবা খুবই অবাক হলেন। খোকনের বাবা রকিব সাহেব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন টিচার। ইতিহাস পড়ান। তিনি খুব সহজে অবাক হতে পারেন। তাঁর বেশ কিছু অদ্ভুত ব্যাপার আছে। যেমন প্রায়ই খোকনের সঙ্গে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নিয়ে কথা বলেন। সে সময় তাকে তুমি তুমি করে বলেন। অন্য সময় তুই করে।

ঃ খোকন ঠিক করে বল তো তোমার শরীর খারাপ করেনি তো ?

ঃ জ্বি না।

ঃ দেখি এদিকে এসো, জ্বর আছে কি না দেখি।

তিনি খোকনের কপালে হাত রাখলেন।

ঃ না, জ্বর নেই তো।

রকিব সাহেব আবার অবাক হলেন। যেন জ্বর না থাকাটাও অবাক হবার মত ব্যাপার।

ঃ কাল অনেক রাত পর্যন্ত জেগে ছিলে, কিছু নিয়ে চিন্তা করছিলে নাকি ?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ আমাকে বলতে চাও ? বলতে চাইলে বলতে পার।

খোকন ইতস্তত করতে লাগলো। বাবা বেশ আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছেন তার দিকে। মাঝে মাঝে খোকনের প্রতি তাঁর আগ্রহ খুব বেড়ে যায়। খুব খোঁজ খবর করেন। তারপর আবার আগ্রহ কমে যায়। বইপত্র নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কিছুই আর মনে থাকে না।

ঃ আমরা ছয় জন বন্ধু মিলে একটা দল করেছি। দলের নাম ভয়াল-ছয়।

ঃ বল কি ? খুব ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে। দলের কাজ কি ?

ঃ আমরা ভূ-পর্যটন করব।

ঃ ভূ-পর্যটন করবে ?

ঃ হ্যাঁ। প্রথমে যাব আফ্রিকা।

ঃ বাহ্ বেশ মজার তো !

বাবা এবার আর অবাক হলেন না। হাসতে লাগলেন। হাসতে হাসতে বললেন, 'ছোটবেলায় আমিও একটা দল করেছিলাম। আমাদের দলের কাজ ছিল গুপ্তধন খুঁজে বের করা। কোন গুপ্তধন আমরা

AMARBOI.COM

খুঁজে পাইনি। তখন আমার বয়স ছিল বার কি তের। তোমার এখন কত বয়স?'

ঃ তের বছর চার মাস।

ঃ এই বয়সটাই হচ্ছে দল করবার বয়স।

বাবা ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেললেন।

ঃ কবে যাচ্ছ আফ্রিকায়?

ঃ এখনো ঠিক হয়নি।

ঃ তাড়াতাড়ি ঠিক করে ফেলা দরকার। আমরা সব সময় শুধু পরিকল্পনা করি। কাজ আর করা হয় না। তোমরা যদি একদিন সত্যি সত্যি হাঁটতে শুরু কর তাহলে ভালই হবে। মাইল দশেক যেতে পারলেও অনেক কিছু শিখবে।

বাবা হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। খোকন বুঝতে পারলো না, এখন তার কি করা উচিত। চলে যাওয়া উচিত না দাঁড়িয়ে থাকা উচিত। কারণ বাবার অন্যমনস্কতা খুব বিখ্যাত। একবার শুরু হলে দীর্ঘ সময় থাকে। তখন কাউকে চিনতে পারেন না।

ঃ খোকন।

ঃ জ্বি?

ঃ ছুটির দিনে তুমি তোমার দলের সঙ্গে না থেকে ঘরে বসে আছ কেন?

ঃ বড়চাচা বলেছেন আজ কোথাও বেরুতে পারব না।

ঃ ও আচ্ছা। কারণটা কি?

খোকন কারণ বললো। রকিব সাহেব বললেন, 'শাস্তিটা একটু মনে হয় বেশি হয়ে গেছে। তোমার কি মনে হয়?'

খোকন কিছু বললো না।

ঃ তোমার বড়চাচা হয়তো ভেবেছেন তুমি মিছিলে টিছিলে গিয়েছ, সে জন্যেই এমন শাস্তি। তুমি গিয়েছিলে নাকি?

ঃ না।

ঃ কখনো যাও নি?

খোকন চুপ করে রইলো।

ঃ কয়েকবার গিয়েছ, তাই না?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ আমার কি মনে হয় জান? আমার মনে হয় মিছিল করবে যুবকরা। মিছিল হচ্ছে প্রতিবাদের ভাষা। এ কাজটি যুবকদের জন্যে।

AMARBOI.COM

শিশুরা শিখবে, যুবকরা কাজ করবে, বৃদ্ধরা ভাববে। ঠিক না ?

ঃ হ্যাঁ।

রকিব সাহেব হঠাৎ করে খানিকটা গম্ভীর হয়ে বললেন, 'তোমার কি ধারণা শেখ মুজিবুর রহমান প্রধানমন্ত্রী হবেন ?'

ঃ আমি জানি না।

ঃ এ নিয়ে কখনো ভেবেছ ?

ঃ না।

ঃ আমি অবশ্যি অনেক ভেবেছি। আমি নিজেও বুঝতে পারছি না। শেখ মুজিবকে প্রধানমন্ত্রী করা ছাড়া ওদের উপায় নেই। ইলেকশনে জিতেছেন। কিন্তু ওরা করতে চাচ্ছে না। ওদের অজুহাত বের করতে হবে। কি অজুহাত দেবে সেটাও একটা সমস্যা। সমস্যা নয় ?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ এদিকে ভুট্টো সাহেব বলেছেন, পশ্চিম পাকিস্তানে আমার দল সবচে বেশি ভোট পেয়েছে। তার মানে কি বলতে পার ?

ঃ না।

ঃ ভুট্টো সাহেবই পাকিস্তানকে দু'টি অংশ হিসেবে ভাবছেন। অথচ তারা দোষ দিচ্ছে আমাদের। ভাবখানা এ রকম যেন আমরাই পাকিস্তানকে দু'ভাগে ভাগ করতে চাচ্ছি।

ঃ আমরা চাচ্ছি না ?

ঃ ওরা যা শুরু করেছে তাতে চাওয়াই উচিত। আমি অন্তত চাই। তবে যারা একসময় পাকিস্তানের জন্যে আন্দোলন করেছেন, দুঃখ কষ্ট ভোগ করেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই চান না। যেমন তোমার বড়চাচা।

ঃ বড়চাচা চান না ?

ঃ মনে হয় না। তবে আমার ভুলও হতে পারে।

ঃ শেষ পর্যন্ত কি হবে ? পাকিস্তান ভাগ হয়ে যাবে ?

ঃ নির্ভর করছে ওদের ওপর। ওরা যদি আমাদের ন্যায্য অধিকার স্বীকার করে তাহলে হয়তোবা ওদের সঙ্গে থাকা যাবে। কিন্তু ওরা আমাদের বিশ্বাস করতে পারছে না। পরিস্থিতি ভাল না।

বাবা কথা শেষ না করেই চটি ফট ফট করে তাঁর ঘরে ঢুকে গেলেন। খোকন চলে গেল ছাদে। এ বাড়ির ছাদটা প্রকাণ্ড। রোজ বিকেলে ব্যাডমিন্টন খেলে অনজু আর বিলু। চুন দিয়ে ঘর আঁকা আছে।

খোকন বেশ খানিকক্ষণ একা একা ঘুরে বেড়ালো। ঘুর বেড়াতে ভাল লাগছিলো না, আবার নিচে যেতেও ইচ্ছে করছিলো না। এক সময়

AMARBOI.COM

রতনের মা এসে বললো—এখন নাশতা দেই ?

ঃ বললাম তো কিছু খাবো না।

ঃ এক গ্লাস দুধ আইন্যা দিমু ?

ঃ না।

ঃ আপনের আম্মা ডাকে।

ঃ একটু আগেই গেলাম। আবার ?

ঃ হ্যাঁ। আসেন আমার সাথে।

খোকন দেখলো তার মা হাঁপাচ্ছেন। অসুখ বোধ হয় খুব বেড়েছে। খোকন বললো—মা ডেকেছো ?

ঃ হ্যাঁ, তুই নাকি কিছু খাস নি ? কেনরে ব্যাটা, কারো ওপর রাগ করেছিস ?

ঃ না।

ঃ আমি তো কোনো খোঁজ খবর করতে পারি না। কি খাস না খাস কে জানে।

ঃ আমি ঠিকই খাই।

মা হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন—রতনের মা, যাও তো খোকনের খাবার নিয়ে এসো। আমার সামনে বসে বসে খাবে। খোকনের একবার ইচ্ছে হলো বলে, ছুটির দিনে খাওয়া নিয়ে পীড়াপীড়ি করা যাবে না। বড়চাচার নিষেধ আছে। কিন্তু সে কিছু বললো না। মাকে কষ্ট দিতে তার কখনো ইচ্ছে করে না। মা এত ভাল।

AMARBOI.COM

ভয়াল-ছয় বাহিনীর তিনজন সদস্যকে স্কুলে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেলো। তিনজনই অত্যন্ত বিমর্ষ। টুনু একটা ঘাসের ডাঁটা চিবুচ্ছে। সাজ্জাদ রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। দলের বাকি সদস্যদেরও এসে পড়ার কথা। কেউ আসছে না। সময় সকাল দশটা। রোদ উঠেছে কড়া। বেশ গরম লাগছে। টুনু বলল—'চল ছায়াতে দাঁড়াই'। কেউ জবাব দিল না। ঐ দিন টুনু কাপুরুষের মত পালিয়ে যাওয়ার পর থেকে কেউ তার সঙ্গে কথা বলছে না।

এক জায়গায় এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। তারা পাঁচিলে উঠে পা ঝুলিয়ে বসলো। পাঁচিলে ওঠা নিষেধ। হেড স্যার খুব রাগ করেন। কিন্তু আজ শুক্রবার, স্কুল বন্ধ। হেড স্যারের এদিকে

আসার কোনো সম্ভাবনা নেই। যতক্ষণ ইচ্ছে পা ঝুলিয়ে বসে থাকা যাবে। বল্টু হঠাৎ ফিস্ ফিস করে বললো—'মুনির আসছে'। তিনি জনেই তাকালো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। মুনির হন হন করে আসছে। তার হাতে কি একটা বই। গল্পের বই নিশ্চয়ই। ওদের দেখতে পেয়েই সে বই শার্টের নিচে লুকিয়ে ফেললো। মুনিরের সঙ্গে ওদের তেমন ভাব নেই। যে ছেলে প্রতি পরীক্ষায় ফার্স্ট হয় তার সঙ্গে কারোর ভাব থাকে না। ক্লাশটিচার সোলায়মান স্যারের ধারণা, মুনিরের মত ভাল ছাত্র এই স্কুলে এর আগে আর ভর্তি হয়নি। পরেও হবে না। গত বৎসর স্কুল ম্যাগ্যজিনে তাঁর একটা ইংরেজি গল্প ছাপা হয়েছে। গল্পের নাম—'দি বেগার বয়'। হেড স্যার সেই গল্প আবার স্কুল এ্যাসেম্বলীতে পড়ে শুনিয়েছেন এবং বলেছেন, 'ক্লাশ সেভেনের ছেলের ইংরেজি দেখলে? বি. এ. এম. এ. পাশরা এমন লিখতে পারবে না। এর গল্পের মরালটা লক্ষ্য করবে। যে ছেলে ভিক্ষা করে তার মধ্যেও মনুষ্যত্ব আছে।'

মুনির স্কুল গেটের কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। সন্দেহ ভরা গলায় বললো, 'এই তোরা কি করছিস?'

ঃ কিছু করছি না।

ঃ ওয়ালের ওপর বসে আছিস কেন? হেড স্যার নিষেধ করেছেন না?

ঃ আমরা কারোর নিষেধ মানি না।

ঃ ও, তোরাতো আবার ভয়াল-ছয়।

ভয়াল-ছয়টা মুনির এমন ভাবে বললো যেন খুব একটা হাস্যকর ব্যাপার। সাজ্জাত চুপ করে রইলো। দলের কথাটা এ রকম জানাজানি হলো কি করে কে জানে। মুনির বললো, 'নিষেধ না মানার মধ্যে কোনো বাহাদুরী নেই।

ঃ না থাকলে নেই, আমরা নিষেধ মানি না।

ঃ কোনো নিষেধ মানিস না?

ঃ না। তোর শার্টের নিচে এটা কি বই?

ঃ 'রাতের আতঙ্ক'। এটা আমি কাউকে দিতে পারব না। এখনো পড়া হয় নি।

ঃ তোর বই আমরা চাই না।

তারা চুপ করে গেল। মুনির চলে যাচ্ছে না, দাঁড়িয়েই আছে। বল্টু বললো, 'তুই চলে যা। দাঁড়িয়ে আছিস কেন?'

ঃ আমি যাই করি তাতে তোর কি?

AMARBOI.COM

মুনির ইতস্তত করে বললো—আমাকে দলে নিলে এই বইটা পড়তে দেব। সে শার্টের ভেতর থেকে বই বের করলো। মোটা একটা বই। মলাটে মুখোশ পরা একটা মানুষের ছবি, তার হাতে পিস্তল। অন্য হাতে লম্বা একটি বর্শা।

ঃ কি, নিবি আমাকে দলে?

ঃ ভাল ছাত্রদের আমরা দলে নিই না।

ঃ কেন, ভাল ছাত্ররা কি দোষ করলো!

ঃ ভাল ছাত্ররা পড়াশোনা করবে। আমরা পড়াশোনা করবো না।

ঃ কি করবি তাহলে?

ঃ দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়াব।

ঃ আমিও ঘুরব তোদের সাথে।

মুনিরকেও দেখা গেলো দেয়ালের ওপর উঠে বসেছে। সে ভয় পাওয়া গলায় বলল—পড়ে যাব না তো? কেউ উত্তর দিল না।

ঃ আমাকে দলে নিয়েছিস?

ঃ ভেবে দেখি। দলের অন্যরা যদি রাজি হয়।

ঃ অন্যরা কখন আসবে?

ঃ আসবে এক্ষুণি।

AMARBOI.COM

কিন্তু দলের অন্যদের আসবার আগেই স্কুলের দপ্তরী কালিপদ এসে বললো—'হেড স্যার আপনাদের ডাকে।' টুনুর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। সাজ্জাদ বিড়বিড় করে বললো, "হেড স্যার কোত্থেকে আসলেন?" কালিপদ তার জবাব দিল না। হাত ইশারা করে দেখালো। হেড স্যার হোস্টেলের বারান্দায় লুঙ্গি পরে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর মুখের ভাব অস্বাভাবিক গম্ভীর।

হেড স্যার প্রথম কিছু সময় কোনো কথাই বললেন না। তারা যে এসে দাঁড়িয়েছে সেটাও যেন চোখে পড়েনি। বেশ কিছুক্ষণ পর মেঘ গর্জন করলেন।

ঃ ওয়ালের ওপর বসেছিলি কেন?

কোনো জবাব নেই।

ঃ তোর হাতে ওটা কি বই?

ঃ রাতের আতঙ্ক।

ঃ এইসব আজে বাজে বই পড়তে নিষেধ করেছি মনে নেই?

সবাই চুপচাপ।

ঃ তোদের বলি নি এখন চারদিকে ঝামেলা হচ্ছে, এখন ঘরে বসে থাকবি ? পাঠ্য বই পড়বি। ট্রানশ্লেসন করবি।

ঃ জ্বি স্যার বলেছেন।

ঃ দু'বছর পর এস.এস.সি পরীক্ষা। খেয়াল আছে ? শাহজাহান, বল তো রাইনোসেরাস মানে কি ?

ঃ গণ্ডার স্যার।

ঃ রাইনোসেরাস বানান কর।

শাহজাহান টেনে টেনে বললো "আর ওয়াই" বলেই থেমে গেল। হেড স্যার আরো গম্ভীর হয়ে গেলেন। মুনির ফিস ফিস করে বললো, 'স্যার আমি বলবো ?'

ঃ না তোমার বলতে হবে না। যাও এখন ঘরে যাও। খবরদার কোনো মিছিলে টিছিলে যাবে না।

ঃ জ্বি আচ্ছা স্যার।

ঃ আর ঐ বইটা রেখে যাও আমার কাছে। মেট্রিক পাশ করবার আগে কোনো আউট বই পড়বে না। যে সব বই পড়ে কিছু শেখা যায় না সে সব বই পড়ার কি মানে ? বল কোনো মানে আছে ?

ঃ নেই স্যার।

ঃ যাও বাড়ি যাও। আর এই তুমি ঘাস চিবাচ্ছ কেন ? ঘাস খায় ছাগলে, তুমি কি ছাগল ? বল তুমি ছাগল ?

টুনু মুখ কালো করে বললো, 'জ্বি না স্যার।'

ঃ ঘাস লতা পাতা এইসব যেন আর খেতে না দেখি। যাও বাড়ি যাও।

বড় রাস্তার মোড়ে এসে টুনু বললো—সে বাড়ি চলে যাবে। সাজ্জাদ বললো, 'যেতে চাইলে যা, তোকে আমরা বেঁধে রেখেছি ?' এটা রাগের কথা। এর পর যাওয়া যায় না। এই সময় একটা বেশ বড়-সড় মিছিল আসতে দেখা গেল। সমুদ্র গর্জনের মত গর্জন—"জেগেছে জেগেছে বীর জনতা জেগেছে, জাগো জাগো জাগো, বীর জনতা জাগো।" সাজ্জাদ বললো, 'যাবি নাকি মিছিলে ?' কেউ কিছু বললো না। শুধু মুনির বললো, 'না, স্যার নিষেধ করেছেন।'

ওরা রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে রইলো। মিছিলটা প্রকাণ্ড। শেষই হতে চায় না। পেছনে চার পাঁচটা পুলিশের ট্রাক। দেখলেই কেমন ভয় লাগে। মুনির ফিস ফিস করে বললো, 'খুব গণ্ডগোল হবে। চল বাড়ি যাই।'

AMARBOI.COM

ঃ তোর ভয় লাগে তুই যা

ঃ কত পুলিশ দেখেছিস ?

ঃ পুলিশকে ভয় পেলে তুই চলে যা। তোকে ধরে রেখেছি নাকি ?

মুনির ইতস্তত করে বললো, 'হেড স্যার দেখলে খুব রাগ করবেন। তাছাড়া বাসায় আজ বড় খালামনির আসার কথা। বড় খালামনি আমাকে না দেখলে খুব রাগ করেন।' সাজ্জাদ বললো, 'তোর আসলে ভয় লাগছে। ভীতুর ডিম কোথাকার!'

মুনির মুখ কালো করে ফেললো, কিন্তু বেশিক্ষণ থাকলো না। গলির ভেতর ঢুকে পড়লো। মুনিরের সাথে টুনুও চলে গেল। তার নাকি পেট ব্যথা করছে। সাজ্জাদ বললো, 'বল্টু, তুইও যাবি নাকি ?'

ঃ নাহ্।

ঃ কি করবি তাহলে ? মিছিলের সাথে যাবি ?

ঃ হুঁ। কিন্তু কিছু হয় যদি ?

ঃ দূর কি হবে ?

ভয়াল-ছয়ের দুই সদস্য মিছিলে ঢুকে পড়লো। অদ্ভুত একটা উত্তেজনা। গর্জনে চারদিক কেঁপে কেঁপে উঠছে। একেকটা ঘামে ভেজা মুখ কি ভয়ঙ্কর রাগী। মিছিল যতই এগুচ্ছে, মানুষের সংখ্যা ততই বাড়ছে। যে দিকে তাকানো যায় শুধু মানুষ আর মানুষ। মিছিল কোন দিকে যাচ্ছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

সাজ্জাদ আর বল্টু হাত ধরাধরি করে হাঁটছিলো, হঠাৎ কে একজন পেছন থেকে বল্টুর শার্টের কলার চেপে ধরলো। বল্টু ঘার ফিরিয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেলো—জামিল স্যার। অঙ্ক করান, দারুণ রাগী। সারের এক হাতে একটা লাল নিশান।

ঃ তোরা এখানে কি করছিস—যা এক্ষুণি বাড়ি যা। এটা হাওয়া খাওয়ার জায়গা ? আর কে কে আছে তোদের সাথে ?

ঃ আর কেউ নেই স্যার।

ঃ ঠিক করে বল।

ঃ না স্যার আমরা দু'জনেই।

ঃ এক্ষুণি বাড়ি যা, খুব গণ্ডগোল হবে। ঐ গলি দিয়ে বেরিয়ে পড়, এক্ষুনি। এক্ষুণি। খুব গণ্ডগোল হবে। দৌড়া, দৌড়া।

স্যারের কথা শেষ হবার আগেই কোথাও কিছু একটা হলো। দারুণ ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেল চারদিকে। ঢেউয়ের মত মানুষের স্রোত আসতে লাগলো। দুম দুম শব্দ হল সামনে। গুলির শব্দ না

AMARBOI.COM

টিয়ার গ্যাস ? কয়েকজন প্রাণপণে চিৎকার করছে, আগুন আগুন ! কোনো দিকে নড়ার রাস্তা নেই, তবু এর মধ্যেই সাজ্জাদ প্রাণপণে ছুটছে। বল্টু তার হাত শক্ত করে চেপে ধরে আছে। কালো কোট গায়ে দেয়া একটা লোক বললো, 'এই খোকারা মাটিতে শুয়ে পড়। দেখছ কি ? গুলি হচ্ছে !' ওরা কি করছে নিজেরা বুঝতে পারছে না। একজন বুড়ো মানুষ বললেন,'কোন খোলা বাড়ি দেখে ঢুকে পড়।' কোনো বাড়ির দরজা খোলা নেই। সাজ্জাদের মনে হলো সে আর দৌড়াতে পারছে না। ডান পায়ের নখ উঠে গেছে বা কিছু হয়েছে। এবার পেছন থেকে দ্রীম দ্রীম শব্দ আসছে।

একতলা একটি বাড়ির গেটে বুড়ো মানুষ একজন কে যেন দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি হাত বাড়িয়ে ওদের ধরে ভেতরে ঢুকিয়ে ফেললেন।

সেদিন ছিল পহেলা মার্চ। ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবী ঘোষণা করেছে সকাল এগারোটায়। বারোটা নাগাদ বাঙালিরা বেরিয়ে পড়েছিল রাস্তায়। সেই জনসমুদ্র দেখে স্তম্ভিত সরকার দুপুর একটায় ঘোষণা বললো বিকেল পাঁচটা থেকে কার্ফু। কেউ ঘর থেকে বেরুবে না। সেই ঘোষণা বাতিল করে নতুন ঘোষণা দেয়া হলো, কার্ফু বেলা তিনটা থেকে। যে যেখানে আছে সেখানেই থাকবে। রাস্তায় দেখা মাত্র তাদের গুলি করা হবে।

সাজ্জাদ এবং বল্টু আটকা পড়ে গেলো একটা অচেনা বাড়িতে।

AMARBOI.COM

খোকনের ছোটচাচা আমিন সাহেব ঢাকা এয়ারপোর্টে এসে পৌঁছলেন বিকেল তিনটায়। চারদিক কেমন থমথম করছে। প্রচুর পুলিশ। এয়ারপোর্ট থেকে কেউ বেরুতে পারছে না।

আমিন সাহেবকে নেবার জন্য কেউ আসেনি। রাস্তাঘাট ফাঁকা। পুলিশের গাড়ি আর এম্বুলেন্স ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ছে না। কাস্টম্‌স-এর একজন অফিসার বললেন—শহরে কার্ফু জারি হয়েছে। তবে আপনাদের কোন অসুবিধা হবে না। আপনাদের পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা হবে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন।

আমিন সাহেব দু'ঘন্টা অপেক্ষা করলেন। কোনো ব্যবস্থা হলো না। খোকনের ছোটচাচী রাহেলা খুব অস্থির হয়ে পড়লেন। কারণ প্রিসিলার

হঠাৎ শরীর খারাপ করেছে। দু'বার বমি হয়েছে। জ্বর আসছে মনে হয়। ওকে ডাক্তার দেখানো উচিত। রাহেলা বললেন—এখন আমরা কি করব? সারারাত এয়ারপোর্টে বসে থাকব নাকি?

ঃ অন্যরা যদি বসে থাকে আমরাও থাকব।

ঃ এ আবার কি ধরনের কথা? লোকজনদের সঙ্গে কথাটথা বলে দেখ কিছু করা যায় কি না।

আমিন সাহেব দু'এক জায়গায় টেলিফোন করতে চেষ্টা করলেন। কোনো লাভ হল না। লাইন নষ্ট বা কিছু একটা হয়েছে।

এয়ারপোর্টে বেশ কিছু লোক আটকা পড়েছে। একটি আমেরিকান পারিবারকে দেখা গেল খুব চিন্তিত। ভদ্রলোকের নাম পিটার কল। তিনি যেচে এসে আমিন সাহেবের সঙ্গে কথা বললেন, 'তোমাদের শহরের অবস্থা তো ভয়াবহ মনে হচ্ছে।'

ঃ হুঁ।

ঃ আন্দোলন হচ্ছে শুনেছিলাম, এতটা বুঝতে পারিনি।

নরওয়ে থেকে এক ভদ্রমহিলা এসেছেন। তিনি শহরে ঢুকতে চান না। পরবর্তী ফ্লাইটে নরওয়ে চলে যেতে চান। ইংল্যাণ্ডের দু'টি পরিবার আছে, ওদের সঙ্গে তিনটি ছেলেমেয়ে। ছেলেমেয়েগুলো সমস্ত এয়ার-পোর্ট জুড়ে ছোটাছুটি করছে। বাচ্চাগুলোর মাকেও মনে হলো বেশ হাসি খুশি। খুট খুট করে ছবি তুলছে।

আমিন সাহেব ফিরে এসে দেখলেন প্রিসিলা আবার বমি করেছে। তার গায়ে বেশ জ্বর।

ঃ কিরে প্রিসিলা, খারাপ লাগছে?

ঃ নো আই এম জাষ্ট ফাইন।

রাহেলা বললেন, 'কিছু ব্যবস্থা করতে পারলে না?'

ঃ না। অবস্থা আরো খারাপ হচ্ছে। জায়গায় জায়গায় মশাল মিছিল বের করছে। কেউ কার্ফু মানছে না। গুলিটুলিও হচ্ছে বোধ হয়, শব্দ শুনলাম।

ঃ এখন আমরা কি করব?

ঃ বসে থাক।

ঃ তোমাকে কতবার বলেছি দেশে ফেরার দরকার নেই। শুনবে না।

ঃ গণ্ডগোল হচ্ছে বলে নিজের দেশে ফিরবে না?

ঃ এই রকম দেশে ফিরে লাভটা কি?

AMARBOI.COM

আমিন সাহেব প্রিসিলাকে কোলে নিয়ে বসলেন। প্রিসিলা রিন-রিনে গলায় ইংরেজিতে বললো, 'গণ্ডগোল হচ্ছে কেন?'

ঃ গণ্ডগোল হচ্ছে, কারণ আমরা বাঙালিরা বলছি—আমরা মানুষের মত বাঁচতে চাই। পাকিস্তানীরা মানছে না। ওদের ধারণা আমরা মানুষ না।

রহেলা বিরক্ত মুখে বললেন, 'থাক, রাজনৈতিক বক্তৃতা মেয়েকে না শোনালেও হবে।'

ঃ না শোনালে হবে না। এরা আন্দোলনের মধ্যে বড় হবে। এদের জানা দরকার এসব কি জন্যে হচ্ছে।

ঃ এখন না জানলেও হবে। এখন দয়া করে চুপ করে থাক।

আমিন সাহেব চুপ করে গেলেন। প্রিসিলা বললো, 'এ রকম ঝামেলা কতদিন চলবে?'

ঃ বলা মুশকিল। অনেকদিন ধরে চলতে পারে। তবে শুরু যখন হয়েছে, তখন একদিন না একদিন শেষ হবে। শুরু হওয়াটাই শক্ত।

ঃ তোমার কথা বুঝতে পারছি না বাবা, ইংরেজিতে বল।

আমিন সাহেব ইংরেজিতে বললেন, তারপর হাসি মুখে বললেন, 'এখন থেকে তোমাকে বাংলায় কথা বলা শিখতে হবে না। ভাল করে বাংলা শিখে নাও।'

ঃ হোয়াই ডেডি?

ঃ কারণ তুমি বাঙালি মেয়ে, সেই জন্যে।

রাহেলা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'বাংলায় কথা বলা শিখতে হবে না। তুমি কথাবার্তা ইংরেজিতেই বলবে। নয়তো ইংরেজি ভুলে যাবে।'

রাত আটটার দিকে একটা মাইক্রোবাস পাওয়া গেল, যেটা বিদেশীদের হোটেলে পৌঁছে দেবে। আটকেপড়া বাঙালিদের সম্পর্কে কারো কোনো মাথা ব্যথা নেই। আমিন সাহেব কথা বলতে গেলেন ওদের সঙ্গে। একজন পাকিস্তানী মিলিটারি অফিসারের দায়িত্বে বাসটি যাবে। আমিন সাহেবকে মিলিটারি অফিসারটি শান্ত ভাবে বললো—ব্যবস্থাটি ফরেনারদের জন্যে।

ঃ কিন্তু আমার মেয়েটি অসুস্থ।

ঃ অসুখ হোক আর যাই হোক, আমার কিছু করার নেই। এই অবস্থার জন্যে দায়ী আপনারা—বাঙালিরা। এর ফল ভোগ করতে হবে আপনাদের।

AMARBOI.COM

ঃ আচ্ছা আমাদের না হয় কোনো একটা হাসপাতালে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে দিন।

ঃ একবার তো বলেছি এটা সম্ভব নয়।

ঃ কিন্তু আপনারা বিদেশীদের জন্যে তো করছেন।

ঃ হ্যাঁ, ওরা আমাদের অতিথি।

ঃ আমার মেয়েটিও বিদেশী। ওর জন্ম আমেরিকায়। ও জন্ম-সূত্রে আমেরিকান। ওর আমেরিকান পাসপোর্ট আছে।

ঃ আপনি আমাকে যথেষ্ট বিরক্ত করছেন। আর করবেন না।

আমিন সাহেব গম্ভীর মুখে ফিরে এসে দেখেন প্রিসিলাকে একটা টেবিলে শোয়ানো হয়েছে। একজন রোগামত ভদ্রলোক তাকে পরীক্ষা করছেন। রাহেলা বললো, 'উনি একজন ডাক্তার।'

ডাক্তার সাহেব বললেন—কি হয়েছে ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে বমিটা বন্ধ করা দরকার। মুশকিল হয়েছে আমার সঙ্গে কোনো অষুধপত্র নেই। আমিও আপনাদের মতই আটকা পড়েছি।

ডাক্তার সাহেব থাকতে থাকতেই প্রিসিলা আরো দু'বার বমি করলো। ডাক্তার সাহেব বললেন—ওকে হাসপাতালে ট্রান্সফার করা দরকার। আসুন দেখা যাক একটা এম্বুলেন্স পাওয়া যায় কি না।

কিন্তু এম্বুলেন্স যোগাড় করা গেল না। রাহেলা কাঁদতে লাগলেন। বেশ কয়েকবার বললেন, 'এই জন্যেই দেশে আসতে চাইনি। তবু আসতে হবে। কি আছে এই দেশে?'

আমিন সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রিসিলা মা, তুমি কেমন আছ?'

ঃ ভাল। জাস্ট ফাইন।

ঃ ভোর হলেই আমরা তোমার দাদুমনির বাড়ি চলে যাব।

ঃ ভোর হতে কত দেরি?

ঃ বেশি দেরি নেই।

ডাক্তার সাহেব প্রিসিলার কাছেই বসে রইলেন। তাঁরা সবাই অপেক্ষা করতে লাগলেন ভোরের জন্যে।

সম্পূর্ণ অচেনা একটা বাড়িতে ঢুকে পড়া এবং প্রায়ান্ধকার একটি ঘরে নিঃশব্দে বসে থাকা খুব সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু বাইরে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। বুড়ো ভদ্রলোক সদর দরজা বন্ধ করে

AMARBOI.COM

দিয়েছেন। সব ক'টি জানালাও বন্ধ করা হয়েছে। চারদিকে গা চমকানো একটা অন্ধকার। বুড়ো লোকটি সাজ্জাদের দিকে তাকালেন। তাঁর চোখে মোটা ফ্রেমের একটা চশমা। একটু রাগী চেহারা। গায়ে সাদা রঙের একটা চাদর। নুয়ে নুয়ে হাঁটেন।

ঃ তোমার নাম কি?

ঃ সাজ্জাদ।

ঃ আর তোমার নাম ?

ঃ শাহজাহান।

ঃ তোমাদের ভয় লাগছে ?

ঃ জ্বি না।

ঃ সাজ্জাদ তোমার পা কেটে গিয়েছে দেখছি, ব্যথা করছে ?

ঃ জ্বি না।

ঃ এসো আমার সাথে, পা ধুইয়ে ডেটল লাগিয়ে দিচ্ছি।

ঃ আমার কিছু লাগবে না।

ঃ বাজে কথা বলবে না। বাজে কথা আমি পছন্দ করি না। নীলু। নীলু।

সাজ্জাদ এবং টুনু দেখলো ওদের বয়েসী একটি মেয়ে এসে দরজার ও পাশে দাঁড়িয়েছে। বুড়ো ভদ্রলোক বললেন, 'এই মেয়েটি আমার নাতনি, ওর নাম নীলাঞ্জনা। আর এদের একজনের নাম শাহ্‌জাহান। অন্য জনের নাম সাজ্জাদ। বলতো নীলু কার নাম সাজ্জাদ?'

সাজ্জাদ এবং শাহ্‌জাহান মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলো। বুড়োটা পাগল নাকি? মেয়েটি কিন্তু ঠিকই সাজ্জাদের দিকে আঙুল দিয়ে দেখালো। বুড়ো মহাখুশি।

ঃ ঠিক হয়েছে, এখন যাও ডেটল নিয়ে এস। তুলা আন। আর সাজ্জাদ, তুমি বাথরুমে গিয়ে পা ধুয়ে এস। নীলুর সঙ্গে যাও। নীলু দেখিয়ে দেবে।

ঃ আমার কিচ্ছু লাগবে না।

ঃ একটা চড় লাগাবো। যা বলছি কর।

সাজ্জাজ উঠে পড়লো। বাথরুমটা বাড়ির একেবারে শেষপ্রান্তে। নীলু বললো, 'দাদুমণির রাগ খুব বেশি। তিনি যা বলেন তা সঙ্গে সঙ্গে না করলে খুব রাগ করেন।' সাজ্জাদ মুখ গোমড়া করে বললো, 'আমি কাউকে ভয় পাই না।'

ঃ কাউকে না?

ঃ শুধু হেড স্যারকে ভয় পাই।

ঃ আমার দাদুমণিও তো হেড স্যার।

ঃ তাই নাকি?

ঃ হুঁ। অবশ্যি এখন রিটায়ার করেছেন।

ঃ এই বাড়িতে আর কেউ থাকে না?

ঃ না। শুধু আমরা দু'জন আর একটি কাজের মেয়ে আছে। সে এসে রান্না করে দিয়ে যায়। আজকে আসেনি।

ঃ তুমি কোন ক্লাশে পড়?

ঃ আমি ক্লাশ সিক্সে পড়ি। এইবার সেভেনে উঠবো।

সাজ্জাজ খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে বললো, তুমি রাইনোসেরাস বানান করতে পার?' নীলু অবাক হয়ে বললো—'না রাইনোসেরাস কি?'

ঃ এক ধরনের গণ্ডার।

ঃ রাইনোসেরাস বানান করার দরকার কি?

ঃ কোনো দরকার নেই। আমি নিজেও জানি না।

পা ধুতে ধুতে সাজ্জাদের মনে হলো এই ছোট্ট মেয়েটি মন্দ নয়। পায়ে পানি ঢালছে চোখ বন্ধ করে। সাজ্জাদ বললো, 'এই, চোখ বন্ধ করে পানি ঢালছো কেন?'

ঃ রক্ত দেখতে পারি না সে এই জন্যে। তোমার ব্যথা লাগছে?

ঃ না। আমার ব্যথা-ট্যাথা লাগে না।

ঃ ইস কি মিথ্যুক।

সাজ্জাদ ফিরে এসে দেখে বুড়ো ভদ্রলোক মস্ত একটা জাবদা খাতা খুলে কি যেন লিখছেন। সাজ্জাদকে ঢুকতে দেখেই বললেন, 'তোমরা কোন ক্লাশে পড়?'

ঃ ক্লাশ সেভেনে।

ঃ সবাই এক স্কুলে পড়?

ঃ জ্বি।

ঃ মিছিলে গিয়েছিলে নাকি?

ঃ জ্বি না।

ঃ আবার মিথ্যা কথা।

ঃ জ্বি গিয়েছিলাম।

বুড়ো লোকটি খাতা বন্ধ করে গভীর গলায় বললেন—একটা

AMARBOI.COM

জিনিস আমি খুব অপছন্দ করি—সেটা হচ্ছে মিথ্যা কথা বলা। কেউ যদি মিথ্যা কথা বলে আমি তা সঙ্গে সঙ্গে ধরতে পারি।

এই সময় বাইরের রাস্তায় খুব হৈ চৈ হতে লাগলো। ঘন্টা বাজিয়ে একটা দমকল গেল। লোকজন ছোটাছুটি করতে লাগলো। একটা ভারী ট্রাক গেল। সম্ভবত মিলিটারি ট্রাক। বুড়ো ভদ্রলোক বললেন, 'মনে হচ্ছে আজ রাতটা তোমাদের এখানেই কাটাতে হবে। শোন, নীলু আমাকে দাদুমণি ডাকে। তোমরাও তাই ডাকবে। এখন যাও, নীলুর সঙ্গে গল্প-টল্প কর। পরে তোমাদের সঙ্গে কথা বলব।' দাদুমণি খাতা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

এদের বাড়িটি বেশ বড়। অনেকগুলো কামরা নীলুর দখলে। একটিতে নীলুর লাইব্রেরি। সেই লাইব্রেরি দেখে সাজ্জাদ ও বল্টুর আক্কেল গুড়ুম। একটা পুঁচকে মেয়ের এত বই! নীলু বললো, 'সব আমার দাদুমণি কিনে দিয়েছেন।'

ঃ তুমি পড়েছ সবগুলো?

ঃ পড়ব না কেন?

বল্টু বললো—নীল আতংক পড়েছ? দারুণ বই।

ঃ না পড়ি নি।

ঃ আমি নিয়ে আসব তোমার জন্যে।

ঘন্টাখানেকের মধ্যে নীলু তার সমস্ত সম্পত্তি দেখিয়ে ফেললো। তাদের সবচে মজা লাগলো দাদুমণোর 'মিথ্যা খাতা' দেখে। মিথ্যা খাতায় দাদুমণি সব মিথ্যা খবরগুলো তুলে রাখেন। খবরের শেষে মজার সব মন্তব্য লেখা থাকে। দু'একটা নমুনা দেয়া যাক।

AMARBOI.COM

অদ্ভুত গাছ

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

> নোয়াখালির ছাগল নাইয়াতে জনৈক আহমেদ আলির একটি অদ্ভুত খেজুর গাছ দেখিবার জন্য মানুষের ঢল নামিয়েছে। উক্ত খেজুর গাছটি নামাজের সময় সেজদার ভঙ্গিতে নুইয়া পড়ে। খেজুর গাছের এই অদ্ভুত কাণ্ডের কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতেছে না।

মন্তব্য ঃ নোয়াখালির ছাগল নাইয়াতে আমি নিজে গিয়েছিলাম। এই জাতীয় গাছের কোনো সন্ধান আমাকে কেহ দিতে পারে নাই। এই মিথ্যা সংবাদ প্রচারের আসল উদ্দেশ্য কি? বুঝিতে পারিতেছি না।

আম গাছে কাঁঠাল

প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়ালে সম্প্রতি সাতক্ষীরার কুণ্ডচরণ বৈরাগীর একটি আম গাছে প্রকাণ্ড একটি কাঁঠাল ফলিয়াছে। কুণ্ডচরণ আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতাকে জানান যে উক্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য প্রতিদিন প্রায় হাজার হাজার মানুষ আসিতেছে। সাতক্ষীরা মহকুমার এসডিও সাহেবও আসিয়াছিলেন।

মন্তব্য ঃ আমি সাতক্ষীরার এসডিও সাহেবকে একটি চিঠি লিখে জানতে পারি যে তিনি নিজে সেই কাঁঠাল দেখেন নি, তবে খবর শুনেছেন। আমি পত্রিকার সম্পাদকের কাছে নিজস্ব সংবাদদাতার ঠিকানা জানতে চাই। সম্পাদক সাহেব আমাকে জানান, উক্ত সংবাদ-দাতা বর্তমানে ছুটিতে আছেন।

ছাগলের গর্ভে সর্পশিশু

সম্পতি একটি ছাগল দুটি সর্প-শিশু প্রসব করিয়াছে। ঘটনাটি ঘটে ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইলগঞ্জে। প্রসবের দুই ঘন্টার মধ্যে একটি সর্পশিশুর মৃত্যু ঘটে। তবে অন্যটি এখনো সুস্থ আছে। ব্যাপারটি স্থানীয় জনগণের মনে দারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছে।

মন্তব্য ঃ গাঁজাখুরির একটা সীমা থাকা দরকার।

নীলু হাসি মুখে বললো—দাদুমণি মিথ্যা কথা একেবারেই সহ্য করতে পারেন না।

ঃ তিনি নিজে বুঝি সব সময় সত্যি কথা বলেন?

ঃ তা বলেন।

ঃ যখন আমাদের মত ছোট ছিলেন তখনো বলতেন?

ঃ তা তো জিজ্ঞেস করিনি।

সাজ্জাদ গম্ভীর ভাবে বললো—তখন তিনি ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা কথা বলতেন। জিজ্ঞেস করলেই জানা যাবে। নীলু হেসে ফেললো। হাসি আর থামতেই চায় না। এই সামান্য কথায় কেউ এত হাসে নাকি?

এক সময় তারা নীলুর পোষা ময়না দেখতে গেল। এই ময়নাটিকে নীলু নিজেই নাকি কথা বলা শিখিয়েছে। এমন ভাবে শিখিয়েছে যাতে মনে হয় ময়না বুঝি সত্যি সত্যি কথা বলে। কেউ কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই ময়না বলবে—

AMARBOI.COM

ঃ তোমার নাম কি ? তোমার নাম কি ?

নাম বলার পর ময়না দু এক মিনিট চুপ করে থেকে বলবে--

ঃ তুমি কেমন আছ ?

এই প্রশ্নে জবাব দিলেই ময়না বলবে—ওগো বাড়িতে মেহমান এসেছে। দারুণ মজার ব্যাপার।

বিকেলবেলা দাদুমনি বললেন—এইবার রান্না-বান্না শুরু করা যাক। কি খাবে তোমরা ?

বল্টু গম্ভীর গলায় বললো, 'আমাদের খিদে নেই।'

ঃ এটা তো ঠিক বললে না। তোমার খিদে না থাকতে পারে, কিন্তু অন্যদের নেই সেটা বুঝলে কি করে ?

নীলু খিল খিল করে হেসে উঠলো।

সন্ধ্যার পর বল্টু বিনা নোটিশে কাঁদতে শুরু করলো। দাদুমণি প্রথম কিছুক্ষণ এমন ভাব করলেন যেন দেখতে পাননি। সাজ্জাদ খুব অস্বস্তি বোধ করছিলো। তার ধারণা নীলু খুব হাসাহাসি করবে। কিন্তু নীলু হাসলো না। সেও এমন ভাব করলো যেন কিছু দেখতে পায়নি। শেষ পর্যন্ত দাদুমণি বললেন—তোমার বোধ হয় পেট ব্যথা করছে, তাই না ? বল্টু ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো, 'হ্যাঁ।'

ঃ আমিও তাই ভেবেছিলাম। বাসার জন্যেও বোধ হয় একটু খারাপ লাগছে। লাগছে না ?

ঃ লাগছে।

ঃ বাসায় তোমার কে কে আছেন ?

ঃ আব্বা আম্মা আর দাদী।

ঃ সকাল হলেই ওরা কার্ফু তুলে নেবে, তখন সবার আগে আমি তোমাকে বাসায় পৌঁছে দেব। কেমন ?

বল্টু মাথা নাড়লো।

ঃ একটা তো মোটে রাত, দেখতে দেখতে কেটে যাবে। মাঝে মাঝে দেশের খুব বড় দুঃসময় আসে, তখন দেশের মানুষকে কষ্ট করতে হয়। এই যেমন আমরা করছি।

দাদুমণি কিছুক্ষণ থেকে থেমে মৃদু স্বরে বললেন—এই গণ্ডগোল, মিছিল কেন হচ্ছে তোমরা জান ?

ঃ জানি।

ঃ কেন হচ্ছে ?

AMARBOI.COM

ঃ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবী ঘোষণা করেছে, সেইজন্যে।

ঃ কিন্তু এর আগেও তো আমরা অনেক মিছিল টিছিল করেছি। করিনি ?

ঃ করেছি।

ঃ সেগুলো কি জন্যে করেছি জান ?

সবাই চুপ করে রইলো। দাদুমণি বললেন, 'তোমাদের এইসব জানা উচিত। চোখের সামনে এত বড় একটা আন্দোলন হচ্ছে। কেন হচ্ছে জানা উচিত না ?'

ঃ জ্বি।

ঃ আমি অনেকের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, গোড়ার কথাগুলো অনেকেই জানে না। সমগ্র পৃথিবীতে দুই ধরনের মানুষ আছে—এই জিনিসটা জান ?

ঃ না।

ঃ এক ধরনের মানুষ হচ্ছে শোষক, যারা শোষণ করে—আর অন্য ধরনের মানুষ হচ্ছে শোষিত। অর্থাৎ এদের শোষণ করা হয়। পাকিস্তানের জন্ম হল মুসলমানদের নিয়ে। তখন শোষিত মানুষরা ভাবলো আর তাদের দুঃখ কষ্ট থাকবে না। এইবার সুখ আসবে।

সুখ কিন্তু এল না। কারণ পাকিস্তানেও একদল আছে, যারা শোষক। তারা ধনী, তাদের হাতে ক্ষমতা আছে। এদের বেশির ভাগই হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানী। দেশের রাজধানীও তাদের অংশে। কাজেই তারা জোরে-শোরে শোষণ শুরু করলো। এবং আমরা পূর্ব পাকিস্তানের মানুষেরা হলাম শোষিত। আমাদের শোষণ করতে লাগলো তারা। যাতে কিছুতেই মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারি। কাজেই আমরা তাদের ঘৃণা করতে শুরু করলাম। আমাদের এই ঘৃণা তারা কখন প্রথম বুঝতে পারল জান ?

ঃ না, কখন ?

ঃ ভাষা আন্দোলনের সময়।

ভাষা আন্দোলনের সময় তাদের আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল। তখন তারা বুঝতে পারলো—আরে পূর্ব পাকিস্তানের এই মানুষগুলো তো সহজ পাত্র নয়। কাজেই তারা এখন খুব সাবধান। এবং আমার কি মনে হয় জান ? আমার মনে হয় এরা কিছুতেই শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে ক্ষমতা দেবে না।

AMARBOI.COM

মুনীর হঠাৎ বলে বসলো—আমাদের হাতে ক্ষমতা আসলে আমরাও কি শোষক হয়ে যাবো ?

ঃ যেতে পারি। হয়তো দেখা যাবে আমরা তখন পশ্চিম পাকিস্তানীদের শোষণ করতে শুরু করেছি। তখন হয়তো তারাও আন্দোলন শুরু করবে।

নীলু বললো—এইসব শুনতে ভাল লাগছে না দাদুমণি। একটা ভূতের গল্প বলো। দাদুমণি বললেন, 'এখন আর ভূতের গল্প বলতে ইচ্ছে হচ্ছে না।' ঠিক তখন কারেন্ট চলে গিয়ে চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল। উত্তর দিক থেকে খুব হৈ চৈ হতে লাগলো। দাদুমণি দরজা খুলে কিছুক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর ফিরে এসে বললেন, 'কোথায় যেন আগুন লেগেছে—উত্তর দিকে। বিরাট আগুন।'

রাতের ভাত খাবার সময় রেডিওতে বললো, লেফটেনেন্ট জেনারেল টিক্কা খান পূর্ব পাকিস্তানে আসছে।

বল্টু আবার কাঁদতে শুরু করলো। দাদুমণি বললেন—কি হয়েছে বল্টু ? পেট ব্যথা করছে ?

ঃ না, বাসার জন্যে খারাপ লাগছে।

ঃ কার্ফু উঠলেই আমি তোমাকে বাসায় দিয়ে আসবো।

বল্টু ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো—যদি কার্ফু না ওঠে ?

কার্ফু তোলা হলো সকাল ন'টায়।

চারদিকে কেমন ছমছমে ভাব। যেন কিছু একটা হবে। কি হবে কেউ জানে না, কেউ কিছু বুঝতে পারছে না। যুবকদের চেহারা একই সঙ্গে রাগী ও বিষণ্ণ।

এয়ারপোর্টে আমিন সাহেব মেয়েকে কোলে নিয়ে অপেক্ষা করছেন। ডাক্তার ভদ্রলোক বললেন—বাসায় না গিয়ে মেয়েকে সরাসরি কোনো হাসপাতালে নিয়ে যান। বডি ডিহাইড্রেটেড হয়ে গেছে। রাহেলা অস্থির হয়ে পড়েছেন—এতক্ষণেও নেবার জন্যে কোন গাড়ি আসছে না কেন ? তিনি বললেন—গাড়ি লাগবে না, চল একটা বেবিটেক্সি নিয়ে চলে যাই।

ঃ এত মালপত্র কি করব ?

ঃ পড়ে থাকুক।

AMARBOI.COM

বেবিট্যাক্সি, রিকশার সংখ্যা খুব কম। বহু কষ্টে একটি জোগাড় করা গেল। রাস্তায় যানবাহন তেমন নেই। কিন্তু প্রচুর মানুষ। ছোট ছোট দল বানিয়ে জটলা পাকাচ্ছে। রাস্তার প্রতিটি মোড়ে ইপিআর-এর বড় বড় ভ্যান। ভ্যানের মাথায় মেশিনগান বসিয়ে সৈন্যরা অপেক্ষা করছে। আমিন সাহেব বললেন—দেখে মনে হচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্র। রাহেলা অবস্থা দেখ।

ঃ তুমি দেখ। আমার দেখার শখ নেই।

ঃ এত সৈন্য নামিয়েছে শহরে, আশ্চর্য!

প্রিসিলা বললো, 'বাবা আমি সৈন্য দেখব।' রাহেলা ধমক দিলেন —সৈন্য দেখতে হবে না। শুয়ে থাক। আমিন সাহেব বললেন, 'ওকে দেখতে দাও। দেখে অভ্যস্ত হোক। এ দেশের অবস্থা জানতে হবে না তাকে?'

ঃ না জানার দরকার নেই। আমি এখানে থাকব না।

ঃ কোথায় যাবে?

ঃ আমেরিকা। যেখান থেকে এসেছি সেখানে যাব।

আমিন সাহেব কিছু বললেন না। রাহেলা বললেন—এ রকম দেশে মানুষ থাকতে পারে?

ঃ কেন, মানুষ থাকছে না? ওরা থাকতে পারলে আমরাও পারব। তাছাড়া এ রকম থাকবে না।

ঃ কি করে তুমি জান থাকবে না?

ঃ এটা জানা যায়। সব খারাপ সময়ের পর আসে সুসময়।

ঃ সুসময় আসুক আর যাই আসুক আমি এখানে থাকব না। তুমি যেতে না চাও থাকবে। আমি প্রিসিলাকে নিয়ে চলে যাব।

আমিন সাহেব কিছু বললেন না।

ফার্মগেটের সামনে এসে দেখা গেল, প্রতিটি গাড়িকে থামানো হচ্ছে। দু'জন মিলিটারি এসে উঁকি দিচ্ছে প্রতিটি গাড়িতে। কাউকে কাউকে জিজ্ঞাসাবাদও করছে। আমিন সাহেবকে অবশ্যি কিছু বললো না। হাত দিয়ে ইশারা করে চলে যেতে বললো। প্রিসিলা বললো—ওরা মিলিটারি বাবা?

ঃ হুঁ।

ঃ কি দেখছে?

ঃ কি জানি কি? তোমার শরীর কেমন লাগছে এখন?

ঃ ভাল।

AMARBOI.COM

ঃ আবার বমি বমি লাগছে ?

ঃ নাহ্ ।

ঃ বাড়িতে গেলেই দেখবে শরীর পুরোপুরি সেরে গেছে। বাড়িতে পৌঁছেই ডাক্তার আনাব। ঠিক আছে ?

প্রিসিলা বাধ্য মেয়ের মত মাথা নাড়লো। বাড়ি পৌঁছতে অবশ্যি দেরি হলো অনেক। নীলক্ষেতের সামনে সমস্ত গাড়ি আটকে রাখা হয়েছে। যেতে দেয়া হচ্ছে না। কেন দেয়া হচ্ছে না তাও কেউ বলছে না। রাহেলা অসহিষ্ণু গলায় বললেন—কি হচ্ছে ?

ঃ বুঝতে পারছি না তো!

ঃ আমি অসুস্থ মেয়ে নিয়ে রাস্তায় পড়ে থাকব নাকি ?

ঃ কিছু তো করার নেই। অপেক্ষা করা যাক। বোধ হয় মিছিল টিছিল আসছে।

ঃ আমি থাকবো না এদেশে, আমি আগামী সপ্তাহেই চলে যাব।

রাহেলা কেঁদে ফেললেন।

AMARBOI.COM

খোকন বাড়ির সামনের গেটের কাছে একা একা দাঁড়িয়ে ছিলো। তার খুব ইচ্ছে সে ভয়াল ছয়ের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। কিন্তু বড়চাচা বলে দিয়েছেন—কেউ যেন বাড়ি ছেড়ে কোথাও না যায়। দারোয়ান গেটে তালা লাগিয়ে দিয়েছে। বড়চাচার হুকুম ছাড়া তালা খোলার অনুমতি নেই। খোকন আশা করে আছে সাজ্জাদ বা বল্টু এদের কেউ তাদের খোঁজে আসবে। কিন্তু এখনো কেউ আসছে না। আসবে জানা কথা, কিন্তু এত দেরি করছে কেন ?

ছোটচাচা যখন বেবিটেক্সি থেকে নামলেন, তখনো খোকন গেটের কাছে দাঁড়িয়ে। তবু সে বুঝতে পারলো না যে ছোটচাচা এসে পড়েছেন। তিনি ডাকলেন—'এটা কে, খোকন না ?' খোকনের চোখ বড় বড় হয়ে গেল।

ঃ আমরা যে গতকাল আসছি সে টেলিগ্রাম পাসনি ?

ঃ না তো!

ঃ যা ভেতরে গিয়ে খবর দে।

খোকনের হুঁস ফিরে এলো, সে বিদ্যুৎগতিতে ছুটে গেল বাড়ির ভেতরে। আর তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির প্রতিটি মানুষ বেরিয়ে এলো। বহুদিন এ বাড়িতে এ রকম আনন্দের ব্যাপার হয়নি।

কার্ফু ভাঙার সাথে সাথেই সাজ্জাদ ও বল্টু বেরিয়ে পড়লো। দাদু-মণি সঙ্গে যেতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু তারা কিছুতেই সঙ্গে নেবে না। তারা নাকি নিজেরাই যেতে পারবে। নীলুরও দাদুমণিকে ছাড়ার ইচ্ছে নেই। বাসায় তার একা একা থাকতে ভয় লাগে।

দু'জনে প্রথমে গেল বল্টুদের বাসায়—কাওরান বাজারে। বাসায় তখন দারুণ কান্নাকাটি হচ্ছে। তার মা সারা রাত কেঁদেছেন। তিনবার ফিট হয়েছেন। বাবা মা'র পাশেই একটা মোড়াতে বসে আছেন। বল্টুর বড় দু'ভাই কার্ফু ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে সাইকেল নিয়ে খুঁজতে বের হয়েছে। মা ছেলেকে জড়িয়ে ধরে বিকট স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন। বাবা বিড় বিড় করে বললেন—আগামী রোববারেই আমি ছুটি নিয়ে সবাইকে দেশের বাড়িতে রেখে আসব। ঝামেলা না মিটলে কাউকে ফিরিয়ে আনব না। বলতে বলতে তিনিও চোখ মুছতে লাগলেন।

সাজ্জাদ কি করবে ভেবে পেল না। চলে যাবে, না আরো খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে? কাউকে কিছু না বলে চলে যাওয়াটা ভাল দেখায় না। আবার এ রকম কান্নাকাটির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতেও ভাল লাগে না। বল্টুর বাবা বললেন—সাজ্জাদ, তুমি আর এ বাড়িতে আসবে না। তোমার পাল্লায় পড়ে ছেলের আজ এই অবস্থা। বুঝতে পারছ? সাজ্জাদ মাথা নাড়লো।

ঃ যাও এখন বাড়ি যাও। দাঁড়িয়ে আছ কেন?

সাজ্জাদদের বাসা ভজকুনী পাড়া। সে থাকে তার বোন এবং দুলাভাইয়ের সঙ্গে। দুলাভাই লেদ মেশিন ওয়ার্কশপের একজন মেকানিক। লোকটি নিরীহ গোছের। সে নিশ্চয়ই সাজ্জাদকে দেখে তেমন কিছু বলবে না। হয়ত বলবে—এই রকম ঘোরাফেরা করা ঠিক না। আর যাবে না। অবশ্যি তার বোন খুবই রাগ করবে। আজ সারাদিন হয়তো কথাই বলবে না। ঘন ঘন চোখ মুছবে।

সাজ্জাদ তাদের বাসার সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। কান্নাকাটির শব্দ শোনা যায় কি না। কোন শব্দ নেই, কেউ কাঁদছে না। সে ঘরে ঢুকে দেখলো তার বোন রান্নাঘরে। সাজ্জাদকে দেখেই সে বললো—তোর দুলাভাই কোথায়?

ঃ আমি তো জানি না

ঃ তুই জানিস না মানে? তোর খোঁজে সেই সন্ধ্যাবেলা গেছে, আর তো আসে নি।

AMARBOI.COM

ঃ কার্ফু'র মধ্যে কোথায় গেল ?

ঃ আমি বললাম যাওয়ার দরকার নেই। তবু গেল।

ঃ বল কি!

সাজ্জাদের বোন সরু গলায় বললো—এখন কোথায় কোথায় ঘুরছে কে জানে। বোকা সোকা মানুষ।

ঃ কার্ফু'র মধ্যে আটকা পড়েছে আরকি। আসবে, আসবে এখুনি।

তারা দুই ভাইবোন দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করলো, কেউ এলো না। সাজ্জাদের বোন কান্নাকাটি কিছুই করলো না। সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে ঘরের কাজ করতে লাগলো। দুপুরের পর সাজ্জাদ খুঁজতে বেরুল।

তখন শহরে মিছিলের পর মিছিল বেরুচ্ছে। উত্তেজিত মানুষের মুখে একটি মাত্র কথা—শেখ সাহেবের ভাষণ হবে ৭ তারিখে। সেই ভাষণে দারুণ একটা কিছু বলবেন তিনি।

সাজ্জাদ নানান জায়গায় উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ালো। ফার্মগেট, নীলক্ষেত, আজিমপুর। সন্ধ্যার আগে বাড়ি ফিরে শুনলো তার বোন ক্ষীণ স্বরে কাঁদছে। দুলাভাই এখনো ফেরেন নি।

AMARBOI.COM

খোকনের বাড়িতে সন্ধ্যাবেলা চায়ের একটা জমকালো আয়োজন করা হয়েছে। খোকনের মা এবং প্রিসিলা ছাড়া আর সবাই এসে বসেছে খাবার টেবিলে। প্রিসিলার জ্বর কমে গিয়েছে, তবে দুর্বল হয়ে গেছে। বিকেল থেকেই সে ঘুমুচ্ছে। খোকনের একজন মামা পিজির বড় ডাক্তার। তিনি এসে দেখে গিয়েছেন এবং বলেছেন, তেমন কিছু নয়—ট্রাভেল সিকনেস। দু'একদিন পুরোপুরি রেস্টে থাকলেই ঠিক হয়ে যাবে।

চায়ের টেবিলে ছোটরা কোনো কথা বলতে পারে না। কিন্তু আজ সবাই কথা বলছে। বড়চাচার মুখ হাসি হাসি। তাঁর হাসি দেখেই মনে হচ্ছে আজ আর তিনি রাগ করবেন না। ছোটচাচা একটির পর একটি মজার মজার গল্প বলে যাচ্ছেন—একবার বেড়াতে গিয়েছিলেন আলাস্কা, সেখানে ঠাণ্ডায় নাকি হঠাৎ তাঁর চোখের মনি জমে গেলো। কিছুই দেখতে পান না। শেষকালে হাতের তালু দিয়ে চোখ ঘষে ঘষে গরম করার পর আবার দেখতে পেলেন।

তারপর একবার স্কুবা ডাইভিং করতে গিয়েছেন প্রশান্ত মহাসাগরে। পানির নিচে বেশিদূর যাননি, অল্প কিছুদূর গিয়েছেন—হঠাৎ তাঁর মনে

হলো পেছন থেকে তাঁর বাঁ হাত ধরে কে যেন টানছে। তিনি চমকে পেছনে ফিরে দেখলেন একটা দৈত্যের মত প্রকাণ্ড অক্‌টোপাস। অক্‌টোপাসটির সঙ্গে ছোট ছোট বাচ্চা। সেগুলো মা'র চারপাশে কিলবিল করছে। ভয়াবহ ব্যাপার!

ঘন্টাখানিক গল্পগুজব হবার পর বড়চাচা চোটদের উঠে যেতে বললেন। হাসি মুখে বললেন—

ঃ অনেকক্ষণ গল্প হয়েছে, এখন সবাই যাও। আমরা বড়রা কিছু কথা বলি। আজ আর পড়াশোনা করতে হবে না। আজ ছুটি।

এখন বড়দের গল্প মানেই দেশের কথা। কি হবে এই নিয়ে আলোচনা। তর্ক। এখানেও তাই হলো। সাত তারিখে কি বক্তৃতা হবে তাই নিয়ে কথা বলতে লাগলেন সবাই। বড়চাচা গম্ভীর হয়ে বললেন—শেখ সাহেব যা করছেন তার ফল ভাল হবে না! পাকিস্তান ধ্বংস হয়ে যাবে। তিনি দেশকে দুই ভাগ করে ফেলবার চেষ্টা করছেন।

ঃ এ রকম মনে করার তো কারণ নেই। আছে কোন কারণ? ভুট্টো সাহেবরা যা করছেন সেটাই দেশকে দু'ভাগ করবে। নির্বাচনে যে জিতেছে সে ক্ষমতায় যাবে, এতো সোজা কথা।

ঃ কিন্তু ক্ষমতায় গিয়েইতো দেশকে দু'ভাগ করার চেষ্টা করবে।

ঃ করবার আগেই সেটা বলছেন কেন? অজুহাতটা খুব বাজে না? দুর্বল অজুহাত না? ধরেন আজ যদি ভুট্টো শেখ মুজিবের মত নির্বাচনে জিততো তাহলে কি তাকে সঙ্গে সঙ্গে প্রধান মন্ত্রী করা হত না?

বড়চাচা ক্রমেই কোণঠাসা হয়ে পড়তে লাগলেন এবং রেগে উঠতে লাগলেন। ঠিক তখন খোকন এসে বলল—বড়চাচা আপনার সঙ্গে কথা বলব।

ঃ এখন না, পরে।

ঃ জ্বি না বড়চাচা, এখন। আমার সঙ্গে একটু বাইরের ঘরে আসেন। আসতেই হবে।

বড়চাচা বেশ অবাক হয়েই বাইরের ঘরে এসে দেখলেন সাজ্জাদ দাঁড়িয়ে আছে। সে তার শার্টের লম্বা হাতায় ঘন ঘন চোখ মুছছে।

ঃ সাজ্জাদ না তোমার নাম? কি হয়েছে?

'দুলাভাই হারিয়ে গেছেন' এই খবরটি বলতে সাজ্জাদের দীর্ঘ সময় লাগলো। বড়চাচা নিঃশব্দে শুনলেন। শান্ত স্বরে বললেন, 'কার্ফু ভঙ্গের জন্য ধরে নিয়ে থানায় রেখে দিয়েছে। থানায় খোঁজ করলেই পাওয়া যাবে। তুমি কাঁদবে না, আমি খোঁজ করছি। তুমি কিছু খেয়েছ?

AMARBOI.COM

ঃ জ্বি না।

ঃ খাও কিছু। খোকন তোমার বন্ধুকে কিছু খাবার দিতে বল।

ঃ আমার খিদে নেই, আমি কিছু খাব না।

ঃ সাজ্জাদ তুমি খাও। আমি খোঁজ করছি। কি নাম তোমার দুলাভাইয়ের?

ঃ শমসের আলি।

বড়চাচা প্রথমেই ফোন করলেন রমনা থানায়—আমি মোহাম্মদ রফিক চৌধুরী। আমার একটা খবর দরকার। গতরাতে কার্ফু চালাকালীন সময় শমসের নামের.....।

বড়চাচা সব ক'টি থানায় ফোন করলেন। কেউ কোনো খবর দিতে পারলো না। শমসের আলি নামের কেউ গত রাতে গ্রেফতার হয়নি। বড়চাচা ক্রমেই গম্ভীর হতে শুরু করলেন। এক সময় বললেন—'নিজে না গেলে হবে না। খোকন ড্রাইভারকে গাড়ি বের করতে বল। সাজ্জাদ তুমিও চল আমার সঙ্গে।'

বড়চাচা রাত দশটা পর্যন্ত নানান জায়গায় ঘোরাঘুরি করলেন। কোনোই খবর পাওয়া গেল না। তিনি রাগী গলায় বললেন---একটা লোক আপনা আপনি নিখোঁজ হয়ে যাবে? এটা একটা কথা হলো? বড়চাচার কপালে ভাঁজ পড়েছে। সাজ্জাদ ক্রমাগত চোখ মুছছে। তিনি এক সময় বললেন—'পুরুষ মানুষদের কাঁদতে নেই। কান্না বন্ধ কর। আমি তোমার দুলাভাইকে খুঁজে বের করব। এখানকার ডিসিএমএলএ আমার পরিচিত। কাল দেখা করব তার সঙ্গে। নাকি এখন যেতে চাও?' সাজ্জাদ জবাব দিল না। তিনি বললেন---চল এখনি যাওয়া যাক। ডিসিএমএলএকে পাওয়া গেল না।

AMARBOI.COM

সাত তারিখে শেখ মুজিবুর রহমান ভাষণ দেবেন রেসকোর্সের মাঠে। ভোর রাত থেকে লোকজন আসতে শুরু করেছে। দোকান-পাট বন্ধ। অফিস আদালত কিছু নেই। সবার দারুণ উৎকণ্ঠা। কি বলবেন এই মানুষটি? সবাই তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। খুব মন দিয়ে আজ শুনতে হবে তিনি কি বলেন। আজ তাঁকে পথ দেখাতে হবে। শোনাতে হয়ে অভয়ের বাণী।

হাজার হাজার মানুষ জমতে শুরু করেছে। দেখতে দেখতে রেসকোর্সের ময়দান জনসমূদ্রে পরিণত হলো। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরী সবাই অপেক্ষা করছে। বাবার কাঁধে চেপে এসেছে শিশুরা। অবাক হয়ে তারা দেখছে এই বিশাল মানুষের সমুদ্রকে।

বহুদূরে অপেক্ষা করছে সারি সারি মিলিটারি ভ্যান। চোখে সানগ্লাস পরা তরুণ অফিসারদের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে। সম্মিলিত শক্তি—ভয়াবহ শক্তি। ওরা কি বুঝতে পারছে সে কথা? ঘন ঘন কথা বলছে ওয়ারলেসে। মাথার ওপর দিয়ে অস্থির ভঙ্গিতে উড়ে যাচ্ছে হেলিকপ্টার। বিমান বাহিনীর পদস্থ অফিসাররা হেলিকপ্টারের জানালা দিয়ে নিচে তাকাচ্ছে, ওদের কপালেও ঘাম। নিঃশ্বাস পড়ছে দ্রুত। অপেক্ষা করছে তারাও।

সাজ্জাদ এসেছে খুব ভোরে। সে ঠিক বক্তৃতা শুনতে আসেনি। বক্তৃতা টক্তৃতা তার বিশেষ ভাল লাগে না। সাজ্জাদ এসেছে তার দুলাভাইয়ের খোঁজে। তার মনে ক্ষীণ আশা, কোনো অলৌকিক উপায়ে তাকে হঠাৎ হয়তো পাওয়া যাবে। দেখা যাবে মাঠের প্রান্তে পা ছড়িয়ে চীনাবাদাম খাচ্ছে। সাজ্জাদকে দেখা মাত্রই ডাকবে—এই যে এই। এই সাজ্জাদ। সাজ্জাদ বলবে—আরে দুলাভাই আপনি এখানে!

ঃ আসলাম, দেখি শেখ সাহেব কি বলেন।

ঃ এদিকে আপনার জন্য আমরা অস্থির। আপা খাওয়া-দাওয়া বন্ধ বরে দিয়েছে।

ঃ তাই নাকি?

ঃ আবার বলছেন তাই নাকি। এইসব কি কাণ্ড দুলাভাই। চলেন বাসায় যাই।

ঃ যাব যাব। বস আগে বক্তৃতাটা শুনি। বাদাম খাবে?

ঃ না।

ঃ আরে খাও না। এই, এই বাদামওয়ালা।

বাস্তবে অবশ্যি সে রকম কিছুই হলো না। কত অসংখ্য মানুষ এসেছে। কিন্তু কারো সঙ্গে কারুর চেহারার কোনো মিল নেই। সাজ্জাদের হঠাৎ মনে হলো এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার তো! সব পশু দেখতে এক রকম। দুটি শেয়ালের মধ্যে প্রভেদ কিছু নেই, কিন্তু মানুষরা কত আলাদা। কেন, এ রকম কেন?

সাজ্জাদ চমকে পেছন ফিরলো। খয়েরী রঙের একটা চাদর গায়ে দিয়ে হেড স্যার দাঁড়িয়ে আছেন। সাজ্জাদের মনে হলো সভাতে আস-

AMARBOI.COM

বার জন্যে হেড স্যার প্রথমেই একটা প্রচণ্ড ধমক দেবেন। কিন্তু সে রকম কিছু হলো না। স্যার অস্বাভাবিক নরম গলায় বললেন—সাজ্জাদ একটা খবর শুনলাম তোমার দুলাভাইয়ের সম্পর্কে, এটা কি সত্যি? ওনাকে নাকি পাওয়া যাচ্ছে না?

ঃ সত্যি স্যার।

ঃ বল কি! আত্মীয়স্বজনকে খবর দিয়েছে তো?

ঃ জ্বি স্যার।

ঃ আত্মীয়স্বজন কে কে আছেন?

সাজ্জাদ চুপ করে রইলো। তার তেমন কোনো আত্মীয়স্বজন নেই। এক মামা আছেন কুড়িগ্রামে, পোস্ট মাস্টার। নিকট আত্মীয় বলতে তিনিই। তাঁর সঙ্গে বহুদিন যাবত যোগাযোগ নেই। হেড স্যার বললেন, 'তোমাদের চলছে কি ভাবে? সঞ্চয় তো মনে হয় তেমন কিছু তোমার দুলাভাইয়ের ছিল না। নাকি ছিল?' সাজ্জাদ জবাব দিল না। হেড স্যার চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন—কাল তুমি অবশ্যই আমার সঙ্গে দেখা করবে। বাসা চেন তো?

ঃ চিনি স্যার।

ঃ সকালবেলা চলে আসবে।

ঃ জ্বি আচ্ছা।

ঃ এখানে দাঁড়িয়ে তো কিছু শুনতে পাবে না। আরেকটু সামনে যাওয়া দরকার। চল সামনে যাই।

ঃ আপনি যান স্যার। আমি বাসায় চলে যাব।

ঃ সে কি, ভাষণ শুনবে না?

ঃ জ্বি না স্যার।

ঃ আচ্ছা ঠিক আছে যাও। কাল সকালবেলা মনে করে আসবে। মনে থাকবে তো?

ঃ থাকবে স্যার।

সাজ্জাদ বাসায় গেল না। নীলুদের বাসার দরজায় গিয়ে ধাক্কা দিল। তার একটু লজ্জা করতে লাগলো। এক সপ্তাহ পর আসছে এখানে। দাদুমণি খুব করে বলে দিয়েছিলেন একটা খবর দেয়ার জন্যে।

দরজা খুললো নীলু। সে থমথমে গলায় বললো—খুব বকা খাবে দাদুমণির কাছে। দাদুমণি খুব রেগেছেন তোমার ওপর। আমাকে বলেছেন আসলেও যেন ঢুকতে না দিই।

AMARBOI.COM

দাদুমণি অবশ্যি তেমন রাগ করলেন না। কিংবা রাগটা জমা করে রাখলেন, পরে করবেন। তিনি বললেন---তুমি আমি না আসা পর্যন্ত থাকবে এখানে। আমি শেখ সাহেবের ভাষণ শুনতে যাচ্ছি। নীলু বললো—সেতো দাদুমণি রেডিওতে শুনলেই হয়।

ঃ না, এসব জিনিস সভাতে উপস্থিত থেকে শুনতে হয়। রেডিওতে শুধু কথাগুলো শোনা যাবে। কিন্তু বক্তৃতা শুনে মানুষের চোখে-মুখে কি পরিবর্তন হচ্ছে সেটা দেখা যাবে না। আমার কাছে বক্তৃতার চেয়ে এই সব জিনিসই দেখতে ভাল লাগে।

দাদুমণি চলে যাওয়া মাত্র নীলু বললো—তোমাদের কথা আমার রোজ মনে হয়েছে। আশ্চর্য, একবারও তোমরা আসলে না!

ঃ আসলাম তো।

ঃ এক সপ্তাহ পর আসলে। দাদুমণি যতটুকু রাগ করেছে, আমি তার চেয়েও বেশি রাগ করেছি। আমি কোনো কথাই বলবো না।

ঃ আমার একটা বড় বিপদ হয়েছে। আমার দুলাভাইকে খুঁজে পাচ্ছি না।

ঃ খুঁজে পাচ্ছো না মানে?

ঃ কার্ফুর রাতে আমাকে খুঁজতে বেরিয়েছিলেন, তারপর আর ফিরে আসেননি।

সাজ্জাদের চোখ দিয়ে জল পড়তে শুরু করলো। নীলু তাকিয়ে রইল অবাক হয়ে। এক সময় দেখা গেলো সেও কাঁদতে শুরু করেছে। তার পোষা ময়না ক্রমাগত ডাকতে লাগলো, 'কুটুম এসেছে বসতে দাও।'

ঠিক তখনি রেসকোর্সে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতা শুরু করলেন। তাঁর মুখ দিয়ে কথা বলে উঠলো বাংলাদেশ।

> "...আমি যদি তোমাদের কাছে না থাকি
> তোমাদের উপর আমার আদেশ রইলো
> ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল, তোমাদের যা
> কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত হও। রক্ত
> যখন দিতে শিখেছি আরো দেব।
> বাংলাকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ্।"

AMARBOI.COM

মেয়ের গায়ে হাত দিয়ে রাহেলা গম্ভীর হয়ে পড়লেন। বেশ জ্বর গায়ে। জ্বরের আঁচে গাল লাল হয়ে আছে। অথচ সকালে বেশ ভাল ছিল। অঞ্জু ও বিলুর সঙ্গে হৈ চৈ করে খেলেছে।

ঃ কেমন লাগছে মা ?

ঃ ভাল লাগছে।

ঃ মাথা ব্যথা করে ?

ঃ নাহ্।

ঃ শরীর খারাপ লাগছে না ?

ঃ না তো।

রাহেলা কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, 'তুমি একটু সুস্থ হয়ে উঠলেই আমরা নর্থ ডাকোটায় চলে যাবো।'

ঃ আমি যেতে চাই না মা।

ঃ যেতে চাও না কেন ? আমেরিকা তোমার ভাল লাগে না ?

ঃ লাগে।

ঃ তাহলে যেতে চাও না কেন ? কি আছে এখানে বল ? হৈ চৈ গণ্ডগোল। ছিঃ ছিঃ। আমেরিকাতে আমরা ভাল ছিলাম না ?

ঃ ছিলাম।

ঃ এবার গিয়েই আমরা একটা বাড়ি কিনে ফেলব। বড় একটা দোতলা বাড়ি। সেখানে বেসমেন্টে থাকবে তোমার খেলার ঘর। শীতের সময় যখন বরফ পড়বে, তখন আমরা দু'জনে মিলে স্নোম্যান বানাবো কেমন ? গাজর দিয়ে বানাবো নাক। কালো বোতাম দিয়ে চোখ, কেমন ?

প্রিসিলা জবাব দিল না। ঘরের দরজায় অঞ্জু আর বিলু উঁকি দিচ্ছিল। তাদের হাতে লুডু বোর্ড। রাহেলা বললেন, 'প্রিসিলার জ্বর। প্রিসিলা খেলবে না! তোমরা এখন ওকে বিরক্ত করবে না।'

প্রিসিলা বললো, 'মা আমি ওদের সঙ্গে খেলতে চাই।'

ঃ না। তুমি চুপচাপ শুয়ে থাকবে।

ঃ শুয়ে থাকতে আমার ইচ্ছে হচ্ছে না।

ঃ ইচ্ছে না হলেও থাকবে। আমি ডাক্তারকে টেলিফোন করছি।

AMARBOI.COM

রাহেলা নিচে নেমে গেলেন। নিচে গিয়ে দেখলেন কবীর পাংশু মুখে বসে আছে একটা চেয়ারে। তার ঠোঁট কাটা, সেখানে রক্ত জমে আছে। আমিন সাহেব বসে আছেন তার সামনে। রাহেলা বললেন, 'কি হয়েছে ?'

ঃ মিছিলে গিয়েছিলাম চাচী। হঠাৎ পুলিশ তাড়া করলো। দৌড়াতে গিয়ে উল্টে পড়ে গেছি।

ঃ ঠোঁট তো দেখি অনেকখানি কেটেছে।

ঃ না বেশি না।

আমিন সাহেব বললেন, 'খুব মিছিল হচ্ছে, না ?'

ঃ খুব হচ্ছে।

ঃ ওদের এখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা, ঠিক না ?

আমিন সাহেব হেসে উঠলেন। রাহেলা গম্ভীর হয়ে বলসেন, 'হাসির কোনো ব্যাপার হয়নি। তুমি হাসছো কেন ?'

ঃ হাসির ব্যাপার না, তবে আনন্দের ব্যাপার।

ঃ আনন্দের ব্যাপারটা কোথায় ?

আমিন চাচা গম্ভীর হয়ে বললেন, একটা সিংহ তার ক্ষমতা বুঝতে পারছে, ব্যাপারটা আনন্দের নয় ? রাহেলা জবাব দিলেন না। ডাক্তারকে টেলিফোন করতে গেলেন। টেলিফোনে রিং হচ্ছে না। অনেকবার চেষ্টা করা হলো। রাহেলা মুখ কালো করে বললেন—পৃথিবীর কোনো দেশে এত খারাপ টেলিফোন সার্ভিস আছে বলে আমার জানা নেই।

AMARBOI.COM

খোকনের সমস্তটা দিন খুব খারাপ কেটেছে। ভয়াল ছয়ের একজন মানুষকেও খুঁজে পাওয়া যায়নি। বল্টু ও টুনু দু'জনেই দেশের বাড়িতে চলে গেছে। অবস্থা ভাল না হলে এরা ফিরে আসবে না। সাজ্জাদকেও তার বাসায় পাওয়া গেল না। সে কোথায় গেছে তাও জানা গেল না। সাজ্জাদের বোন কোনো কথারই জবাব দিতে পারেন না। শুধু কাঁদেন। অনেক ঝামেলা করে মুনীরকে পাওয়া গেলো। মুনীরের কাছে স্যার এসেছেন—ইংরেজি পড়াচ্ছেন। মুনীর এক ফাঁকে বলে গেল, 'একটু দাঁড়া, স্যার এক্ষুণি চলে যাবেন।' খোকন অপেক্ষা করতে লাগলো। স্যার যেতে অনেক দেরি করলেন। বসে থাকতে থাকতে খোকনের প্রায় যখন ঘুম ধরে গেল তখন স্যার গেলেন। খোকন বললো, 'দুপুরে পড়িস তুই ?'

ঃ হু। বাবা স্যার রেখে দিয়েছেন। স্কুল তো এখন বন্ধ, কাজেই ঘরে বসে যতটুকু পারা যায়। তোদের ভয়াল ছয়ের কি অবস্থা ?

ঃ ভালই।

ঃ ভাল আর কোথায়, সব তো চলেই গেছে। তুই আর সাজ্জাদ এই দু'জন ছাড়া তো এখন আর কেউ নেই।

ঃ ওরা আবার আসবে, তখন হবে।

ঃ এসব জিনিস একবার ভেঙে গেলে আর হয় না।

ঃ তোকে বলেছে।

খোকনের বসে থাকতে ভাল লাগছিলো না। সে এক সময় বললো, 'ঘুরতে যাবি ?'

ঃ কোথায় ?

ঃ ঐ রাস্তায়, আর কোথায় ?

ঃ না ভাই। বাবা রাগ করবেন। তাছাড়া বিকেলে আমার কাছে আরেকজন স্যার আসবেন। অঙ্ক স্যার।

ঃ কয়টা স্যার তোর ?

ঃ বেশী না এই দু'জনেই। বৃত্তি পরীক্ষা আসছে তো, তাই।

খোকন একা একা অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়ালো। ফার্মগেট থেকে হেঁটে হেঁটে চলে গেলো শাহবাগ এভিন্যু পর্যন্ত। শাহবাগের মোড়ে কিসের যেন জটলা। লোকজন বলাবলি করছে 'জঙ্গী মিছিল' আসছে পুরান ঢাকা থেকে, একটা কাণ্ড হবে। একজন স্যুট টাই পরা ভদ্রলোক বললেন, 'খোকা তুমি বাড়ি যাও।' খোকন বাড়ি গেল না, পাক মটরস পর্যন্ত গিয়ে চলে গেলো কলাবাগানের দিকে। সেখানেও প্রচুর গণ্ডগোল, একটা পুলিশের ট্রাক পুড়ছে। সবাই গোল হয়ে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছে। খোকনের দেখার ইচ্ছে ছিলো। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও ভীড় গলে ভেতরে ঢুকতে পারলো না। একটা দমকলের গাড়ি এসে থেমে আছে। কেউ সেটাকে যেতে দিচ্ছে না। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো আশেপাশে কোথাও পুলিশ বা মিলিটারির কোনো চিহ্ন নেই। খোকন কলাবাগানে কাটালো বিকেল পর্যন্ত। বাড়ি ফিরতে তাই সন্ধ্যা মিলিয়ে গেলো। বড়চাচা আজ নির্ঘাৎ ধরবেন। আজ বাড়িতে ভুমিকম্প হবে।

AMARBOI.COM

বড়চাচা অবশ্যি তাকে ধরলেন না। ধরলেন কবীর ভাইকে। রাতের খাবার শেষ হয়ে যাবার পরপরই বিচার সভা বসলো। আসামী মাত্র একজন। কবীর ভাই। বিচার সভা বসলো বড়চাচার লাইব্রেরি ঘরে। সবাই সেখানে উপস্থিত। কবীর ভাই মাথা নিচু করে সোফার

একটা কোণায় বসে আছেন। বড়চাচা থেমে থেমে বললেন, "তুমি একবার সকালবেলা একটা মিছিলের সঙ্গে জুটে গিয়ে ঠোঁট কেটে এলে। তারপরও বিকেলবেলা আবার গেলে। অথচ আমি অনেকবার বলেছি এইসব মিটিং মিছিল থেকে দূরে থাকবে। এই প্রসঙ্গে তোমার কি বলার আছে ?"

কবীর ভাই চুপ করে রইলেন।

ঃ তোমার কিছু বলার থাকলে বলে ফেলো। তোমার কি ধারণা যা করছ দেশের জন্যে করছো ?

ঃ জ্বি।

ঃ ভুল ধারণা। হাঙ্গামা হুজ্জত করে দেশের কিছু হবে না। এতে দেশের অমঙ্গলই হবে, মঙ্গল হবে না, বুঝতে পারছ ?

কবীর ভাই কিছু বললেন না। খোকনের আব্বা হঠাৎ কথা বলে উঠলেন। শান্ত স্বরে বললেন—আপনার কথাটা ঠিক না। আন্দোলন করে অনেক কিছু আদায় করা যায়। ভাষা আন্দোলনের কথা মনে করে দেখুন। সেদিন আমরা আন্দোলন না করলে আজ রাস্তাঘাটে উর্দুতে কথা বলতাম।

ঃ আন্দোলনের অনেক রকম পথ আছে। গান্ধিজী অহিংস পথে দেশকে স্বাধীন করেছেন।

আমিন চাচা বললেন—তার জন্যে গান্ধিজীর মত নেতা দরকার। সে রকম যখন নেই তখন আমাদের পথে নামা ছাড়া উপায় কি ?

ঃ এই সব বাচ্চা ছেলেপুলে পথে নামবে ?

ঃ নামবে না কেন ? নামবে। অল্প বয়স থেকেই তাদের শিখতে হবে।

বড়চাচা দীর্ঘ সময় চুপ করে থেকে বললেন—'ভুট্টো সাহেব এসেছেন। আলোচনায় বসেছেন। এখন সব মিটমাট হবে। মিছিল ফিছিলের প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। এতে ওদেরকে শুধু ক্ষেপিয়েই তোলা হবে। কবীর আমার হুকুম অমান্য করেছে। কাজেই এর শাস্তিস্বরূপ সে আগামী এক সপ্তাহ ঘর থেকে বেরুতে পারবেনা। কবীর, আমি কি বলেছি তুমি বুঝতে পারছ ?

ঃ পারছি।

ঃ আর শোন, যদি আমার কথার অবাধ্য হয়ে আবার বের হয়ে যাও, তাহলে এ বাড়িতে এসে আর ঢুকতে পারবে না।

AMARBOI.COM

বড়চাচা দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে অসম্ভব গম্ভীর হয়ে পড়লেন।

রাত দশটায় ভয়েস অব আমেরিকা থেকে বলা হলো—'শেখ মুজিব ও ভুট্টোর মধ্যে কথাবার্তা এগুচ্ছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় তাঁরা একটা আপোসে পৌঁছবার চেষ্টা করছেন। শহরের পরিস্থিতি আগের মতই। চারদিকে থমথমে ভাব, যা আসন্ন ঝড়ের ইঙ্গিত দেয়।'

রাতে ঘুমতে যাবার আগে খোকনের মা খোকনকে ডেকে পাঠালেন। কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, 'তুই আজও গিয়েছিলি ?' খোকন চুপ করে রইলো। তিনি খুব কাঁদতে লাগলেন। খোকন বললো, 'কাঁদছ কেন ?'

ঃ কাদবো না! তুই যেখানে সেখানে যাবি। আমি খোঁজও নিতে পারি না তুই কোথায় যাস, কি করিস। আর কোথাও যাবি না।

ঃ আচ্ছা।

ঃ আমার গা ছুঁয়ে বল কোথাও যাবি না।

খোকন মাথা নিচু করে বসে রইলো।

ঃ আয় না বাবা আয়।

খোকন এগিয়ে যেতেই মা তার হাত ধরে ফেললেন। খোকনের কেন জানি খুব লজ্জা করতে লাগলো।

AMARBOI.COM

সাজ্জাদের বাড়ি ফিরতে ভাল লাগে না।

তার বোনটি সারাক্ষণ কাঁদে। কাঁদে নিঃশব্দে। সাজ্জাদ কিছুই করতে পারে না। শুধু বসে থাকে চুপচাপ। বড়ই একা একা লাগে তার।

মামাকে টেলিগ্রাম করা হয়েছে। কিন্তু তাঁর কাছ থেকে কোনো খবর এখনো এসে পৌঁছায়নি। এখন তারা কি করবে তা বুঝতে পারছে না। দেশের বাড়িতে চলে যাবে ? কিন্তু কেউ নেই সেখানে। ছোট্ট একটা বাড়ি ছিলো। নদীর ভাঙনে কোথায় চলে গেছে। কে এখন আর জায়গা দেবে ? তাছাড়া সাজ্জাদের বোন কোথাও যেতে চায় না। যদি কখনো মানুষটি ফিরে আসে ? রাতের বেলা খুব কম করে হলেও সে দশবার জেগে উঠবে। সাজ্জাদকে ডেকে বলবে—মনে হলো কেউ যেন এসেছে, আয় দরজাটা খুলি।

ঃ কেউ না আপা।

ঃ খোল না তুই। এ রকম করছিস কেন?

দরজা খোলা হয়। কোথাও কিছু নেই। একটা কুকুর দরজার পাশে বসে হাই তুলছে শুধু।

সাজ্জাদের বয়স দ্রুত বেড়ে যেতে লাগলো। আমাদের বয়স বাড়ে অভিজ্ঞতার সঙ্গে। সেই সময়ে অত্যন্ত দ্রুত সাজ্জাদের অভিজ্ঞতা বাড়তে লাগলো। একদিন সে তার বোনের দুল নিয়ে বিক্রি করে এলো সোনার দোকানে। দোকানী খুব সন্দেহ নিয়ে তাকাচ্ছিল তার দিকে। সরু গলায় বলেছিলো—কার গয়না খোকা বাবু?

ঃ আমার বড় বোনের।

ঃ তাকে বলে এনেছ?

ঃ হ্যাঁ। সে নিজেই দিয়েছে।

ঃ দেখ খোকাবাবু, তুমি তোমার বোনকে সঙ্গে করে নিয়ে এসো।

ঃ কেন?

ঃ আমার মনে হচ্ছে জিনিসটা তুমি না বলে এনেছ। তুমি যাও বোনকে নিয়ে এসো। আর শোন, অন্য দোকানে যাবে না। তুমি ছোট মানুষ, ঝামেলা টামেলা হবে।

সাজ্জাদ বোনকে নিয়ে এসেছিল। তারপরও দু'দিন আসতে হলো। একবার একটি চুড়ি নিয়ে। আরেকবার আংটি নিয়ে। দোকানদার এর পর আর কিছু বলতো না। সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিতো। শেষবার খুব শান্ত গলায় বললো, 'এইভাবে আর কতদিন চলবে? এবার তো অন্য কিছু চেষ্টা করা দরকার।'

ঃ কি চেষ্টা করব?

ঃ একটা কাজ টাজ করার চেষ্টা কেমন মনে হয়?

ঃ কি কাজ?

ঃ তাও ঠিক। তোমার যে বয়স তাতে কি কাজ আর করবে? তবে খোকাবাবু দিন আর এ রকম থাকবে না। তুমি ভেঙে পড়বে না। দেশের অবস্থা বদলাবে। মানুষের ভাগ্যও বদলাবে। তুমি কি কিছু খাবে?

ঃ জ্বি না।

ঃ খাও। একটা কিছু খাও। এই যাতোরে একটা মিষ্টি আন। বুঝলে খোকাবাবু, এখন তোমার যে দুঃসময় সে দুঃসময় আমাদের সবার। তবে এটা থাকবে না।

এই লোকটির সঙ্গে সাজ্জাদের বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল। তার দোকানের পাশ দিয়ে যাবার সময় সাজ্জাদ উঁকি দিতো আর সে হাসি

AMARBOI.COM

মুখে বলতো—'আরে খোকাবাবু যে এসো এসো। দেশের কি খবর বলতো? ওরে একটা মিষ্টি দিতে বল তো।' অনেক রকম গল্প-গুজব হতো তার সঙ্গে। মজার মজার সব গল্প।

ঃ বুঝলে খোকাবাবু, গয়নার দোকানের মালিকরা মানুষের দুঃখের গল্পগুলো খুব ভাল জানে। আমরা চোখের সামনে কতজনকে নিঃস্ব হতে দেখি। বড় খারাপ লাগে খোকাবাবু।

সাজ্জাদ বুঝতে পারে তারা নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। প্রায়ই তার বোন ভয় পাওয়া গলায় বলে—এখন কি হবে? সাজ্জাদ জবাব দিতে পারে না।

ঃ আর কয়েকদিন পর তো ঘরে রান্না হবে না। তখন কি করবি?

ঃ আমি কাজ করব।

ঃ তোকে কে কাজ দেবে? একবার তোর দুলাভাইয়ের অফিসে বরং যা। দেখ ওরা কি বলে?

ঃ ওরা কি বলবে?

ঃ জানি না কি বলবে। গিয়ে দেখ না।

একদিন সাজ্জাদ গেল সেখানে। এবং আশ্চর্য লোকগুলো খুবই যত্ন করলো তাকে। বারিন বাবু বলে এক ভদ্রলোক বললেন—তুমি চিন্তা করবে না। এই কারখানাতেই তোমার একটা ব্যবস্থা করব। পড়াশোনা যা করছিলে তাই করবে, অবসর সময়ে কাজ শিখবে। ফেরার সময় বারিন বাবু বললেন—"তোমার দুলাভাইয়ের কাছ থেকে একবার পঞ্চাশ টাকা ধার করেছিলাম, সেটা ফেরত দেয়া হয়নি তোমার কাছে দিয়ে দিই, কেমন?' তখন দেখা গেল আরো অনেকেই একই কথা বলছে। কেউ দশ টাকা ধার নিয়েছিলো। কেউ কুড়ি টাকা।

সাজ্জাদের মনে হলো লোকগুলো মিথ্যে কথা বলছে। কিন্তু মাঝে মাঝে মিথ্যে কথা এমন মধুর হয় কি করে কে জানে। তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো।

বারিন বাবু তাকে কোলে করে একটি রিকশায় এনে তুলে দিলেন। ভরাট গলায় বললেন—তোমরা কোথায় থাকো জানতাম না। জানলে আরো আগে এসে খোঁজ নিতাম। এখন থেকে খোঁজ খবর রাখব। তোমার কোন ভয় নেই।

সাজ্জাদ বাড়ি ফিরে দেখে দাদুমণি ও নীলু বসে আছে তাদের বাসায়। নীলুর মুখ দারুণ হাসি হাসি। এবং আশ্চর্য, বহুদিন পর

AMARBOI.COM

দেখা গেল তার বোন কাঁদছে না। দাদুমণি বললেন, 'এই যে সাজ্জাদ বাবু, তুমি কোথায় ছিলে? তোমার জন্যেই বসে আছি। কাপড় চোপড় রেডি কর সময় নাই।'

সাজ্জাদ অবাক হয়ে তাকালো।

ঃ তোমরা দু'জন এখন থেকে আমাদের সঙ্গেই থাকবে। তোমার বোনকে রাজি করিয়েছি।

সাজ্জাদ কিছু বুঝতে পারলো না।

'তোমার কোনো সুবিধার জন্যে বলছি না। আমার এবং নীলুর সুবিধার জন্যে। নীলু একা একা থাকে। তোমরা থাকলে আমি নিশ্চিন্ত হবে ঘোরাঘুরি করতে পারি। তাইনাগো দাদুমণি?' নীলু হাসি মুখে বললো—হ্যাঁ। দাদুমণি বললেন, 'ঢাকায় আমরা কত দিন থাকতে পারি তা অবশ্যি জানি না। যদি শেখ মুজিব আর ভুট্টোর মধ্যে কথা-বার্তায় কোন ফল না হয়, তাহলে ঢাকা ছাড়তে হবে। আমরা সবাই মিলে তখন গ্রামে চলে যাব। নীলগঞ্জে আমার একটা বড় বাড়ি আছে।' নীলু হাসি মুখে বললো—খুবই সুন্দর বাড়ি। বাড়ির পাশে একটা ছোট নদী আছে। নদীর নাম সোহাগী। সাজ্জাদের বোন ইতস্তত করে বললো, 'ওর দুলাভাই যখন ফিরে এসে দেখবে কেউ নেই তখন?'

ঃ আমরা এ পাড়ার সবাইকে বলে যাব। তাছাড়া সে আমাদের খুঁজে বের করবে। আমরা তো তাকে কম খোঁজাখুঁজি করিনি, কি বল?

AMARBOI.COM

পঁচিশে মার্চ দুপুর থেকেই সবার ধারণা হলো কিছু একটা হয়েছে। হয়তো ভুট্টো আর ইয়াহিয়া ঠিক করে ফেলেছে এ দেশের মানুষদের কোনো কথা শোনা হবে না। চারদিক থমথম করতে লাগলো। খোকনের বড়চাচা দুপুর একটায় অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে ঘরে ফিরলেন। ফিরেই বললেন, 'আজ যেন কেউ ঘর থেকে বের না হয়। সবাই যেন ঘরে থাকে। কবীর কোথায়, কবীরকে ডাক।'

কবীরকে কোথাও পাওয়া গেল না। বড়চাচা থমথমে গলায় বললেন—ও কোথায় গিয়েছে? কেউ জবাব দিতে পারলো না।

ঃ খোকনকে ডাক।

খোকন নিচে নেমে এলো। বড়চাচা বললেন, 'কবীর কোথায় জান?'

ঃ জ্বি না।

ঃ তুমি আজ ঘর থেকে বেরুবে না।

ঃ কেন চাচা?

ঃ শহরের অবস্থা ভাল না। শহরে মিলিটারি নামবে, এ রকম একটা গুজব শোনা যাচ্ছে।

খোকন কিছু বুঝতে পারলো না। মিলিটারি তো নেমেই আছে। নতুন করে নামবে কি? বড়চাচা বললেন—তোমার ঐ বন্ধুটি, সাজ্জাদ যার নাম—ও কোথায় আছে?

ঃ ও আছে দাদুমনির বাসায়।

ঃ কার বাসায়?

ঃ একজন বুড়ো ভদ্রলোকের বাসায়। ওনাকে আমরা দাদুমণি ডাকি।

ঃ করেন কি উনি?

ঃ আমি জানি না চাচা।

ঃ তাঁর বাসায় আমাকে একদিন নিয়ে যাবে। আমি ঐ ছেলেটির জন্যে কিছু করতে চাই।

ঃ জ্বি আচ্ছা, আমি নিয়ে যাব।

ঃ এখন যাও দারোয়ানকে ডেকে নিয়ে এসো।

দারোয়ান আসামাত্র বড়চাচা বললেন—কবীর যখন ফিরবে, তাকে ঢুকতে দেবে না। বলবে এ বাড়িতে তার জায়গা নেই। সে যেন তার নিজের পথ দেখে নেয়। বুঝলে?

আমিন চাচা সন্ধ্যাবেলা মুখ কালো করে ঘরে ফিরলেন। চা খেতে খেতে বললেন শেখ মুজিবুর রহমান যে প্রেস কনফারেন্স ডেকেছিলেন সেটা বাতিল হয়ে গেছে। ব্যাপার কি কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

খোকনরা যখন ফার্স্ট ব্যাচে খেতে বসেছে তখন দারোয়ান এসে খবর দিল কবীর ভাই এসেছে, গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। বড়চাচা বললেন—তুমি এই খবরটি আমাকে দিতে এসেছ কেন? তোমাকে বলে দিয়েছি না ওকে ঢুকতে দেবে না? যাও, যা বলেছি তাই কর। বড়চাচী বললেন—সে কোথায় থাকবে রাত্রে?

ঃ যেখানে ইচ্ছা সেখানে থাকবে, এ বাড়িতে না।

ঃ তুমি এটা ঠিক করছ না।

ঃ আমি যা করছি ঠিকই করছি।

ঃ না ঠিক করছ না।

AMARBOI.COM

ওপর থেকে খোকনের বাবা নেমে এলেন। তিনি অত্যন্ত শান্ত গলায় বললেন—ভাইয়া, ছেলেটাকে ঘরে আসতে দিন।

ঃ যে ছেলে আমার কথা শোনে না, সে আমার বাড়িতে থাকবে না।

ঃ আমরা বড়রা মাঝে মাঝে ভুল কথা বলি, সে সব কথা সব সময় মানা যায় না।

ঃ আমি ভুল কথা বলি ?

ঃ না, আপনি ভুল কথা কম বলেন। কিন্তু এই একটি ক্ষেত্রে ভুল করছেন। সবাইকে মূল আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইছেন। এটা ঠিক না।

বড়চাচা তাকিয়ে রইলেন। খোকনের বাবা শান্ত স্বরে বললেন, অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে মনে হয় এক সময় এইসব বাচ্চা বাচ্চা ছেলেদেরই বন্দুক হাতে তুলে নিতে হবে। আপনি নিশ্চয়ই চান না আপনার ছেলেমেয়েরা পরাধীন হয়ে থাক। চান ? বলুন আপনি চান ?

ঃ না চাই না।

ঃ তাহলে এমন করছেন কেন ?

বড়চাচা ক্লান্ত স্বরে বললেন—ওকে ভেতরে আসতে বল। যাও বল ভেতরে আসতে।

দারোয়ান ছুটে গেলো। কিন্তু গেটের বাইরে কাউকে পাওয়া গেল না। আমিন চাচা তাকে খুঁজতে বের হলেন। বড়চাচী কাঁদতে শুরু করলেন।

খোকন অনেক রাত পর্যন্ত জেগে রইলো, যদি কবীর ভাই ফিরে আসেন। আমিন চাচা ফিরলেন দশটায়। কবীর ভাইকে কোথাও পান নি। তার মুখের ভাব-ভঙ্গিতে মনে হচ্ছে তিনি ভীষণ চিন্তিত।

গভীর রাতে খোকনকে ডেকে তোলা হল। বাবা এসে খুব নরম গলায় বললেন—খোকন তোমার মা'র শরীর খুব খারাপ, এসো মায়ের পাশে বস।

মায়ের ঘরে সবাই আছেন। বড়চাচা মাথা নিচু করে বসে আছেন একটি ছোট চেয়ারে। বড়চাচী মার হাত ধরে কাঁদছেন। মায়ের মুখ নীল বর্ণ। নিংশ্বাস নিতে পারছেন না। বার বার কেঁপে কেঁপে উঠছেন। নার্সটি বললো—হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার। এক্ষুণি হাসপাতালে নেয়া দরকার। কিন্তু সবাই এমন ভাব করছে যেন তার কথা কেউ শুনতে পাচ্ছে না। খোকন অবাক হয়ে তাকালো

AMARBOI.COM

বাবার মুখের দিকে। কেন, হাসপাতালে নেয়া হচ্ছে না কেন? বাবা শান্ত স্বরে বললেন—পাকিস্তানী মিলিটারিরা আক্রমণ শুরু করেছে খোকন। রাস্তায় মিলিটারি ছাড়া আর কিছু নেই। আজ রাতে কাউকে পাওয়া যাবে না। আজ রাতে কিছুই করার নেই!

খোকন নিজেও শুনতে পেলো প্রচণ্ড গোলাগুলি হচ্ছে। ট্যাংক নেমে গেছে রাস্তায়। বড়চাচা মৃদু স্বরে কি যেন বললেন। কেউ শুনতে পেলো না! নার্স আবার বললো—একজন ডাক্তার দরকার। সবাই চুপ করে রইলো। বাবা বললেন, 'খোকন মায়ের পাশে গিয়ে দাঁড়াও।'

শুরু হলো একটি অন্ধকার দীর্ঘ রাত। মানুষের সঙ্গে পশুদের একটা বড় পার্থক্য আছে। পশুরা কখনো মানুষের মত হৃদয়হীন হতে পারে না। পঁচিশে মার্চের রাতে হৃদয়হীন একদল পাকিস্তানী মিলিটারি এ শহর দখল করে নিল।

তারা উড়িয়ে দিল রাজারবাগ পুলিশ লাইন। জগন্নাথ হল ও ইকবাল হলেও প্রতিটি ছাত্রকে গুলি করে মারলো। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ঢুকে হত্যা করলো শিক্ষকদের। বস্তিতে শুয়ে থাকা অসহায় মানুষদের গুলি করে মেরে ফেললো বিনা দ্বিধায়। "বাঙালি-দের বেঁচে থাকা না থাকা কোনো ব্যাপার নয়। এরা কুকুরের মত প্রাণী, এদের মৃত্যুতে কিছুই যায় আসে না। এদের সংখ্যায় যত কমিয়ে দেয়া যায় ততই মঙ্গল। এদের মেরে ফেল। এদের শেষ করে দাও।"

AMARBOI.COM

এক রাত্রিতে এ শহর মৃতের শহর হয়ে গেল। অসংখ্য বাবারা তাঁদের ছেলেমেয়েদের কাছে ফিরে গেল না। অসংখ্য শিশু জানলো না বড় হয়ে ওঠা কাকে বলে। বেঁচে থাকার মানে কি?

শহরের জনশূন্য পথে দৈত্যাকৃতি ট্রাক চললো। ধ্বংস ও মৃত্যু। স্বজনহারা মানুষের কান্নার সঙ্গে ঠাঠা শব্দে গর্জাতে লাগলো মেশিনগান। জেনারেল টিক্কা খান বাঙালির মেরুদণ্ড ভেঙে চুরমার করে দিতে চায়। যেন এরা দ্বিতীয়বার আর পাকিস্তানীদের মুখের ওপর কথা বলার স্পর্ধা না পায়!

পরদিন ভোরবেলা পাকিস্তানের জনদরদী ভুট্টো চলে গেল পাকিস্তানে। সে মহা উল্লসিত। প্লেনে ওঠার আগে হাসি মুখে বলে গেল—'যাক শেষ পর্যন্ত শত্রুদের হাত থেকে পাকিস্তানকে রক্ষা করা গেল।'

ছাব্বিশে মার্চের সমস্তদিন কেউ ঘর থেকে বেরুতে পারলো না। শহরে কার্ফু। ঘরে বসে শুধুই প্রতীক্ষা। এর মধ্যেই আবার অবাঙালিরা যোগ দিল মিলিটারিদের সঙ্গে। বলে দিতে লাগলো—কাদের কাদের শেষ করে দিতে হবে। চারদিকে মৃত্যু আর মৃত্যু।

ছাব্বিশ তারিখ ভোর এগারোটায় ইয়াহিয়ার ভাষণ প্রচারিত হলো।

> "..শেখ মুজিবকে বিনা বিচারে আমি ছেড়ে দেব না। আওয়ামী লীগ দেশের শত্রু। আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। আমার দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী দেশকে শত্রুমুক্ত করতে এগিয়ে এসেছে। এবারো তাদের পূর্ব সুনাম অক্ষুণ্ণ থাকবে..."

দেশের লোক হতবুদ্ধি হয়ে গেল। কি হচ্ছে এসব। কি হচ্ছে ঢাকা শহরে? কিছুই জানার উপায় নেই। ঢাকা বেতার থেকে অনবরত হামদ ও নাতে রসুল প্রচারিত হচ্ছে।

পাশের দেশ ভারত। সেখানকার বেতারেও কোনো খবর নেই। এতবড় একটা কাণ্ড হয়ে গেছে, তারা কি কিছুই জানে না? কোলকাতা বেতার থেকে দুপুর বেলা হঠাৎ করে 'গীতালি' অনুষ্ঠান বন্ধ করে বলা হল—

"পূর্ব বাংলায় গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস, পূর্ব বাংলা রেজিমেন্ট, পূর্ব পাকিস্তান পুলিশ, পূর্ব পাকিস্তান আনসারস, পূর্ব পাকিস্তান মুজাহিদ দুর্জয় প্রতিরোধ গড়ে তুলছে।"

ঘোষণা শেষ হওয়া মাত্র বাজানো হলো সেই বিখ্যাত গান—'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।" এই দেশে শুরু হলো সম্পূর্ণ নতুন ধরনের জীবনযাত্রা।

ঢাকা শহরের অলিতে গলিতে মৃতদেহ পড়ে রইলো। সরাবার লোক নেই।

নীলু খুব মন খারাপ করে একা বসে ছিল। রাত প্রায় আটটা! চারদিক অন্ধকার। ইলেকট্রিসিটি আছে। তবু রান্নাঘরের বাতিটি ছাড়া আর সব বাতি নিভিয়ে রাখা হয়েছে। দাদুমণি নীলুর ঘরে ঢুকে

AMARBOI.COM

জিজ্ঞেস করলেন—একা একা বসে আছ কেন ? এসো আমার সঙ্গে এসে বস।

ঃ না।

ঃ ভয়ের কিছু নেই নীলু।

ঃ আমার ভয় করছে না।

ঃ সাজ্জাদরা কোথায় ?

ঃ জানি না। রান্নাঘরে বোধ হয়।

ঃ আমি কি বসব তোমার সঙ্গে ?

ঃ জানি না, ইচ্ছে হলে বসেন।

দাদুমণি বসলেন। নীচু স্বরে বললেন—আমরা গ্রামে চলে যাব। সুযোগ পেলেই চলে যাব। নীলু কিছু বললো না। দাদুমণি বললেন—কার্ফু ওদের এক সময় তুলতেই হবে। হবে না ?

ঃ তুলতেই হবে কেন ? না তুললে কে কি করবে ?

দাদুমণি এর উত্তর দিতে পারলেন না। তিনি আরো কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে নিজের ঘরে চলে গেলেন। তাঁর হাতে একটি ট্রানজিস্টার। তিনি বিদেশের রেডিও স্টেশনগুলো ধরতে চেষ্টা করছেন। পারছেন না। এই ট্রানজিস্টারটি বেশি ভাল না। ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে এখনো হামদ আর নাতে রসুল হচ্ছে। মাঝে মাঝেই ইংরেজি বাংলা ও উর্দুতে বলা হচ্ছে—

"শহরে কারফিউ বলবৎ আছে।"

সাজ্জাদ ও সাজ্জাদের বোন চুপচাপ রান্নাঘরে বসে আছে। কেউ কোনো কথা বলছে না। রান্না-বান্না হয়ে গেছে। শুধু ডাল ভাত। কিন্তু কেউ খেতে বসছে না। কারো খিদে নেই। এক সময় সাজ্জাদের বোন কি বললো। সজ্জাদ জবাব দিল না। তার কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। এটা এমন একটা সময় যখন কারোর কথা বলতে ইচ্ছে করে না। সাজ্জাদ দেখলো দাদুমণি দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি নরম স্বরে বললেন—

ঃ সাজ্জাদ, তোমরা রান্নাঘরে বসে আছ কেন ? এসো সবাই এক সঙ্গে বসি। নীলুকেও ডেকে নিয়ে এসো, ও খুবই মন খারাপ করছে।

নীলু এলো না। তার নাকি কিছুই ভাল লাগছে না। কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত দাদুমণি এলেন তাকে নিতে।

ঃ একা একা থাকলে আরো খারাপ লাগবে।

ঃ না লাগবে না।

AMARBOI.COM

ঃ তাহলে বরং খেয়ে ঘুমিয়ে পড়।

ঃ আমি এখন ঘুমবো না।

দাদুমণি চলে এলেন। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল নীলু দরজা বন্ধ করে টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়েছে। ট্রাংক খুলে তার বাদামী রঙের খাতা বের করেছে। এখানে সে মাঝে মাঝে নিজের মনের কথা লেখে। সেই লেখাগুলো খুব গোপন। কেউ পড়তে পারে না। এমন কি দাদুমণিও না। তিনি জানেনও না যে তার এ রকম একটা খাতা আছে। এটি সে জন্মদিনে পাওয়া টাকায় নিজে গিয়ে কিনে এনেছে। নীলু খাতা সামনে রেখে পুরোনো দু'একটা লেখা পড়লো, তারপর লিখতে শুরু করলো ঃ

নীলুর ডাইরী

২৬শে মার্চ

রাত ন'টা

আমরা আজ সারাদিন ঘরে বন্দি হয়ে আছি। খুব খারাপ লাগছে আমার। বাইরের সব দরজা জানালা বন্ধ। বারান্দায় উঁকি দেয়ার হুকুম নেই। এত খারাপ লাগছে। এই দেশটা লরা মেরীর দেশের মত কেন হলো না? তাহলে কী চমৎকার হতো। ঘাসের বনে একটা ছোট্ট কুটির বানিয়ে আমরা থাকতাম। শীতকালে তুষার ঝড় হতো। জানালার পাশে বসে বসে দেখতাম সাদা বরফে চারদিক ঢেকে যাচ্ছে। দাদুমণি ঘরে একটা আগুন করে মজার মজার সব গল্প বলা শুরু করতেন। বাইরে ঝড়ের মাতামাতি। কোথাও যাবার উপায় নেই। এখনো অবশ্যি কোথাও যাবার উপায় নেই। কিন্তু এই দুয়ের মধ্যে কত তফাৎ। আমার খুব খারাপ লাগছে। কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে।

AMARBOI.COM

এইটুকু লেখা হওয়া মাত্রই খুব কাছেই কোথাও ঝাঁকে ঝাঁকে গুলির শব্দ হতে লাগলো। ক্যাট ক্যাট করতে লাগলো মেশিন গান। দাদুমণি নীলুর দরজায় ধাক্কা দিয়ে ভীত স্বরে বললেন, 'দরজা খোল নীলু।'

নীলু দরজা খুললো না। দাদুমণি দরজায় ধাক্কা দিতে দিতে বললেন —মেঝেতে শুয়ে পড় নীলু, মেঝেতে শুয়ে পড়।

নীলু তাও করলো না। পাথরের মূর্তির মত বসে রইলো। গুলির শব্দ থেমে গেল, কিন্তু একজন পুরুষ মানুষের চিৎকার শোনা যেতে লাগলো। ভয়াবহ চিৎকার। নীলু দরজা খুলে বেরিয়ে এলো। তার মুখ রক্তশূন্য। সে কাঁপা গলায় বললো, 'ওর কি হয়েছে দাদুমণি?'

ঃ জানি তো না নীলু।

ঃ কেউ কি দেখতে যাবে না ওর কি হয়েছে ?

দাদুমণি সে কথার জবাব দিতে পারলেন না। নীলু দ্বিতীয়বার বললো, 'কেউ কি যাবে না ?'

সাতাশ তারিখ চার ঘন্টার জন্যে কার্ফু তোলা হল। মানুষের ঢল নামলো রাস্তায়। বেশির ভাগই শহর ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। করুণ অবস্থা। যানবহন সে রকম নেই। সময়ও হাতে নেই। যে অল্প কয়েক ঘন্টা সময় পাওয়া গেছে তার মধ্যেই শহর ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যেতে হবে। পথে পথে মানুষের মিছিল, কিন্তু এই মিছিলের চরিত্র ভিন্ন।

বড় রাস্তার সব ক'টি মোড়ে সৈন্যবাহিনী টহল দিচ্ছে। তাদের চোখে মুখে ক্লান্তি ও উল্লাস। তাদের ধারণা যুদ্ধে তাদের জয় হয়েছে। তারা অলস ভঙ্গিতে নতুন ধরনের মিছিল দেখছে। এই মিছিলে আকাশ ফাটানো ধ্বনি নেই। এই মিছিলের কেউ পাশের মানুষটির সঙ্গেও কথা বলে না। শিশু কেঁদে উঠলে মা বলেন—চুপ চুপ। শিশুরা কিছুই বোঝে না, তারা কাঁদে এবং হাসে। নিজের মনে কথা বলে। বয়স্ক মানুষেরা বলে—চুপ চুপ।

যারা পালিয়ে যাচ্ছে, তাদের মধ্যে অনেককেই কাঁদতে দেখা যায়। তাদের কি হয়েছে ? প্রিয়জন পাশে নেই ? যার রাতে বাড়ি ফেরার কথা ছিল সে কি ফেরেনি? প্রশ্ন করবার সময় নয় এখন। যে চার ঘন্টা সময় পাওয়া গেছে, এর মধ্যেই শহর ছাড়তে হবে। সময় ফুরিয়ে আসছে। সবাই দ্রুত যেতে চেষ্টা করে। শিশুরা হাসে ও কাঁদে। কোনো কিছুই তাদের বিচলিত করে না।

মিলিটারিরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে জনস্রোত দেখে। তাদের চকচকে বন্দুকের নল রোদের আলোয় ঝকমক করে। তারা মাঝে মাঝে কথা বলে নিজেদের মধ্যে, মাঝে মাঝে হেসে ওঠে। নিশ্চয়ই কোনো আশা ও আনন্দের গল্প। মজার কোন স্মৃতি নিয়ে তামাশা। ওদের উচ্চস্বরের হাসির শব্দে শুধু শিশুরাই অবাক হয়ে তাকায়। আর কেউ তাকায় না।

কার্ফু শুরু হয় চারটায়। রাস্তাঘাট আবার জনশূন্য হয়ে যায়। শহরের অবস্থা যারা দেখতে বেরিয়েছিলো,তারা ঘরে ফিরে অসম্ভব গম্ভীর হয়ে যায়। দাদুমণি ঘন্টাখানিকের জন্যে গিয়েছিলেন, তিনি ফিরেই শান্ত স্বরে বললেন—শহর ছাড়তে হবে! কালই আমরা শহর ছাড়ব। তারপর আর কোনো কথা বলেন না। বিকেলে চারটা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত তিনি তাঁর ঘরে একা একা বসে থাকেন।

AMARBOI.COM

খোকনদের বাড়ি খুব চুপচাপ হয়ে গেছে।

অঞ্জু আর বিলু এখন আর চেঁচিয়ে এক্কা দোক্কা খেলে না। বড়-চাচা সারাদিন তাঁর নিজের ঘরেই বসে থাকেন। কারো সঙ্গে বিশেষ কথা-টথা বলেন না। খোকনও বেশির ভাগ সময় থাকে তার নিজের ঘরে। সময় শ্লথ হয়ে গিয়েছে। মা মারা গেছেন মাত্র তিন দিন আগে, অথচ খোকনের কাছে মনে হয় বহু বৎসর কেটে গেছে। আজ সকাল-বেলা হঠাৎ কি মনে করে খোকন তার মায়ের ঘরে গেল। সবকিছু আগের মত আছে। মার লাল রঙের চটি দুটি পর্যন্ত যত্ন করে তুলে রাখা।

ঃ খোকন।

খোকন দেখলো, বাবা এসে দাঁড়িয়েছে দরজার পাশে।

ঃ কি করছ খোকন ?

ঃ কিছু করছি না।

ঃ এসো, আমার ঘরে এসো। আমরা গল্প করি।

খোকন তার বাবার সঙ্গে চলে এলো। বাবাও যেন কেমন হয়ে গেছেন। হঠাৎ করে তাঁর যেন অনেক বয়স বেড়ে গেছে।

ঃ খোকন, মা'র জন্যে খারাপ লাগছে ?

ঃ হুঁ।

ঃ লাগাই উচিত।

বাবা অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'ব্যক্তিগত দুঃখই সবচে বড় দুঃখ। আমাদের কথাই ধর। আমরা নিজেদের দুঃখে কাতর হয়ে আছি ঠিক না ?'

ঃ হ্যাঁ।

ঃ কিন্তু দেশের কি অবস্থা হচ্ছে বুঝতে পারছ তো ? খুব খারাপ অবস্থা। এবং যতই দিন যাবে ততই খারাপ হবে।

খোকন কিছু বললো না। নিচ থেকে এই সময় বড়চাচীর কান্না শোনা গেল। বাবা চুপ করে গেলেন। কবীর ভাই এখনো ফিরে আসেননি। বড়চাচী দিন রাত সর্বক্ষণ তাঁর জন্যে কাঁদেন। দিনের-বেলা কিছু বোঝা যায় না। কিন্তু রাতেরবেলা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাবা বললেন, 'একমাত্র মহাপুরুষদের কাছেই ব্যক্তিগত দুঃখের চেয়েও

AMARBOI.COM

দেশের দুঃখ বড় হয়ে ওঠে। আমরা মহাপুরুষ নই। আমাদের কাছে আমাদের কষ্টটাই বড় কষ্ট।

বড়চাচীর কান্নার শব্দ ক্রমেই বাড়তে লাগলো। বাবা চুপ করে বসে রইলেন। তারপর প্রসঙ্গ বদলবার জন্যে বললেন—তোমার কি মনে হয় বঙ্গবন্ধু বেঁচে আছেন?

ঃ আমি জানি না।

ঃ সে তো কেউ জানে না। কিন্তু তোমার কি মনে হয়?

ঃ আমার কিছু মনে-টনে হয় না।

ঃ এভাবে কথা বললে তো হবে না খোকন। এখন থেকে আমাদের সবাইকে ভাবতে হবে। খুব খারাপ সময় আমাদের সামনে।

খোকন চুপ করে রইলো। বাবা শান্ত স্বরে বললেন—

ঃ এখন ওদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ শুরু হবে। সেই যুদ্ধ অনেকদিন পর্যন্ত হয়তো চলবে। এর মধ্যেই তোমরা বড় হবে। কি খোকন, চুপ করে আছ কেন? কিছু বল।

ঃ কি বলব?

ঃ ওদের সঙ্গে যুদ্ধ কিন্তু শুরু হয়ে গেছে।

ঃ কে বলেছে?

ঃ বোঝা যাচ্ছে। আমি বুঝতে পারছি। তোমার কি মনে হয় হচ্ছে না?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ খোকন, এই যুদ্ধে কে জিতবে?

উত্তর দেবার আগেই ছোটচাচী এসে বললেন খাবার দেয়া হয়েছে।

রাহেলাকে দেখে মনে হচ্ছে তাঁর জীবনের ওপর ঝড় বয়ে যাচ্ছে। গত দু'রাতে এতটুকুও ঘুমতে পারেননি। তাঁর চোখের নিচে কালি পড়েছে। মুখ ফ্যাকাশে। বাবা বললেন, 'আমরা একটু পরে আসি?'

ঃ না, এখনই চলে আসেন। ঝামেলা সকাল সকাল চুকে যাক।

ঃ আসছি, আমরা আসছি।

খাবার টেবিলে বড়চাচা বললেন—আমাদের এখন কি করা উচিত, গ্রামে যাব? আমিন চাচা গম্ভীর মুখে বললেন—গ্রামে পালিয়ে গিয়ে কি হবে?

ঃ এখানে এ রকম আতঙ্কের মধ্যে থাকা। সবার মনের ওপর খুব চাপ পড়ছে।

AMARBOI.COM

ঃ গ্রামে পালিয়ে গেলেও সেই চাপ কমবে না। তা ছাড়া কবীর কোথায় আছে আমরা জানি না। ওকে এখানে ফেলে রেখে যেতে পারি না।

ছোটচাচার কথা শেষ হবার আগেই রাহেলা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললো, 'আমি কোথাও যাবো না। আমি আমেরিকা চলে যাব। আমি এই দেশে থাকব না।'

আমিন চাচা কি একটা বলতে চাইলেন। বড়চাচা ইশারা করে তাকে থামিয়ে দিলেন। রাহেলা শিশুদের মত কাঁদতে শুরু করলেন।

ঃ সব ঠিক হয়ে যাবে রাহেলা।

ঃ না কিছুই ঠিক হবে না।

ঃ শান্ত হয়ে বস।

ঃ আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

হঠাৎ আমিন চাচা বললেন—সবাই চুপ। একটি কথাও না। সবাই তাকালো তাঁর দিকে! তিনি চাপা গলায় বললেন—

ঃ শব্দ শোনা যাচ্ছে।

ঃ কিসের শব্দ?

ঃ আমার মনে হয় একটা মিলিটারি গাড়ি এসে থেমেছে।

সবাই নিঃশব্দ হয়ে গেলো। দীর্ঘ সময় কেউ কোনো কথা বললো না। গেটের কাছে কুকুরটি শুধু ঘেউ ঘেউ করতে লাগলো। আমিন চাচা ভুল শুনেছিলেন। ওটা কোনো মিলিটারি গাড়ি ছিল না।

AMARBOI.COM

সাজ্জাদরা নীলগঞ্জে এসে পৌঁছলো আটাশ তারিখ সন্ধ্যায়। খুব ঝামেলা করে আসা। প্রথমে শোনা গেল মীরপুর ব্রীজ কাউকে পার হতে দেওয়া হচ্ছে না। মিলিটারি চেক পোস্ট বসেছে। যারাই শহর ছাড়তে চাচ্ছে তাদেরকেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। যাদের কথাবার্তা পছন্দ হচ্ছে না, তাদের আলাদা সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তাদের ভাগ্যে কি ঘটছে কিছু বলা যাচ্ছে না। দাদুমণিরা মীরপুর ব্রীজের কাছে এসে পৌঁছলেন দুপুরে। তের চৌদ্দজন মিলিটারির একটা দলকে সেখানে সত্যি সত্যি দেখা গেল। এবং দেখা গেল দু'টি ছেলেকে ওরা কি সব যেন জিজ্ঞেস করছে। ছেলে দুটি ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। নীলু বললো, 'ওদেরকে কি জিজ্ঞেস করছে?' দাদুমণি উত্তর দিলেন না। নীলু বললো, 'ওরা এ রকম করছে কেন?'

ঃ তুমি ওদিকে তাকিও না। ওদের যা ইচ্ছে করুক।

সাজ্জাদের বোন বললো, 'ওরা আমাদেরকে ধরবে?'

ঃ না, আমাদের ধরবে না।

ওরা সত্যি সত্যি কিছু বললো না। তবে বাস থেকে প্রতিটি লোককে নামালো। এবং কোনো কারণ ছাড়াই বুড়োমত একটা লোকের পেটে হাঁটু দিয়ে প্রচণ্ড গুঁতো দিল। লোকটি উল্‌টে পড়ে কোঁ কোঁ শব্দ করতে লাগলো। যেন কিছুই হয়নি এমন ভঙ্গিতে মিলিটারির সেই জোয়ান হাত নেড়ে সবাইকে বাসে উঠতে বললো। সবাই বাসে উঠলো। বুড়ো লোকটি উঠতে পারল না। তার সম্ভবত খুব লেগেছে। সে মাটিতেই গড়াগড়ি খেতে লাগলো। নীলু ফিস ফিস করে বললো, 'ওকে মারলো কেন দাদুমণি। ও কি করেছে?'

ঃ জানি না। কিছু করেছে বলে তো মনে হয় না।

ঃ তাহলে শুধু শুধু মারলো কেন?

ঃ মানুষের মনে ভয় ঢুকিয়ে দিতে চায়। এই জন্যেই এইসব করছে। কিংবা হয়ত অন্য কিছু। আমি জানি না।

আরিচাঘাটে পৌঁছে খুব মুশকিল হলো। ফেরী নেই। নৌকায় করে কিছু লোকজন পারাপার করছে। কিন্তু নৌকার সংখ্যা খুবই কম। নৌকা জোগাড় হলো না। মাথার ওপর কড়া রোদ। সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি। নীলু বললো—তার শরীর খারাপ লাগছে।

দাদুমণি চিন্তিত মুখে বললেন, 'ঢাকায় ফিরে যাওয়াই বোধ হয় ভাল। সাজ্জাদ কি বলে?'

ঃ না, ঢাকায় যাব না।

ঃ নীলু তুমি কি বল?

নীলু থেমে থেমে বললো—আমার শরীর খুব খারাপ লাগছে।

সন্ধ্যার দিকে একটা ট্রাক এলো, সেটি আবার ঢাকা ফিরে যাবে। ট্রাকের ড্রাইভার বললো—আপনারা যাবেন ঢাকায়?

না গিয়েই বা উপায় কি? রাত কাটানোর একটা জায়গার দরকার। ট্রাকে উঠেই নীলুর প্রচণ্ড জ্বর এসে গেল। সে দু'বার বমি করে নেতিয়ে পড়লো।

আকাশের অবস্থা ভাল না। ঝড় বৃষ্টি হবে হয়তো। দূরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সাজ্জাদের বোন নীলুকে জড়িয়ে ধরে বসে আছে। আরো চারজন মহিলা আছেন ওদের সাথে। ওরা সবাই বসেছে পাশাপাশি। তাঁদের সঙ্গে তিন-চার বছরের দুটি ফুটফুটে বাচ্চা। এরা ঘুমিয়ে

AMARBOI.COM

পড়েছে। ট্রাকে বসে থাকা লোকগুলো কোন কথা বলছে না। সবাই চিন্তিত। সবাই তাকিয়ে আছে অন্ধকারের দিকে। একজন কে যেন বললো, 'বৃষ্টি নামলে মুশকিল হবে।' কেউ তার জবাব দিল না।

কিছুদূর যাবার পর ট্রাককে আবার ফিরে আসতে হল আরিচা ঘাটে। ঢাকায় যাওয়া যাবে না। খুব গণ্ডগোল হচ্ছে। মিলিটারিরা নাকি মার্চ করে আসছে।

তারা সারারাত বৃষ্টি মাথায় করে ট্রাকে অপেক্ষা করল। নদী পার হবার নৌকা পাওয়া গেল না। কি কষ্ট কি কষ্ট!

সাজ্জাদরা নীলগঞ্জে পৌঁছলে আটাশ তারিখে রাতে। এগারো মাইল হেঁটে প্রচণ্ড জ্বর এসে গেলো নীলুর। সে কয়েকবার বমি করলো। কোথায় ডাক্তার কোথায় কি। নীলগঞ্জের লোকজন পালাচ্ছে, কারণ দেওয়ান বাজারে মিলিটারি এসে গেছে। তারা নির্বিচারে বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে। দেওয়ান বাজার নীলগঞ্জ থেকে মাত্র পাঁচ মাইল।

মিলিটারিরা এদিকেই হয়তো আসবে। নীলগঞ্জের লোকজন নৌকায় করে সুখানপুকুরের দিকে পালাচ্ছে। নীলু বললো, 'দাদুমণি আমি কোথাও যাব না।' দাদুমণি বললেন, 'সুখানপুকুরে ডাক্তার পাওয়া যাবে।' নীলু থেমে থেমে বললো, 'আমার ডাক্তার লাগবে না।' দাদুমণি কি করবেন ভেবে পেলেন না।

ঃ সাজ্জাদ কি করা যায়? যাবে সুখানপুকুরে?

ঃ চলেন যাই।

নৌকা জোগাড় করতে অনেক সময় লাগলো। কেউ যেতে চায় না। গতরাতে নাকি নদীতে গানবোট এসেছিলো। আজও হয়তো আসবে। মাঝিরা বললো—

ঃ হাঁটা পথে যান। হগ্‌গলেই হাঁটা পথে যাইতাছে।

ঃ অসুস্থ একটা মেয়ে সাথে আছে। হাঁটা পথে যাওয়া যাবে না। বড় নদীতে না গিয়ে যেতে পারবে না? বিশাখালি দিয়ে যাও।

কেউ রাজি হয় না। একজনকে শুধু পাওয়া গেল। তার নৌকাটা ছোট। দুপুর রাতে তারা সবাই খোলা নৌকায় করে রওনা হলো। অনেক লোকজন। একটি মাত্র নৌকা।

AMARBOI.COM

সে রাতে আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিলো। সুখানপুকুরের কাছাকাছি আসতেই ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়তে লাগলো।

ঠিক এই সময় রোগামত একটি ছেলে চেঁচিয়ে বললো—'চুপ চুপ। শুনেন সবাই শুনেন। ছেলেটির হাতে একটি ট্রানজিসটার। সে বেতারের ট্রানজিসটার উঁচু করে ধরলো। চেঁচিয়ে বললো—স্বাধীন বাংলা অনুষ্ঠান। স্বাধীন বাংলা বেতার।

ঘোষকের কথা পরিস্কার নয়। ট্রানজিসটারে ঘড় ঘড় শব্দ হচ্ছে। তবু সবাই শুনলো—

"ওরা জানে না আমরা কি চীজ। জানে না ইবিআর কি জিনিস। আমরা ওদের টুটি টিপে ধরেছি। তুমুল যুদ্ধ চলছে। জয় আমাদের সুনিশ্চিত।"

ঘোষকের কথা শেষ হওয়া মাত্র রোগা ছেলেটি বিকট স্বরে চেঁচিয়ে উঠলো—"যুদ্ধ শুরু হয়েছে। যুদ্ধ শুরু হয়েছে। আর আমাদের ভয় নাই। বলেন ভাই সবাই মিলে, জয় বাংলা।" সেখানকার প্রতিটি মানুষ আকাশ ফাটানো ধ্বনি দিল। ছেলেটি বললো—

ঃ আবার বলেন।

ঃ জয় বাংলা।

ঃ বলেন, 'জয় বঙ্গবন্ধু।'

ঃ জয় বঙ্গবন্ধু।

নীলু আচ্ছন্নের মত পড়ে ছিল। সে বিড় বিড় করে বললো, 'কি হয়েছে?'

সাজ্জাদ হাসতে হাসতে বললো, 'নীলু, যুদ্ধ শুরু হয়েছে। আর আমাদের ভয় নেই। স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে বললো।'

ঃ কে যুদ্ধ করছে?

ঃ বাঙালি মিলিটারিরা।

ঃ শুধু ওরা?

ঃ না আমরাও করব। আমিও যাবো।

ঃ তোমাকে কি ওরা নেবে?

সাজ্জাদ দৃঢ় স্বরে বললো, 'নিতেই হবে।'

যুদ্ধ শুরু হলো। রুখে দাঁড়ালো বাঙালি সৈন্য, বাঙালি পুলিশ, আনসার ও মুজাহিদ বাহিনী। তাদের সঙ্গে যোগ দিল এ দেশের

AMARBOI.COM

মানুষ। বৃদ্ধরা যেমন এগিয়ে এল, তেমনি এগিয়ে এল, নিতান্তই অল্পবয়েসী কিশোরেরা। তাদের সবচে বড় অস্ত্র, মাতৃভূমির জন্যে ভালবাসা। দেখতে দেখতে সেই সহায় সম্বলহীন বাহিনী একটি মহা-শক্তিমান দুর্ধর্ষ সৈন্যদলে পরিণত হলো। এদের যুদ্ধ মুক্তির জন্যে, তাই এদের আমরা ভালবেসে ডাকলাম মুক্তিবাহিনী। এদের স্বপ্ন একটিই—অন্ধকার রজনীর শেষে এরা আনবে একটি সূর্যের দিন।

একটি সূর্যের দিনের জন্যে এ দেশের ত্রিশ লক্ষ মানুষকে প্রাণ দান করতে হলো।

AMARBOI.COM

পরিশিষ্ট

খোকন মে মাসের শেষদিকে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেবার জন্যে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। তার আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

মুক্তিযুদ্ধে অসীম সাহসিকতার সঙ্গে মৃত্যুবরণ করবার জন্যে একটি চৌদ্দ বছরের বালককে 'বীর প্রতীক' উপাধি দেওয়া হয়। মেথিকান্দা অপারেশনে এই বালক শত্রুর গুলিতে নিহত হয়। তার নাম সাজ্জাদ। একবার এই ছেলেটি 'ভয়াল ছয়' নামের একটি ছেলেমানুষী দল গঠন করেছিলো। এবং ঠিক করেছিলো 'ভয়াল ছয়ের' সদস্যরা পায়ে হেঁটে আফ্রিকার গহিন অরণ্য দেখতে যাবে।

ছেলেমানুষদের কত রকম স্বপ্ন থাকে।

———